উপক্রমণিকা

মহান দেশনায়ক সুভাষচন্দ্র বসুর নামাঙ্কিত এই মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্মুক্ত শিক্ষাঙ্গনে আপনাকে স্বাগত। সম্প্রতি এই প্রতিষ্ঠান দেশের সর্বপ্রথম রাজ্য সরকারি মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে ন্যাক (NAAC) মূল্যায়নে 'এ' গ্রেড প্রাপ্ত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন প্রকাশিত নির্দেশনামায় স্নাতক শিক্ষাক্রমকে পাঁচটি পৃথক প্রকরণে বিন্যস্ত করার কথা বলা হয়েছে। এগুলি হল— 'কোর কোর্স', 'ডিসিপ্লিন স্পেসিফিক ইলেকটিভ', 'জেনেরিক ইলেকটিভ' এবং 'স্কিল'/'এবিলিটি এনহ্যান্সমেন্ট কোর্স'। ক্রেডিট পদ্ধতির ওপর ভিত্তি করে বিন্যস্ত এই পাঠক্রম শিক্ষার্থীর কাছে নির্বাচনাত্মক পাঠক্রমে পাঠ গ্রহণের সুবিধে এনে দেবে। এরই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে যান্মাসিক মূল্যায়ন ব্যবস্থা এবং ক্রেডিট ট্রান্সফারের সুযোগ। শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক এই ব্যবস্থা মূলত গ্রেড-ভিত্তিক যা অবিচ্ছিন্ন আভ্যন্তরীণ মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে সার্বিক মূল্যায়নের দিকে এগোবে এবং শিক্ষার্থীকে বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত সুবিধা দেবে। শিক্ষাক্রমের প্রসারিত পরিসরে বিবিধ বিষয় চয়নের সক্ষমতা শিক্ষার্থীকে দেশের অন্যান্য উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আন্তঃব্যবস্থায় অর্জিত ক্রেডিট স্থানান্তরে সাহায্য করবে। শিক্ষার্থীর অভিযোজন ও পরিগ্রহণ ক্ষমতা অনুযায়ী পাঠক্রমের বিন্যাসই এই নতুন শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য।

'UGC (Open and Distance Learning programmes and Online Programmes Regulations, 2020' অনুযায়ী সকল উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্নাতক পাঠক্রমে এই সি.বি.সি.এস পাঠক্রম পদ্ধতি কার্যকরী করা বাধ্যতামূলক— উচ্চশিক্ষার পরিসরে এই পদ্ধতি এক বৈকল্পিক পরিবর্তনের সূচনা করেছে। আগামী ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষ থেকে স্নাতক স্তরে এই নির্বাচনভিত্তিক পাঠক্রম কার্যকরী করা হবে, এই মর্মে নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। বর্তমান পাঠক্রমগুলি উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রের নির্ণায়ক কৃত্যকের যথাবিহিত প্রস্তাবনা ও নির্দেশাবলী অনুসারে রচিত ও বিন্যস্ত হয়েছে। বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে সেইসব দিকগুলির প্রতি যা ইউ.জি.সি কর্তৃক চিহ্নিত ও নির্দেশিত।

মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে স্ব-শিক্ষা পাঠ-উপকরণ শিক্ষার্থী-সহায়ক পরিষেবার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সি.বি.সি.এস পাঠক্রমের এই পাঠ-উপকরণ মূলত বাংলা ও ইংরেজিতে লিখিত হয়েছে। শিক্ষার্থীদের সুবিধের কথা মাথায় রেখে আমরা ইংরেজি পাঠ-উপকরণের বাংলা অনুবাদের কাজেও এগিয়েছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ শিক্ষকরাই মূলত পাঠ-উপকরণ প্রস্তুতির ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন— যদিও পূর্বের মতোই অন্যান্য বিদ্যায়তনিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযুক্ত অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞ শিক্ষকদের সাহায্য আমরা অকুণ্ঠচিত্তে গ্রহণ করেছি। তাঁদের এই সাহায্য পাঠ-উপকরণের মানোন্নয়নে সহায়ক হবে বলেই আমার বিশ্বাস। নির্ভরযোগ্য ও মূল্যবান বিদ্যায়তনিক সাহায্যের জন্য আমি তাঁদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। এই পাঠ-উপকরণ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষণ পদ্ধতি প্রকরণে নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। উন্মুক্ত শিক্ষাঙ্গনের পঠন প্রক্রিয়ায় সংযুক্ত সকল শিক্ষকের সদর্থক ও গঠনমূলক মতামত আমাদের আরও সমৃদ্ধ করবে। মুক্ত শিক্ষাক্রমে উৎকর্ষের প্রশ্নে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

পাঠ-উপকরণ প্রস্তুতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাই এবং এই উদ্যোগের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি।

প্রফেসর ড. রঞ্জন চক্রবর্তী

উপাচার্য

প্রথম মুদ্রণ : জানুয়ারি, 2023

ভারত সরকারের দূরশিক্ষা পর্ষদের বিধি অনুযায়ী মুদ্রিত।

Printed in accordance with the regulations
of the Distance Education Council, Government of India.

Netaji Subhas Open University
Under Graduate Degree Programme
Choice Based Credit System (CBCS)
নির্বাচনভিত্তিক মূল্যমান ব্যবস্থা
বিষয় : সাম্মানিক ইতিহাস
(Subject : Honours in History)
Course Code : CC-HI-10
HISTORY OF INDIA VI (c.1605 - 1750s)

: বিষয় সমিতি :

: সদস্যবৃন্দ :

চন্দন বসু
Professor of History
NSOU and Chairperson, BoS

অমল দাস
Professor (Former) of History
University of Kalyani

রূপ কুমার বর্মণ
Professor of History
Jadavpur University

মনোশান্ত বিশ্বাস
Professor of History
Sidho-Kanho-Birsha University

ঋতু মাথুর মিত্র
Associate Professor of History
School of Social Sciences, NSOU

: রচনা :

একক ১ : রাজনারায়ণ পাল
Assistant Professor of History,
Mahadebananda Mahavidyalaya

একক ১২-১৩ : রাজনারায়ণ পাল
Assistant Professor of History
Mahadebananda Mahavidyalaya

একক ২-৫ : কৃষ্ণকান্ত ঢালি
Assistant Professor of History
Gobardanga Hindu College

একক ১৪-১৯ : অশোক কুমার চক্রবর্তী
Registrar (Former),
Institute of Historical Studies

একক ৬-১১ : অশোক কুমার চক্রবর্তী
Registrar (Former),
Institute of Historical Studies

একক ২০-২৩ : রাজনারায়ণ পাল
Assistant Professor of History
Mahadebananda Mahavidyalaya

: সম্পাদনা:

চন্দন বসু
Professor of History, NSOU

: বিন্যাস সম্পাদনা:

চন্দন বসু
Professor of History, NSOU

প্রজ্ঞাপন

এই পাঠ উপকরণের সমুদায় স্বত্ব নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সংরক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ছাড়া এর কোনো অংশের পুনমুর্দ্রণ বা কোনোভাবে উদ্ধৃতি সম্পূণ নিষিদ্ধ।

ড. অসিত বরন আইচ
নিবন্ধক

UG HISTORY
(HI)

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

কোর্স শিরোনাম : History of India VI (c. 1605-1750s)
কোর্স কোড : CC-HI-10

পর্যায় ১ পারসিক সাহিত্য এবং দেশীয় সাহিত্যিক সংস্কৃতি, ইতিহাস, স্মৃতিকথা এবং ভ্রমণ বৃত্তান্ত

একক ১ ❑ উৎস 9-22

পর্যায় ২ জাহাঙ্গির ও শাহজাহানের সময় রাজনৈতিক সংস্কৃতি

একক ২ ❑ মুঘল সাম্রাজ্যের বিস্তার 25-41
একক ৩ ❑ মনসবদার ও জায়গিরদার ব্যবস্থার বিবর্তন 42-49
একক ৪ ❑ সাম্রাজ্যিক সংস্কৃতি 50-56
একক ৫ ❑ গোঁড়ামি এবং সমন্বয়বাদ-নকশবন্দী সুফি, মিয়া মীর দারাশুকো, সরমন্দ 57-62

পর্যায় ৩ ঔরঙ্গজেবের আমলে মুঘল সাম্রাজ্য

একক ৬ ❑ ঔরঙ্গজেবের আমলে রাষ্ট্র ও ধর্ম 65-74
একক ৭ ❑ উত্তরাধিকার দ্বন্দ্ব সংক্রান্ত সমস্যা 75-80
একক ৮ ❑ ঔরঙ্গজেবের ধর্মচিন্তা এবং ধর্মীয় গোষ্ঠী ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্ক 81-88
একক ৯ ❑ ঔরঙ্গজেবের রাজ্য বিস্তার ও সীমাবদ্ধতা 89-103
একক ১০ ❑ সংকটের সূচনা: ঐতিহাসিক বিতর্ক 104-109
একক ১১ ❑ জায়গিরদারি সমস্যা এবং কৃষক বিদ্রোহ 110-118

পর্যায় ৪ দৃশ্য সংস্কৃতি: চিত্রকলা ও স্থাপত্য

একক ১২ ❑	চিত্রকলা	121-130
একক ১৩ ❑	মুঘল স্থাপত্য	131-140

পর্যায় ৫ আঞ্চলিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা

একক ১৪ ❑	রাজপুত রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও রাষ্ট্র গঠন	143-148
একক ১৫ ❑	দক্ষিণ ভারত: মারাঠা জাতির অভ্যুত্থান: শিবাজী	149-156
একক ১৬ ❑	পেশোয়াদের অধীনে মারাঠা সাম্রাজ্যের বিস্তার	157-165
একক ১৭ ❑	মুঘল সাম্রাজ্যের পতন	166-174
একক ১৮ ❑	আঞ্চলিক শক্তির উত্থান	175-191
একক ১৯ ❑	ভারত ইতিহাসে অষ্টাদশ শতক : ঐতিহাসিক বিতর্ক	192-198

পর্যায় ৬ ব্যবসা ও বাণিজ্য

একক ২০ ❑	হস্তশিল্প ও প্রযুক্তি	201-211
একক ২১ ❑	মুদ্রা ব্যবস্থা	212-220
একক ২২ ❑	বাজার; পরিবহন ব্যবস্থা; সামরিক কেন্দ্র	221-229
একক ২৩ ❑	ভারত মহাসাগরীয় সমুদ্র বাণিজ্য	230-245

পর্যায় ১:
ফারসি সাহিত্য এবং দেশীয় সাহিত্যিক সংস্কৃতি, ইতিহাস, স্মৃতিকথা এবং ভ্রমণ বৃত্তান্ত

একক ১ ❑ উৎস

গঠন

১.০ উদ্দেশ্য

১.১ ভূমিকা

১.২ ফারসি সাহিত্য

১.৩ দেশীয় সাহিত্য

১.৪ ইতিহাস

১.৫ স্মৃতিকথা ও ভ্রমণ বৃত্তান্ত

১.৬ উপসংহার

১.৭ অনুশীলনী

১.৮ গ্রন্থপঞ্জি

১.০ উদ্দেশ্য

এই একক পাঠের মধ্যে দিয়ে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আমরা অনুধাবন করতে সক্ষম হব :

- মুঘল যুগের সাহিত্য
- এই যুগে পারসিক সাহিত্য
- পারসিক সাহিত্যের পাশাপাশি দেশীয় সাহিত্যচর্চা
- মুঘল আমলে রচিত ইতিহাস, স্মৃতিকথা ও ভ্রমণ বৃত্তান্ত

১.১ ভূমিকা

মুঘল আমলে সাহিত্যের ক্ষেত্রে যে অভূতপূর্ব বিকাশ ঘটে তা আলোচিত হয়েছে বর্তমান পাঠে। এ যুগে ফারসি সাহিত্যের বিশেষ বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। পাশাপাশি হিন্দি, ওড়িয়া, মারাঠী, অসমিয়া প্রভৃতি দেশীয় ভাষায় অসংখ্য গ্রন্থ রচিত হয়। ইতিহাসকে উপজীব্য করে অনেকে পুস্তক রচনা করেন। র‍্যালফ ফিচ, হকিন্স, এডওয়ার্ড টেরী, টেভার্নিয়ে, মানুচ্চি-র মত ইউরোপীয় পর্যটকেরাও এদেশে তাদের ভ্রমণ অভিজ্ঞতার কথা রেখে যান তাদের বর্ণনায়। সমকালকে জানতে এসব বিদেশিদের বর্ণনা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আলোচ্য পাঠের উদ্দেশ্য হল ফারসি সাহিত্য, দেশীয় সাহিত্য, ইতিহাস গ্রন্থ বা পর্যটকদের বর্ণনা সম্পর্কে পাঠদান করা।

মুঘল আমলে বিভিন্ন ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশ ঘটেছে। তার মধ্যে সংস্কৃত উর্দু আরবি ফারসি ভাষায় রচিত সাহিত্যের কথা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে অনেক কবি সাহিত্যিক পারস্য থেকে ভারতে চলে আসেন। তাদের হাতেই পরবর্তীকালে এ দেশে ফরাসি সাহিত্যে গৌরজ্জ্বল

অধ্যায়ের সূচনা ঘটে। এমনকি সেই সব সাহিত্যের কাছে পারস্যের কাব্য-সাহিত্যও অনেকক্ষেত্রে ম্লান হয়ে যায়। আব্দুস শোভান এপ্রসঙ্গে বলেছেন : '' The literary of forts of these immigrants coupled with similar efforts of indigenous litterateurs created in India intellectual tradition which sometimes seemed to outshine that of Iran itself in output and quality.''

১.২ ফারসি সাহিত্য

এই সব কবি ও সাহিত্যিকদের প্রতিভার দ্যুতির ভারতের ফারসি সাহিত্য উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। বাবর তুর্কি ভাষায় তার যে আত্মজীবনী *তুজুক-ই-বাবরি* রচনা করেছিলেন পরবর্তীকালে তা ফারসিতে অনুবাদ করেন বৈরাম খাঁ-য়ের পুত্র আব্দুর রহিম খান-ই-খানান। এছাড়া আরও তিনবার ফারসিতে বাবরনামা অনূদিত হয়। গোটা মুঘল যুগ ধরে বাবরের আত্মজীবনীর জনপ্রিয়তা ছিল আকাশ চুম্বি। গ্রন্থটিতে বাবর নিজের জীবনের কথা মেলে ধরতে গিয়ে একদিকে যেমন মন্দ দিকটির কথা বলেছেন, অন্য দিকে, তার গুণাবলীর কথাও বলেছেন। ফারগানা ও মধ্য এশিয়ার ভৌগোলিক বৈশিষ্ট, গাছ-পালা, ফুল পশু-পাখি, নদী ঝর্ণার সুন্দর বর্ণনা মেলে এ রচনায়। গ্রন্থটি বাবরের সংগ্রামী জীবনের ইতিবৃত্ত। ১৪৯৫ খ্রিস্টাব্দের রমজান মাসে বাবর ফরগানার সুলতান হন। তিন দিক পাহাড়ে ঘেরা ছোট্ট এই রাজ্যের যখন শাসক হলেন তখন তার বয়স মাত্র ১২ বছর। বাবরের বাবা ওমর শেখ মির্জা ছিলেন ফারগানার অধিপতি। ১৪৯৪ খ্রিস্টাব্দের রমজান মাসে তিনি আখসি দুর্গে অবস্থান করছিলেন। একেবারে খাড়া পাহাড়ের ওপর অবস্থিত এই দুর্গের কিনারায় তিনি কয়েকটা বাড়ি বানিয়েছিলেন। একদিন যখন তিনি তার সাধের পায়রাদের দানা খাওয়াচ্ছিলেন তখন হটাৎ তার পায়ের নিচের পাটাতন সরে যায়। তিনি পায়রার খাচা সমতে পড়ে যান একদম পাহাড়ের নীচেয়। মৃত্যু হয় তার। পিতার মৃত্যুর পর ফারগনার অধিপতি হন তিনি।

ফারসিতে বাবরের বেশ দখল ছিল। ফার্সি ভাষায় এক কবিতার বইও লিখেছিলেন—নাম *মাথনবি-ই-মুবিন*। বাবর তার প্রথম গীতি কবিতায় লেখেন :

নিজেরই আত্মা ছাড়া
পাই নাই, কোনো কালে
হিতৈষী, বিশ্বাসী বন্ধু
এই ভূমণ্ডলে।
অন্তরের বাণী ছাড়া
আর কোনও বাণী
পাই নাই, শুনি নাই,
যে বাণী দেখাবে পথ,
ঘুচাবে মনের গ্লানি।
আর কোনও বন্ধু নাই মোর
নিজের হৃদয় ছাড়া
এই ধরাতলে।' (*বাবরনামা*) অনুবাদ—অতীন জানা।

ঐতিহাসিক লেনপুল বাবর সম্পর্কে বলেছেন, ''In Persian–the language of culture–the Latin of Central Asia-he was an acompliched poet; and his native Turki, he was master of a pure and unaffected style like in prose and verse.'' বাবরের দরবারে তুর্কিদের পাশাপাশি ফারসি-কবি-সাহিত্যিকরাও পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিল। আতিশি কান্দাহারি, নাদির সমরখন্দি, তাইব খাওয়ান্দি প্রমুখ ফারসি কবি সাহিত্যিকরা বাবরের অনুগ্রহভাজন হয়েছিলেন।

পিতার ন্যায় হুমায়ুন ও ফারসি সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিল। আতিশি কান্দাহারি, নাদির সমরখন্দি, তাইব খাওয়ান্দি প্রমুখ ফারসি কবি সাহিত্যিকরা বাবরের অনুগ্রহভাজন হয়েছিলেন।

পিতার ন্যায় হুমায়ুন ও ফারসি সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। নিজেও কাব্য-চর্চা করতেন। ফারসি ভাষায় লিখেছিলেন 'দিওয়ান'। তার দরবারে অনেক জ্ঞানী ব্যক্তির সমাবেশ ঘটেছিল। কাশিম খান মৌজি রচনা করেছিলেন ছয় হাজার কবিতা সমন্বিত গ্রন্থ ইউসুফ-উ-জুলেইখা। আকবরের আমলেও ফারসি সাহিত্যের বিশেষ বিকাশ ঘটে। ফারসি ভাষায় অসাধারণ কিছু গ্রন্থ রচিত হয় এ সময়ে। সাহিত্য-মূল্যের পাশাপাশি সেগুলির ঐতিহাসিক মূল্যও অনন্য। আকবরের সভাকবি গাজালি মাসাদি-র রচনা মসদ-ই-আনোয়ার, মিরাৎ-আল-সিফৎ, নকস-ই-বাদা কুদারাৎ সমকালীন ফারসি সাহিত্যের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তার অপর সভাকবি কবি ফৈজিও অসাধারণ কাব্য প্রতিভা সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন, যদিও তাঁর অধিকাংশ গ্রন্থ সমূহের নাম জানা সম্ভব হয়নি। বদাউনির মতে, তিনি শতাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। তবে নানান কবিতা সংগীত সন্নিবিষ্ট *তবাসির-আল-সুবহ* তার বিখ্যাত গ্রন্থ। শেখ্ আবুল ফজল-বিন-মুবারক নাগরী ছিলেন আকবরের সভায় 'মালিক-উস-শুয়ারা' বা কবি শ্রেষ্ঠ (Poet Laureate)। 'ভারতের তোতাপাখি' খসরুর পরে তিনিই সম্ভবত ভারতের শ্রেষ্ঠ ইন্দো-পারসিক কবি। এই মুবারক নাগরী শেখ ফৈজি নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁর বিখ্যাত পাঁচটি মাসনভি (Manavis) ফারসি ভাষায় রচিত। এগুলি হল মারকাজ-ই-আদওয়ার, সুলেইমান-ওয়া-বিলকিস, নল ওয়া দমন, হফত-ই-কেশওয়ার ও আকবরনামা।

তবে আকবর ও জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে পাণ্ডিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আব্দুর রহিম খান-ই-খানান-এর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আকবরের নির্দেশে তিনি তুজুক-ই-বাবরি ফারসি ভাষায় অনুবাদ করেন। আব্দুর-রহিম-খান-ই-খানান মুঘল অভিজত শ্রেণি ভুক্ত ছিলেন। তার পৃষ্ঠপোষকতায় আরফি সিরাজী, আব্দুল বাকি, নাজিরী নিশাপুরী প্রমুখ ফারসি কাব্য-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেন। রচনাশৈলীর মাধুর্যের জন্য নিশাপুরী খ্যাতি লাভ করেন।

জাহাঙ্গীরের আমলে ফারসি সাহিত্যের বিশেষ বিকাশ ঘটে। বাবরের মত তারও সাহিত্যপ্রীতি ছিল অনন্য। আত্মজীবনী লিখে জাহাঙ্গীর নিজে সাহিত্য প্রতিভার পরিচয় দেন। তার রচিত *তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরী*-তে সাহিত্য ও ইতিহাসের অপূর্ব মেলবন্ধন ঘটে। জাহাঙ্গীর গ্রন্থটি সম্পূর্ণ করে যেতে পারেননি। পরবর্তীকালে হাদিখান গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ করেন। জাহাঙ্গীরের সভাসদ ছিলেন মুতম্মদ খান। ইনি ইকবাল-নামা-জাহাঙ্গীরী রচনা করেন। কামগর খানের মাসির-ই-জাহাঙ্গীরীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

শাহজাহান স্থাপত্য নির্মাণে যেমন উদারহস্ত ছিলেন, কবি সাহিত্যিকদেরও তেমনি পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন অকৃপণভাবে। বিদেশাগত বহু সাহিত্যিক কবি তার রাজসভায় আশ্রয় লাভ করেন। হমদন থেকে আগত আবু তালিম্ কলিম শাহজাহানের সভাকবি ছিলেন। বহু উৎকৃষ্ট দিওয়ালা ছাড়াও বাদশাহ নামে তিনি একখানি

কাব্য রচনা করেন। এছাড়া সেকালের অপর বিখ্যাত কবি ছিলেন তাব্রিজ থেকে আগত মির্জা মহম্মদ আলি ঘাইব। ফারসি কবিতার এক নতুন পদ্ধতি তিনি প্রবর্তন করেন। ঘটনার বর্ণনা কাব্যে প্রকাশ করার রীতির তিনিই ছিলেন পথপ্রদর্শক। এই সময়ে অন্য উল্লেখযোগ্য ফারসি কবি ছিলেন কাসিম খান জুয়েইনী, মীর মহম্মদ হোসেইন সরফি, মহম্মদ হোসেনিন রসমী ও মীর রদা দানিশমর্দী।

বিদেশাগত এসব বহু কবি-সাহিত্যিকরা ছাড়াও ভারতীয় লেখকরাও শাহজাহানের আমলে নিজের প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছিলেন। এদের মধ্যে সৈয়দা আকবরবাদী এবং হাদিক ফতেপুরীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এছাড়া খ্যাতি অর্জন করেছিলেন সুফীবাদী কবি সরমদ। তবে প্রসঙ্গত উল্লেখ্য সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বকালে ফারসি গদ্য লেখকরা প্রধানত ইতিহাস রচনায় মধ্যে নিজেদের সীমিত রাখার চেষ্টা করেন। এসময় তিন তিনটি 'বাদশাহনামা' রচিত হয়। এদের লেখকরা হলে আমিনা-ই-কোজাইনী, আব্দুল হামিদ লাহোরী এবং মহম্মদ ওয়ারিখ।

শাহজাহানের জ্যেষ্ঠ পুত্র দারাশুকো। তিনি গীতা ও উপনিষদ ফারসি ভাষায় অনুবাদ করেন। তাঁর রচিত *মাজমা-উল বাহারিন* গ্রন্থে সুফিবাদ ও হিন্দু ধর্মের মধ্যে সমন্বয়ের আদর্শ উচ্চারিত। শাহজাদা দারাশুকো *সফীনৎ-অল-আউলিয়া* এবং *সকীনাৎ-অল-আউলিয়া* নামক গ্রন্থে যথাক্রমে বিভিন্ন সন্তের এবং নিজের ধর্ম-উপদেষ্টা মীয়াল মীরের জীবনী আলোচনা করেন। শাহজাহানের কন্যা জাহানারাও কাব্য প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তাঁর রচিত *মুনিন-আল-আরওয়াহ* নামক গ্রন্থে খাজা মইনুদ্দিন চিশতির জীবনী সরল ভাষায় সুন্দরভাবে আলোচিত হয়েছে। সে কালে বেশকিছু হিন্দু পণ্ডিতও ফারসি সাহিত্যে বুৎপত্তি লাভ করেন। দারাশুকো-র সহযোগী হিসাবে ফারসি ভাষায় অনুবাদের কাজ করেন চন্দ্রভান পণ্ডিত। *ব্রাহ্মণ* ছদ্মনামে পরিচিত চন্দ্রভান-ই প্রথম ফারসি ভাষারী কবি হিসাবে জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। তার রচিত গজলগুলি খুব জনপ্রয়তা পায়। এছাড়া যশোবন্ত রাও মুন্সী 'দিওয়ান' রচনায় যেমন মুন্সিয়ানা দেখান, তেমনি ভোপত রায় 'মনসবি' রচনার ক্ষেত্রে নিজ প্রতিভার ছাপ রাখেন। আওরংজেবের আমলে মাধোরাও রচিত ইনসা পত্র রচনা পদ্ধতির চরম উন্নতির স্বাক্ষর বহন করে। এছাড়া সুজন রাই, ভগবানদাস, ইশ্বরদাস নাগর কাব্য সাহিত্য রচনায় নিজেদের প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন। মাখনলাল নামে জাহান-ই জাফর নামে এক ব্যক্তি রামায়ণের এক ফারসি সংস্করণ প্রকাশ করেন। ফারসী ভাষায় এ সময়ে বেশ কয়েকজন হিন্দু ইতিহাস রচনা করেন। এদের মধ্যে সুজন রায়ের *রুনা খুলসাৎ-উৎ-তোয়ারিখ* বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

অভিধান রচনার ক্ষেত্রে শাহজাহানের যুগ নতুন পথের দিশারি। *ফারহাঙ্গ-ই-জাহাঙ্গীরী* নামে ১৬৪৮ খ্রিস্টাব্দে ফারসি ভাষায় এক অভিধান প্রণয়ন করেন জামাল উদ্দিন হাসান ইঞ্জু। সম্রাট শাহজাহানের পরামর্শে আবদুল রশিদ তওয়ই রচনা করেন *ফারাঙ্গ-ই-রশিদী*।

ধর্মীয় গোঁড়ামির কারণে ঔরঙ্গজেব কবি ও সাহিত্যিকদের রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা থেকে বঞ্চিত করেন। ফলে তারা মুঘল দরবার থেকে বিদায় গ্রহণ করে। সম্রাটের কন্যা জীব-ঊন-নিসার কাব্য ও কবিতার প্রতি আকর্ষণ ছিল। মকফী ছদ্মনামে তিনি *দিওয়ান-ই-মখফী* নামক কাব্য গ্রন্থ রচনা করেন। তবে সমকালের শ্রেষ্ঠ ফারসি কবি ছিলেন মির্জা আব্দুল কাদির বিদিল। পাটনার বাসিন্দা এই কবি অসংখ্য 'মনসবি' ছাড়াও অসংখ্য গীতিকবিতাও রচনা করেন। বিদেশে খ্যাত ভারতীয় ফারসি কবিদের মধ্যে তিনিই সর্বাপেক্ষা আদৃত।

ঔরঙ্গজেবের আমলে কাব্য সাহিত্য বিশেষ সৃষ্টি না হলেও অনেক ঐতিহাসিক সাহিত্য প্রকাশিত হয়েছে যা সমকালকে জানতে বিশেষ সহায়তা করে। এর মধ্যে ঈশ্বরদাস নাগর ঔরঙ্গজেবের যুদ্ধ জয়ের ইতিহাস লিখেছেন। সুজন রায় ফারসিতে লিখেছেন *খুলাসাৎ-উৎ-তোয়ারিখ*।

১.৩ দেশীয় সাহিত্য

পারসিক সাহিত্য ছাড়াও মুঘল ইতিহাস রচনার উপাদান হিসেবে দেশীয় সাহিত্যের ভূমিকা কম নয়। সে কালে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় অনেক দেশীয় সাহিত্য রচিত হয়েছিল যা থেকে ইতিহাসের তথ্য আহৃত হয়ে থাকে। সম্রাট জাহাঙ্গীরের পৃষ্ঠপোষকতায় কয়েকজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত সাহিত্য চর্চা করেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন জগন্নাথ পণ্ডিত। তিনি রচনা করেন *রস গঙ্গাধর, ভামিনি বিলাস, গঙ্গালহরী জগদাধারণ, আসফ বিলাস*। এ সব কাব্য সাহিত্য থেকে মুঘল আমলের দর্শন, ধর্ম, জ্যোতিশাস্ত্রের অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়। বিকানীরের যুবরাজ দলপত সিংহ সংস্কৃত ভাষায় রচনা করেন *দলপত বিলাস*। কেশব দাসের *'জাহাঙ্গীর চন্দ্রিকা', 'বীরসিংহদেব চরিত'* লালকবি রচিত *'অমর বংশাবলী, 'ছত্রপ্রকাশ'* প্রভৃতি সাহিত্যও মুঘল ইতিহাস রচনার গুরুত্বপূর্ণ আকর। আকবর, জাহাঙ্গীর, শাহজাহানের রাজত্বকালের সামাজিক ধর্মীয় ও রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন জৈন লেখক বানারসী দাস তার *'অর্থকথা'* বা *'অর্ধকথনক'* গ্রন্থে। তার অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল *'বানরসী বিলাস', 'নামমালা'* ও *'নাটকসময়সার'*। রেওয়া-র বাঘেলা রাজাদের ইতিহাস অথা মুঘলদের সাথে তাদের সম্পর্ক জানতে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল বীর-ভানুদয়া কাব্যম্।

হিন্দী, বাংলা, মারাঠী, ওড়িয়া, গুজরাটী ইত্যাদি ভারতীয় ভাষায় রচিত ভক্তিকাব্য সমূহ ধর্মীয় আন্দোলনের অগ্রগতির ইতিহাস রচনার সহযোগী উপাদান। এ প্রসঙ্গে সপ্তদশ শতকের মঙ্গলকাব্য সমূহ যেমন *চণ্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গল* বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

হিন্দি সাহিত্য : সুমতানী যুগে হিন্দি সাহিত্যের যে দ্রুত প্রসার ঘটে মুঘল আমলে তার আরও উন্নতি ঘটে। পঞ্চাদশ শতকে হিন্দি সাহিত্যে যে ভক্তিকলা যুগের সূচনা ঘটে তা সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ভক্তিকলা যুগকে হিন্দি সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ যুগ বলা হয়। এ সময়ের ভক্তিবাদী কবিরা নানান ভক্তি সাহিত্য রচনা করেন। সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মকে কেন্দ্র করে তারা ভক্তিবাদী সাহিত্য রচনা করেন। এদের মধ্যে ধর্মদাস, নানক, দাদু, সুন্দরদাস প্রমূখ ছিলেন নির্গুণ মার্গের সাধক। তাদের ভক্তিবাদী পদগুলি হিন্দি সাহিত্যের অমূল্য সৃষ্টি। এছাড়া সেযুগে জীবনকে কেন্দ্র করে বেশ কিছু গ্রন্থ রচিত হয়। এগুলির মধ্যে মহম্মদ জয়সীর পদ্মবৎ, মনজন্সের মধুমালতী অসমানের চিত্রাবতী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সগুণ ব্রহ্মাকে কেন্দ্র করে সে সব সাহিত্য রচিত হয় সেকালে তাদের মূল উপজীব্য বিষয় ছিল হয় রাম, না হয় কৃষ্ণ। হিন্দি সাহিত্যের অমর কবি তুলসিদাস (১৫৩২-১৬২৩) এযুগেই আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর *রামচরিতমানস* গ্রন্থে গভীর জীবনদর্শন ও সাহিত্যিক উতকর্ষতার মেলবন্ধন লক্ষ্য করা যায়। দীর্ঘকাল ধরে উত্তরভারতের মানুষের জীবনবোধা এ গ্রন্থকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল।

উড়িয়া সাহিত্য : মুঘল যুগে ঐতিহাসিক মূল্য সমৃদ্ধ কয়েকটি ওড়িয়া সাহিত্য হল অচ্যুত নন্দ দাসের *হরিবংশ*, বনমালি দাসের *ইচ্ছাবতী হরণ*, পুরুষোত্তম দাসের *কাঞ্চি কাবেরী*, প্রতাপ রাই-য়ের

সরিসেনা ইত্যাদি। গ্রন্থগুলি উড়িষ্যার ধর্ম, সমাজ সম্পর্কে বহু তথ্য সরবরাহ করে থাকে। তবে উড়িয়া সাহিত্যে ভাষার যাদুকর ছিলেন গজপতি রাজাদের সভাকবি উপেন্দ্র ভদ্র (১৬৭০-১৭২০)। শ্রীচৈতন্যের প্রভাবে উড়িষ্যায় ভক্তিবাদী ভাবধারর প্রভাব বৃদ্ধি পায়। সেখানে ভক্তিবাদী সাহিত্য রচনা করেন দিনকর দাস, অভিমূন্য সামান্ত, কবিসূর্য বলদেব প্রমূখ।

অসমীয়া সাহিত্য : পূর্বভারতে আসাম অঞ্চলে ইতিহাস জানতে 'বরুওহী' সাহিত্যাবলীর ভূমিকা এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। অসমীয়া সাহিত্যে শঙ্করদেব ও মাধবদেব ভক্তিগীতি রচনায় খুব দক্ষতার পরিচয় দেন।

মারাঠা সাহিত্য: মারাঠা-মুঘল সম্পর্কের ইতিহাস, বিশেষত শাহজাহান ও ঔরঙ্গজেবের আমলের মারাঠা ইতিহাস রচনার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল কৃষ্ণাজী অনন্ত-র *শিব ছত্রপতিচেন চরিত*। গ্রন্থটিতে শিবাজীর জীবন ও কার্যকলাপ সম্পর্কে তথ্যের প্রাচুর্য রয়েছে। এমন আরেকটি উল্লেখযোগ্য সাহিত্য হল দত্তাজি রচিত *কলমি বখর*। এছাড়া *শিব-চরিতন প্রদীপ, শিবচরিত সাহিত্য, সার সংগ্রহ* ইত্যাদি গ্রন্থ সমূহ ও মুঘল ইতিহাসের রচনায় সহায়ক গ্রন্থ। মারাঠা সাহিত্যে তুকারাম রচিত 'আভাঙ্গ' রামদদাস ও বামান পণ্ডিতের কথা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

গুজরাটি সাহিত্য : ইতিহাসের উপাদান হিসাবে গুজরাটি সাহিত্যের মধ্যে নাস্‌রি মেহ্‌তা ও অখো-র রচনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মহান গুজরাটি কবি প্রেম নন্দ ছিলেন সপ্তদশ শতকের মানুষ। ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকে তার রচনাও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

১.৪ ইতিহাস

'মুঘল ইতিহাসের কলম্বাস' ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার বলেছেন, "মুঘল সাম্রাজ্যের শিল্পকলা ও ধন-দৌলতের কথা আমরা সকলেই জানি; সে যুগের অট্টালিকা ও চিত্র আজও জগতের চিত্ত বিমোহিত করিতেছে। কিন্তু আমার মনে হয় যে, ঐ যুগের সর্ব্বাপেক্ষা বেশী গৌরবের, আমাদের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা কাজের দাম হইতেছে ঐতিহাসিক সাহিত্যের অজস্র ও বিচিত্রধারা। এগুলির অনুগ্রহে মধ্যযুগের ভারতের অবস্থা, সমাজ ও সভ্যতা অথবা এখনও যেমন অতি সূক্ষ্ম, অতি স্পষ্ট রূপে দেখিতে পাই অন্যযুগের পক্ষে তেমন সম্ভব নহে। এই সব ঐতিহাসিক উপাদান বিভিন্ন শ্রেণীর এবং যেগুলি একই ঘটনা বা রাজত্বকালের উপর নানা দিক হইতে আলোকপাত করে, একটি অপরটিকে সমালোচনা, সংশোধন করিবার উপকরণ-স্বরূপ।"

যদুনাথ মুঘলযুগের ইতিহাসের উপাদানগুলিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করেছেন—

প্রথম শ্রেণি : আকবর থেকে বাহাদুর শাহ (বা প্রথম শাহ্‌আলম) পর্যন্ত (১৫৫৬-১৭১০) পর্যন্ত প্রত্যেক বাদশাহর দীর্ঘ ধারাবাহিক সরকারি ইতিহাস লেখা হয় যেমন—*আকরবনামা, পাদশাহ্‌নামা, আলমগীরনামা* এবং *বাহাদুরশাহনামা*। এর সঙ্গে আত্মজীবনী তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরী-এর কথাও স্মরণে রাখতে হবে।

দ্বিতীয় শ্রেণি : বেসরকারি ইতিহাস। এগুলি সরকারি কর্মচারীদের দ্বারা লেখা হলেও এগুলি 'official history' বা সরকারি আজ্ঞায় দরবারে লিখিত এবং বাদশাহ বা উজিরের দ্বারা অনুমোদিত ইতিহাস থেকে ভিন্ন। এগুলির রচনাপ্রণালী স্বতন্ত্র। ঘটনা ও সন-তারিখের ঘনঘটা কম। বড় রাজকর্মচারীদের জীবনচরিত এর শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত।

তৃতীয় শ্রেণি : এগুলিকে ঠিক ইতিহাস বলা চলে না। খণ্ড ইতিহাস বা ইতিহাসের উপকরণ বলে আখ্যায়িত করা যেতে পারে। দিন-লিপি (ডায়েরী), কোন নির্দিষ্ট সমর অভিযানের রিপোর্ট পূর্ণাঙ্গ ইত্যাদি।

চতুর্থ শ্রেণি ও পঞ্চম শ্রেণি : ইতিহাসের 'কাঁচা মসলা' (যদুনাথ সরকার) এই শ্রেণীর উপাদানগুলি হল সমসাময়িক চিঠি, হাতে লেখা খবরের কাগজ।

ষষ্ঠ শ্রেণি : শাসন সম্বন্ধে কাগজপত্র, চিঠি, আজ্ঞা, আয়-ব্যয়ের বিবরণ হিসাব ইত্যাদি এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

মুঘল সম্রাটরা কোনো বিখ্যাত পণ্ডিতকে বেছে নিয়ে তাকে সরকারি ঐতিহাসিক হিসেবে (Historigrapher Royal) নিযুক্ত করতেন। তাকে তার রাজত্বকালের চিরস্থায়ী ইতিহাস লিখতে আজ্ঞা করতেন। সমস্ত সরকারি বিভাগের—বিশেষত দপ্তরখানার যাবতীয় কাগজপত্র তাকে দেখাবার ও নকল করবার অনুমতি দেওয়া হত। প্রদেশে প্রদেশে হুকুম যেত যে, সেখানকার পুরানো ইতিহাস, আর্থিক অবস্থা, প্রধান ঘটনা ইত্যাদি সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করে রাজধানীতে লেখকের কাছে পাঠানো হবে। ঐ নির্বাচিত লেখকের প্রধান অবলম্বন হত সেনাপতি ও প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের প্রেরিত রিপোর্ট এবং তাদের শিবির ও করদ রাজাদের দরবার থেকে প্রেরিত সাপ্তাহিক বা পাক্ষিক সংবাদপত্র যা প্রথমে *ফর্দ্দ*-এ-ওয়াজেয়া এবং পরে পরচা-এ-আখবার বা আখ্‌বারাৎ নামে পরিচিত ছিল। এগুলি সরকারি 'রেকর্ড অফিস' বা 'বস্তাখানা'য় যত্ন সহকারে রক্ষিত হত। এই বিপুল রেকর্ডের প্রয়োজনীয় অংশ লেখক লিখে নিতেন। পরে তা ব্যবহার করে ইতিহাস রচনা করতেন। বাদশাহ্ নিজ কর্মচারীদের সে পত্র বা ফর্ম্মান পাঠাতেন। (হব্‌স্-উল্-হুকম্) (যা এখানকার গেজেটের নীচেয় যেমন লেখা হয় 'By Order' সেরকম, অনুরূপ), তার নকল (Copy) ঐ কেন্দ্রীয় রেকর্ড অফিসে থাকতো। সম্রাট নিযুক্ত ঐতিহাসিক এগুলির মধ্যে কোন কোন দলিল হুবহু নিজ গ্রন্থে ব্যবহার করতেন। ফলে এই সম সকলের মধ্যে আজও সম্রাটের অনেক নির্দেশ বা হুকুম ঐতিহাসিকদের কাছে সহজলভ্য হয়েছে। 'মূল নির্দেশের' দলিল হয়তো পাওয়া যায়নি।

মুঘল আমলের এই সব সরকারি ইতিহাসগুলি প্রায় দু'শ পঞ্চাশ বছরের ধারাবাহিক কাহিনী জানান দেয়। আকবরের সময় হইতেই এই সরকারি ইতিহাস রচিত হওয়া শুরু হয়। তবে এগুলির সাথে মুঘল ইতিহাসের জন্য উপাদান হিসাবে বাবার, জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনী বা হুমায়ুনের ভৃত্য জৌহর রচিত হুমায়ুনের রাজত্বকালের কাহিনিকেও সঙ্গে রাখতে হবে। এছাড়া খ্বান্দামীর রচিত *কানুন-ই-হুমায়ুনী, হাবিব-আল-সীয়র, কানুন-ই-হুমায়ুন* হুমায়ুনের রাজত্যকালের ইতিহাস। পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত কাল পর্বে আমরা জাহাঙ্গীরের আমল থেকেই আলোচনা করবো।

জাহাঙ্গির শিক্ষা ও সাহিত্যের একান্ত অনুরাগী ছিলেন। মৌলানা মির মুহাদ্দী, মীর্জ্জা আবদুর রহিম প্রমুখ পণ্ডিতদের কাছে তিনি বিদ্যাশিক্ষা লাভ করেন। ফারসি ও তুর্কী উভয় ভাষাই তিনি করায়ত্ত করেছিলেন। তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরী নামে আত্মচরিত রচনা করেন। তার রাজত্বের প্রথম সতের বছরের বিবরণ এতে লিপিবদ্ধ করেন। আর রাজত্বের শেষ দু'বছরের ইতিহাস লেখেন মুতামিদ খান। ইতিহাসের উপাদান হিসাবে এর গুরুত্ব অপরিসীম। নিজ সম্পর্কে কয়েকটি সত্য গোপন করলেও এ গ্রন্থ ছিল তার আত্ম-সমালোচনা। তার সমকালের আরেকটি উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক সাহিত্য হল তিন খণ্ডে রচিত মুতামিদ খাঁ-র ইকবালনামা। জাহাঙ্গিরের আমলের উচ্চ রাজকর্মচারী হবার সুবাদে লেখক অনেক ঘটনাবলী সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন। প্রথম খণ্ড মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাকাল থেকে শুরু করে হুমায়ুনের আমল পর্যন্ত ইতিহাস বর্ণিত। দ্বিতীয় খণ্ডে আকবরের রাজত্বকাল আর তৃতীয় খণ্ডে ঔরঙ্গজেবের শাসনকাল বিধৃত। লেখক নূরজাহান বিদ্বেষী ছিলেন। জাহাঙ্গিরের জীবনের শেষ পর্যায়ের বছরগুলির জন্য ইকবালনামার বই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া মহম্মদ হাজি রচিত *ওয়াকিয়াত-ই-জাহাঙ্গীরী,* গৈরাও খাঁ রচিত *মাসির-ই-জাহাঙ্গীরী,* অজ্ঞাতনামা

লেখক রচিত *ইন্তিখাব-ই-জাহাঙ্গীর* শাহ প্রভৃতি গ্রন্থ তার রাজত্বকাল সম্পর্কিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

ঐতিহাসিক উপাদানে সমৃদ্ধ একাধিক গ্রন্থ রচিত হয়েছে শাহজাহানের রাজত্বকালে। তার মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় *পাদশাহ-নামা*-র। লেখক আব্দুল হামিদ লাহোরী। দু'খণ্ডে বিভক্ত এই গ্রন্থে যুবরাজ খুর্‌রম এবং সম্রাট শাহজাহানের প্রথম ২০ বছরের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। তবে শাহজাহানের রাজত্বের প্রথম ১০ বছরের ইতিহাসের জন্য গ্রন্থটি কাজভিনির গ্রন্থের কাছে ঋণী। পাদশাহনামা নামে আরেকটি গ্রন্থ রচনা করেন লাহোরীর ছাত্র মহম্মদ ওয়ারিশ। গ্রন্থটিতে শাহজাহানের রাজত্বের ত্রিশ বৎসরের ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয়েছে। এক্ষেত্রে সম্রাটের রাজত্বের প্রথম ২০ বছরের জন্য তিনি গুরু লাহোরীর গ্রন্থের ওপর নির্ভর করলেও শেষ ১০ বছরের ইতিহাস রচনায় নিজ অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করেছেন। শাহজাহানাবাদের ইমারতের যে বর্ণনা তিনি দিয়েছেন, অন্যত্র তা দুর্লভ। *পাদশাহনামা* নামের তৃতীয় গ্রন্থটির রচয়িতা মহম্মদ আমিন কাজভিনী। সম্রাট শাহজাহানের নির্দেশে রচিত এই গ্রন্থটি সম্রাটের রাজত্বকালে প্রথম দশ বছরের ইতিহাস বর্ণনা করেছে। শাহজাহানের রাজত্বের প্রথম দশ বছরের জন্য এই গ্রন্থ সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য। কাজভিনী নূরজাহান বিরোধী ছিলেন। তার বিরুদ্ধে শাহজাহানের বিদ্রোহের জন্য তিনি নূরজাহানকেই দায়ী করেছেন। এছাড়া যে যুগে আরো দুটি ইতিহাস গ্রন্থ রচিত হয়—এনায়েত খাঁ-য়ের *শাহজাহাননামা* এবং মহম্মদ-র *আলম্-ই-শালিহ*। এনায়েৎ খাঁ-এর প্রকৃত নাম মহম্মদ তাহির। দরবারের গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারী এই ব্যক্তির কাছে সরকারি নথি সহজলভ্য ছিল। তাছাড়া দরবারী ঐতিহাসিক না হওয়ায় নিরপেক্ষ দৃষ্টি নিয়ে তিনি ইতিহাস বিধৃত করেছেন। শাহজাহানের প্রতি তার পক্ষপাত দেখা গেলও সত্য ঘটনার বর্ণনায় তিনি কুণ্ঠিত হননি। প্রয়োজনে তীব্র ভাষায় তিনি সম্রাটের সমালোচনাও করেছেন। জাহাঙ্গীরের মৃত্যু থেকে গ্রন্থটির সূচনা হয়ে সমাপ্তি হয়েছে শাহজাহানের বন্দীদশায়। শালিহকম্বু রাজকীয় মহাফেজখানার কর্মী হবার সুবাদে অনেক ইতিহাসের উপাদান দেখেছিলেন। প্রথম গ্রন্থটিতে ঔরঙ্গজেবের কর্তৃক আগ্রা দুর্গ অবরোধের সময়কাল পর্যন্ত ইতিহাস বর্ণিত। আর দ্বিতীয়টি আছে শাহজাহানের জন্ম থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত সময়ের ইতিহাস। সমকালীন বিশিষ্ট ধর্মীয় ব্যক্তি, জ্ঞানীগুণি জন, চিকিৎসক, কবি, হস্তাক্ষর বিশারদ-দের জীবনচরিত গ্রন্থ শেষে সন্নিবেশিত হয়েছে। এছাড়া গ্রন্থটির শেষে লেখক যুবরাজ, ওমরাহ, সেনানায়কদের এক তালিকা তাদের পদমর্যাদা অনুসারে দিয়েছেন। মহম্মদ সাদিক খান নাম্নী শাহজাহানের এক কর্মচারী সে কালে রচনা করেন শাহজাহান-নামা নামে অপর একটি গ্রন্থ। সম্রাটের রাজত্বকালে বিভিন্ন ঘটনাবলী এবং তার বন্দীদশার বিবরণ আছে গ্রন্থটিতে। জাহাঙ্গীরের মৃত্যু থেকে গ্রন্থটির সূচনা হয়ে সমাপ্তি হয়েছে শাহজাহাদের বন্দীদশায়। লেখক ছয়হাজারী মনসবদারর ছিলেন। মুঘল রাজকর্মচারীদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের কথা জানা যায় তার রচনা থেকে।

সম্রাট ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালে ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচনা বাধাপ্রাপ্ত হয়। ধর্মীয় কারণে তিনি রাজত্বের ঘটনাক্রমে লিপিবদ্ধ করার বিরোধী ছিলেন। রাজত্বের একাদশ বৎসরে এ সম্পর্কে হুকুমনামা জারি করে ইতিহাস রচনায় নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। তবুও তার আমলে অনেক তথ্যবহুল ইতিহাসগ্রন্থ রচিত হয়েছিল। হতে পারে সেগুলি গোপনে রচিত বা তার হুকুমনামা জারির পূর্বে গ্রন্থিত। এর মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হল মীর্জা মহম্মদ কামীজের *আলমগীরনামা* যা ঔরঙ্গজেবের রাজত্বের প্রথম দশ বছরের ইতিহাস। সরকারি দলিল-দস্তাবেজে নির্ভর এ গ্রন্থ শেষ মহান মুঘলের (ঔরঙ্গজেবের) জন্য বিশেষ মূল্যবান। তখনও সম্রাট ইতিহাস রচনার অপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেননি। তাছাড়া লেখক সরকার নথি ও অন্যান্য উপাদানের উপর নির্ভর করেছিলেন। সুতরাং মুঘল

ইতিহাস সম্পর্কে এটি একই নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ। ঔরঙ্গজেবের আমলের অর্থনৈতিক অবস্থা, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, কৃষির-অবনতি, বণ্যার মত প্রাকৃতিক দুর্বিপাক প্রভৃতি বিষয় এ গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে।

এছাড়া ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হল কাফি খাঁ-এর মুন্তাখাব-উল-লুবাব। গোপনে রচিত এ গ্রন্থে তৈমুরের বংশের ইতিহাস সামগ্রিকভাবে স্থান পেলেও, ঔরঙ্গজেবের শাসনকালই এ গ্রন্থের মূল উপজীব্য। ঔলঙ্গজেরে গুণমুগ্ধ এই ঐতিহাসিমের মধ্যে শিবাজী-বিদ্বেষ স্পষ্ট। তৎসত্ত্বেও আলমগীরের ব্যর্থতা তার নজর এড়ায়নি এবং শিবাজীর দক্ষতাকে তিনি সপ্রশংস দৃষ্টিতে দেখেছেন। গ্রন্থটির রচনা শেষ হয় ১৭৩৩ খ্রিস্টাব্দে। সরকারি দলিল-দস্তাবেজ ও নথি নির্ভর সমকালীন আরেকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল মসীর-ই-আলমগীর। লেখক মহম্মদ শাদী খাঁ। এছাড়া আকিল খাঁ-র *হালাত-ই আলমগীরী* ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালের বর্ণনা সম্বলিত গ্রন্থ। অষ্টাদশ শতকে রচিত মুঘল সাম্রাজ্যের ভৌগোলিক বিবরণমূলক গ্রন্থ চাহার গুলশান্-এসেকালের পথ-ঘাটের বর্ণনা মেলে। ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার এই গ্রন্থের উপর নির্ভর করেই তার প্রথম গ্রন্থ India of Auranzib করেন।

মুঘল আমলের যে সব বেসরকারি ইতিহাস রচিয়িতা আছেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল বখশী নিজামুদ্দীন আহমদ, ফিরিশ্তা এবং খাফি খাঁ। এদের রচনায় বিষয় বিন্যাসের দক্ষতা ভাষা মাধুর্য, অতিশোয়ক্তি বর্জন, নানান গ্রন্থ অনুসন্ধান দ্বারা সত্যে উপনীত হবার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। এদের গ্রন্থে মুঘল বাদশাহদের ঘটনাবলীদের সাথে সাথে প্রাদেশিক মুসলমান রাজ্যগুলির ইতিহাসও লিখিত আছে। দাক্ষিণাত্যের রাজ্যগুলির জন্য ফিরিস্তার ইতিহাস বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ তিনি সেখানকার লোক এবং অনেক দক্ষিণী ঐতিহাসিক উপকরণ তার কাছে সহজলভ্য ছিল। ফিরিস্তার ইতিহাসের সমাপ্তি ঘটে ১৬১৫ সালে। তিন খণ্ডে রচিত ফিরিস্তার গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডটি বিশেষ মূল্যবান। কারণ এতে ঔরঙ্গজেব ও তার বংশধরদের বিবরণ আছে। খাফি খাঁর গ্রন্থ মুন্তখাব-উল্-লুবাব-এ ১৬৮০ থেকে ১৭২৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মুঘল ইতিহাস লিপিবদ্ধ। তবে গ্রন্থটি সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত নয়। কারণ তিনি *মাসির-ই-আলমগীরী* দেখেননি বা আখবরাৎ—ও পড়েন নি।

ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালে হিন্দুদের লেখা দুটি ফার্সী ইতিহাস পাওয়া গেছে। ইতিহাস হিসাবে গ্রন্থ দু'টি খুব মূল্যবান।—নুখসা-ই-দিল্খুসা, অন্যটি ফতুহাৎ-ই-আলমগীরী। প্রথমটির লেখক ভীম সেন। তার জন্মস্থান বুরহানপুর। দ্বিতীয়খানির রচয়িতা ঈশ্বরদাস, তিনি সুবা গুজরাটের পট্টন নগরের অধিবাসী। যদুনাথ সরকার লিখেছেন, 'বই দু'খানি ঐতিহাসিকদের চক্ষে এই জন্য মহামূল্যবান যে, গ্রন্থকারদ্বয় সম্রাট দরবারের কোনো মোসাহেব ছিলেন না। অথচ সেই সময়কার বড় বড় রাজকর্ম্মচারীদের সঙ্গে পরিচয় থাকায় অনেক ঘটনার সঠিক সংবাদ পাইতেন।' ঈশ্বরদাস সেখ-উল্-ইসলামের অধীনে চাকুরি করতেন। ইনি সম্রাজ্যের সর্বপ্রধান কাজী ছিলেন, সর্বদা সম্রাট ঔরঙ্গজেবের সঙ্গে থাকতেন। ঈশ্বরদাস ও তার প্রভুর সঙ্গে সঙ্গে থাকতেন। ফলে উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের নিকট থেকে তিনি অনেক সংবাদ পেতেন। এবং তা-ই তাঁর গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন। ১৬৮৪ খ্রিস্টাব্দে সেখ হজ যাত্রা করলে ঈশ্বরদাস তার কাজ ছেড়ে দেন এবং গুজরাতের শাসনকর্তা গুজায়েত খাঁ-র অধীনে চাকুরি নেন। গুজায়েত খাঁ ঈশ্বরদাসকে যোধপুর পরগণার কতগুলি মহলের আমিন ও শিকদার নিযুক্ত করেন। যশোবন্ত সিংহের মৃত্যুর পর ঔরঙ্গজেব যোধপুর অধিকার করেন। যশোবন্ত সিংহের নাবালক পুত্র অজিত সিংহের অভিভাবক ও রক্ষক ছিলেন দুর্গাদাস। এই দুর্গাদাস পরবর্তীকালে ঔরঙ্গজেবের বশ্যতা স্বীকার করেন। সে কাজে ঈশ্বরদাস মধ্যস্থতা করেছিলেন। ফলে তিনি ঔরঙ্গজেবের কাছ থেকে ২৫০ শত অশ্বারোহীর মনসবদারের পদ লাভ করেন। বৃদ্ধ বয়সে ঈশ্বরদাস তাঁর পৌত্রের অনুরোধে ঔরঙ্গজেবের স্মৃতিকথা লিপিবদ্ধ করেছিলেন। গ্রন্থটিতে শাহজাহানের অসুস্থতা, প্রথম সুজার পরাজয়, মুরাদের বন্দীর, দারা ও সুজার পতন, ঔরঙ্গজেবের

সহিত সাক্ষাৎ ও পলায়ন, সৎনামী বিদ্রোহ ইত্যাদি বহু ঘটনা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে লিখিত। সম্রাটের আদেশে গ্রন্থখানি রচিত হয়নি, অনেক ঘটনা লেখক প্রত্যক্ষ করেছিলেন, অন্যান্য ঘটনার সত্য বিবরণ জানবার সুযোগ ছিল তার—এ সব কারণে ইতিহাসখানি পক্ষপাত দোষে দুষ্ট নয়। তাই বইটির ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম। ১৬৫৭ থেকে ১৬৯৮ পর্যন্ত সময়কালে মালওয়া ও যোধপুরের ইতিহাস রচনার জন্য গ্রন্থটি বিশেষ মূল্যবান। অনুরূপে দাক্ষিণাত্যে মুঘল কার্যকাপ তথা ঔরঙ্গজেবের কার্যক্রম যে গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়েছে, তা হল নক্সা-ই-দিলখুসা। বইটিতে ১৬৭০ থেকে ১৭০৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দাক্ষিণাত্যের মুঘলদের ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে।

মুঘল যুগে বেগশ কিছু গ্রন্থ রচিত হয়েছিল যার উপজীব্য আঞ্চলিক ইতিহাসের ঘটনা প্রবাহ। বাংলাদেশে মুর্শিদকুলি খাঁর রাজত্বকাল সম্পর্কিত এমন এক গ্রন্থ হল সলিমউল্লাহ রচিত তওয়ারিখ-ই-বাংলা। গ্রন্থটিতে ঔরঙ্গজেবের সাথে বাংলার সম্পর্কের ইতিহাসও বিধৃত আছে। বাংলা সম্পর্কিত এমন আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল মহম্মদ মানসুম রচিত *তারিখ-ই-শাহসুজা,* সিতাব খাঁ রচিত *বাহারিস্তান-ই-ঘাইবি,* গুলাম হুসেন সলীম রচিত *রিয়াজ-উস-সালাতিন,* মীর গুলাম হুসেন খান রচিত *সিয়র-উল-মুতক্ষণীণ* ('Manner of the Moderns')। *সিয়র-উল-মুতক্ষরীণ*-এ প্রায় সত্তর বছরের ইতিহাস বর্ণিত। ভারতে মুঘল শক্তির পতন, মারাঠাদের উত্থান ও ইংরেজদের দ্বারা বাংলা দখলের ইতিহাসের বিভিন্ন ঘটনা বর্ণিত হয়েছে গ্রন্থটিতে। মীর গুলাম হুসেন খান ছিলেন দিল্লির এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান। তিনি তার পিতার সঙ্গে দীর্ঘকাল বাংলা বিহার ও উড়িষ্যার নবাব দরবারে কাটিয়েছিলেন। সেই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই তিনি এ গ্রন্থ রচনা করেন।

আসাম ও কুচবিহার সম্পর্কিত তথ্য সমৃদ্ধ গ্রন্থ সাহেবউদ্দিন আহমদ রচিত *'ফতেয়া-ই-আবারিয়া'* ও তারখি-ই-আসম'। সিন্ধু প্রদেশ সম্পর্কিত গ্রন্থ মাসুমী রচিত 'তারিখ-ই-মাসুমী' ও বাগলান-নাম থেকে ঐ প্রদেশের ইতিহাস জানা যায়। বিজাপুর, গোলকুণ্ডার সাথে মুঘলদের সম্পর্কের ইতিহাস জানা যায় এ সময়ে রচিত বেশ কিছু গ্রন্থ থেকে। যেমন—জওহর-বিন্-জওহর রচনা করেনত্ম 'মহম্মদ নামা' বিজাপুরের ইতিহাস, হাবিব উল্লাহের 'তারিখ-ই-আদলশাহী' এবং মীর্জা রফি-র তাজাকিরাত-উল্ মুল্ক। কুতুবশাহী সুলতানদের ইতিহাসকে ভিত্তি করে এ সময়ে সে সব গ্রন্থ রচিত হয়েছিল তাদের মধ্যে অন্যতম সৈয়দ আলি তবতবা রচিত 'বুরহান-ই-মাসির' এবং হাবিবউল্লাহ-র তারিখ-ই-কুতুবশাহী। কাশ্মীরের ইতিহাস সংকলিত হয়েছে মীর্জা হায়দার রচিত তারিখ-ই-রশিদি গ্রন্থে এবং হায়দার মালিকের 'তারখি-ই-কাশ্মীর'এ বাদিউজ্জামান তার লতিফ-উল্ আখবর-এ মুঘলদের কান্দাহার অভিযান সম্পর্কিত উল্লেখযোগ্য তথ্য লিপিবদ্ধ করেছেন। ১৬১৬ সালে আব্দুল বাকি তিন খণ্ডে রচনা করেন 'মাসির-ই-রহিমি' মুঘল অভিজাত আব্দুর রহিম খান-ই-খানান-এর জীবনচরিত। মাসির-ই-রহিম নামে সে গ্রন্থের আব্দুর রহিমের কৃতিত্ব বর্ণনা প্রসঙ্গে মুঘল শাসনের নানান তথ্যাবলী পরিবেশিত হয়েছে।

১.৫ স্মৃতিকথা ও ভ্রমণ বৃত্তান্ত

যুগযুগান্তর ধরে ভারতবর্ষে বিভিন্ন সময়ে বিদেশী পর্যটকগণ ভারতে এসেছেন এবং এ দেশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা তারা লিপিবদ্ধ করেছেন। মেগাস্থিনিসের ইণ্ডিকা, ফা-হিয়েনের *ফো-কুও-কিংবা ইউ-এন-সাং-এর সি-ইউ-কি* এমনই সব ভ্রমণ অভিজ্ঞতার ফসল। ইতিহাসের উপাদান হিসাবে এ সব ভ্রমণবৃত্তান্তর গুরুত্ব অমূল্য। তবে ভিনদেশের দৃষ্টিতে দেখা এ সব গ্রন্থে সর্বদা অবশ্য ভারতীয় সমাজ, ধর্ম, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি সঠিকভাবে প্রতিভাত হয়নি। তাই ইতিহাসের উপাদান হিসাবে ভ্রমণকাহিনীগুলি ব্যবহার করার সময় ঐতিহাসিকের সতর্কতার একান্ত প্রয়োজন। তাছাড়া রয়েছে ভাষাগত সমস্যা। মুঘল যুগে অবশ্য বিদেশী পর্যটকরা দো-ভাষীর সাহায্য নিতেন। ১৬০৫ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে যে সব ইউরোপীয় পর্যটকেরা ভারতে আসেন তাদের মধ্যে ব্রিটিশ

পর্যটক র‍্যালফ্ ফিচ (১৫৮৬-৯১ খ্রিঃ) সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তখন মুঘল সম্রাট ছিলেন আকবর। সমকালীন আর্থ-সামাজিক বিশেষত বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডের বহুল তথ্য তার বর্ণনায় মেলে। জাহাঙ্গিরের আমলে তিনজন ব্রিটিশ দূত মুঘল দরবারে আসেন। এরা হলেন—উইলিয়াম হকিন্স (১৬০৮-১৩), স্যার টমাস রো (১৬১৫-১৮ খ্রিঃ), ও এডওয়ার্ড টেরী (১৬১৬-১৯ খ্রিঃ); হকিন্স ১৬০৭ সালে সুরাট বন্দরে অবতরণ করেন। সেখান থেকে আগ্রা অভিমুখে যাত্রা করেন এবং ১৬০৮ সালে জাহাঙ্গিরের দরবারে পৌঁছান। তুর্কী জানা এই ব্রিটিশ পর্যটকের সাথে অচিরেই জাহাঙ্গীরের সখ্যতা গড়ে ওঠে। সুরাটে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর জন্য ফ্যক্টরী প্রতিষ্ঠা করার জন্য তিনি জাহাঙ্গির কঅনুমোদনও লাভ করেন। তিন বছর তিনি ভারতে ছিলেন। ব্রিটিশ মিউজিয়ামের রক্ষিত হকিন্সের জার্নালে ভারত সম্পর্কিত অভিজ্ঞতার কথা পরবর্তীকালে *দি হকিন্স ভয়েজেস* (The Hawkins' Voyages) গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে।

ভারতে ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্যিক অধিকার লাভের পথে পর্তুগীজ বিরোধীতার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন টমাস রো। জাহাঙ্গিরের সঙ্গী হিসাবে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে পরিভ্রমণ করেন এই ব্রিটিশ রাজদূত। রাজপুতনা সম্পর্কিত তার বর্ণনা ইতিহাসের উপাদান হিসেবে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

এডওয়ার্ড টেরি দেড় বছর পর ভারতে কাটিয়ে ছিলেন স্যার টমাস রো-এর যাজক হিসেবে। তিনি ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল পরিভ্রমণ করে তার অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করেন।

সমকালীন অপর এক পর্যটক ফ্রান্সিসকো পেলসার্ট। জাহাঙ্গিরের রাজত্বকালে এই ডাচ পর্যটক নেদারল্যাণ্ড থেকে ভারতে আসেন এবং এদেশে দীর্ঘদিন অতিবাহিত করে *Remonstrontie* নামে ডাচ ভাষায় একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। পরবর্তীকালে গ্রন্থটি ইংরাজীতে অনূদিত হয় *Jhangir's India* নামে। পেলসার্ট তার বইয়ে এদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস খুব সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এদেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাস রচনার জন্য তার গ্রন্থ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ভারতে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে বিরাট পার্থক্যের কথা তার রচনা থেকে জানা যায়। ভারতীয় কৃষকদের দৈন্য এবং মুঘল রাজ-কর্মচারীদের দ্বারা তাদের উপর অত্যাচারের কথা পেলসার্ট উল্লেখ করেছেন। সপ্তদশ শতকে ভারতের বাণিজ্যিক বা শিল্পজাত পণ্য, কৃষি-পণ্য, মুঘল সরকারের আয়-ব্যয় সম্পর্কিত তথ্য লিপিবদ্ধ করেছেন তার গ্রন্থে।

শাহজাহানের রাজত্বকালে ভারতে আসেন ফরাসী চিকিৎসক ফ্রাসোঁয়া বার্নিয়ের। মিশর থেকে মক্কার জেড্ডা ও মোখা বন্দর হয়ে তিনি ভারতের সুরাট বন্দরে এসে পৌঁছান। ১৬৫৯ থেকে ১৬৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি ভারতে ছিলেন। বার্নিয়ের ছিলেন শিক্ষিত ও পণ্ডিত মানুএ। 'Prince of Travellers' নামে খ্যাত (মোদাভের কাউন্ট বলেছেন) বার্ণিয়ের প্রথমে ঔরঙ্গজেবের অধীনে চিকিৎসকের কাজ নেন, পরবর্তীকালে জনৈক আমির ও সোনবাহিনীর বক্সী দানিশমন্দ খান-এর অধীনে চাকুরী গ্রহণ করেন। সিংহাসনের উত্তরাধিকার নিয়ে শাহজাহানের পুত্রদের মধ্যে বিবাদের ঘটনা তিনি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তার গ্রন্থে লিখে গিয়েছেন।

দারাশুকোকে যখন ঔরংজেব দিল্লিতে বন্দী করে নিয়ে এসে প্রকাশ্য রাজপথে সকলের সামনে উপস্থিত করেন, সেসময়ে বার্নিয়ের দিল্লিতেই ছিলেন। তিনি লক্ষ্য করেন উপস্থিত জনতা তাদের যুবরাজের এই লাঞ্ছনা দেখে সমবেদনা জানালেও কেউই তাকে মুক্ত করার জন্য অসি বার করেনি। ভারতীয়দের এই নিষ্ক্রিয়তা বার্নিয়ের দক্ষতার সাথে বর্ণনা করেছেন। দারার চরিত্র বর্ণনা করে তিনি বলেছেন, যে

দারার ধারণা ছিল যে মানসিক শক্তির দ্বারাই তিনি যেকোনো সমস্যার সমাধান করতে পারবেন। সেজন্য সামরিক শক্তিকে তিনি অবহেলা করেছিলেন। শাহজাহানের অসহয়তা ও ঔরঙ্গজেবের ষড়যন্ত্রমূলক রাজনীতির কথা তিনি স্বল্প পরিসরে অসামান্য ভঙ্গিতে তুলে ধরেছেন তার গ্রন্থে।

বার্ণিয়ের তার রচনায় ঘটনার বিবরণ লিবিদ্ধ করেই কেবল তার দায়িত্ব শেষ করেননি। ঘটনার পশ্চাতপট ও প্রতিক্রিয়াও ব্যাখ্যা করেছেন। যুক্তির কষ্টিপাথরে ঘষে ঘটনাবলীকে তিনি বর্ণনা করেছে। এ জন্য তাঁর রচনা মুঘল ইতিহাস রচনায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

মুঘল যুগে ভূমির ওপর সম্রাটের একছত্র কর্তৃত্ব ছিল বলে তিনি জানিয়েছেন। স্বৈরাচারী শাসনকে তিনি মুঘলদের পতনের জন্য দায়ী করেছেন। বার্নিয়ের মুঘল সাম্রাজ্যের কাঠামো ও তার ভিতরকার বিভিন্ন উপাদান ও তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক তুলে ধরতে চেয়েছেন। তবে এগুলি তাঁর দৃষ্টিতে ফরাসী বিধি-ব্যবস্থা থেকে ভিন্ন ও নিকৃষ্ট বলে প্রতিভাত হয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা সপ্তদশ শতকেই মুঘল সাম্রাজ্যের কাঠামোর ধ্বংসের অনিবার্যতা সম্পর্কে তিনি নিঃসংশয় ছিলেন।

দানিশমন্দ যখন ঔরাঙ্গজেবের আমলে দিল্লি বা শাহজাহানবাদের শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়েছিলেন, তখন অভিজাত মহলে বার্ণিয়ের যাতায়াত সহজ হয়। মুঘল সরকারের কাজের সূত্রে তিনি ভারতের বিভিন্ন শহর পরিভ্রমণ করেন। শাহজাহান থেকে ঔরাঙ্গজেবের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর তিনি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার নিরিখে বর্ণনা করেছেন। আগ্রা দুর্গে বন্দী শাহজাহান সম্পর্কে' মানুচ্চি যা লিখেছেন বার্ণিয়ের তার বিপরীত বক্তব্য রেখেছেন। বন্দি অবস্থায় শাহজাহান প্রিয় কন্যা জাহানারার সঙ্গ ও অন্যান্য বেগমদের সাহচর্য থেকে বঞ্চিত হননি, ধর্মপালনের স্বাধীনতা তাঁর ছিল। এমনকি গায়ক নর্তকীদের সঙ্গসুখ লাভ থেকেও বঞ্চিত হননি। এই তথ্য জানিয়েছেন বার্ণিয়ের। এমনকি ঔরঙ্গজেব তাকে মাঝে মধ্যে উপঢৌকনও পাঠাতেন। কিন্তু মানুচি লিখেছিলেন যে, ঔরঙ্গদেব বন্দি শাহাজাহানের প্রতি কর্কশ ও রূঢ় ব্যবহার করতেন। বার্ণিয়ের বাংলাতেও এসেছিলেন। এখানকার ধান, আখ, চিনি উৎপাদন ও রপ্তানির কথা লিখেছেন। সেই সাথে দক্ষিণবঙ্গে আরাকানী দস্যুদের উপদ্রবের কথাও বর্ণনা করেছেন।

১৬৪০ খ্রিস্টাব্দে এদেশে আসেন অপর এক ফরাসী পর্যটক জাঁ বাতিস্ত টেভার্নিয়ে। তিনি এদেশে দীর্ঘ ২৭ বছর অতিবাহিত করেন। শাহজাহানের জুহুরি ও রত্ন ব্যবসায়ী এই ব্যক্তি দেশের ব্যবসাবাণিজ্য, যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পর্কে মনোজ্ঞ বর্ণনা রেখে গেছেন। থেভেনটের বর্ণনায় এদেশের উৎপাদন ব্যবস্থার ও শাসনব্যবস্থার কথা ধরা আছে। ঐতিহাসিক লেনপুলের মতে, টেভার্নিয়ে-র জুহুরির চোখ দিয়ে ভারতের ইতিহাসকে তাঁর রচনায় মেলে ধরেছেন। স্যার বার্ণিয়ের রচনায় ফুটে উঠেছে তার দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি।

১৬৫৩ খ্রিস্টাব্দে মাত্র চোদ্দ বছর বয়সে ইটালীয় পর্যটক নিক্কোলো বেনেটিয়ান মানুচ্চি ভারতে আসেন। এ দেশেই তার জীবনদীপ নির্বাপিত হয়। দারাশুকোর গোলন্দাজ বাহিনীর সদস্য হিসেবে মুঘল অভিজাতদের সঙ্গে মানুচ্চির সখ্যতা গড়ে ওঠা। উত্তরাধিকারের যুদ্ধের পর তিনি ঔরঙ্গজেবের অধীনে কর্মে নিযুক্ত হন। তাঁর ভারত অভিজ্ঞতার কথা মানুচ্চি চার খণ্ডে রচিত 'স্টোরিও-দো-মোগর' (Storia Do Mogor) নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন। এটির অনুবাদ করেন ইংরেজ আই-সি-এস অফিসার উইলিয়াম আর্ভিন।

পাঁচটি ভাগে বিভক্ত এই গ্রন্তে বর্ণিত হয়েছে :

১. মানুচ্চির ভেনিস থেকে আগ্রা যাত্রা ও বাবর থেকে ঔরঙ্গজেব পর্যন্ত মুঘল সম্রাটগণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

২. ঔরঙ্গজেবের শাসনকাল ও গ্রন্থকারের ব্যক্তিগত ইতিহাস।

৩. মুঘল দরবার, রাজ্য শাসন পদ্ধতি, রাজস্ব ব্যবস্থা।

৪. ১৭০১ খ্রিস্টাব্দ হইতে দাক্ষিণাত্যে মুঘল শিবিরের ঘটনাবলী রও জেসুইট ক্যাথলিকদের কার্যাবলীর বিবরণ।

৫. ১৭০৫ ও ১৭০৬ খ্রিস্টাব্দের ঘটনাবলী।

বার্নিয়ের মতো মানুচ্চি ও শাহজাহানের উত্তরাধিকারী যুদ্ধের সাক্ষী ছিলেন। তার রচনায় সম্রাট শাহ্জাহান ও দারা ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের অনেক বর্ণনা মেলে। সমুদ্রগড়ের যুদ্ধের প্রত্যক্ষ সাক্ষী মানুচ্চি। এই যুদ্ধের পর থেকে দারার মৃত্যু পর্যন্ত সমস্ত ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় *স্টোরিও ডোর মগরে*। বার্নিয়ের রচনা থেকে মানুচ্চির বর্ণনা অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য কারণ দারার সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক থাকায় মানুচ্চি অনেক ঘটনায় প্রত্যক্ষ সাক্ষী ছিলেন। মানুচ্চি লিখেছেন সিংহাসনে বসার আগে ও পরে ঔরংজেব জনগণের সমালোচনার পাত্র ছিলেন। ওরংজেব সিংহাসনের বসলে তিনি পূর্বভারত পরিভ্রমণে বেরিয়ে পড়েন এবং আগ্রা এলাহাবাদ, পাটনা হয়ে হুগলী, কাশিমবাজার পর্যন্ত গমন করেন। এরপর তিনি মাদ্রাজ ও পণ্ডিচেরীতে যান ও সেখানে স্থায়ী ভাবে বসবাস করেন। চিকিৎসক হিসাবে সেখানে তাঁর খুব সুনাম হয় এবং ১৭১৭ খ্রিস্টাব্দে সেখানেই তার মৃত্যু হয়। মানুচ্চির রচনায় এসব স্থানের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের ছবি ফুটে ওঠে।

এছাড়া আরো অনেক পর্যটক ভারত সম্পর্কে তাদের বক্তব্য লিপিবন্ধ করেছেন তাদের রচনায়। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন—যোসেফ শ্যালব্যাঙ্ক (১৬০৯-১৬১০), টমাস বেস্ট (১৬১২-১৬১৪), নিকোলাস ডাউটন (১৬১৪-১৬১৫), ডেলা ভেলী (১৬২৩-১৬২৪), পিটামর মান্ডি (১৬৩০-১৬৩৪), থেভেনট (১৬৬৬-১৬৬৭), টমাস বাউরি (১৬৬৯-১৬৭৯), জেমেল্লি কারেরি (১৬৯৫) প্রমুখ।

১.৬ উপসংহার

বিদেশী রচনায় অনেক ত্রুটি বিচ্যুতি থাকলেও মুঘল ইতিহাস রচনায় সেগুলির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। কারণ মূলত রাজনৈতিক ঘটনাকে কেন্দ্র করেই সেকালে ইতিহাস রচিত হত। সম্রাটের কার্যকলাপ, যুদ্ধ জয়, শাসনতান্ত্রিক পদক্ষেপ, রাজকীয় হুকুমনামা ইত্যাদি বিষয়কে গুরুত্ব দিয়ে সমকালীন লেখকরা ইতিহাস রচনায় ব্রতী হতেন। অনেকে আবার সম্রাট ও প্রশাসকদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করায় তাদের বক্তব্যে পক্ষপাতের নজির বিরল ছিল না। সম্রাটের হুকুমে যে সব ইতিহাস রচিত হত সেখানে সরকারি নীতির সমালোচনা করা সম্ভব ছিল না। তবে মুঘল প্রশাসনের আভ্যন্তরীণ সংবাদ বা সরকারি নথিপত্র বা মহাফেজখানার কাগজপত্র দেখবার সুযোগ থাকায় দরবারি ঐতিহাসিক বা উচ্চ পদাধিকারীদের অধীনস্ত কর্মচারীদের দ্বারা রচিত ইতিহাসে রাজনৈতিক ঘটনার গূঢ় তত্ত্বের সন্ধান মেলে। অন্যদিকে বিদেশি লেখকরা ভারতীয় ঘটনাবলী নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বর্ণনা করার সুযোগ পাওয়ায় তাঁরা নিরপেক্ষভাবে ভারতীয় ইতিহাস তাদের রচনায় তুলে ধরেছেন। তবে তাঁদের কিছু সীমাবদ্ধতা ছিল। অনেক পর্যটকই ভারতীয় ভাষা বুঝতেন না। ফারসি তাদের আয়ত্বে ছিল না। অন্যের মুখের কথার ওপর তাঁরা অনেক সময় নির্ভর করায় তাদের রচনায় অতরঞ্জন বা ভুল তথ্য পরিবেশিত হয়েছে। ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার লিখেছেন, "আমি স্বীকার করি যে, দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা, প্রজাদের সুখদুঃখ, রাস্তাঘাট, শিল্প-বাণিজ্য প্রভৃতি

সম্বন্ধে এবং ভারতীয় শাসন-পদ্ধতি ও সমাজের আলোচনায় এই বিদেশি স্বাক্ষীগুলির কথা আমাদের জ্ঞানের ক্ষেত্রে এক মহা অভাব পূরণ করে। কিন্তু ঐতিহাসিক ঘটনা ধরিলে এই ভ্রমণ কাহিনী ও রিপোর্ট অনেক সময় বিশ্বাসের অযোগ্য, গুজবের উপর নির্মিত অথবা ভাসাভাসা মামুলি কথামাত্র। যে যুগে বিদেশি ভ্রমণকারী ও পাদ্রীগণ পারসেক ভাষায় লেখাপড়া করিতে জানিতেন না, কোনো রকমে উর্দুর সাহায্যে কথাবার্তা চালাইতেন, সুতরাং তাহারা পারসিক ভাষায় লিখিত সরকারি কাগজ বা গ্রন্থ ও পত্রাদির জ্ঞান হইতে বঞ্চিত ছিলেন। এজন্য ফাদার মনসেরাট এবং মানুচ্চি পর্যন্ত হাস্যকর ভুল করিয়া গিয়াছেন, যাহাতে বুঝা যায় যে, তাহাদের পারসিক ভাষার জ্ঞান কর্ণের দ্বারা প্রাপ্ত, চক্ষুর দ্বারা নহে। আবার এই সব সাহেবদের মধ্যে অনেকে ভারতে অতি অল্পদিন মাত্র কাটাইয়াছিলেন, আর কেহ কেহ ছোট নগণ্য মফস্বল শহরে বাস করিতেন; কাজে কাজেই সত্য সংবাদের মূল কেন্দ্র অর্থাৎ রাজসভা ও সেনাপতির শিবির হইতে দূরে থাকায় প্রকৃত তথ্য শুনিতে পান নাই।" ('মুঘল ভারতের ইতিহাস') তবে ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাস রচনায় বিদেশিদের রচনা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বার্ণিয়ে ও মানুচ্চি-র বর্ণনায় ভারতীয় সমাজের বিস্তৃত বর্ণনা মেলে। মুসলিম শাসনকালে হিন্দুদের অর্থনৈতিক অবস্থা যে শোচনীয় হয়ে পড়েছিল, তা বার্ণিয়ের রচনায় লিপিবদ্ধ। দিল্লি ও আগ্রার সন্নিহিত হিন্দু অধ্যুষিত অঞ্চলগুলি যে ধ্বংশ হয়ে গিয়েছিল, তা বার্ণিয়ের রচনা থেকে জানা যায়। হিন্দুদের বাল্য বিবাহ, সতীদাহ প্রথার মত সামাজিক কুপ্রথাগুলিও বিদেশিদের (বার্নিয়ে) রচনায় মেলে। তবে সীমাবদ্ধতা সত্বেও বিদেশিদের বর্ণনার সাথে দেশীয় লেখকদের রচনাগুলি পাঠ করলে মুঘলযুগের এক সামগ্রিক চিত্র পাওয়া সম্ভব।

১.৭ অনুশীলনী

১। মুঘল যুগে ফারসি ও দেশীয় সাহিত্যের বিকাশ আলোচনা করুন।
২। মুঘল ইতিহাস রচনায় বিদেশি পর্যটকদের বর্ণনায় গুরুত্ব আলোচনা করুন।
৩। ইতিহাসের উপাদান হিসাবে আত্মকথা ও ভ্রমণ-বৃত্তান্তর গুরুত্ব আলোচনা করুন।

১.৮ গ্রন্থপঞ্জি

Gupta, Manik Lal (1989). *Sources of Mughal History, 1526-1740,* Atlantic Publishers & Distributors.

নিখিলেশ গুহ এবং রাজনারায়ণ পাল (2015) *যদুনাথ সরকার রচনা সম্ভার*, এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লি:।

ননীগোপাল চৌধুরী (1984) *বিদেশী পর্যটক ও রাজদূতের বর্ণনায় ভারত*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ।

—

পর্যায় ২:
জাহাঙ্গির ও শাহজাহানের সময় রাজনৈতিক সংস্কৃতি

একক ২ ❑ মুঘল সাম্রাজ্যের বিস্তার

গঠন

২.০ উদ্দেশ্য

২.১ ভূমিকা

২.২ জাহাঙ্গির

২.৩ জাহাঙ্গিরের সিংহাসন লাভ ও প্রশাসনিক ঘোষণা

২.৪ মুঘল সাম্রাজ্য সম্প্রসারণে জাহাঙ্গিরের অবদান

২.৫ মেবার জয়

২.৬ বাংলা জয়

২.৭ দাক্ষিণাত্য জয়

২.৮ কাংড়া জয়

২.৯ উত্তর-পশ্চিম ভারত জয়

২.১০ শাহজাহানের সিংহাসন লাভ

২.১১ শাহজাহানের সাম্রাজ্য বিস্তার নীতি

২.১২ দাক্ষিণাত্যে সম্প্রসারণ নীতি

২.১৩ শাহজাহানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত নীতি

২.১৪ শাহাজাহানের মধ্য-এশিয়া নীতি

২.১৫ উপসংহার

২.১৬ প্রশ্নাবলী

২.১৭ গ্রন্থপঞ্জি

২.০ উদ্দেশ্য

এই একক উদ্দেশ্য হল নিম্নলিখিত বিষয়গুলিকে অনুধাবন করা :

- সার্বিক ভাবে মুঘল সাম্রাজ্যের বিস্তারকে অনুধাবন করা

- আকবরের পরবর্তী মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গিরের সময় সাম্রাজ্যের বিস্তার নীতি ও তার ফলাফল
- শাহজাহানের রাজত্বকালে মুঘল সাম্রাজ্যিক বিস্তার
- শাহজাহানের দাক্ষিণাত্য নীতি, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত নীতি ও মধ্য-এশিয়া নীতি

২.১ ভূমিকা

এই এককে সম্রাট জাহাঙ্গির ও শাহজাহানের সময় মুঘল সাম্রাজ্যের সীমা কীভাবে বিস্তার লাভ করেছিল এবং সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য কী ধরনের নীতি এই দুই সম্রাট গ্রহণ করেছিলেন তা বিশ্লেষণ করা হবে। আকবরের সময় মুঘল সাম্রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠা হয়েছিল শুধু নয়, তাঁর সুদৃঢ় নীতি গ্রহণের ফলে উত্তর ভারত সহ বাংলা থেকে গুজরাট পর্যন্ত মুঘল সাম্রাজ্যের সীমা বিস্তৃত হয়। দাক্ষিণাত্যেও মুঘলরা প্রথম প্রবেশ করে আকবরের সময়। জাহাঙ্গিরের মূল দায়িত্ব ছিল আকবরের তৈরি করা সাম্রাজ্যের সংহতি রক্ষা করা ও সাম্রাজিক প্রসারণকে সচল তথা শক্তিশালী রাখা। তাঁর উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হল মেবার, বাংলা ও দাক্ষিণাত্যের উপর মুঘল আধিপত্য সংহত করা। শাহজাহান মুঘল সিংহাসনে আসীন হওয়ার পর সাম্রাজ্যিক প্রসারণ নীতি অক্ষুণ্ণ থাকে। শাহজাহানের অন্যতম লক্ষ্য ছিল, উত্তর-পশ্চিম সীমান্তকে সুরক্ষিত করা ও বিশেষ করে কান্দাহার এর উপর মুঘল আধিপত্য ধরে রাখা। কিন্তু মুঘল রাজকোষ থেকে বিপুল অর্থ ব্যয় সত্ত্বেও এবং একাধিক অভিযান চালানো হলেও শাহজাহানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত নীতি ও মধ্য এশিয়া নীতি প্রত্যাশিত সাফল্য পায়নি।

২.২ জাহাঙ্গির

আকবর ও অম্বরের রাজা বিহারীমলের কন্যা যিনি বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিলেন, তাঁর রাজপুত নাম ছিল হীরা কানওয়ারী বা হরবাঈ এবং মুসলিম নাম ছিল মরিয়াম-উস-জামানির। তাঁরই গর্ভজাত সন্তান ছিল সেলিম। ১৬০৫ সালে আকবরের মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র সেলিম ৩৬ বছর বয়সে আগ্রা দুর্গে নুরুদ্দিন মহম্মদ জাহাঙ্গির নাম নিয়ে দিল্লীর মসনদে বসেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে আকবরের জীবনে প্রথমদিকে তাঁর দুই পুত্র সন্তান মুরাদ ও দানিয়েল-এর মৃত্যু হলে আকবর মানসিকভাবে বিচলিত হন এবং তিনি সুফি সন্ত খাজা মঈনুদ্দিন চিস্তির আজমীর দরগায় প্রার্থনা করেন ও ফতেপুর সিক্রির শেখ সেলিম চিস্তির কাছে পুত্র সন্তানের জন্য আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন। কথিত আছে সেলিম চিস্তির আশীর্বাদেই আকবর পুত্র সন্তান লাভ করেন। ১৫৬৯ সালে সেলিমের জন্ম হলে আকবর এই সন্তের নাম অনুসারে পুত্রের নাম রাখেন সেলিম। ঐতিহাসিক Ashirbadi Lal Srivastava তাঁর *The Mughal Empire, 1526-1803 AD* গ্রন্থে জাহাঙ্গির প্রসঙ্গে লিখেছেন, 'Jahangir was a child of many prayers'. কাজেই সেলিম ছিলেন আকবরের প্রিয়পত্র ও নয়নের মণি।

২.৩ জাহাঙ্গিরের সিংহাসন লাভ ও প্রশাসনিক ঘোষণা

ঐতিহাসিক A. L. Srivastava লিখেছেন, যুবরাজ সেলিমের প্রতি অতিরিক্ত যত্ন নেওয়া হয়েছিল এবং তাঁর শিক্ষার জন্য সাম্রাজ্যের নতুন রাজধানী ফতেপুর সিক্রিতে উপযুক্ত আয়োজন করা হয়েছিল।

এখানে জাহাঙ্গিরের জন্য নতুন ইমারত গঠন করা হয়েছিল। এমনকি যুবরাজ সেলিমের বিদ্যালয় যাওয়ার দিনটি ২৮শে নভেম্বর ১৫৭৩ সালকে স্মরণীয় করে তুলে রাখা হয়েছিল। তাঁর শিক্ষার জন্য একদল দক্ষ শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছিল। যার মধ্যে ছিল ফারসি, তুর্কী, আরবিক, হিন্দি, গণিত, ইতিহাস, ভূগোল ও অন্যান্য বিষয়ের শিক্ষায় শিক্ষিত দক্ষ শিক্ষক। এই শিক্ষকদের মধ্যে আব্দুর রহিম খান-ই-খানান নামক বহু বিষয়ে পারদর্শী দক্ষ শিক্ষক সেলিমকে আরবি ভাষা শিক্ষা, তুর্কী, ফারসি, সংস্কৃত এবং হিন্দি ও কখনও কখনও সামরিক ও কূটনৈতিক বিষয়ের শিক্ষা দ্বারা সেলিমকে আকৃষ্ট করেন। তবে সেলিম ইতিহাস, ভূগোল উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা, সঙ্গীত, অঙ্কন বিদ্যা, সামরিক শিক্ষা ও অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষার প্রতি আগ্রহী হন।

পাশাপাশি সেলিম অতিরিক্ত মদ্যপানের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েন এবং পিতা আকবরের বিরুদ্ধে চক্রান্তে লিপ্ত হন। এমনকি ১৬০১ সালে সেলিম তাঁর পিতার বিরুদ্ধে এলাহাবাদে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। যদিও প্রথমে আকবর বোঝালেও সেলিম তাঁর পিতার বিরুদ্ধে এলাহাবাদে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। আকবর বোঝালেও সেলিম তাঁর কৃতকর্মের পথ থেকে সরে আসেনি। তিনি পুনরায় ১৬০৩ সালে এলাহাবাদে ফিরে এসে পুরনো পথেই চলতে থাকেন। এই অবস্থায় মুঘল অভিজাতদের একাংশ সেলিমের পরিবর্তে তাঁর পুত্র খসরুকে পরবর্তী সিংহাসনের পক্ষে দাবি তোলে। যাইহোক শেষ পর্যন্ত আকবর চাগতাই তাতারদের পরম্পরা অনুসারে খসরুর দাবিকে অগ্রাহ্য করে সেলিমের দাবিকে মান্যতা দেন এবং ১৬০৫ সালে আকবরের মৃত্যুর সময় আসন্ন বুঝে তিনি ২১শে অক্টোবর ১৬০৫ সালে রাজকীয় পাগড়ী সেলিমের মস্তকে পরিয়ে দেন। ১৬০৫ সালের ২৪ অক্টোবর দেহত্যাগ করলে সেলিম মুঘল সাম্রাজ্যের সম্রাট হন। তবে ১৫ বছর বয়সেই সেলিমের সঙ্গে রাজা ভগবান দাসের কন্যা মানবাঈয়ের বিবাহ হয়। পরবরর্তীকালে সেলিম আরও বিবাহ করেন যেমন রাজা উদয় সিংহের কন্যা যোধাবাঈ বা বেগম নূরজাহানের কথা বলাই যায়।

২.৪ মুঘল সাম্রাজ্য সম্প্রসারণে জাহাঙ্গিরের অবদান

১৬০৫ সালে সিংহাসনে বসার পর জাহাঙ্গির তাঁর শত্রু ও প্রতিদ্বন্দ্বী অভিজাতদের ক্ষমা করেন ও তাদের পদমর্যাদা ফিরিয়ে দেন। এই সময়ায় জাহাঙ্গিরের চক্রান্তে আকবরের সভাসদ আবুল ফজল নিহত হন। তবে জাহাঙ্গির আবুল ফজলের পুত্র খান-ই-খানানকে সম্মানজনকপদ প্রদান করেন। এমনকি মীর্জা আজিজ কোকাকেও তিনি আগের পদেই বহাল রাখেন। মানসিংহকেও ক্ষমা করেন ও মনসব পদে বহাল রাখেন। এছাড়াও জাহাঙ্গির তাঁর সমর্থকদের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করেন। এই সময় নূরজাহানের পিতা মীর্জা গিয়াস বেগকে ১৫০০ মনসবদারের পদ প্রদান সহ 'ইতিমাদ্দৌউলা' খেতাব প্রদান করেন।

জাহাঙ্গির প্রশাসনিক ক্ষেত্রে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য আগ্রা দুর্গের শাহ বুরুজ থেকে যমুনা নদীর তীর পর্যন্ত ৩০ গজ লম্বা সোনার তৈরি ঘণ্টাযুক্ত শিকল প্রজাদের জন্য টানিয়ে দেন। প্রজারা শিকল ধরে টানলে সম্রাটের ঘরে ঘণ্টা বাজত। সম্রাট আবেদনকারীর প্রার্থনা নিজে বিচার করতেন। তবে

শিকলের অপব্যবহার করলে কঠোর শাস্তি দেওয়া হত। যাইহোক জাহাঙ্গিরের এই জাতীয় পরিকল্পনাকে একজন স্বৈরাচারী শাসকের ন্যায়-পরায়ণতা ও প্রজাকল্যাণকারী মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ হিসাবেই গণ্য করা যায়। তাছাড়াও জাহাঙ্গির ১২টি আইন বা দস্তুর-উল-আলম জারী করেন। তবে এই আইনগুলি কতটা সঠিকভাবে প্রয়োগ করা হয়েছিল তা সমসাময়িক তথ্য থেকে সঠিক জানা যায় না। আসলে প্রশাসনিক দক্ষতার ক্ষেত্রে আকবরের মতো বিরাট ব্যক্তিত্বের কাছে জাহাঙ্গির অবশ্যই অনেকাংশে ম্লান। তবে তিনি একেবারে অপদার্থ ছিলেন এমন মনে করার কোনো কারণ নেই। এমনকি জাহাঙ্গির উদারতার সঙ্গে শাসন চালাতে বিভিন্ন আইন জারী করেন, পাশাপাশি তিনি মুঘল কারাগারে বন্দি বহু মানুষকে মুক্তির আদেশ জারী করেন। তবে পিতা পুত্রের মধ্যে সম্পর্ক খুব সুখকর ছিল না। ১৬০৬ সালে জাহাঙ্গির পুত্র খসরু শাহ আগ্রা দুর্গ থেকে পালিয়ে মথুরার শাসক হুসেন বেগের সঙ্গে মিলিত হয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। অন্যদিকে খসরু পাঞ্জাবের তরন-তারনে শিখগুরু অর্জুনের আশীর্বাদ ধন্য হলে জাহাঙ্গির বিচলিত হয়ে পড়েন এবং 'ভারোত্তয়ালের যুদ্ধে' খসরুর বাহিনীকে বিদ্ধস্ত করেন। খসরু কাবুলের দিকে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে চেনাব নদী পার হওয়ার সময় মুঘল সেনার হাতে বন্দী হন। তবে সম্রাট জাহাঙ্গির খসরুকে কারাবন্দীর নির্দেশ দিলেও তাঁর অন্যান্য সহযোগীদের নিষ্ঠুরতার সঙ্গে হত্যা করার নির্দেশ দেন।

অবশ্য কিছুদিনের মধ্যে খসরুর প্রতি সম্রাট জাহাঙ্গিরের মনভাব পিতৃস্নেহে পরিবর্তিত হয় এবং ক্ষমা প্রদর্শনের কথা ভাবেন। ১৬০৭ সালে জাহাঙ্গিরের জীবন যাত্রায় এক চক্রান্তে খসরু জড়িত এমন সম্ভাবনা তৈরি হলে সম্রাটের নির্দেশে মহবত খাঁ রাজপুত্র খসরুর দুই চোখ অন্ধ করে দেন। পুত্র খসরুর প্রতি পিতা সম্রাট জাহাঙ্গিরের এই সন্দেহবশত নিষ্ঠুরতা তাঁর চরিত্রে কালিমা করেছে। আসলে খসরু রাজপুত্র হিসাবে বহুগুণের অধিকারী ছিলেন। তাঁর চরিত্র ছিল নির্মল, চিন্তাধারা ছিল উদার। এমনকি জাহাঙ্গিরের বহু সভাসদ মনে করতেন যে, খসরু তাঁর পিতামহ আকবরের ভাবধারা ও গুণাবলীর প্রকৃত উত্তরাধিকারী ছিলেন। খসরুর জনপ্রিয়তা দেখে পিতা জাহাঙ্গির ও অপর ভ্রাতা খুররম (শাহাজাহান) আশঙ্কিত ছিল। তাই খুররম নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য ১৬২২ সালে তাঁর দায়িত্বে রাখা বন্দী খসরুকে সফলভাবে হত্যার ষড়যন্ত্র করে। এই ভাবে ভাগ্যের পরিহাসে হতভাগ্য খসরুর জীবনের বিয়োগয়ান্ত পরিণতি ঘটে। তবে জাহাঙ্গিরের ক্রোধের উপশম হলে তিনি পুত্রের জন্য দুঃখিত হন এবং তাঁর চোখের চিকিৎসার জন্য অদ্রা নামে একজন পারসিক হাকিম নিযুক্ত করেন। তাঁর চিকিৎসায় খসরু কিছুটা দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেলেও বন্দীশালায় তাঁর স্বাস্থ্য ও মনোবল নষ্ট হয়ে যায়।

২.৫ মেবার জয়

পিতা আকবরের মত জাহাঙ্গির সাম্রাজ্য সম্প্রসারণের নীতি গ্রহণ করেন। বলা যায় পিতার অসম্পূর্ণ কাজ সম্পূর্ণ করাই ছিল তাঁর প্রাথমিক লক্ষ্য। প্রথমেই তিনি শাহজাদা পারভেজের নেতৃত্বে কুড়ি হাজার সেনার বিরাট বাহিনী মেবারের বিরুদ্ধে পাঠান। কিন্তু এক্ষেত্রে তাঁর সাফল্য না আসায় ১৬০৮ সালে মুঘল সেনাপতি মহবত খাঁর নেতৃত্বে পুনরায় মেবার রাজ্য আক্রমণ করেন। তবে এই অভিযানেও জাহাঙ্গিরের সাফল্য আসেনি। এই পরিস্থিতিতে সম্রাট জাহাঙ্গির নিজের নজরদারীর মধ্য দিয়ে শাহজাদা খুররম বা শাহজাহানের নেতৃত্বে ১৬১৩ সালে রাজপুত রাজ্য মেবার আক্রমণ করেন এবং এক্ষেত্রে তিনি সাফল্য

পান। আসলে শাহজাহানের চরম অত্যাচার, অবরোধ, লুণ্ঠন ইত্যাদি পদক্ষেপের সামনে রাজপুতদের মনোবল ভেঙ্গে পড়ে। এই সময় মেবারের খাদ্যাভাব ও দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে রানা অমর সিংহ মুঘলদের সঙ্গে ১৬১৫ সালে সন্ধি করতে বাধ্য হন। তবে এই সন্ধির শর্তের ক্ষেত্রে সম্রাট জাহাঙ্গির যথেষ্ট ধৈর্য ও বিচক্ষণতার পরিচয় দেন। এইভাবে মেবার মুঘল অধীনতা স্বীকার করে নেয় এবং প্রয়োজনে মুঘল সম্রাটকে সৈন্য সাহায্য দিতে সম্মত হয়। অন্যদিকে এই শর্তের বিনিময়ে রানা অমর সিংহ তাঁর সমগ্র ভূখণ্ড ফিরে পান। এমনকি রানা অমর সিংহের পুত্র ৫০০০ মনসবদারি পান। জাহাঙ্গির তাঁর আত্মজীবনী তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরিতে স্বীকার করেছেন যে, "মেবার আমার পিতা বা হিন্দুস্থানের কোন বাদশাহর কাছে মাথা নত করেন নি। প্রকৃত সত্য হল এই অসম্ভব সম্ভব হয়েছে আমার রাজত্ব কালে। "এমন কি ঐতিহাসিক A.L. Srivastava বলেছেন, "The treaty is a landmark in the history of the relations between Mewar and Delhi. No ruler if the Sisodia dynasty even before openly professed allegiance to any Mughal emperor." বাস্তবিকপক্ষে সম্রাট জাহাঙ্গির ও তাঁর পুত্র খুররম এই সাফল্যের দাবিদার ছিলেন। বলা যায় উভয়ের সম্মানহানি না ঘটিয়ে এই সাফল্য উভয়পক্ষের মধ্যে দীর্ঘ দিনের শান্তির সম্পর্ক তৈরি করেছিল। তবে নামমাত্র বশ্যতা স্বীকার করে মেবার কার্যত স্বাধীনই ছিল। অন্যদিকে রাজপুতদের সঙ্গে জাহাঙ্গির যে ধরনের ব্যবহার করেন তা একাধারে যেমন রাজপুতদের বীরত্বের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন তেমনি সম্রাট হিসাবে জাহাঙ্গিরের মহানুভবতা ও বিজ্ঞতার পরিচায়ক বলেই গণ্য হওয়া উচিত।

২.৬ বাংলা জয়

আকবরের শাসনকালে বাংলা জয় সম্পূর্ণ রূপ লাভ না করায় বাংলার শাসনের ক্ষেত্রে মুঘল আধিপত্য সেভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বাংলার 'বার ভুঁইয়ারা' কার্যত স্বাধীনভাবেই শাসনকার্য পরিচালনা করতেও থাকে। তার উপর বহু আফগান সামন্ত রাজা শক্তিশালী হয়ে ওঠেন। এই অবস্থায় মানসিংহ বাংলা থেকে চলে যেতেই আফগানরদের তৎকালীন নেতা উসমান খান মুঘল আধিপত্যকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। ফলে মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গিরের সামনে নতুন সমস্যা তৈরি হয়। ১৬০৬ সালে জাহাঙ্গির তাঁর একান্ত অনুগত অনুচর ইসলাম খাঁকে (সেলিম চিস্তির পুত্র) বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করেন। এই সময় তিনি মুসা খানকে (সোনার গাও-এর আফগান সামন্ত) পরাজিত করেন। ইতিমধ্যে কুলতু খান, ঈশা খান, সুলেমান খান ও যশোহরের সামন্ত প্রতাপাদিত্য এবং শ্রীহট্টের যুদ্ধে (১৬১২ খ্রিস্টাব্দ) ওসমান খান মুঘলদের কাছে পরাজিত হন। এর ফলে বাংলায় আফগান ও হিন্দু সামন্ত রাজাদের প্রতিরোধের অবসান হয়। কিছুদিনের মধ্যেই মুঘল সাম্রাজ্য পূর্ব বাংলার সমুদ্র উপকূল পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। এমন কি মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গির বাংলার রাজধানী রাজমহল থেকে ঢাকায় সরিয়ে নিয়ে যান এবং ঢাকায় জাহাঙ্গিরনগর নামে নগর প্রতিষ্ঠা করেন। তবে এ প্রসঙ্গে আমাদের মনে রাখতে হবে অসমের অহোম রাজাদের প্রতিরোধের মুখে মুঘল খুব একটা সফল হয়নি। বিচক্ষণ জাহাঙ্গির বাংলার ক্ষেত্রে শান্তি বজায় রাখার নীতিই গ্রহণ করেন। তিনি আফগানদের বিভিন্ন উচ্চ অভিজাত পদ বিতরণ করেন। এই সব কাজ জাহাঙ্গিরের দূরদর্শী সাম্রাজ্যবাদী নীতির পরিচয়।

২.৭ দাক্ষিণাত্য জয়

ঐতিহাসিক A.L. Srivastava তাঁর গ্রন্থে দেখিয়েছেন জাহাঙ্গির তাঁর জীবনের প্রথম দিকে সাম্রাজ্য বিস্তারের ক্ষেত্রে পিতা আকবরের নীতিকে গ্রহণ করেন ও আকবরের অসম্পূর্ণ কাজকে সম্পূর্ণ করার চেষ্টা করেন। দাক্ষিণত্যের ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম হয়নি। দক্ষিণ ভারতের ক্ষেত্রে আহমদনগর আকবরের নিকট পরাজিত হয় এবং তার একাংশ মুঘল সাম্রাজ্যভূক্ত হয় যা জাহাঙ্গিরের রাজত্বের সূচনাতে অনেকাংশেই স্বাধীন মনোভাবের পরিচয় দেন। জাহাঙ্গির আহমদনগরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেও সম্পূর্ণভাবে সাফল্য তিনি কোনদিনই পাননি। তার কারণ অবশ্যই আহমনগরের নিজামশাহী বংশের উজির বা মন্ত্রী মালিক অম্বরের কৌশলী নীতি। এই ব্যক্তি ছিলেন আবিসিনীয় বা হাবসী ক্রীতদাস। যিনি প্রথম জীবনে বিজাপুর ও মুঘল সাম্রাজ্যের অধীনে কাজ করে প্রচুর অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। সুদক্ষ শাসক ও কূটনীতিবিদ এবং সফল সেনা পরিচালক বারবার জাহাঙ্গিরকে কঠিন প্রতিরোধের মধ্যে ফেলে দেন।

আসলে জাহাঙ্গির সিংহাসন লাভের পর থেকে সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লে সেই সুযোগ দক্ষিণের রাজ্য আহমদনগর ও খান্দেশ এর নিজামশাহী বংশের শাসকরা মালিক অম্বরের নেতৃত্বে মুঘল প্রভুত্বের সম্ভাবনাকে শিথিল করার চেষ্টা শুরু করেন। এই প্রচেষ্টা বিজাপুরসহ দক্ষিণের অন্যান্য অংশেও কমবেশি দেখা যায়। এর ফলে দক্ষিণের আহমদনগর ও বিজাপুরের মধ্যে মিত্রতার সম্পর্ক তৈরি হয়। এই পরিস্থিতিতে মালিক অম্বরের নেতৃত্বে আদিলশাহী ও নিজামশাহী বংশের মধ্যে মৈত্রীর বিষয়টি জাহাঙ্গির যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েই উপলব্ধি করতে সচেষ্ট হন। তাই জাহাঙ্গির ১৬০৮ সালে আব্দুর রহিম খান-ই-খানানকে আহমদনগরের বিরুদ্ধে পাঠান কিন্তু তিনি সফল না হলে জাহাঙ্গির পরবর্তীকালে ১৬১০ সালে খান-ই-জাহান লোদী ও মানসিংহকে একদিক থেকে এবং অন্যদিক থেকে আবদুল্লা খানকে আহমদনগর আক্রমণের নির্দেশ দেন। কিন্তু আবদুল্লা খানের বিচক্ষণতার অভাব এই অভিযানকে ব্যর্থ করে। তার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে মালিক অম্বর মুঘল অধিকৃত অঞ্চল অধিকারভুক্ত করার উদ্যোগী হন।

এই সময় রাজপুত রাজ্য মেবারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শেষ করে সফল যুবরাজ খুররম দিল্লীতে ফিরতে সম্রাট জাহাঙ্গির তাঁকে দাক্ষিণাত্যের পাঠান এবং তিনি স্বয়ং মাণ্ডুতে শিবির তৈরি করে সমস্তটা নজরে রাখেন। ১৬১৬ সালে মুঘল বাহিনী খুররমের নেতৃত্বে আহমদনগর আক্রমণ করে অধিকার করতে সক্ষম হন। তবে যুবরাজ খুররম খান-ই-খানানসহ অভিজ্ঞ সেনাপতিদের পরামর্শে আহমদনগরের সঙ্গে সন্ধি করতে উদ্যোগী হন। শেষ পর্যন্ত উভয় পক্ষ সন্ধিতে আবদ্ধ হন। আবার এ বিজয়ের সূত্রে খুররমের প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায়। কেননা সম্রাট জাহাঙ্গির খুররমকে 'শাহজাহান' (বিশ্বের রাজা) উপাধী প্রদান করেন। তবে বেশির ভাগ ইতিহাসবিদগণ মনে করেন মুঘলদের এই জয় ছিল 'অলীক' যার সঙ্গে বাস্তবিকতার কোন যোগ ছিল না। যদিও ১৬১৭ সালের এই সন্ধির শর্তানুসারে বালাঘাট অঞ্চল ও আহমদগরের দুর্গ এবং বার্ষিক ১২ লক্ষ টাকা আহমদনগরের শাসকরা মুঘলদের দিতে রাজি হয়। কিন্তু আহমদনগরের মন্ত্রী মালিক অম্বর এই সন্ধিকে সাময়িক যুদ্ধ বিরতি বলে গণ্য করেন। ঐতিহাসিক বেণী প্রসাদ বলেন, "এই সত্য কোনভাবেই গোপন করা যাবে না যে, কোটি কোটি টাকা ব্যয় এবং হাজার হাজার মানুষের

প্রাণ বলি দিয়েও দাক্ষিণাত্যে মুঘল সীমানা ১৬০৫ সাল থেকে এক মাইলও প্রসারিত হয়নি। " তাই ১৬২০ সালে মালিক অম্বর সন্ধির শর্ত অগ্রাহ্য করে বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করে আহমদনগর দুর্গ আক্রমণ করেন। মুঘলরা আহমদনগর দুর্গ ত্যাগ করে বুরহানপুরে প্রাথমিক ভাবে আশ্রয় নেয়। এই সময় পুনরায় শাহাজাহানের নেতৃত্বে মুঘলরা আহমদনগর আক্রমণ করে এবং মালিক অম্ভরকে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করেন। পুনরায় মুঘল ও আহমনগরের মালিক অম্ভরের মধ্যে সন্ধি হয়। যার ফলে মুঘলরা আহমদনগরের উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। পাশাপাশি আহমদনগর, বিজাপুর এবং গোলকুণ্ডা যথাক্রমে ১২ লক্ষ, ১৮ লক্ষ, এবং ২০ লক্ষ টাকা কর দিতে রাজি হয়। কিন্তু ১৬২২ সালে বিজাপুর ও আহমদনগরের মধ্যেকার মৈত্রী ভেঙ্গে গেলে দাক্ষিণাত্যে বিশৃঙ্খল পরিবেশ তৈরি হয়। আবার এই সময় পিতা জাহাঙ্গিরের বিরুদ্ধে পুত্র শাহাজাহান বিদ্রোহ ঘোষণা করলে মালিক অম্ভরের কাছে পুনরায় মুঘলদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের সুযোগ আসে এবং ১৬২৪ সালে 'The battle of Bhatvadi' বা ভাটভাদির যুদ্ধের মুঘল ও বিজাপুরের সম্মিলিত বাহিনীকে পরাস্ত করেন এবং মুঘলদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তিনি আহমদনগর পুনর্দখল করেন। তবে ১৬২৬ সালে মালিক অম্ভরের মৃত্যু হলে অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন হয়। তিনি যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিন মুঘলদের বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রতিরোধ আন্দোলন চালিয়ে যান, যা মালিক অম্ভরের কৃতিত্বের সবচেয়ে বড়দিক হিসাবে গণ্য হয়। এই আলোচনা থেকে স্পষ্ট যে জাহাঙ্গিরের দাক্ষিণাত্য নীতির সাফল্য প্রশ্নাতীত নয়।

২.৮ কাংড়া জয়

মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গির তাঁর আত্মজীবনী তুজুক-ই-জাহাঙ্গির গ্রন্থে দাবি করেন যে, তিনি প্রথম মুসলমান সম্রাট যিনি প্রথম কাংড়া জয় করেন। যদিও তাঁর এ জাতীয় দাবীর সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়। তথাপি বলা যায় কাংড়া জয় জাহাঙ্গিরের রাজত্বের বিরল কৃতিত্ব। আসলে ভৌগোলিক দিক থেকে চারদিকে পাহাড়-পর্বত বেষ্ঠিত কাংড়া দুর্গটি ছিল সুরক্ষিত। যাইহোক ১৬১৫ সালে জাহাঙ্গির পাঞ্জাবের শাসনকর্তা মুর্তাজা খানকে কাংড়া দুর্গ দখলের আদেশ দেন এবং তাঁর সহকারী হিসাবে পাঞ্জাবের শাসনকর্তা মুর্তাজা খানকে কাংড়া দুর্গ দখলের আদেশ দেন এবং তার সহকারী হিসাবে পাঞ্জাবের মাওয়রা রাজা বাসুর পুত্র সুরজমলকে পাঠানো হয়। তাদের এই অভিযান কিন্তু ব্যর্থ হয়। এর কারণ ছিল সুরজমলের সঙ্গে কাংড়ার রাজার বন্ধুত্বের বিষয়। ফলে সুরজমল নিজেই চাননি যে কাংড়ার পতন হোক। এমনকি মুর্তাজা খানের মৃত্যুর পর জাহাঙ্গির সুরজমলকে কাংড়া দুর্গ দখলের সম্পূর্ণ দায়িত্ব দিলে তিনি সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। এই অবস্থায় জাহাঙ্গির সুন্দরদাস যিনি রাজা 'বিক্রমাদিত্য বাখেলা' নামে পরিচিত তাঁকে দায়িত্ব দেন। তিনি ১৬২০ সালে প্রায় এক মাস কাংড়া দুর্গটি অবরোধ করার পর দুর্গের সৈন্যরা পরাজয় স্বীকার করে। তবে এই অভিযানে মুসলিম কাজি, অন্যান্য ধর্মীয় লোকজনও ছিল। দুর্গের মধ্যে ইসলামীয় ধর্মীয় কাজ করার অধিকার দেওয়া হয়। এই সব কাজের মধ্যে ছিল মোষ কাটা, খুৎবা পাঠ, প্রার্থনার জন্য আহ্বান ইত্যাদি। তবে বিজয় সূত্রে জাহাঙ্গির যে জাতীয় কাজ করেন তা একাধারে যেমন তাঁর উদারনীতি বিরোধী তেমনি মুঘল ঐতিহ্য বিরোধী।

২.৯ উত্তর-পশ্চিম ভারত জয়

জাহাঙ্গিরের রাজত্বের বিরল ঘটনা হল ১৬২২ সালে মুঘল সাম্রাজ্যের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ঘাঁটি কান্দাহার মুঘলদের হাত থেকে পারসিক শাসক শাহ আব্বাসের হাতে চলে যাওয়া। কিন্তু গুরুত্বের দিক থেকে বিচার করলে কান্দাহার ছিল ভারতের প্রবেশদ্বার। এই পথ দিয়েই একদিন তুর্কীরা ভারতে প্রবেশ করেছিল এবং তারা প্রথম দিক থেকেই কান্দাহারকে গুরুত্ব দিয়ে নিরাপত্তা বিধান করেছিল। এমনকি বিচক্ষণ শাসক আকবরও কান্দাহার দখল করে তাঁর বিশ্বস্ত সেনাপতি মানসিংহ ও টোডরমলকে দিয়ে কান্দাহারে স্থায়ী সামরিক ঘাঁটি তৈরি করেছিলেন।

কিন্তু জাহাঙ্গিরের রাজত্বকালে পারস্যের শাসক হিসাবে শাহ আব্বাস যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন। তিনি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ কান্দাহরকে নিয়ন্ত্রণে রাখার ইচ্ছা মনে মনে পোষণ করতেন। তাই ১৬০৬ সালে কান্দাহার দখলের এক ব্যর্থ অভিযানও করেন। তারপর তিনি সম্রাট জাহাঙ্গিরের সঙ্গে রাজনৈতিক ছলনার কৌশল অবলম্বন করেন। অন্যদিকে সম্রাট জাহাঙ্গির শাহ আব্বাসের এই রাজনৈতিক ছলনায় বিশ্বাস রাখায় তিনি কান্দাহারের নিরাপত্তার প্রতি সঠিক দৃষ্টি দিতে পারেননি। তার ফলে ১৬২১ সালে মুঘলদের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ও অনৈক্যের পূর্ণ সুযোগকে কাজে লাগিয়ে শাহ আব্বাস কান্দাহার অভিযান করেন। যদিও সম্রাট জাহাঙ্গির এই সময় খুররমকে কান্দাহার দখলের নির্দেশ দেন কিন্তু রাজধানিতে পরবর্তী উত্তরাধিকার নিয়ে চরম বিশৃঙ্খলা শুরু হয়। নূরজাহান পরবর্তী উত্তরাধিকারী খুররমের পরিবর্তে শাহরিয়ারকে মনোনীত করার যে ষড়যন্ত্র শুরু করেন, তা খুররমের মনে রাজধানীর বাইরে যাওয়ার ক্ষেত্রে অনিচ্ছার মনোভাব তৈরি করে। ফলে কান্দাহার যেমন মুঘলদের হস্তচ্যুত হল তেমনি পিতার বিরুদ্ধে পুত্রের বিদ্রোহ মুঘল সাম্রাজ্যকে ব্যতিব্যস্ত করে তুললো।

সম্রাট জাহাঙ্গিরের শাসন ও সাম্রাজ্য বিস্তার প্রসঙ্গে আমাদের কতকগুলি বিষয় মনে রেখে তাঁর মূল্যায়ন করতে হবে তা হল, প্রথমত: পিতা আকবরের সাফল্যের নিরিখে তাঁকে বিচার করলে আমাদের ভুল হবে। দ্বিতীয়ত, তিনি পিতা আকবরের নীতিকে যে ভাবে তাঁর রাজত্বকালে মর্যাদা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন তার ফলে সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে শান্তি ও উদারতার যে পরিবেশ তৈরি হয়েছিল সেই বিষয়টিকেও আমাদের ভুলে গেলে চলবে না। হয়ত সম্রাট জাহাঙ্গিরের পুত্র খসরুর প্রতি নিষ্ঠুরতার নিদর্শন রেখেছেন বা কাংড়া জয়ের পর দূর্গের ভেতরে যে অমুঘলোচিত কাজ সংগঠিত হয়েছে তার দায় জাহাঙ্গিরকে অবশ্যই নিতে হবে। এই সমস্ত দোষত্রুটি বাদ দিলে সম্রাট জাহাঙ্গিরের সাফল্য খুব কম ছিল না। কেননা তার পূর্ব পুরুষরা যে কাজ করতে ব্যর্থ হয়েছেন তিনি তা সাফল্যের রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন, কিছু সাফল্য কিছু ব্যর্থতা হয়েছে,—এমনকি জীবনে শেষের দিকে হয়ত প্রিয়তমা পত্নী নূরজাহানের দ্বারাও প্রভাবিত হয়ে রাজকার্যে অবহেলা করেছেন। কিন্তু যোগ্যতাকে তিনি মান্যতা দিয়েছেন। তিনি মেবারের রানা, বাংলার জমিদার, আফগান অধিপতি ও সাম্রাজ্যের পরবর্তী উত্তরাধিকারী নির্বাচনের ক্ষেত্রেও রাজনৈতিক বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতার আশ্চর্য সমন্বয় তৈরি করেছেন। তিনি এটাই প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন শুধু বাহুবল নয়, উদারতাও সাম্রাজ্য সংগঠনের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রয়োজন। আবার সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে চিত্ররসিক হিসাবে তিনি খ্যাতি পেয়েছেন। তাই ঐতিহাসিক বেনীপ্রসাদ বলেছেন "সম্রাট

জাহাঙ্গিরের রাজত্বকাল ছিল মুঘল সাম্রাজ্যের শান্তির ও সমৃদ্ধির সূচক। শিল্প বাণিজ্যে চরম উৎকর্ষের কাল। স্থাপত্যের অগ্রগতির সামান্য ঘটলেও চিত্রশিল্পে এই সময় গৌরবের কাল হিসাবে গণ্য হয়।

২.১০ শাহজাহানের সিংহাসন লাভ

সম্রাট জাহাঙ্গির ও রাজপুত রাজ্য মেবার রাজা উদয়সিংহের কন্যা রাজকুমারী জগত গোঁসাই এর গর্ভজাত সন্তান ছিলেন শাহজাহান। তাঁর জন্ম হয় ১৫৯২ সালে ১৫-ই জানুয়ারি। তাঁর বাল্য নাম ছিল খুররম। তিনি বাল্য কালে পিতামহ সম্রাট আকবরের প্রিয় পাত্র ছিলেন। তিনি লালিত হয়েছিলেন আকবরের সন্তানহীনা পত্নী রাকেয়া বেগমের কাছে। এমনকি ভবিষ্যতের বাহশাহী তখত/সিংহাসনে বসার জন্য যে সমস্ত গুণাবলীর প্রয়োজন ছিল তার সবই শাহজাহানের মধ্যে ছিল। ১৬১২ সালে অভিজাত আসফ খাঁর কন্যা আরজুমান্দ বানু বেগমের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। ঐতিহাসিক অব্দুর রসিদ শাহজাহান প্রসঙ্গে লিখেছেন, ''Intelligent quick witted and gifted with an excellent memory, he nevertheless showed very early his predilection for the profession of arms rather than the pursuit of knowledge.'' এমনকি পিতা জাহাঙ্গিরের রাজত্বকালেই শাহজাহান মেবার, দাক্ষিণাত্য ও কাংড়া অভিযানের সময় তাঁর রাজনৈতিক বিচক্ষণতা ও সামরিক প্রতিভার নিদর্শন রাখেন। যে কারণে দাক্ষিণাত্যের সাফল্যের পুরস্কার স্বরূপ সম্রাট জাহাঙ্গির নিজে তাকে 'শাহজাহান' উপাধি প্রদান করেন। সম্রাট তাকে ভবিষ্যতের সম্রাট হিসাবেই মনে মনে ভাবতেন। অন্যদিকে যুবরাজ খুররম নিজেকে ভবিষ্যতের মুঘল সম্রাট হিসাবে তার দাবিকে নিষ্কণ্টক রাখতে তার অন্য দুই ভাই খসরু ও পারভেজকে ষড়যন্ত্র করে হত্যা করেন। কিন্তু যুবরাজ খুররমের সমস্যা ছিল অন্যত্র, কেননা এই সময় জাহাঙ্গিরের ওপর নূরজাহানের কতৃত্বলাভ ও ভবিষ্যতের মুঘল সম্রাট হিসাবে নূরজাহান নিজের জামাতা শাহরিয়াকে বসানোর পরিকল্পনা শাহজাহানকে ক্রমেই দিল্লির রাজনীতির মূল স্রোত থেকে দূরে ঠেলে দিয়েছিল। এমনকি এই সময় শাহজাহান পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে দিল্লি রাজনীতি থেকে বহু দূরে দক্ষিণে থাকতেন। অবশ্য জাহাঙ্গিরের মৃত্যুর পর 'পরবর্তী বাদশাহ' হিসাবে জাহাঙ্গিরের অন্য পুত্র শাহরিয়ার নাম ঘোষণা করেন। লাহোর দুর্গে তাঁর অভিষেক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। এদিকে দিল্লীর অভিজাতদের মধ্যে প্রভাবশালী আসফ খাঁ মধ্যবর্তী ব্যবস্থা স্বরূপ মৃত খসরুর পুত্র দাওয়ার বক্সকে 'বাদশা' হিসাবে ঘোষণা করে নিজের জামাতা শাহজাহানকে দক্ষিণ ভারত থেকে রাজধানী দিল্লীতে আসার জন্য দূত পাঠিয়ে পরামর্শ দেন। এই সময় দিল্লীর অপর প্রভাবশালী অভিজাত মহাবত খাঁও দেওয়ান আবুল হাসান আসফ খাঁর গোষ্ঠীতে যোগদান করেন। শাহজাহান ফিরতেই আসফ খাঁ তাঁর নামে দরবারে খুৎবা পাঠ করেন। শাহজাহানের দাবিকে নিষ্কণ্টক করতে শাহরিয়ার, দাওয়ার বক্স এবং দানিয়েলের পুত্রদের হত্যা করেন। যদিও ঐতিহাসিক B. P. Sakesena তাঁর *History of Shahjahan* গ্রন্থে কিছু ইউরোপীয় লেখক এবং পারসিক রচনার ভিত্তিতে লিখেছেন, দাওয়ার বক্স তার মত দেখতে একজনকে কারাগারে রেখে নিজে পারস্যে পালিয়ে প্রাণে বেঁচে ছিলেন। তবে শাহজাহানের সময় থেকেই মুঘলদের মধ্যে উত্তরাধিকার সংক্রান্ত দ্বন্দের স্থায়ী সূচনা হয় যা পরবর্তী কালেও চলতে থাকে। যাইহোক ১৬২৮ সালের ২৪শে জানুয়ারি আত্মীয়-পরিজনের

রক্তে স্নান করে খুররম পিতার দেওয়া 'শাহজাহান' উপাধি নিয়ে সিংহাসনে বসেন এবং পিতার অসম্পূর্ণ কাজকে সম্পূর্ণ করার জন্য সচেষ্ট হন।

২.১১ শাহজাহানের সাম্রাজ্য বিস্তার নীতি

শাহজাহান সিংহাসনে বসার পর তাঁর বিরুদ্ধে খান-ই-জাহান লোদী ও জুমার সিংহের বিদ্রোহ দমন করার পর পিতামহ আকবরের নীতি অনুসরণ করে তিনি মুঘলদের পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলিকে অধিগ্রহণের নীতি গ্রহণ করেন। আর এক্ষেত্রে শাহজাহানের নিজস্ব যে ভাবনা কাজ করেছিল তা হল 'মুঘল আলোকিত শাসন' পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলিতে চালু হলে তাতে জনগণের কল্যাণ সাধন হবে। তাই শাহজাহান সাম্রাজ্য বিস্তারের নীতি নিয়ে কতকগুলি পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এগুলি হল যথা—(১) রাজপুত রাজ্য বাগলানার রাজা বাহারজিকে পদচ্যুত করে বাগলানাকে খান্দেশ সুবার সঙ্গে যুক্ত করেন। (২) সিন্ধু অঞ্চলের বালুচ উপজাতিদের দমন করে মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। (৩) গোণ্ড অঞ্চলের উপজাতীয় রাজাকে পরাস্ত করে প্রচুর উপঢৌকন দিতে বাধ্য করেন। হিমাচল অঞ্চলের গাড়োয়াল রাজ্যকে প্রথমবারের ব্যর্থতার পর দ্বিতীয়বার আক্রমণের মাধ্যমে পরাস্ত করে সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। (৪) এঁর পর শাহজাহান কাশ্মীরের উত্তরদিকের বাল্টিস্থান আক্রমণ করে প্রথমবারের ব্যর্থতার পর দ্বিতীয়বার সেনাপতি জাফর খানের নেতৃত্বে বাল্টিস্থানের সুলতান আব্দলকে দশ লক্ষ আর্থিক ক্ষতিপূরণ ও মুঘল সম্রাট শাহজাহানের নামে খুৎবা পাঠ করে বাধ্য করেন। তাছাড়াও শাহজাহান ব্রহ্মপুত্র বা কামরুপের রাজা বালিনারায়ণ ও অহোম রাজাকে ১৬৩৭ সালে বরপেটার স্থল ও জলযুদ্ধে পরাস্থ করে মুঘলদের সঙ্গে সন্ধি করতে বাধ্য করেন।

২.১২ দাক্ষিণাত্যে সম্প্রসারণ নীতি

শাহজাহানের দাক্ষিণাত্য নীতি প্রসঙ্গে যে কথাগুলি উঠে আসে তা হল পিতামহ আকবরের সম্প্রসারণ নীতি এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, পিতার অসম্পূর্ণ কাজকে সম্পূর্ণ করা, দাক্ষিণাত্য সম্পর্কে শাহজাহানের নিজস্ব স্পর্শকাতরতা, দক্ষিণের খা-ই-জাহানের বিদ্রোহী হওয়া ও আহম্মদনগরকে সাহায্য দেওয়া এবং দক্ষিণের শিয়া সম্প্রদায়ের ধ্বংস সাধন ছিল শাহজাহানের মূল উদ্দেশ্য। কেননা সুন্নি মতে বিশ্বাসী শাহজাহানের কাছে শিয়া রাজ্যগুলির অস্তিত্ব ছিল বিধর্মীমনোভাবের সমতুল্য। তাই বলা যায়, দাক্ষিণাত্য নীতিতে রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা, সাম্রাজ্য বিস্তার ও শাহজাহানের ধর্মীয় উদ্দেশ্য, এই তিন নীতির সার্থক সমন্বয় ঘটেছিল। দক্ষিণ ভারতের ক্ষেত্রে শাহজাহান প্রথমেই আহম্মদনগরের প্রতি দৃষ্টি দেন। এর কারণ এই রাজ্যটি মুঘল সীমান্তের সন্নিকটে ছিল। তাছাড়া দীর্ঘদিন ধরে আহমদনগর ও মুঘল সংঘর্ষ ও সংঘাত সত্ত্বেও মুঘলদের ব্যর্থতা ও সাফল্য না পাওয়ার পরিবেশ বিচক্ষণ ও স্পর্ধিত সম্রাট শাহজাহানের পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না। এমনকি এই সময় মালিক অম্বরের মৃত্যুর ফলে আহম্মদ নগরের দুর্বলতা ও নৈরাজ্যের পরিবেশ অভিজ্ঞ শাহজাহানকে সুযোগ করে দেয়। তাই শাহজাহান চেয়েছিলেন নিজামশাহী শাসকের কাছে হৃত গৌরব ও দাক্ষিণাত্যে হৃত অঞ্চল পুনরুদ্ধার করতে। তাছাড়া অভিজ্ঞ সেনাপতি খান-ই-জাহানকে দক্ষিণে পাঠান কিন্তু তাঁর ব্যর্থতা ও বিদ্রোহ ঘোষণা সম্রাটকে বিচলিত করে।

কিন্তু সম্রাট এই সময় সিদ্ধান্ত নেন যে আহমদনগর স্বাধীন থাকলে মুঘলদের কাছে তা সমস্যা হিসাবেই থাকবে। তাই শাহজাহান মালিক অম্বরের অযোগ্য পুত্র ফতে খানের অসহায়তার সুযোগ নিতেও পিছুপা হননি। কেননা এই ফতে খানের সঙ্গে আহদনগরের সুলতাদের সম্পর্ক বিশেষ ভাল ছিল না। এমনকি সুলতানকে হত্যা করে তিনি তাঁর নাবালক পুত্র হুসেন নিজাম শাহকে সিংহাসনে বসান কিন্তু অভিজাতদের সমর্থন না পাওয়ায় ফতে খান মুঘলদের কাছে আত্মসর্মপণ করেন। যাইহোক এই সময়কালে সম্রাট শাহজাহানের প্রিয়তমা পত্নী মমতাজমহলের মৃত্যু (১৬৩১ খ্রিষ্টাব্দে) সংবাদ শাহজাহান সেনপতি মহব্বত খানের ওপর দায়িত্ব দিয়ে দাক্ষিণাত্য ত্যাগ করেন। মহব্বত খান আহমদনগরের রাজধানী দৌলতাবাদ দখল করেন। এই সময় ফতে খানকে তাঁর বিশ্বাসঘাতকতার পুরস্কার স্বরূপ আহমদনগরের কিছু অংশ জায়গির দেন। এই ঘটনায় শাহজী ভোসলে নামে মারাঠা নেতা, যিনি মুঘলদের বিজাপুরের সুলতানকে আহমদনগরের প্রাণকেন্দ্র দৌলতাবাদ দুর্গ আক্রমণে প্ররোচিত করেন। এই আক্রমণে মুঘল রাজ্য বিধ্বস্ত হয়। হুসেন নিজাম শাহকে সিংহাসন থেকে সরিয়ে তৃতীয় মুর্তাজা হুসেনশাহকে আহমদনগরের সিংহাসনে বসানো হয়। এমনকি মুঘলদের সঙ্গে ফতে খানের চুক্তি অগ্রাহ্য করা হয়। এই সময় শাহজাহান নিজে দৌলতাবাদে আসেন ও এক চতুর্মুখী অভিযান চালিয়ে প্রতিপক্ষকে পরাস্ত করেন। এই ঘটনায় আহমদনগর তার স্বাধীনতা হারায়। গোলকণ্ডা ও বিজাপুর মুঘল বাদশাহের সঙ্গে সন্ধি করতে বাধ্য হয়। এই সন্ধির ফল স্বরূপ বিজাপুরকে কোঙ্কন ও আহমদনগরের কয়েকটি জেলা প্রদান করা হয়। গোলকুণ্ডার সুলতান আবদুল্লাহ কুতুব শাহ, সুন্নি মতানুসারে দরবারে খুৎবা পাঠ করতে ও বছরে ৪-৬ লক্ষ টাকা নজরানা দিতে সম্মত হন এবং আহম্মদনগরের বিজয়ী সুলতান তৃতীয় মুর্তাজা হুসেন শাহকে গোয়ালিয়র দুর্গে বন্দী করে রাখা হয়। পাশাপাশি মুঘল ও বিজাপুর বাহিনী শাহজির পশ্চাধাবন করে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দুর্গ মুঘলদের অধিকারে আনেন। দাক্ষিণাত্যকে খান্দেশ, বেরার, তেলেঙ্গানা ও দৌলতাবাদ এই চারটি প্রদেশে ভাগ করা হয়। দাক্ষিণাত্যের ৬৪টি পার্বত্য দুর্গ ছিল মুঘল শক্তির কাছে প্রাণকেন্দ্র স্বরূপ।

দক্ষিণ ভারতে মূঘল শাসন প্রতিষ্ঠা লাভ করার পর এই অঞ্চলের শাসন কর্তা হিসাবে ঔরঙ্গজেবকে নিয়োগ করা হয়। তিনি ১৬৩৬ থেকে ১৬৪৪ পর্যন্ত সময়কাল শাসন কাজ পরিচালনা করেন। তারপর আবার ১৬৬২ সালে ওরঙ্গজেব শাসক হিসাবে দ্বিতীয়বারের জন্য নিযুক্ত হন। এই সময় তিনি দাক্ষিণাত্যের রাজধানী ঘিড়কীতে প্রতিষ্ঠিত করেন যার নতুন নামকরণ হয় 'আওরঙ্গাবাদ'। কিন্তু দক্ষিণের অনুর্বর ভূমি মুঘল রাজস্বের চাহিদা সেভাবে পূরণ করতে পারেনি, যেমনটা মুঘলরা আশা করেছিল। এই সময়ই ঔরঙ্গজেব মহারাষ্ট্র ও গুজরাটের মধ্যবর্তী বাগলানা দখল করেন এবং গোলকুণ্ডা দখলের পরিকল্পনা করেন এবং সেই মত অজুহাত খোজার চেষ্টা করে সফল হন। সম্রাট শাহজাহান গোলকুণ্ডার অভ্যন্তরীণ বিষয়ের হস্তক্ষেপ করেন ও ঔরঙ্গজেবকে গোলকুণ্ডা আক্রমণের নির্দেশ দেওয়ার পূর্বেই ঔরঙ্গজেব গোলকুণ্ডা আক্রমন করেন। অবশ্য গোলকুণ্ডার সুলতান অবদুল্লা কুতুবশাহ মুঘল সম্রাটের দাবী মত মিরজুমলাও তার পরিবারকে দক্ষিণের শাসক ঔরঙ্গজেবের নিকট পাঠিয়ে দিলেও তাতে যুদ্ধের অবসান হয়নি। শেষ পর্যন্ত সুলতান মুঘলদের সব শর্ত মেনে নেন। এই ভাবেই মুঘল সম্রাট শাহজাহানের গোলকুণ্ডা জয় সম্পূর্ণ হয়। আর এক্ষেত্রে ঔরঙ্গজেবের ভূমিকাও ছিল যথেষ্ট।

গোলকুন্ডা দখলের পর শাহজাহান ও ঔরঙ্গজেবের নজর পরে দক্ষিণের অপর রাজ্য বিজাপুরের উপর। এক্ষেত্রেও শাসক ঔরঙ্গজেব বিজাপুরের সুলতান মহম্মদ আদিল শাহের মৃত্যুর (১৬৫৬ সাল) পর পরবর্তী শাসক সুলতান দ্বিতীয় আলি আদিল শাহের বিজাপুরের সিংহাসনে বসার বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। অথচ সুলতান মহম্মদ আদিল শাহ ১৬৩৬ সালে শাহজাহানের সঙ্গে সন্ধির মধ্য দিয়েই বিজাপুর শাসন চালিয়ে আসছিলেন। তাই বিজাপুর দখলের ক্ষেত্রে ঔরঙ্গজেবের পিতা সম্রাট শাহজাহানের অনুমতির প্রয়োজন ছিল। যাইহোক শেষ পর্যন্ত বিজাপুর আক্রমণের ক্ষেত্রে শাহজাহানের অনুমতি মিলতেই ঔরঙ্গজেব বিজাপুর আক্রমণ করে বিদর ও কল্যাণী অধিগ্রহণ করেন। যদিও শাহজাহানের অপর পুত্র দারার হস্তক্ষেপে শেষ পর্যন্ত এই যুদ্ধ স্থগিত হয় এবং বিজাপুর তার অব্যর্থ পতন থেকে কিছুটা হলেও রক্ষা পায়। আর এঁর মূল্য হিসাবে বিজাপুর, কল্যাণী, বিদর ও পরেন্দা হারায় এবং বিপুল অর্থ ক্ষতি পূরণ হিসাবে দিতে বাধ্য হয়। আসলে গোলকুণ্ডা ও বিজাপুর উভয় রাজ্যের ক্ষেত্রেই শাহজাহানের ভূমিকাকে ছাপিয়ে ঔরঙ্গজেব তার নগ্ন সাম্রাজ্যবাদী নীতির পরিচয় রাখার চেষ্টা করেন। তবে এক্ষেত্রে শাহজাহান ও তার অন্য পুত্রদের দ্বারা কখনও কখনও বিরোধিতা ঔরঙ্গজেবকে সম্পূর্ণ সাফল্য এনে দেয়নি।

২.১৩ শাহজাহানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত নীতি

মুঘলদের দাক্ষিণাত্য জয় সম্পূর্ণ হলে বিশাল সাম্রাজ্যকে রক্ষার জন্য কাবুল ও কান্দাহারের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখা খুবই প্রয়োজন ছিল। কেননা আফগানিস্থানের উত্তর দিকে উজবেগ শক্তির চাপ এবং দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে পারসিক শক্তির চাপ ছিল। আসলে আফগানিস্তান ও বালুচিস্তানের মানুষের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা মুঘলদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। উপজাতীয় স্বাধীনতার ধারণা এই অঞ্চলের মানুষের মনের মধ্যে গেঁথে গিয়েছিল। অথচ মুঘলরা এখানকার মানুষের অভ্যন্তরীণ বিষয় হস্তক্ষেপ না করার নীতিই নিয়ে ছিলেন। তবে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ ছিল উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের কান্দাহার। এই কান্দাহারের ওপর এক সময় সম্রাট আকবরের অধিকার প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু জাহাঙ্গিরের সময় মুঘলদের হস্তচ্যুত হয়। এহেন গুরুত্বপূর্ণ কান্দাহরকে শাহজাহান পুনরুদ্ধার করার সংকল্প নেন। এই উদ্দেশ্যকে সফল করার জন্য শাহজাহান কান্দাহার দখলকারী পারস্যের শাসক শাহ আব্বাসের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে তাঁর আত্মীয়র কাছে দূত মাধ্যমে শোকবার্তা পাঠান। তিনি একটি পত্রের মাধ্যমে পারস্য ও মুঘল বাদশাহের মধ্যেকার পুরনো বন্ধু শাহকে স্মরণ করতে চেষ্টা করেন। তবে এই সময় পারস্যের শাসক অনুরূপ ভাবে এক দূত মারফত শাহজাহানের প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। মুঘল-পারস্যের এই বন্ধুত্ব ও সুসম্পর্কের সদিচ্ছার অন্তরালেই শাহজাহান কান্দাহার দখলের চেষ্টা করেন। তিনি পূর্ব পরাজয়ের প্রতিশোধ নেওয়ার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেন এবং সেইমত সুযোগের সন্ধান করতে থাকেন।

যাইহোক পারস্যের এক অভ্যন্তরীণ বিবাদ শাহজাহানকে সেই সুযোগের সন্ধান দেয়। তা হল কান্দাহারের পারসিক শাসক ও সেনাপতি আলি মরদান খানের সঙ্গে শাহ সফির সম্পর্ক ভালো ছিল না। রাজকোষের

প্রদেয় রাজস্ব কান্দাহারের শাসক ঠিক মত জমা করতেন না। এই সময় পারস্যের শাসক শাহ সফির কান্দাহারের শাসক আলি মরদানকে রাজদরবারে ডেকে পাঠালে তিনি তা অমান্য করেন। এই পরিস্থিতিতে শাহ সফির আলি মরদান খানকে কান্দাহারের শাসকের পদ থেকে অপসরণ করেন। এর ফলে আলি মরদান খান কাবুলের শাসনকর্তা ও গজনীর সেনাপাতির কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেন। এমনকি ১৬৩৮ সালে তিনি মুঘলদের কান্দাহার সমর্পণ করেন। এই কাজের পুরস্কার স্বরূপ শাহজাহান আলি মরদান খানকে প্রচুর অর্থ উপহার দেন। অন্যদিকে পারস্যের শাসক শাহ সফির বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ কাজে ব্যস্ত থাকার ফলে তিনি কোন প্রতিশোধ যুদ্ধ সংগঠিত করেননি। তবে কৌশলী শাহজাহান একটি পত্র মারফত তার কান্দাহার দখল সমর্থন করে ক্ষমা চেয়ে নেন এবং বিষয়টি ভুলে যাওয়ার অনুরোধ করেন। তবে এই ঘটনার পর মুঘল-পারস্যের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক শাহ সফির মৃত্যু পর্যন্ত কার্যত খারাপ ছিল না।

পরবর্তী পারস্যের শাসক দ্বিতীয় শাহ আব্বাস শাহজাহানের বলখ অভিযানের ব্যর্থতার পূর্ণ সুযোগ নিয়ে ১৬৪৮ এ কান্দাহারের বিরুদ্ধে শক্তিশালী সেনা অভিযান প্রেরণ করেন এবং ১৫৭ দিন অবরোধের পর ১৬৪৯-এর ফেব্রুয়ারিতে কান্দাহার পুনরায় পারস্যের সাফাভিদের দখলে আসে। পরবর্তীকালে অবশ্য সম্রাট শাহজাহান কান্দাহার দখলের জন্য ১৬৪৯-এ শাহজাদা ঔরঙ্গজেব ও প্রধানমন্ত্রী আবদুল্লা খানের নেতৃত্বে বিশাল বাহিনী পাঠিয়েও ব্যর্থ হন। এরপর পুনরায় ১৬৫২ সালে ঔরঙ্গজেব, সাদুল্লা খাঁ এবং রুস্তম খাঁর নেতৃত্বে বিশাল বাহিনী পাঠিয়ে ব্যর্থ হলে পুনরায় সম্রাট শাহজাহান ১৬৫৩ সালে শাহজাদা দারাশুকোর নেতৃত্বে পাঁচবার কান্দাহার দুর্গ অবরোধ করেও শেষ পর্যন্ত পারসিক বাহিনীর প্রতিরোধের মুখে বিধস্ত হয়ে পিছু হটতে বাধ্য হন। এই ভাবে পর পর ব্যর্থ অভিযানের পরেও সাহসী শাহজাহান চতুর্থ অভিযানের ভাবনা চিন্তা করতে শুরু করলে তাঁর পরামর্শদাতারা তাঁকে এই কাজে নিরস্ত করেন। ফলে কান্দাহার শাহজাহানের জীবিতকালে আর মুঘলদের অধিকার যেমন আসেনি তেমনি মুঘল-পারস্যের কূটনৈতিক সম্পর্কও তলানিতে এসে যায়।

মুঘলদের পশ্চিম-সীমান্ত নীতির ক্ষেত্রে শাহজাহানের কান্দাহার অভিযানের ব্যর্থতা সার্বিকভাবে মুঘল রাজশক্তির ক্ষমতা ও মর্যাদাকে ভুলুণ্ঠিত করে। এই অভিযানগুলির ব্যয় নির্বাহ করতে মুঘল রাজকোষ থেকে ১১কোটি টাকা বেশি ব্যয় হয়, প্রচুর সেনার প্রাণ যায় ও সম্পদ নষ্ট হয়। কিন্তু এর পরেও এক ইঞ্চি জমি বা এককানা অর্থ সম্পদ মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়নি। এমনকি শরস্যের শাহ দম্ভ ভরে বলেছিলেন যে, "দিল্লির শাসকরা সোনার বিনিময়ে দুর্গ চুরি করতে পারে কিন্তু অস্ত্রের জোরে দুর্গ বিজয় করতে পারে না।"। এই অপবাদ মুঘলদের মাথা পেতে মেনে নেওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় থাকেনি। যাইহোক উত্তর পশ্চিম সীমান্তে কান্দাহার দখলের ক্ষেত্রে মুঘলদের ব্যর্থতার কারণ প্রসঙ্গে অধ্যাপক অনিরুদ্ধ রায় যে বিষয়গুলি তুলে ধরেছেন তা হল মুঘলদের কামানগুলি যথেষ্ট দক্ষ না থাকা, প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় মুঘল বাহিনীর বেশিদিন অবরোধ চালানোর ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা যেমন দায়ী ছিল তেমনি পশ্চিম অভিযানের প্রচুর ব্যয়ের বিষয়টি আমাদের ভুলে গেলে চলবে না। যার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল শাহ আব্বাসের ইউরোপিয়ানদের সাহায্য নিয়ে তৈরি উন্নত কামান। যার দক্ষতার পরিচয়

পারসিকরা বিভিন্ন যুদ্ধে পেয়েছিলেন। তবে মুঘল সম্রাট শাহাজাহানের সাম্রাজ্য বিস্তারের ক্ষেত্রে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে কান্দাহার দখলের ব্যর্থতা অবশ্যই ছিল, তবে এই ব্যর্থতাকে খুব বেশি করে না দেখাই ভাল। কারণ ব্যর্থ হয়েও মুঘলরা কিন্তু উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের কান্দাহার সম্পর্কে উৎসাহ হারায়নি। তারা কান্দাহারকে পেতে বারবার চেষ্টা করেছেন অন্তত তা শাহজাহানের ক্ষেত্রে সত্যি।

২.১৪ শাহাজাহানের মধ্য-এশিয়া নীতি

উত্তর ভারত সহ সমগ্র ভারত জয়ের পর মুঘলদের বাবরের পিতৃভূমির প্রতি অধিকার স্থাপন করার বাসনা যে লোপ পেয়েছিল এমন নয়। হিন্দুকুশ পর্বত ও অক্ষু নদীর অপর তীরে সমস্ত অঞ্চলের উপর এই সময় তৈমুরের আধিপত্যকে স্মরণে রেখেই মুঘলরা এই অঞ্চলের উপর নিজেদের অধিকার স্বাভাবিক ও বৈধ বলে মনে করতেন। বাবর সমরখন্দ ও বুখারা দখলের চেষ্টা করেন। হুমায়ুন বাদাখসান পর্যন্ত নিজের কতৃত্ব বজায় রাখেন। আর আকবর মধ্য এশিয়ার ঐ অঞ্চল দখলের জন্য উজবেক এমনকি পারস্য পর্যন্ত এগিয়ে যাওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন। এঁর পরবর্তীকালে শাহজাহানের সময়কাল প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক আব্দুল হামিদ লাহোরী লিখেছেন, "রাজত্বের গোড়া থেকেই সম্রাটের মন পড়েছিল বাদাখসান ও বালখ জয়ের দিকে"। এমনকি ঐতিহাসিক ঈশ্বরী প্রসাদের মতে, শাহাজাহানের মধ্য এশিয়া অভিযান ছিল সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব ও ভাবাবেগ প্রসূত, যা দক্ষিণ ভারত জয়ের পর বৃদ্ধি পেয়েছিল। তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় সম্রাট কাবুলের আফগান উপজাতিদেরূ বিদ্রোহ সত্ত্বেও তিনি বালখ-বাদাখসান অভিযানের পরিকল্পনা করে। এক্ষেত্রে শাহজাহান অজুহাত হিসাবে কাবুল অঞ্চলের উজবেগী আক্রমণের তত্ত্ব হাজির করেন। মধ্য এশিয়ার স্তেপ ভূমির যাযাবর মানসিকতার অধিকারী উজবেগ ও মোঙ্গলদের লুণ্ঠন প্রিয় ও আক্রমণ-পরায়ণতা সম্রাট শাহজাহানকে ভাবিয়ে তুলেছিল। যে কারণে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের নিরাপত্তার জন্য বালখ-বাদাখসান আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেন।

শাহজাহানের শাসনকালের শুরুতে একটি দুর্ভাগ্যজনক ঘটনাকে কেন্দ্র করে ট্রান্স অক্সিয়ানার শাসকদের সঙ্গে শাহজাহানের সম্পর্কে ফাটল ধরে। পরবর্তীকালে বোখারা ও বালখের শাসক নজর মহম্মদের স্বৈরাচারী শাসনের ফলে উজবেগী সর্দাররা বিদ্রোহ শুরু করলে নজর মহম্মদের পুত্র আব্দুল আজিজও পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। এই সময় নজর মহম্মদ সম্রাট শাহাজাহানের সাহায্য কামনা করে। এই পরিস্থিতে ১৬৪৬ সালে শাহাজাহান যুবরাজ মুরাদের নেতৃত্বে প্রায় পঞ্চাশ হাজার অশ্বারোহী এবং দশ হাজার পদাতিক সেনা সমন্বিত দল হিন্দুকুশ পর্বতমালা পার করে বালুকাময় শুষ্ক মরু অঞ্চল অভিযানের মাধ্যমে বালখ অধিকার করে। অবশ্য ইতিমধ্যে নজর মহম্মদ পারস্যের শাহের প্রতি তার আনুগত্য স্বীকার করেন। তবে মুঘল বাহিনী নজর মহম্মদের সঞ্চিত বাহাত্তর লক্ষ মূদ্রা, বারো লক্ষ টাকা, আড়াই হাজার ঘোড়া, তিনশ উঠ অধিকার করলে নজর মহম্মদ বাধ্য হয়ে পারস্যে আশ্রয় নেয়। তবে বালখ অঞ্চলের উপর মুঘলদের আধিপত্য দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। কারণ শাহজাদা মুরাদ পিতা শাহজাহানের অনুমতি ছাড়াই আগ্রায় ফিরে আসেন। তার সেনাপতিরাও এই দুর্গম কষ্ট সহিষ্ণু অঞ্চলে না থেকে মুরাদের পিছনে পিছনে দিল্লিতে ফিরে আসেন। তাই মুঘলদের মধ্যে এশিয়া জয় স্থায়ী হয়নি এবং

সম্রাট শাহাজাহান মুরাদকে দরবার থেকে নিবাসিত করেন। এরপর অবশ্য ঔরংজেবের নেতৃত্বে শাহাজাহান একটি সেনা দল বালখ বাদাকসান অভিযানে পাঠান। যদিও ততদিনে এই অঞ্চলের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পরিবর্তন-স্বরূপ নজর মহম্মদের প্রত্যাবর্তন ও জাতীয়তাবাদে উদ্দীপ্ত উজবেগীর মুঘল শক্তিকে সরাসরি প্রতিরোধ না করে গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে প্রতিরোধের নীতি নেয়। শেষ পর্যন্ত ঔরংজেব বিশ্বস্ত রাজপুত বাহিনীর সাহায্যে উজবেগীদের যুদ্ধ করতে বাধ্য করেন এবং প্রথম যুদ্ধেই উজবেগীদের পরাস্ত করে বালখ অধিকার করেন। এই সময় রাজপুত মধুসিংহকে বালখের শাসন কর্তা হিসাবে বসানো হয়।

ঔরংজেব এর পরবর্তী অভিযান হিসাবে আঘচার দিকে এগিয়ে গেলে এক বিরাট উজবেগী সেনাদল বোঘারায় ঔরঙ্গজেবকে ঘিরে ফেলে। যদিও মুঘল বাহিনীই বোঘারার যুদ্ধে তাদের হটিয়ে দেয়। তবে বিচক্ষণ ঔরঙ্গজেব বুঝতে পারেন তাঁর পক্ষে আর এগিয়ে যাওয়া ঠিক হবে না। তাই তিনি বালখে ফিরে আসেন। তবে এই সময় তিনি যে দৃঢ় মানসিকতার নজির রাখেন, তার ফলে বোঘারার সুলতান ঔরঙ্গজেবের নিকট আত্মসমর্পণ করাকে শ্রেষ্ঠ বিচক্ষণতার পরিচয় বলে মনে করেন। আসলে মধ্য এশিয়ার কষ্টকর প্রাকৃতিক পরিবেশে মুঘল সেনারা মানিয়ে নিতে পারছিলেন না। আবার ঔরঙ্গজেবও বালখ অঞ্চল থেকে চলে আসার সিদ্ধান্ত নিলেন। সেই পরিস্থিতিতে শাহজাহান বালখের শাসক নজর মহম্মদকে আনুগত্য স্বীকারের বিনিময়ে তাঁর রাজ্য ঔরঙ্গজেবকে ফিরিয়ে দেওয়ার পরামর্শ দিলেন। ঔরঙ্গজেব পিতার আদেশ মান্য করে নজর মহম্মদকে সাক্ষাতের প্রস্তাব দিলেন। নজর মহম্মদ নিজে সাক্ষাৎ না করায় ঔরঙ্গজেব তাঁর পৌত্রকে বশ্যতার বিনিময়ে বালখ অঞ্চল ফিরিয়ে দেন ও স্বদেশের দিকে রওনা দেন। পথে অবশ্য হাজারা উপজাতির আক্রমণের সম্মুখীন হলে ঔরঙ্গজেবের রাজপুত্র বাহিনীকে তা প্রতিরোধ করার জন্য পিছনে রেখে ঔরঙ্গজেব নিজে কাবুলে চলে আসেন। এই সময় রাজপুত সেনারা খাদ্য-কষ্ট সহ বিবিধ সমস্যার সম্মুখীন হলে প্রচুর সেনা প্রাণ হারান। সামান্য সংখ্যক জীবিত মুঘল সেনা মধ্য এশিয়ার অভিযান দিল্লীতে ফেরে। এই অভিযানের প্রচুর প্রাণ, প্রভুত সম্পদ ও অর্থ, এবং মুঘল আত্মমর্যাদা বিনষ্ট হয়। আধুনিক ইতিহাসবিদ জন এফ. রিচার্ডস মুঘল ঐতিহাসিক সাদিকের সাক্ষ্য তুলে ধরেছে, *"nothing resulted from this expedition except the shedding of blood, the killing of thirty to forty thousand of people, and the expenditure of three crore and fifty lac [35 million] rupees"*. ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার মুঘল দরবারি তথ্য থেকে দেখিয়েছেন, সম্রাট শাহজাহান রাজনৈতিক বিচক্ষণতা ভুলে এই অপরিণামদর্শী অভিযানের শুরু করেন। এর ফলে নিজের ও সাম্রাজ্যের সুনাম ও মর্যাদা নষ্ট হয়। এমনকি মধ্য এশিয়ার ব্যর্থতার ফলে আঞ্চলিক ক্ষেত্রে মারাঠারাও মুঘলদের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাড়াবার নৈতিক সাহস অর্জন করে।

আসলে শাহজাহানের মধ্য এশিয়া নীতি ছিল নানা ভুলের সমাহার। কেননা প্রথমত, কান্দাহার ও মধ্য-এশিয়া অভিযান ছিল শাহজাহানের বিচক্ষণতার অভাব। দ্বিতীয়ত, এই অভিযানগুলির মধ্য দিয়ে রাজকোষের প্রচুর অর্থ ও সেনা ক্ষয় হয় যা পরবর্তীকালে সাম্রাজ্যের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সমস্যা তৈরি করে। তৃতীয়ত, শাহজাহানের অবিবেচনা প্রসূত কাজ। বিশেষ করে দারার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ঔরঙ্গজেবকে পর্যাপ্ত পরিমাণ সেনা না পাঠানো, কার্যক্ষেত্রে তার ফল স্বরূপ উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত ও মধ্য এশিয়ার

ব্যর্থতা ডেকে আনে। ঐতিহাসিক John F. Richards তাঁর 'The Mughal Empire' গ্রন্থে মনে করেন, শাহজাহান যদি প্রতিভাবান, শৃঙ্খলাপরায়ণ, সামরিক নেতা ঔরঙ্গজেবকে পর্যাপ্ত সামরিক সাহায্য প্রদান করতেন ও স্বাধীনভাবে যুদ্ধ পরিচালনার অধিকার ও উৎসাহ দিতেন, তাহলে হয়ত শাহজাহানের মধ্য এশিয়া নীতি এভাবে ব্যর্থ হত না। ঐতিহাসিক আব্দুল আজিজও শাহাজাহানের মধ্য এশিয়া নীতির ব্যর্থতা প্রসঙ্গে লিখেছেন, ''It had brought nothing but disaster, famine and death both to the Indians and the Turanians,.....its prestige in Central Asian affairs had vanished and the myth of its invincibility was shattered.''

২.১৫ উপসংহার

শাহজাহানের সাম্রাজ্য বিস্তারের ক্ষেত্রে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত ও মধ্য এশিয়া নীতির ক্ষেত্রে ব্যর্থতা দিয়ে শাহজাহানের রাজত্বকালকে মূল্যায়ন করলে ঠিক হবে না। কেননা ১৬২৭ থেকে ১৬৫৮ সাল পর্যন্ত তার রাজত্বকালে সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় ছিল। তিনি প্রজাদের জন্য জনকল্যাণমূলক নীতি গ্রহণ করেছিলেন। সাম্রাজ্য বিস্তারের ক্ষেত্রেও দাক্ষিণাত্যে সাফল্য ও প্রতিবেশী সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলিকে অধিকারে এনেছিলেন এবং সুস্থ প্রশাসন উপহার দিয়েছিলেন। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বিশেষ করে মুঘল স্থাপত্যে তাঁর অপূরণীয় দান রয়েছে। তাঁর প্রিয়তমা পত্নী বিয়োগের পর প্রচুর অর্থ ও সময় ব্যয় করে তাজমহলের মত সৌধ নির্মাণ করেছিলেন, যা তাঁর উচ্চ সাংস্কৃতিকবোধের পরিচয় বহন করে। তবে ব্যক্তি মানুষ হিসাবে শাহজাহানের মধ্যেও কখনও কখনও নিষ্ঠুরতা ও ন্যায়পরায়ণতা বা নীতি বোধের অভাব ছিল। এই সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতি বাদ দিলে শাহজাহান মুঘল রাজত্বের ক্ষেত্রে শাসন ব্যবস্থার নজির পরবর্তী প্রজন্মের মানুষের সামনে রেখেছিলেন, তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার যোগ্য।

২.১৬ প্রশ্নাবলী

১। জাহাঙ্গিরের রাজত্বকালে মুঘল সাম্রাজ্যের সীমা কীভাবে বিস্তৃত হয়েছিল তার একটি বিবরণ দিন।

২। জাহাঙ্গিরের শাসনকালের বিশেষ উল্লেখ করে বাংলায় মুঘল শক্তির ক্ষমতা প্রসারণ সম্পর্কে একটি টীকা লিখুন।

৩। মুঘলরা কীভাবে কাংড়া জয় করেছিল?

৪। মুঘল সম্রাট শাহজাহানের সাম্রাজ্য বিস্তার নীতি সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লিখুন।

৫। শাহজাহানের উত্তর-পশ্চিম ভারত নীতি বিশ্লেষণ করুন।

৬। আপনি কি মনে করেন যে শাহজাহানের মধ্য এশিয়া নীতি সফল হয়েছিল?

৭। শাহজাহানের দাক্ষিণাত্য নীতির একটি মূল্যায়ন করুন।

২.১৭ গ্রন্থপঞ্জি

- Chandra, Satish (1999). *Mediival India. From Sultanate to the Mughals*. Mughal Empire, 1526-1748, Part Two, Har-Anand Publications, New Delhi.
- Chandra, Satish (2007). *Hitory of Medieval India, Orint BlackSwan,* New Delhi.
- Bhargava, Meena (2010). *Exploring Medieva lIndia, Vol II,* Orint BlackSwan, New Delhi.
- Richards, John F (1993). *The Mughal Empire*, New Delhi, Oxford University Press.
- রায়, অনিরুদ্ধ (2020), *মুঘল সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনের ইতিহাস,* প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড, প্রগতিশীল প্রকাশনা,
- হাবিব, ইরফান (2018), *মধ্যযুগের ভারত একটি সভ্যতার পাঠ*, ন্যাশানাল বুক ট্রাস্ট।

—

একক ৩ ❑ মনসবদার ও জায়গিরদার ব্যবস্থার বিবর্তন

গঠন

৩.০ উদ্দেশ্য

৩.১ ভূমিকা

৩.২ জাহাঙ্গিরের আমলে মনসবদার ব্যবস্থা

৩.৩ শাহজাহানের আমলে মনসবদার ব্যবস্থা

৩.৪ জাহাঙ্গির ও শাহজাহানের আমলে জায়গিরদারি ব্যবস্থার বিবর্তন

৩.৫ উপসংহার

৩.৬ প্রশ্নাবলী

৩.৩৭ গ্রন্থপঞ্জি

৩.০ উদ্দেশ্য

এই এককের উদ্দেশ্য হল মুঘল সাম্রাজ্যিক ব্যবস্থাপনায় মনসবদার ও জায়গিরদারি প্রথা সম্পর্কে একটি সাধারণ ধারণা করা। নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর এই আলোচনায় বিশেষ জোর দেওয়া হবে:

- জাহাঙ্গিরের আমলে মনসবদারি ব্যবস্থা ও তার পরিবর্তন
- শাহজাহানের রাজত্বকালে মনসবদারি ব্যবস্থা ও তার বিবর্তন
- জাহাঙ্গির ও শাহজাহানের আমলে জায়গিরদারি ব্যবস্থার বিবর্তন

৩.১ ভূমিকা

মুঘল আমলের প্রশাসনিক পদবিন্যাসের একটি উল্লেখযোগ্য এবং গুরুত্বপূর্ণ নাম হল মনসবদার। মনসবদার প্রথার উদ্ভব মধ্য এশিয়ায়। আকবর বিশাল সাম্রাজ্য গঠনের ফলশ্রুতি হিসাবে মনসবদারি ব্যবস্থার প্রচলন করেছিলেন। আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরি এবং সপ্তদশ শতকের 'জাতবিত' থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে মনসবদারি ব্যবস্থা সম্পর্কে পণ্ডিতরা একটা ধারণা পাওয়ার চেষ্টা করে। W.H. Moreland তাঁর 'Rank in the Mughal State Service' প্রবন্ধে এবং আবদুল আজিজ 'Mansabdari System of the Mughal Army' গ্রন্থে মনসবদারির মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যাখ্যা করার প্রথম চেষ্টা করেন। পরবর্তীকালে এম. আতাহার আলী *The Mughal Nobility under Aurangzeb* গ্রন্থে এবং ইরফান হাবিব তাঁর 'The Mansab System, 1595-1637' প্রবন্ধে পূর্ববর্তী অভিমতের পরিমার্জন

ও সংশোধন করেন। আকবর প্রবর্তিত মনসবদারি ব্যবস্থার মূল নীতিগুলি সপ্তদশ শতক পর্যন্ত বজায় ছিল। সুতরাং প্রায় ২৫০ বছরের মুঘল শাসন কাঠামোর একটি প্রধান স্তম্ভ ছিল এই মনসবদারি ব্যবস্থা। তবে এই প্রথা বহু পূর্ব থেকেই মুসলিম বিশেষ করে আব্বাসিদ খলিফাদের সময়ে, এমনকি চেঙ্গিস খাঁ ও তৈমুরের সময়েও প্রচলিত ছিল। ভারতে সুলতানি যুগে এই প্রথা ভিন্ন অর্থে চালু ছিল। কিন্তু মুঘল যুগে যে 'মনসব' প্রথা চালু হয়, তা ছিল একান্তই সম্রাট আকবরের নিজস্ব উদ্ভাবন। সাধারণভাবে 'মনসব' কথাটির অর্থ ছিল পদমর্যাদা বা র‍্যাঙ্ক। এর সঙ্গে মুঘল যুগের কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং নিয়ম-কানুন যুক্ত হয়ে সামগ্রিকভাবে মনসব বোঝাত। আসলে যে কোন সরকারি কর্মচারীই মুঘল যুগে মনসবদার হিসাবে গণ্য হতেন। বৃহত্তর অর্থে নগদে যারা বেতন পেতেন তারাই ছিলেন মনসবদার। তবে সম্রাট আকবর প্রচলিত মনসবদারি ব্যবস্থা পরবর্তীকালে নানা ধরনের পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে মুঘল প্রশাসনের ধারা এগিয়ে নিয়ে যায়। বিশেষ করে আকবরের পুত্র জাহাঙ্গিরের ও তার পুত্র শাহজাহানের শাসনকালে মনসবদারের সংখ্যা, তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য, বেতন, ঘোষিত বেতনের ওপর দায় ও জরিমানার ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনা হয়।

৩.২ জাহাঙ্গিরের আমলে মনসবদার ব্যবস্থা

ঐতিহাসিক মোরল্যাণ্ডের তথ্য অনুসারে জানা যায়, সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে মনসবদারের অধীনে সওয়ার পদ যা নির্ধারিত ছিল তার অনেক ক্ষেত্রে পরিবর্তন করা হয়। সম্রাট জাহাঙ্গিরের এই পরিবর্তনের কারণ ছিল আকবরের সময়কালে অনেক নতুন মনসব পদের সৃষ্টি করা। আর এই ধরনের প্রশাসনের উপর নিয়ন্ত্রণ তৈরি করতে জাহাঙ্গিরকে সওয়ার পদের বেতন কাঠামোতেও অনেক অনেক রদবদল করতে হয়। ফলে আকবরের সময়কার মত অশ্বারোহীদের বেতন জাহাঙ্গিরের সময় দেওয়া হত না। জাহাঙ্গিরের আমলে দু-আসপা ও শিহ-আসপা পদের সংযোজন ঘটেছিল। একজন মনসবদার তাঁর অনুমোদিত 'সওয়ার' পদের একাংশ দু-আসপা ও শিহ-আসপা হিসাবে দেখানোর অধিকার পেতেন। এই 'আসপা সংখ্যক 'সওয়ারের জন্য দ্বিগুণ দায়িত্ব ও বেতনের অধিকারী হতেন। আবার শাহজাহানের আমলে এই দু-আপসা ও শিহ-আসপা পদ প্রদানের সংখ্যা অনেক বেড়েছিল। তাঁর আমলে প্রায় ৬০ জন মনসবদার এই পদের অধিকারী হয়েছিলেন। 'আসপা' পদের অবশিষ্ট সওয়ার 'বারাওয়াদি' নামে অভিহিত। ঐতিহাসিক ইরফান হাবিব সমসাময়িক পর্যটক হকিন্সের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে দেখিয়েছেন যে, সম্রাট জাহাঙ্গির তাঁর রাজত্বের শুরুর দিকে একজন মনসবদারকে সওয়ার প্রতি ৯৬০০ দাম বা ২৪০ টাকা নির্দিষ্ট করেন। কিন্তু সম্রাট জাহাঙ্গিরের রাজত্বকালেই মনসবদার ব্যবস্থায় বেতন কাঠামোতে আমূল পরিবর্তন করা হয়েছিল। সম্রাট আত্মজীবনী তুজক-ই-জাহাঙ্গীরিতে এই বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। এমনকি ১৬১৬ সালে টমাস রো প্রদত্ত তথ্য থেকেও জানা যায় জাহাঙ্গিরের শাসনকালে একজন মনসবদার-সওয়ার প্রতি বছরে বেতন পেতেন ৪০০০ দাম বা ২০০ টাকা। যদিও ডঃ হাবিবের মতে, অর্থের পরিমাণ ছিল ৪৪০০ দাম বা ২২০ টাকা অর্থাৎ ১৬২০ সালের আগেই ঘোড়সওয়ার কিছু মনসবদারের বেতন হ্রাস করা হয়। জাহাঙ্গির তাঁর আত্মজীবনীতে উল্লেখ করেছেন যে, মনসবদার আব্দুল্লাহ খানকে

২০০০ সওয়ার পদ বারাওয়াদি হিসাবে প্রদান করার সময়ে শিহ-আসপা ও দু-আসপা ক্ষেত্রেও বেতন নির্দিষ্ট করা হয়। অর্থাৎ জাহাঙ্গিরের সময় মনসবদারের বেতন কাঠামো যে, পরিবর্তন করা হয় তা তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন। তাছাড়া স্যার রো ও এডওয়ার্ড টেরির তথ্য থেকেও যানা যায় যে, সম্রাট জাহাঙ্গির ১৬১৩ সালের অথবা তার আগেই বারাওয়াদি পদেরও পরিবর্তন ঘটান এবং তিনি মনসবদারদের ঘোষিত সওয়ার সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ রাখার স্বাধীনতা দিয়েছিলেন।

জাহাঙ্গিরের আমলে একজন মনসবদারের জাটপদ অপরিবর্তিত রেখে সওয়ার পদের মর্যাদা বাড়ানো হয়েছিল। এর ফলে দায়িত্ব ও বেতন বৃদ্ধি করা দরকার হয়। এইভাবে যে সব মনসবদার ১০০০ অশ্বারোহী পোষণ করতেন, যার মধ্যে ৩০০ শিহ-আসপা, ৬০০ দু-আসপা এবং ১০০ ইয়াক-আসপা অর্থাৎ মোট ২২০০ অশ্ব থাকত, তাকে ১২ মাসের বেতন লাভের (হাসিল) উপযোগী জায়গির দেওয়া হত। এইভাবে ৮০০ দু-আসপা, ২০০ ইয়াক-আসপা সম্পন্ন মনসবদার (মোট অশ্ব ১৮০০) ১০ মাসের বেতন পেতেন। এই হিসাবে কেবল ১০০০ ইয়াক আসপা সম্পন্ন ১০০০ অশ্বারোহীর পরিপোষক মনসবদার পেতেন ৫ মাসের বেতন। তবে বেতনের অর্থ মূল্য কীভাবে নির্ধারিত হত সে বিষয়ে তেমন তথ্য নেই। তবে জাহাঙ্গির ও শাহজাহানের আমলে সওয়রের এককের বেতন ক্রমশ কমতে থাকে। ১৬১৬ সালে সওয়ারের এককের বেতন ৯৬০০ থেকে কম ৮৮০০ দাম হয়েছিল। শাহজাহানের আমলে তা আরো কমে দাঁড়ায় ৮০০ দামে। মনসবদের বেতন কাঠামো মুঘল যুগে বারে বারে পরিবর্তিত হয়েছে। ইরফান হাবিব দেখিয়েছেন যে, জাট পদের বেতনের হার খুব বেশি কমে যায় ১৬১৬-১৬৩০ সালের মধ্যে। জাহাঙ্গিরের প্রথম দিকে সওয়ার পদের এককের যে বেতন নির্দিষ্ট করা হয়েছিল, তা ১৬১০-১৬১৬ সালের মধ্যে কমে যায়। শাহজাহানের সময়ে প্রতি এককের ৮৮০০ দাম থেকে কমে ৮০০০ দামে এসে দাঁড়ায়। যদিও দু-আসপা, শিহ-আসপার ক্ষেত্রে জাহাঙ্গিরের সময় যে বেতন বৃদ্ধি করা হয়েছিল তা শাহজাহানের সময়ে আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল। ১৬১৫ সালে জাট পদের সংখ্যা পূর্বেকার থেকে দ্বিগুণ করা হয়। ১৬১৫-৩২ সালের মধ্যে জাট পদের সংখ্যা ১/৩ বৃদ্ধি পায়। অন্য দিকে ১৬২১-৩৭ সালের মধ্যে এই সংখ্যা১/২ বাড়ে।

'জাট' ও 'সওয়ারের' পদের ভিত্তিতে মনসবদারদের বেতন নির্দিষ্ট করা হত। মনসবদারদের বেতন দুভাবে দেওয়া হত, এদের বলা হত 'মনসবদার-ই-নগদী'। অধিকাংশ মনসবদার কিছু নির্দিষ্ট জমি বরাদ্দ পেতেন এবং জমি থেকে নির্ধারিত খাজনা ভোগ করতেন। জমি থেকে আদায়কৃত খাজনা হল 'জমা' এবং যে পরিমাণ খাজনা আদায় হত তাকে হাসিল বলা হত। বহু ক্ষেত্রে জমা ও হাসিলের মধ্যে ব্যাপক ফারাক ঘটত এবং সেই কারণে অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় জটিলতার উদ্ভব হয়। পরবর্তীকালে দেখা যায়, জমা অনুপাতে হাসিল বহু পরিমাণে কম। কারণ মনসবদারের সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে তাল মেলানোর জন্য তুলনামূলকভাবে কম পরিমাণ জমিতে 'জমার' পরিমাণ বেশি দেখিয়ে জায়গির বন্টন করা হয়েছিল। স্বভাবতই 'হাসিল' আদায় অসম্ভব হয়েছিল। ফলে জমা ও হাসিলের এই পার্থক্য সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক ভাঙ্গনের সূত্রপাত করে। ১৬০৮ সালের পর মুঘল সাম্রাজ্যে জায়গির ব্যবস্থার কিছু পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। সমকালীন লেখক মীর্জা নাথান *বাহারিস্তান-ই-ঘাইবি* (Baharistan-i-Ghaibi)-তে এর বিবরণ

দিয়েছেন। তাঁর মতে, যে সকল জমিদাররা মুঘলদের সঙ্গে যুদ্ধ না করে বশ্যতা স্বীকার করেছেন, তাদের জমিদারি জায়গির হিসাবে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। অর্থাৎ সাধারণ অর্থে তাদেরকে মুঘল মনসবদার করে নেওয়া হয়। (অনিরুদ্ধ রায়, সম্পাদনা, *মধ্যযুগের ভারত*, পৃষ্ঠা-৩৭) যুদ্ধে পরাজিতদের জমিদারির একটা অংশ 'ভরণ-পোষণ' জায়গির হিসাবে তাদের ফেরত দেওয়া হয় এবং বাকি অংশ নিয়ে নেওয়া হয়। আবার এই নিয়ে নেওয়া জায়গির তনখা জায়গির হিসাবে অন্য মনসবদারদের দেওয়া হয়। (অনিরুদ্ধ রায়, সম্পাদনা, *মধ্যযুগের ভারত*, পৃষ্ঠা-৩৭)

৩.৩ শাহজাহানের আমলে মনসবদার ব্যবস্থা

শাহজাহানের আমলে এই সমস্যা প্রকট হয়েছিল। ডঃ নোমান অহম্মদ সিদ্দিকি দেখিয়েছেন যে, এই সমস্যা সমাধানের জন্য শাহজাহান মাসিক বেতনের স্তর বিভাজন করেছিলেন। এই ব্যবস্থা অনুসারে, একজন মনসবদার যত মাসের বেতন সংগ্রহে সক্ষম, তাকে তত মাসের জন্য নিয়োগ করার ব্যবস্থা করা হয়। শাহজাহানের রাজত্বের শেষ দিকে (১৬৫৫ খ্রিস্টাব্দ) এক নির্দেশ নামা জারি করে ঘোষণা করা হয় যে, নগদী মনসবদাররা সবচেয়ে বেশি আট মাসের বেতন পাবার অধিকারী হবেন। যুবরাজদের এই বেতন হবে দশ মাসের। অবশ্য দু-একটি ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম দেখা যায়। তবে শাহজানের সময়কালে মনসবদারের সংখ্যা অনেক অনেক বৃদ্ধি পায়। আবুল ফজলের আকবরনামা গ্রন্থের ভিত্তিতে দেওয়া পরিসংখ্যান অনুযায়ী ১৫৯৫-৯৬ সালে মুঘল রাষ্ট্র ৩,০৯,২০০ পদ সংখ্যার জন্য বেতন প্রদান করত। আবার শাহজাহানের রাজত্বকাল প্রসঙ্গে ১৬৪৬-৪৭ সালে আবদুল হামিদ লাহোরী যে পরিসংখ্যান প্রদান করেন তা থেকে যানা যায় যে, শাহজাহান রাজকোষ থেকে ৭,৪০,০০০ পদ সংখ্যার জন্য অর্থ বরাদ্দ করেছিলেন। এই পরিসংখ্যান থেকে এটা স্পষ্ট যে মনসবদারি পদ সংখ্যা আকবরের আমলের থেকে শাহজাহানের সময়কালে অনেকটাই বৃদ্ধি পেয়েছিল। আবার ড: আতাহার আলী দেখিয়েছেন যে, আকবরের সময়কালে রাজত্বের ৪০তম বছরে যে ৫০০০ হাজারী ও তার ঊর্ধ্বে মনসবদারের সংখ্যা ছিল ২৯, তা শাহজাহানের আমলে রাজত্বের ৩০তম বছরে বেড়ে দাঁড়ায় ৪৯-এ। এই সংখ্যা ১৬৫৮-৭৪ সালে দাঁড়ায় ৫১-এ। একই ধরনের পরিবর্তন ৩০০০-৪৫০-এর মধ্যেকার মনসবদার এবং ১০০০-২৭০০ মনসবদারের সংখ্যার ক্ষেত্রে বৃদ্ধি চিত্র সমসাময়িক *আইন-ই-আকবরি* ও *আলম-ই-সালে তে* তুলে ধরা হয়েছে।

ঐতিহাসিক মোরল্যান্ড দেখিয়েছেন যে, শাহজাহান মধ্য এশিয়ার বালখ ও বাদাখসান অভিযানের সময়ে থেকে সওয়ার পদের একক কমিয়ে দিয়েছিলেন। যদিও সাম্প্রতিক কালে একটি প্রবন্ধে ইরফান হাবিব মোরল্যান্ডের এই মত গ্রহণ করেননি।

শাহজাহানের আমলে মনসবদারেরা তার পদমর্যাদা অনুযায়ী কত সংখ্যক সৈন্য রাখবেন তা নির্ধারণ করা হয়। আইনের বলে ১/৫ অংশ সৈন্য রাখবে বলে স্থির হয়। এরপর সওয়ারের সংখ্যাকে ৪০ টাকা দিয়ে গুণ করা হয়। বারো মাসের মাহিনার স্তর হলেও এটা ছিল মাসিক মাহিনা। এই নিয়ম ছিল বেশ জটিল। ঐতিহাসিক আতাহার আলি দেখিয়েছেন যে, জায়গিরেরর জমা ও হাসিলের মধ্যেকার ফারাকের জন্য শাহজাহান মনসবদারদের মাসিক বেতনের স্তর শুরু করেন। অর্থাৎ মনসবদার জায়গির

থেকে যত মাসের বেতন সংগ্রহ করতে পারছে, তত মাসের জন্যই তাকে নিয়োগ করা হয়। এইসব জায়গিরগুলির নামকরন ছিল এইরূপ-যেমন, শশমাহা (ছয় মাসের), সিমাহ (তিন মাসের) ইত্যাদি। এই প্রথা যে কেবল জায়গিরের বেলায় প্রয়োগ করা হয়েছিল তা নয়। শাহজাহানের রাজত্বের ২৭ তম বছরে একটা ফরমানে আদেশ দেওয়া হয় যে নগদ অর্থে যারা বেতন পাবে, তারা আট মাসের বেশি বা চার মাসের কম পাবে না। তবে যুবরাজরা দশ মাসের বেতন পেতেন। এই নিয়মের ব্যতিক্রম করা হয়েছিল মাত্র দুজন অভিজাতের জন্য। অধ্যাপক অনিরুদ্ধ রায় তার 'মুঘল সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনের ইতিহাস' গ্রন্থ-এ দেখিয়েছেন যে, নগদীর মনসবদারদের বেলায় যেমন প্রতিমাসের বেতন সহজেই করা যায়, জায়গিরের রাজস্ব সংগ্রহ থেকে করা কঠিন। এর ফলে জায়গির থেকে মনসবদাররা তাদের পাঁচ মাসের বা সাত মাসের মতই রাজস্ব সংগ্রহ করতে পারতেন। আর এটি প্রয়োগ করা হয়েছিল প্রধানত দুটি পদের মনসবদারদের বেতনের ক্ষেত্রে, অবশ্য সওয়ার পদের জন্য শাহজাহান একটি ভিন্ন প্রথা গ্রহণ করেন। শাহজাহানের রাজত্বের ২৭তম বছরের ঐ ফরমানের মধ্যে একটি সারণি তৈরি করেছেন, যা এই বিষয়ের সমস্ত সমস্যাকে পরিস্কার করে দেয়। এই সারণিকে বিশ্লেষণ করে ঐতিহাসিক আতাহার আলি মনে করেন যে, উচু নগদী মনসবদারদের মাসিক বেতনের স্তর নীচু নগদী মনসবদারদের থেকে বেশি ছিল। অথচ এই ফরমানের আগে এদের অবস্থা বেশি ভাল ছিল। তবে যুবরাজ হিসাবে ঔরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্যের প্রাদেশিক শাসনকর্তা থাকাকালীন এই আদেশ বদলানোর আবেদন করলে শাহজাহান দাক্ষিণাত্যের নীচু স্তরের মনসবদারদের জন্য ছাড় দিয়েছিলেন। এমনকি ঔরঙ্গজেব সম্রাট হয়েও শাহজাহানের আদেশ বলবত রাখেন এবং কিছু পরিবর্তন করেন।

তাই বলা যায় আকবর প্রবর্তিত সমসবদারি প্রথা জাহাঙ্গিরের সময় কিছুটা গোষ্ঠীদন্দ্ব ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে ঠিক মত পালিত হচ্ছে কিনা তা দেখা সম্ভব হয়নি। তবে শাহজাহান আকবরের নিয়মের কিছু পরিবর্তন করে কঠোরভাবে তা পালন করার চেষ্টা করেন। সমসাময়িক লেখক আবদুল হামিদ লহোরী ওই সময়ের ১/৩ অংশ নিয়ম প্রচলনের উল্লেখ করেছেন যা পরবর্তীকালে কাবুলের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা হয়। কাজেই আকবর প্রবর্তিত মনসবদারি ব্যবস্থার বিবর্তনের ক্ষেত্রে জাহাঙ্গিরের থেকে শাহজাহানের ভূমিকা ছিল অনেক বেশি। তবে তিনি রাজপুত মনসবদারদের ক্ষেত্রে আকবরের রাজপুত নীতি বজায় রেখেছিলেন, যা সাম্রাজ্যের সংহতির ক্ষেত্রে বড় পদক্ষেপ ছিল। মনসবদারি প্রথার গুরুত্ব বর্ণনা প্রসঙ্গে ড: অনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, "সুলতানি আমলের সামরিক ব্যবস্থার তুলনায় মনসবদারি ব্যবস্থা ছিল উন্নত ব্যবস্থা"। বস্তুত এই ব্যবস্থার ফলে মুঘল সম্রাটেরা অল্প আয়াসে এবং সামান্য প্রশাসনিক পরিকাঠামো ব্যবহার করে এক বিশাল সেনা বাহিনী গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। সম্রাট আকবরের আমলে সাম্রাজ্যের ক্ষমতাও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করলেও পরবর্তীকালে মনসবদারি ব্যবস্থার মধ্যে নানা প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির উদ্ভব এই ব্যবস্থাকে অকার্যকরী করে তুলেছিল।

৩.৪ জাহাঙ্গির ও শাহজাহানের আমলে জায়গিরদারি ব্যবস্থার বিবর্তন

সাধারণত 'জায়গির শব্দের অর্থ দখল বা কোন স্থানে অবস্থান।' আরবি শব্দ জায়গির এঁর প্রয়োগ

মুঘল যুগে আকবরই প্রথম সূচনা করেন বলে অধিকাংশ ঐতিহাসিক মনে করেন। তবে ডঃ ইরফান হাবিবের মতে সুলতানি যুগে প্রচলিত ইক্তা আর, মুঘল যুগের জায়গির শব্দ দুটির মধ্যে বিশেষ পার্থক্য ছিল না। ইরফান হাবিবের মতে সুলতানি যুগে প্রচলিত ইক্তা প্রথা প্রায়োগিক রূপ পেয়েছিল। তবে জায়গিরদারি ব্যবস্থা কখনই বংশানুক্রমিক অধিকারভুক্ত হয়নি। সাধারণত মনসবদাররা যখন নগদ বেতনের পরিবর্তে সাম্রাজ্যের একটি অংশের জমি থেকে রাজস্ব আদায়ের অধিকার অর্জন করতেন তাদের বলা হত জায়গিরদার। আর এই সমস্ত সরকারি জমিকে বলা হত জায়গির। তবে কোন মনসবদারকে নগদ বেতন দেওয়া হবে, আর কোন মনসবদারকে জায়গির দেওয়া হবে তা মুঘল সম্রাট নিজে ঠিক করতেন; জায়গির প্রাপক মনসবদারদের জায়গীরের উপর অধিকার কত দিনের জন্য তাও নির্দিষ্ট ছিল না। কোনো জমি থেকে কতটা রাজস্ব পাওয়া যাবে সরকার তার একটা হিসাব করতেন, তাকে বলা হত 'জমা' এবং সেই এলাকা থেকে প্রকৃত রাজস্ব সংগ্রহের পরিমানকে বলা হত 'হাসিল'। আর এই 'জমা' ও 'হাসিলের' মধ্যে পার্থক্যের বিষয়টি জায়গিরদারি ব্যবস্থার সংকট তৈরি করেছে, যা এই ব্যবস্থার বিবর্তনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়।

সম্রাট জাহাঙ্গিরের রাজত্বকালে জায়গীরের জমা ও হাসিলের মধ্যে পার্থক্যের পরিমাণ ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। ফলে মনসবদারদের মধ্যে জায়গির থেকে আয়ের অনিশ্চয়তা তৈরি হলে তার প্রভাব মুঘল প্রশাসনের ওপর পড়তে শুরু করে। আর এপ্রসঙ্গে আমাদের আর একটি বিষয় মনে রাখতে হবে, তা হল মুঘল সম্রাটদের ঘোষিত নীতি যাইহোক না কেন মনসবদার বা জায়গিরদাররা নির্দিষ্ট জাতি ভিত্তিক গোষ্ঠী থেকেই নির্বাচিত হয়ে এসেছেন। সম্রাট আকবর এর আমল থেকে জাহাঙ্গির, শাহজাহান ও ঔরঙ্গজেব হয়ে মুঘল শাসনের শেষ পর্যন্ত এই প্রথাই প্রবর্তিত ছিল। এমনকি কোন বিশেষ জাতিগোষ্ঠী সমাজে রাজনৈতিক ক্ষমতাধারী হলে তাদেরও এই ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত করা হত। তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ ছিল রাজপুত ও মারাঠা সর্দাররা।

আবার জায়গিরদাররা তাদের অধীনস্ত জায়গিরকে ছোট ছোট ভাগে বণ্টন করতে পারতেন। জাহাঙ্গিরের রাজত্বের শুরুর দিকে সিন্ধুর তারখানরা এবং শাহজাহানের রাজত্বে অযোধ্যায় এই ধরনের বন্টন লক্ষ্য করা যায়। যদিও জাহাঙ্গির জায়গিরদারদের নিয়ন্ত্রণের জন্য এমন নির্দেশও দিয়েছিলেন যে, তারা আমিল বা কোন পদস্থ কর্মচারীও স্থানীয় অভিজাত পরিবারের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্কে যুক্ত হতে পারবেন না। ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার দেখিয়েছেন যে, সম্রাট জাহাঙ্গির এক বিশেষ নির্দেশনামা জারি করে স্থানীয় স্তরে জায়গিরদাররা যে বিভিন্ন ধরনের কর আদায় করতেন তা নিষিদ্ধ করেন।

তবে সম্রাট জাহাঙ্গিরের রাজত্ব কালে এক নতুন ধরনের জায়গীরেরও প্রচলন ঘটে। একে বলা হত 'আলতুন তুমঘা' বা 'আল তুমঘা' জায়গির। প্রকৃতপক্ষে জমিদার বা অন্য গোষ্ঠীপতিরা ছাড়া মুঘলযুগে কেউ 'ওয়াতন জায়গির' লাভ করতেন না বা বংশানুক্রমে তা ভোগ করতে পারতেন না। এই জন্য একটি বিশেষ ব্যবস্থা অনুসারে প্রজারা যাতে এই জাতীয় সুযোগ পেতে পারে তার জন্য সম্রাট জাহাঙ্গির 'আল তুমঘা' বা ''আলতুন তুমঘা' জায়গির প্রদান করেন। তবে এই সব জায়গির সংশ্লিষ্ট অমাত্যদের জন্মস্থান বা পরিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল এবং সুযোগ্য সম্রাটের ওপর নির্ভরশীল ছিল। তাছাড়াও

মুঘল যুগে সম্রাটরা যখন কোন ব্যক্তিকে ভূমিদান করতেন তা সাধারণত ঐ ব্যক্তির জীবদ্দশার জন্য এই দান করা হত এবং ঐ ব্যক্তি কোন মালিকানা পেতেন না। সম্রাট ইচ্ছা করলে এই দান বাতিল করতে পারতেন। সম্রাট আকবর এই ধরনের বহু জমির দান বাতিল করেছিলেন বা কমিয়ে দিয়েছিলেন। জাহাঙ্গির আকবরের দান মেনে নিয়েছিলেন। শাহজাহান দানগুলি পরীক্ষা করার কোন চেষ্টা করেন নি। তবে ১৬৪৮-৪৯ সালে এই সব দানের একটা সমীক্ষা করা হয় কিন্তু কেন করা হয় তা জানা যায় না।

অধ্যাপক অনিরুদ্ধ রায় তাঁর 'মুঘল সাম্রাজ্যের উত্থান পতনের ইতিহাস' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে দেখিয়েছেন, আকবরের একত্রিশ বছর রাজত্বের সময়ে দিল্লি, অযোধ্যা ও এলাহাবাদ প্রদেশের খলিসায় জমা ছিল মোট জমার ১/৪ অংশ। জাহাঙ্গিরের রাজত্ব কালে জায়গীরের সংখ্যা অনেক বেড়ে যায় বা প্রচুর মনসব তথা জায়গির বিতরণ করার ফলে খলিসার আয় সাম্রাজ্যের আয়ের 5%-এ নেমে আসে। শাহজাহান মুঘল রাজকোষের অবস্থা ফেরাতে জাহাঙ্গিরের এই ব্যবস্থাকে বদলানোর নীতি নিয়ে 'খলিসা' জমি বাড়াতে থাকেন, এর ফলে আয় বেড়ে ১/১৫ ভাগ হয়ে যায়। কয়েক বছরের মধ্যে এর আয় দাঁড়ায় ১/১১ অংশ এবং ২০ বছর রাজত্বের সময়ে এটা দাঁড়ায় এক-সপ্তমাংশে যা ঔরঙ্গজেবের রাজত্বের দশম বছরে এর আয় সাম্রাজ্যের আয়ের ১/৫ ভাগ এ দাঁড়িয়ে যায়।

সম্রাট শাহজাহান জায়গিরদারি ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণের জন্য এবং এই ব্যবস্থাকে শৃঙ্খলাপূর্ণ করার জন্য প্রথমে প্রতিটি মহলে একজন করে আমীন নিযুক্ত করেন ও ক্রোড়ীদের রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব দেন। পরবর্তীকালে দেওয়ান সাদুল্লাহ খান 'আমীন ফৌজদার' নামক একধরনের কর্মচারী প্রতিটি মহলে নিযুক্ত করে করে ক্রোড়ীদের পরিচালনা করার ব্যবস্থা করেন। এছাড়াও প্রতিটি পরগনাতে ফোতদার বা খিজান্দার, কারকুন নিযুক্ত করা হয়। সমসাময়িক তথ্য থেকে জানা যায়, সম্রাট শাহজাহান স্বয়ং জায়গিরদারদের কাজকর্ম বিষয়ে মাথা ঘামাতেন এবং কর্তব্য কর্মে কোনো প্রকার অবহেলা করলে নিজ পুত্রদেরও ক্ষমা করতেন না। সম্রাট শাহজাহান একবার এই কারণেই ঔরঙ্গজেবকে তিরস্কার করেন বলেও জানা যায়। এমনকি জায়গিরদারি সংকট বা সমস্যাকে সমাধানের জন্য সম্রাট শাহজাহান জমা ও হাসিলের মধ্যে ফারাক কমিয়ে চেষ্টা করেন। কিন্তু খুব বেশি সফল হননি। এমনকি শাহাজাহান সদর মুসওয়াই খানকে তার পদ থেকে সরিয়ে দেন, কেননা তিনি সম্রাটের আদেশ না নিয়ে প্রচুর জায়গির দান করেন বলে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছিল।

৩.৫ উপসংহার

আসলে ক্ষয়িষ্ণুমান মুঘল শক্তির সঙ্গে মনসবদারি ও জায়গিরদারির মত প্রথাগুলির দুর্বলতাও প্রকাশ পেতে থাকে। অনেক ঐতিহাসিক ইরফান হাবিবের জায়গিরদারি সংকটকে কৃষি সংকট হিসাবে দেখেছেন। কেননা জায়গিরদাররা যখন থেকে তাদের জায়গির ইজারা দিতে শুরু করেন তখন থেকেই কৃষক শোষণ বৃদ্ধি পায় এবং ঘন ঘন কৃষক বিদ্রোহ সংগঠিত হয়, যা মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের অন্যতম কারণ। আবার ঐতিহাসিক সতীশ চন্দ্র জায়গিরদারি সংকটকেই মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের মূল কারণ বলে মনে

করেছেন। আর এই সংকটের নিশানা জাহাঙ্গিরের রাজত্বকাল থেকে শুরু হয়। ঔরঙ্গজেবের সময় মুঘল সাম্রাজ্যকে প্রচণ্ড আর্থিক সংকট ও মুঘল দরবারে জায়গিরের জন্য দল ও রাজনীতির বাড়বাড়ান্ত তৈরি হয়, যে কারণে মুঘল সাম্রাজ্য ভেঙ্গে পড়ে।

৩.৬ প্রশ্নাবলী

১. জাহাঙ্গিরের রাজত্বকালে মনসবদারি ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করুন।
২. শাহজাহানের সময় মুঘল মনসবদারি ব্যবস্থা কীভাবে বিবর্তিত হয়েছিল?
৩. জাহাঙ্গির ও শাহজাহানের সময় মুঘল মনসবদারি ব্যবস্থা সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লিখুন।

৩.৭ গ্রন্থপঞ্জি

- Chandra, Satish (1999). *Mediival India. From Sultanate to the Mughals*. Mughal Empire, 1526-1748, Part Two, Har-Anand Publications, New Delhi.
- Chandra, Satish (2007). *Hitory of Medieval India, Orint BlackSwan,* New Delhi.
- Bhargava, Meena (2010). *Exploring Medieva lIndia, Vol II,* Orint BlackSwan, New Delhi.
- Richards, John F (1993). *The Mughal Empire*, New Delhi, Oxford University Press.
- রায়, অনিরুদ্ধ (2020), *মুঘল সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনের ইতিহাস,* প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড, প্রগতিশীল প্রকাশনা,
- হাবিব, ইরফান (2018), *মধ্যযুগের ভারত একটি সভ্যতার পাঠ*, ন্যাশানাল বুক ট্রাস্ট।

একক ৪ ❑ সাম্রাজ্যিক সংস্কৃতি

গঠন

৪.০ উদ্দেশ্য

৪.১ ভূমিকা

৪.২ সাহিত্য

৪.৩ সঙ্গীত

৪.৪ স্থাপত্য শিল্প

৪.৫ চিত্রকলা

৪.৬ উপসংহার

৪.৭ প্রশ্নাবলী

৪.৮ গ্রন্থপঞ্জি

৪.০ উদ্দেশ্য

এই এককের উদ্দেশ্য হল নিম্নে বর্ণিত বিষয়গুলিকে শিক্ষার্থীদের কাছে তুলে ধরা:

- মুঘল আমলের সাম্রাজ্যিক সংস্কৃতি সম্পর্কে একটি ধারণা তৈরি করা
- জাহাঙ্গির ও শাহজাহানের রাজত্বকালে সাহিত্য, সংগীত, স্থাপত্য ও চিত্রকলার বিকাশ পর্যালোচনা করা।

৪.১ ভূমিকা

স্লীম্যান [Sleeman] তাঁর *Rambles and Recollections* গ্রন্থে শেখ সাদির উক্তি উল্লেখ করে লিখেছেন, "যে মানুষ ধর্ম প্রতিষ্ঠান, সেতু, অট্টালিকা ইত্যাদি নির্মাণ কাজের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন তিনি মানুষের মাঝে অমর হয়ে আছেন"। শেখ সাদির এই উক্তি ভারতে মুঘল শাসকদের সঠিকভাবে প্রযোজ্য। শিল্প রসিক ইতিহাসবিদ সরসীকুমার সরস্বতীর মতানুসারে মুঘল সম্রাটরা ছিলেন একান্তভাবেই শিল্প ও প্রকৃতিপ্রেমী। সমকালীন মুঘল শিল্প সংস্কৃতির মধ্যেই তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অনেকাংশেই প্রকাশ পেয়েছে। সাহিত্য, সঙ্গীত, নৃত্যকলা, স্থাপত্য নিদর্শন, চিত্রকলা ও ধর্মীয় চিন্তাধারর প্রতিফলনের মধ্য দিয়েই মুঘল রাজকীয় সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। তবে মুঘল রাজকীয় সংস্কৃতি আলোচনায় আমর সম্রাট জাহাঙ্গির ও শাহজাহানের রাজত্বকালকেই এই অধ্যায়ে তুলে ধরা হল।

৪.২ সাহিত্য

মুঘল যুগে সাহিত্য ও শিল্পের যে অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায় তা কেবলমাত্র মুঘল সম্রাটদের একান্ত সদিচ্ছার প্রতিফলন নয়। এঁর সঙ্গে বৈদেশিক ভয় মুক্ত পরিবেশ ও মুঘল সম্রাটদের ধর্ম সহিষ্ণুতা বিশেষভাবে ভারতীয় সৃজনশীল লেখকদের সাহস যোগায়। এই সময় আঞ্চলিক ভাষায় বিভিন্ন সাহিত্যের অগ্রগতি হয়। শিখ গুরুমুখী ভক্তি সাহিত্য, হিন্দি সাহিত্য, ব্রজবুলি সাহিত্য, উর্দু সাহিত্য, উড়িয়া ও বাংলা সাহিত্যের পাশাপাশি অহমীয়া, গুজরাটি ও ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের অগ্রগতি ঘটে। আর মুঘল যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অবদান হল ফারসি ভাষা ও সাহিত্যে। মুঘল সম্রাট বাবরের শাসনকাল থেকে সাহিত্য ক্ষেত্রে যে বিকাশের সূচনা হয় তা আকবরের রাজত্বকালে অনেকটাই পরিপূর্ণতা পায়। আর সম্রাট জাহাঙ্গির ও শাহজাহান ছিলেন কার্যত সাহিত্যরসিক।

জাহাঙ্গিরের সভাকবি ছিলেন আবু-তালিব-আমুলি, আর শাহজাহানের সভাকবি ছিলেন আবু তালিব কালিম। চন্দ্র ভাস ছিলেন ব্রাহ্মণ এবং মহম্মদ আলি সইব ছিলেন বিখ্যাত কবি। জাহাঙ্গিরের আত্মজীবনী *তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরি*, মুতাসিদ খাঁর *ইকবাল নামা* আলাউদ্দিন ইস্পাহানীর *তারিখ-ই-বাংলা* ছিল বিশেষ উল্লেখযোগ্য সাহিত্য; জাহাঙ্গিরের আমলের বেসরকারী সাহিত্য রচনার মধ্যে মহম্মদ হাদির রচনা *ওয়াকিয়ায়াত-ই-জাহাঙ্গীর* ও কামগার খৈরাত খাঁর রচনা *মসির-ই-জাহাঙ্গীরি* ছিল উল্লেখযোগ্য।

আবার শাহজাহানের রাজত্বকালে আবদুল হামিদ লাহোরীর রচনা *পাদশানামা* বিশেষ ঐতিহাসিক সাহিত্য। এই সময় বাংলার ইতিহাসমূলক গ্রন্থ *বাহারিস্থান-ই-ঘাইবি* গ্রন্থটি বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। আবার *পাদশাহনামা* নামক তৃতীয় গ্রন্থটি মহম্মদ আমিন কাজভিনী সংকলন করেন। এছাড়াও শাহজাহানের রাজত্বকালে এনায়েত খাঁ *শাহজাহান নামা* নামক ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচনা করেন। এই সময়কার আর একজন লেখক হলেন মহম্মদ সাদিক খাঁ, যিনি শাহজাহান-নামা নামে আর একটি গ্রন্থ রচনা করেন। তবে শাহজাহান-পরবর্তী পর্বেও মূঘল সাহিত্য বিকাশ লাভ করেছিল।

৪.৩ সঙ্গীত

প্রাচীনকাল থেকেই ভারতীয় সংস্কৃতিতে সঙ্গীত ও নৃত্য কলার বিশেষ স্থান ছিল। মুঘল সম্রাটরাও এই ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি বিশেষ অনুরাগ দেখান। বাবর নিজে সঙ্গীত বিশারদ ছিলেন। তিনি নিজে কয়েকটি গান রচনা করেন। হুমায়ুন প্রতি সপ্তাহে সোম ও বুধবার সঙ্গীতজ্ঞদের আলাপ আলোচনা শুনতেন। আর আবুল ফজলের বর্ণনা থেকে জানা যায়, আকবর ছোট বেলা থেকে গান শুনতে ভাল বাসতেন। হিন্দু, ইরানি, কাশ্মীরী বহু সঙ্গীত ও নৃত্য শিল্পীদের সঙ্গে তিনি প্রচুর সময় কাটাতেন। তিনি নিজে সঙ্গীত বুঝতেন ও ভাল নাকাড়া বাজাতেন। তাঁর রাজদরবারেই নবরত্নের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রত্ন মিয়া তানসেন বিরাজ করতেন। এছাড়াও সভাসদ আব্দুর রহিম খান-ই- খানান, বৈজু বাওয়া, তানসেনের গুরু স্বামী হরিদাস ও সুরদাস প্রমুখ সঙ্গীত বিশারদ ছিলেন।

আবার সম্রাট জাহাঙ্গির-ও পিতা আকবরের মতই সঙ্গীত ও নৃত্য শিল্পের অনুরাগী ছিলেন। নূরজাহান বেগমও ছিলেন শিল্পীদের অনুরাগী। সামসাময়িক মুতামিদ খানের *ইকবালনামা-ই-জাহাঙ্গীরি* গ্রন্থ থেকে জাহাঙ্গিরের সময়কার ছয়জন দক্ষ সঙ্গীত বিশারদের নাম পাওয়া যায়। পর্যটক উইলিয়াম ফিঞ্চ তাঁর

বিবরণীতে উল্লেখ করেছেন যে, জাহাঙ্গিরের সময়কালেও মুঘল দরবারে পূর্বের মত সপ্তাহের বিভিন্ন দিনগুলিতে গায়ক, শিল্পী ও নর্তকীদের নৃত্য শিল্প প্রদর্শনের রেওয়াজ বা প্রথা প্রচলিত ছিল।

আবার জাহাঙ্গিরের পুত্র শাহজাহান ছিলেন নিজে সঙ্গীতের অনুরাগী। তিনি হিন্দি ভাষায় গান রচনা করার পাশাপাশি গান গাইতেনও। তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল মধুর। পর্যটক টেভারনিয়ের বলেছেন, শাহজাহানের রাজত্বকালে রাজদরবার সংগীতময় পরিবেশে আচ্ছন্ন ছিল। অথচ আমরা জানি শাহজাহানের রাজত্বকালে বহুবিধ ঘটনার সমাবেশ ঘটেছিল। এর মাঝেও সম্রাট শাহজাহান সংস্কৃতির প্রতি নজর রেখেছিলেন। ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকারও লিখেছেন যে, সম্রাটের গলা এত সুমধুর ছিল যে, সাধু, সন্ন্যাসী ও ফকিররা তাঁর গান শুনে আত্মহারা হয়ে যেতেন। শাহজাহানের রাজদরবারের বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞরা হলেন, জগন্নাথ, জনার্দন ভট্ট, রামদাস মহাপাত্র প্রমুখ। তবে শাহজাহান পরবর্তীকালে ঔরঙ্গজেবের ধর্মীয় গোড়ামির দ্বারা চালিত হয়ে রাজদরবারে সঙ্গীত ও নৃত্য কলাকে নিষিদ্ধ করেন এবং দরবার থেকে শিল্পীদের বহিস্কার করেন ও সমসাময়িক মানুচ্চির বিবরণ থেকে যানা যায় সম্রাট কঠোরতার সাথে সাম্রাজ্যের সর্বত্র সঙ্গীত ও নৃত্য কলাকে নিষিদ্ধ করেন।

৪.৪ স্থাপত্য শিল্প

মুঘল শিল্প স্থাপত্যের মধ্যে কার্যত ইসলামিক শিল্পরীতির সঙ্গে ভারতীয় হিন্দু শিল্পরীতির সমন্বয় ঘটে। তবে হুমায়ুন ও আকবরের সময় পারসিক শিল্পরীতির প্রভাবও মুঘল শিল্প স্থাপত্যে লক্ষ্য করা যায়। একথা সত্যি যে বাবর ও হুমায়ুন ভারতে তাদের ভাগ্য পরীক্ষা এবং সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার কাছে ব্যস্ত থাকার জন্য শিল্প কলার দিকে মনোযোগী হতে পারেননি। তবে বাবর তিনি তাঁর আত্মজীবনী *তুজুক-ই-বাবরি*-তে ভারতীয় শিল্প স্থাপত্য সম্পর্কে নানা মন্তব্য করেছেন। তবে বাবরের সময়কালের বৃহৎ স্থাপত্য নিদর্শন আজ আর সেভাবে কিছুই নেই, সবই নষ্ট হয়ে গেছে, টিকে আছে কিছু ছোট ছোট মসজিদ। বাবর নিজে সৌন্দর্য রসিক হওয়া সত্ত্বে ভারতীয় শিল্প স্থাপত্যের ক্ষেত্রে বিশেষ কোন ছাপ ফেলতে পারেনি। আর হুমায়ুনের সমগ্র জীবন ছিল ভাগ্য বিড়ম্বিত। কিন্তু *হুমায়ুননামা* থেকে জানা যায়, দিল্লিতে 'দিন-পনাহ' নামে এক নতুন নগরী নির্মাণের পরিকল্পনা করেছিলেন। আসলে তিনি চেয়েছিলেন দিল্লীকে ইসলামিক সংস্কৃতির কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তুলতে। পাঞ্জাবের ফতেয়াবাদে তিনি পারসিক রীতিতে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। এর বেশি হুমায়ুনের পক্ষে আর কিছু করা সম্ভব হয়নি। পরবর্তীকালে শেরশাহ বেশকিছু শিল্প স্থাপত্য নির্মাণ করেন। এছাড়া তিনি জামালি মসজিদের নির্মাণ কাজও সম্পূর্ণ করেন।

আকবর কেবলমাত্র সাম্রাজ্য বিস্তার ও প্রজাহিতৈষণার জন্য বিখ্যাত ছিলেন না, তিনি স্থাপত্য নিদর্শনের পৃষ্ঠপোষকও ছিলেন। তিনি পিতা হুমায়ুনের স্মৃতি সৌধ নির্মাণ করেন এবং আগ্রা দুর্গের নির্মাণকার্য সম্পূর্ণ করেন। সর্বোপরি তাঁর স্থাপত্য রীতির মহত্তর প্রতিভার বহিঃপ্রকাশ ফতেপুর সিক্রির সৌধরাজি। গুজরাট বিজয়ের পর সম্রাট আকবর স্বয়ং উপস্থিত থেকে ১৪-১৫ বছর ধরে ফতেপুর নগরী নির্মাণ করেন। ফতেপুর সিক্রিতে ধর্মনিরপেক্ষ সৌধের মধ্যে অন্যতম ছিল দেওয়ানি খাস, বীরবলের গৃহ, পঞ্চমহল ইত্যাদি। ঐতিহাসিক ভিনসেন্ট স্মিথ আকবরের ফতেপুরকে পাথরের তৈরি কল্পনা ও স্বপ্ন

(Aromance in stone) বলেছেন। এছাড়াও আকবর তাঁর উত্তরাধিকারীর জন্য আগ্রা দুর্গের নিকটবর্তী স্থানে 'জাহাঙ্গির মহল' নির্মাণ করেন। তবে স্থাপত্য শিল্প নির্মাণে আকবর ছিলেন মুঘল শাসকদের মধ্যে প্রকৃত পথিকৃৎ।

অন্যদিকে জাহাঙ্গির ছিলেন চিত্র রসিক, স্থাপত্য প্রেমী নয়। ১৬১৩ সালে তিনি সেকান্দ্রাতে নির্মিত আকবরের সমাধি সৌধের কাজ শেষ করেন। তবে শিল্প রসিকরা বলেন, আকবর সমাধি মন্দিরের প্রথম তল নির্মাণ করেছিলেন। দ্বিতীয় তল জাহাঙ্গির নির্মাণ করেন। তবে দ্বিতলের কাজে সামঞ্জস্যের অভাব রয়েছে। সুপ্রশস্ত বাগিচা ও কৃত্রিম জলাধারের মাঝে গড়ে তোলা এই সমাধিসৌধ মানুষের অশান্ত হৃদয়ে ক্ষণিকের জন্য হলেও শান্তির বারি সিঞ্চন করতে সক্ষম। বরং বলা যায়, জাহাঙ্গিরের তুলনায় তাঁর পত্নী নূরজাহানের স্থাপত্য প্রীতি ছিল অনেক বেশি আকর্ষণীয়। নূরজাহানের উৎসাহে যমুনার বাম তীরে ১৬২৬ সালে আগাগোড়া মার্বেল পাথরে নূরজাহানের পিতা ইতিমদ-উত-দৌল্লার সমাধি সৌধ নির্মিত হয়। আভ্যন্তরীণ অলংকারণের রঙিন মোজাইক টালির ব্যবহার যা পিয়েত্র ডুরা (Pietra dura) রীতি বলে মনে করা হয়। জাহাঙ্গিরের সময় লাহোরের প্রসাদ, শালিমার বাগ, শাহদোরাতে (লাহোর) নিজের সামধি ভবন উল্লেখযোগ্য শিল্প কীর্তি। দিল্লীতে খান-ই-খানান আব্দুল রহিম এর স্মৃতি সৌধ আর একটি উল্লেখযোগ্য শিল্প কীর্তি। দিল্লীতে খান-ই-খানান আব্দুল রহিম এর স্মৃতি সৌধ আর একটি উল্লেখযোগ্য শিল্প কীর্তি। এখানে হুমায়ুনের স্মৃতি সৌধ ও পরবর্তীকালের তাজমহলের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

শাহজাহানের রাজত্বকাল মুঘল স্থাপত্য কীর্তির সুবর্ণযুগ হিসাবে খ্যাত। শাহজাহানের সময়কালেই মুঘল স্থাপত্য সর্বশ্রেষ্ঠ স্তরে পৌঁছায়। বিশেষ করে দরবারে পারসিক প্রভাব মুঘল স্থাপত্য রীতির ওপরও কাজ করেছিল। একজন দরদি নির্মাতা হিসাবে শাহজাহান আগ্রা দুর্গ, দিল্লী দুর্গ, লাহোর দুর্গ এবং সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বহু স্থাপত্য কীর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। বিশেষ করে শাহজাহানের সময় দেওয়ান-ই-খাস, দেওয়ান-ই-আম, মতি মসজিদ, জামি মসজিদ, শিষমহল, মুসাম্মন বারজ, আংগুরী বাগ, মাছনী ভবন শাহজাহানের স্থাপত্য কীর্তির প্রথম পর্বের নিদর্শন। ১৬২৭ সালে (২০১×৬৭) ফুট বেলে পাথর ও মার্বেলের দ্বারা নির্মিত দেওয়ান-ই-আম নামক একটি সুরম্ভ সৌধ এর পাশে রয়েছে দেওয়ান-ই-খাস, মতি মসজিদ ও শিষমহল। মাথার ওপরে তিনটি গম্ভুজ এবং চতুষ্কোণে অষ্টকোণী মীনা শোভিত শ্বেত মার্বেলে নির্মিত মতি মসজিদের (Pearl Mosque) নির্মাণ কার্য আনুমানিক ১৬৫৪ সালে শেষ হয়। ১৬৩৮ সালে শাহজাহান দিল্লীতে শাহজাহনবাদ নামে রাজধানী নির্মাণ শুরু করেন। এখানেই লাল কেল্লা ১৬৪৮ সালে নির্মিত হয়। এই দুর্গ নগরীর পশ্চিমে আছে লাহোর গেট, ভেতরে দেওয়ান-ই-আম, দেওয়ান-ই-খাস। দেওয়ান-ই-আম এর থাম ও গম্বুজ করুকার্যময়। এখানেই ছিল ময়ুর সিংহাসন যার শিল্পী ছিলেন বেবাদল খাঁ। দেওয়ান-ই-খাসের নীচের অংশ রুপোর পাতে মোড়া। তিনদিকে ছিল মার্বেল সোনা ও মনি মুক্তা। এখানে পিয়েত্রা ডুরা রীতির প্রয়োগ ঘটেছিল। রঙ্গমহল বা ইমতিয়াজ মহল ছিল সোনা রূপার পাত ও ফুলে শোভিত। ১৬৪৪ থেকে ১৬৫৮ সালের মধ্যে শাহজাহান 'জামি মসজিদ' নির্মাণ করেন। কথিত আছে জাহানারার ইচ্ছা অনুসারের জামি মসজিদ নির্মিত হয়েছিল।

১৬৩০ সালে শাহজাহানের পত্নী মমতাজের মৃত্যুর পর প্রায় ২২ বছর ধরে প্রায় কোটি টাকা ব্যয়ে তাঁর আশ্চর্যতম সৃষ্টি 'তাজমহল' এর নির্মাণ কার্য সম্পূর্ণ করেন। তাজমহলের স্থপতি হিসাবে ভিনিসীয়

স্থপতি ভেরেনিওর (Geronimo Verronio) নাম যেমন পাওয়া যায় তেমনি রয়েছে ওস্তাদ ইসাখার নাম। *দেওয়ান-ই-আফ্রিদি* গ্রন্থে উল্লেখ আছে মুলতান ও কনৌজের শিল্পরীতির অভ্যন্তরীণ অলংকরণ, কাশ্মীরী শিল্পরীতি ও হিন্দুশিল্পরীতির বাগিচা নির্মাণ, কান্দাহারের আমানজ খাঁর খোদাইয়ের কাজ, এবং কনস্টান্টিনোপল থেকে আগত ইসমাইল খাঁ রুমী গম্বুজের কাজ করেছিলেন, যাকে বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, "মার্বেলের তৈরি প্রেমের শোক সংগীত, ... সম্রাটের দুঃখ বিগলিত হৃদয় থেকে নিঃসারিত 'অশ্রুবিন্দু'। "নিঃসন্দেহে তাজমহল কল্পনা শক্তির মহত্তর প্রকাশ। তবে Aldous Huxley বলেন, তাজমহলে 'কল্পনার দৈন্য' রয়েছে। সম্রাট তাঁর ঔদ্ধত্য দিয়ে যে সৃষ্টি করেছেন, সেটি স্থাপত্য রীতির প্রযুক্তিগত দিক দিয়ে কোন নতুন শিল্প ছিল না।

একথা অনস্বীকার্য যে শাহজাহান যখন স্থাপত্য শিল্প নির্মাণে রাজকোষ উন্মুক্ত করে দিয়েছেন, তখন সমগ্র উত্তর ও দক্ষিণ ভারত জুড়ে একাধিকবার দুর্ভিক্ষ ও মহামারি এবং মুঘল দরবারি গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব চরম আকার ধারণ করে। অন্যদিকে পরবর্তী সম্রাট ঔরংজেব কঠোর ধর্ম বিশ্বাস দ্বারা চালিত হয়ে শিল্প স্থাপত্য, চিত্রকলা, সঙ্গীত, নৃত্য একান্ত ভাবেই ইসলাম বিরোধী বলে মনে হয়।

৪.৫ চিত্রকলা

মুঘল শিল্প কলার বিভিন্ন ঘরানা হিসাবে মুঘল চিত্রকলা বিশেষ স্বীকৃতি আদায় করে এবং সপ্তদশ শতকে এই ঘরানা পূর্ণতা লাভ করে। ভারতীয় চিত্রকলার ইতিহাসে মুঘল যুগ তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নিয়ে পরবর্তী যুগের পাঠকদের মনোযোগ নিঃসন্দেহে আদায় করতে পেরেছে। প্রকৃতপক্ষে হুমায়ুনের হাত ধরে যে মুঘল চিত্র কলার জন্ম হয়েছিল সেটি আদি মুঘল ঘরানার চিত্র কলা নামে পরিচিত। তবে সপ্তদশ শতকে এসে অনেকটাই এই চিত্র কলা ঘরানার পরিবর্তন ঘটতে দেখা যায়। আবুল ফজলের তথ্য থেকে জানা যায় আকবরের চিত্র শিল্পী বসওয়ন্ত প্রতিমূর্তি অঙ্কনে দক্ষ ছিলেন। তাঁর প্রতিদন্দ্বী দসওয়ান্ত রঙের সমন্বয়ে কৃতিত্ব দেখান। আকবর তাঁর প্রতিভাতে দারুণভাবে মুগ্ধ হয়েছিলেন। যাইহোক আকবরের সময় প্রায় ১০০ জন হিন্দু ও মুসলিম শিল্পী দরবারি পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করতেন। তাঁর দরবারে মুসলিম গুণীদের মধ্যে ছিলেন আবদুস সামাদ, সৈয়দ আলি, ফারুক বেগ ও হিন্দু শিল্পীদের মধ্যে বসওয়ান্ত, দসওয়ান্ত, সানওয়াল দাস, তারাচাদ, জগন্নাথ প্রমুখ। ঐতিহাসিক এস. এম. জাফর লিখেছেন, আকবর ভারতীয় চিত্রকলাকে পরানুকরণ এর কলঙ্ক থেকে মুক্ত করে একটি নিরাপদ ও দৃঢ় ভিত্তি প্রদান করেন। আসলে আকবরের আমলেই চিত্রকলার পারসিক ঘরানা থেকে সরে এসে প্রথমে ভারতীয় পরে ইউরোপীয় চিত্র কলা থেকে প্রেরণা সঞ্চার করে। বস্তুতপক্ষে মুঘল চিত্রকলা এই সময় থেকেই লোক শিল্প, সমসাময়িক রাজস্থানী চিত্রকলা, পুরাণ এমনকি লোকগাথা থেকে অনুপ্রাণিত হয়েছিল।

যাইহোক মুঘল চিত্রকলার বিকাশ আকবরের সময় থেকে যা শুরু হয়েছিল, তা ঐতিহাসিক সতীশ চন্দ্রের ধারনায়, 'জাহাঙ্গিরের সময় চিত্রকলার বিকাশ উচ্চতর অবস্থায় পৌঁছায়। কারণ তিনি ছিলেন যথার্থ চিত্রকলা রসিক'। শিল্পের জন্য শিল্প এই তত্ত্বে তিনি বিশ্বাস করতেন। শোনা যায়, তিনি তুলির টান দেখে বলে দিতে পারতেন, সেটি কোন শিল্পীর টান। উদ্দেশ্য মূলক ও প্রচার মূলক চিত্রাঙ্কন থেকে

শিল্প ভাবনাকে মুক্ত করে নিছক সৌন্দর্য প্রকাশের বাহক হিসাবে তিনি চিত্র কলাকে ব্যবহার করেন। সমসাময়িক টমাস রো এই জন্য তার প্রশংসাও করেছেন। জাহাঙ্গিরের দরবারের বিখ্যাত চিত্র শিল্পীদের মধ্যে ফারুক বেগ, মহম্মদ নাদির, মহম্মদ মুরাদ এবং বিশেষ ভাবে আকারিজার নাম বলা যায়। আকা রিজাকে তিনি নাসির-উস-জামান খেতাব প্রদান করেন এবং জাহাঙ্গির নামায় সম্রাট তাঁর প্রশংসাও করেছেন। এছাড়াও ছিলেন ওস্তাদ মনসুর এবং হিন্দু চিত্র শিল্পীদের মধ্যে বিষেন দাস, গোবর্ধন, বিচিত্র, কেশব, মনোহর, মাধব, তুলসী প্রমুখ উল্লেখ যোগ্য। বিষেন দাস প্রতিকৃতি অংকনে অদ্বিতীয় ছিলেন। কারণ তিনি জাহাঙ্গিরের প্রিয় অমাত্য এনায়েত খাঁ প্রাক মৃত্যুকালীন অসাধারণ প্রতিকৃতি অংকন করেন। এছাড়াও জটায়ু বধ, দশরথের পুত্রেষ্ঠী যোগ্য প্রভৃতি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে চিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরেন। জাহাঙ্গিরের সময় বিশেষ অগ্রগতি হয় প্রট্রেইট এবং পশু, ফুল প্রভৃতি চিত্র আকায়। ঐতিহাসিক সতীশ চন্দ্র আরও বলেন, পশু-পাখি সম্বন্ধে চিত্র আকা হলেও মুঘল চিত্রকারকদের প্রকৃতির চিত্র আকতে অনীহা ছিল যা ইউরোপীয় চিত্র কলার সাথে মুঘল চিত্র কলায় তফাৎ গড়ে তুলেছিল। তবে গাছ, পাখি, নদী, পাহাড়, প্রভৃতিকে প্রায়শই যুদ্ধ ও স্বীকারের দৃশ্য প্রেক্ষাপটে অংকন করা হয়েছে।

যাইহোক মুঘল চিত্র সৌধ ইউরোপীয় ঘরানাকে অনুকরণ করার চেষ্টা করেছিল। তবে ইউরোপীয় ও ভারতীয় ঘরানার মিশ্রণ ঘটেছিল মুঘল চিত্র শৈলীর মধ্যে। কখনও কখনও ইউরোপীয় নিসর্গীয় দৃশ্যকে পটভূমি করে পারসিক চিত্র আকা হয়েছে। আবার কখনও কোরানের প্রতিলিপির পাশে কৃষক পরিবার ও মেরির ছবি অঙ্কিত হয়েছে। আবার একই স্থানে মাতা মেরী ও শিশুর পাশে আকা হয়েছে মদ্যপানের ছবি। সম্ভবত মুঘল শিল্পীরা ইউরোপীয় ভাবধারা প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। এছাড়া সম্ভবত ইউরোপীয়দের সম্মন্ধে মুঘলদের অবিজ্ঞতার ভাব অবচেতনভাবে এই ছবিতে ফুটে উঠেছিল। ঐতিহাসিক সোম প্রকাশ বর্মা মধ্যকালীন ভারতে তাঁর প্রবন্ধ 'মুঘল চিত্রকলায় বিচিত্রর অবদান' এ জাহাঙ্গিরের চিত্র কলার বর্ণনা করেছেন। জাহাঙ্গিরের আমলের এই চিত্র শিল্পীর বিভিন্ন শিল্প কর্মে বিশেষ করে মহম্মদ রিজা কাশ্মীরী এবং শাহ দৌলাতে ছবির পাড় চিত্রন প্রভৃতি ক্ষেত্রে মুঘল অংকন রীতির কথা উল্লেখ করেছেন। আবার রুপক ধর্মী চিত্র কলার বিকাশে আবুল হাসান জাহাঙ্গিরের আমলে সবচেয়ে অভিজাত চিত্র শিল্পী ছিলেন। যাইহোক পর্সি ব্রাউনও স্বীকার করেছেন, জাহাঙ্গিরের মৃত্যুর পর মুঘল চিত্র কলার অবক্ষয়ের যুগ শুরু হয়। কারণ শহজাহান পরবর্তীকালে স্থাপত্যে মনোযোগী হলে চিত্র কলার দৈন্যতা আরো স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে।

৪.৬ উপসংহার

প্রায় সকল মুঘল সম্রাট ছিলেন শিল্প ও সংস্কৃতির অনুরাগী। ভারতের মাটিতে তাঁরা শুধু যে সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিলেন তা নয়; একই সঙ্গে মুঘল শাসকরা বংশানুক্রমিক ভাবে শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা উদার ভাবে করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে আরও মনে রাখা দরকার যে হিন্দু ও ইসলাম উভয় ধর্মের সমন্বয়ের প্রক্রিয়া মুঘল শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে বিকশিত শিল্প, কলা, সাহিত্য, সংগীত এবং স্থাপত্যে দৃশ্যমান ছিল। মুঘল শিল্পকলা সৌন্দর্যের চিরন্তন অনুভূতিকে প্রকাশ করেছিল। এর ফলে

মুঘল ঘরানা ভারতীয় শিল্পকলার ইতিহাসে বিশিষ্টতা অর্জন করেছে। মুঘল শক্তি মধ্য এশিয়া থেকে ভারতে রাজ্য বিস্তারের সূত্রে এসেছিল। কালক্রমে তারা ভারতীয়ত্ব অর্জন করে। মুঘল শিল্পকলার মধ্যে এই ভাবটি বিশেষ ভাবে ফুটে ওঠেছে। মুঘলরা যে শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষকতা এই দেশে করেছিল তা সর্ব অর্থেই ভারতীয় এবং সমন্বয়বাদী সংস্কৃতিকে প্রতিফলিত করে।

৪.৭ প্রশ্নাবলী

১. মুঘল আমলের শিল্প-সংস্কৃতি সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ রচনা করুন।
২. মুঘল শাসক শ্রেণি কীভাবে সাহিত্য-র পৃষ্ঠপোষকতা করত?
৩. মুঘল আমলে সংগীতের বিকাশ কীভাবে হয়েছিল?
৪. মুঘল স্থাপত্যের মূল্যায়ন করুন।

৪.৮ গ্রন্থপঞ্জি

- Chandra, Satish (1999). *Mediival India. From Sultanate to the Mughals*. Mughal Empire, 1526-1748, Part Two, Har-Anand Publications, New Delhi.
- Chandra, Satish (2007). *Hitory of Medieval India, Orint BlackSwan,* New Delhi.
- Bhargava, Meena (2010). *Exploring Medieva lIndia, Vol II,* Orint BlackSwan, New Delhi.
- Richards, John F (1993). *The Mughal Empire*, New Delhi, Oxford University Press.
- রায়, অনিরুদ্ধ (2020), *মুঘল সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনের ইতিহাস,* প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড, প্রগতিশীল প্রকাশনা,
- হাবিব, ইরফান (2018), *মধ্যযুগের ভারত একটি সভ্যতার পাঠ*, ন্যাশানাল বুক ট্রাস্ট।

একক ৫ ❑ গোঁড়ামি এবং সমন্বয়বাদ-নকশবন্দী সুফি, মিয়া মীর দারাশুকো, সরমন্দ

গঠন

৫.০ উদ্দেশ্য

৫.১ ভূমিকা

৫.২ খাজা বাকি বিল্লাহ

৫.৩ খাজা খায়ন মাহমুদ

৫.৪ হুমান উদ্দিন আহম্মদ

৫.৫ মিঁয়া মীর **(Miyan Mir)**

৫.৬ দারাশুকো/ **(Darashukho) (১৬১৫-১৬৫৯)**

৫.৭ সারমাদ

৫.৮ উপসংহার

৫.৯ প্রশ্নাবলী

৫.৮ গ্রন্থাবলী

৫.০ উদ্দেশ্য

এই এককের উদ্দেশ্য হল—

- মুঘল আমলে ইসলামের মধ্যে গোঁড়ামি ও উদার-সমন্বয়বাদী চিন্তার মধ্যে যে টানাপোড়েন ছিল আলোচনা করা।
- এই প্রসঙ্গে আলোচনা করা হবে খাজা বাকি বিল্লাহ, খাজা খায়নি মাহমুদ, হুমান উদ্দিন আহম্মদ, মিঁয়া মীর এবং দারাশুকো প্রমুখর তত্ত্ব।

৫.১ ভূমিকা

ইসলাম ধর্মেও এক শ্রেণির অতিন্দ্রিয়বাদী ও রহস্যময় মানুষের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়, এরা 'তাসায়ফ' বা সুফি নামে পরিচিত। ঐতিহাসিক ইউসুফ হোসেন মনে করেন ইসলামের বক্ষদেশ থেকেই সুফিবাদের জন্ম। আসলে হজরত মহম্মদ যখন ইসলামের মর্ম কথা প্রচার করেন, সেই সময় বেশ কিছু জ্ঞানী অথচ নির্বিবাদী ও ভাববাদী মানুষ এই ধর্মের অনুগামী হয়েছিলেন। ঐতিহাসিক ফিলিপ কে. হিট্টি তাঁর 'History of Arabs' গ্রন্থেও উল্লেখ করেছেন যে, ইসলাম ধর্মে অতিন্দ্রিয়বাদ যে বিশেষ রূপ ধারণ করছিল তাকেই

সুফিবাদ বলা হয়। তবে একে ঠিক কিছু উপমহাদেশাবলির সমষ্টি বলা যায় না বরং সুফিবাদ হল ধর্ম সংক্রান্ত বিশেষ চিন্তা ও অনুভব করার একটি বিশেষ পদ্ধতি। আসলে অন্যান্য মুসলিম ধর্ম আন্দোলনের মত সুফিমতবাদেরও উৎস হল কুরান ও হাদিস। তবে খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতকের শেষ দিক থেকে সুফিবাদীদের মধ্যে স্থায়ী ও সুনির্দিষ্ট নীতির ভিত্তিতে সংগঠন গড়ে ওঠে। কিছু দিনের মধ্যে বিভিন্ন দেশে কয়েকটি স্বাধীন সংগঠন গড়ে ওঠে এগুলিকে সিলসিলাহ বলা হয়। এদের সদস্যরা দরবেশ বলে পরিচিত হতেন।

সুফি সিলসিলাগুলির মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য সিলসিলাহ হল, 'নকশ-বন্দী' (Naqsh-bandi)। ভারতে মুঘল যুগে এই সুফি সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। খাজা বাহা-উদ্দিন নকস-বন্দী এই সিলসিলার প্রতিষ্ঠাতা। ১৩১৮ সালে বুখারার কাছে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন এবং ১৩৮৯ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। তুর্কীস্থানে এই সম্প্রদায়ের মতাদর্শ খুব জনপ্রিয় ছিল। এই সম্প্রদায়ের আচরণ বিধির সঙ্গে বৌদ্ধদের ধর্মীয় সাধনার খুব মিল খুঁজে পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে আরও উল্লেখ যে, পঞ্চদশ শতকে মধ্য এশিয়ায় খাজা উবেদ উল্লাহ অহরর 'নকশ-বন্দী' সম্প্রদায়ের আদর্শকে প্রচার করেন এবং তিনি শিয়াপন্থীদের থেকে সুন্নিদের রক্ষার যে চেষ্টা করেন তার দ্বারা বাবর প্রভাবিত হন। এমনকি বাবর তাঁর পুত্রদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতেন এবং তারা সমরখন্দে বাবরকে আশ্রয় দেওয়ার জন্য যথেষ্ট আগ্রহ ও দেখান ও বাবরের সঙ্গে তাদের কয়েকবার সাক্ষাতও হয়।

বাবার ভারতে মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করলে উবেদ উল্লাহর বংশধররা ও তাদের অনুগামীরা ভারতে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন এবং নকশবন্দী মতাদর্শ প্রচার করেন। তবে হুমায়ুন এই মতাদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হননি। সম্রাট আকবরের রাজত্ব কালের শুরুতেই সুফি-সন্ত মির্জা শরফ উদ্দিন হুসেইন স্থায়ীভাবে ভারতে নকশবন্দী ভাবধারা প্রচার করেন। সম্রাট তাকে ৫০০০ মনসবপদ দিয়ে আজমীরের শাসনকর্তা হিসাবে নিয়োগ করেন। আকবরের শাসনকালে নকশ-বন্দীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এই সময় খাজা আবদ শহীদ সমরখন্দ থেকে পাঞ্জাবে আকবরের সহযোগিতায় বসবাস করেছিলেন। পরবর্তী সময়কালে তাঁর শিষ্য খয়না দোস্ত এর পুত্র সুলতান খাজা নকশ-বন্দীকে আকবর আমীর পদে নিয়োগ করে, হজ তীর্থ যাত্রীদের অর্থ বন্টনের ক্ষমতা প্রদান করেন। তারই মত খাজা আবদুল আজিমকে আকবর রাজধানীর সদর পদে নিয়োগ করেন। যিনি পরবর্তীকালে সম্রাট আকবরের সুল-ই-কুল মতের সমর্থক ছিলেন। আকবর তাঁর কন্যার সঙ্গে রাজকুমার দানিয়েলের বিবাহ দেন। যাইহোক আকবরের রাজত্বকালে নকশবন্দী সম্প্রদায়ের প্রভাব বৃদ্ধি পেলেও আকবরের উদারনৈতিক সমন্বয়ের বিরুদ্ধে নকশ-বন্দীদের একাংশ আন্দোলনও গড়ে তুলেছিলেন। তবে সামগ্রিকভাবে এই সম্প্রদায় আকবরের উদার মতবাদকে সমর্থন করেছিল।

৫.২ খাজা বাকি বিল্লাহ

ভারতে মুঘল যুগে নকশবন্দী সিলসিলাহকে প্রতিষ্ঠা দেওয়ার ক্ষেত্রে খাজা বাকি বিল্লাহর অবদান কম ছিল না। তিনি ১৬০৩ সালে মাত্র ৪১ বছর বয়সে মারা যান। এই অল্প সময়ে ইসলামীয় তত্ত্বগত বিষয়ে জ্ঞান লাভের পাশাপাশি সুন্নিপন্থীদের আদর্শকে সংরক্ষণের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি শরিয়তের বিধানকে মেনে চলার উপর জোর দেন। হজরত মহম্মদ শরিয়তে যে বিধান দিয়েছেন তা প্রতিটি মুসলমানের মেনে চলা পবিত্র কর্তব্য বলে তিনি মনে করেন। বলা যায়, মুঘল যুগে প্রথাগত ইসলামের পূনর্জাগরণে খাজা বাকি বিল্লাহর অবদান অগ্রগণ্য। তবে তিনি অল্প কয়েকজনকেই তাঁর শিষ্য হিসাবে দীক্ষিত করেন। তিনি কোনো রকমের বিধর্মীয় আচরণকে মনে প্রাণে ঘৃণা করতেন।

৫.৩ খাজা খায়ন মাহমুদ

নকশবন্দী সিলসিলাহর ভারতে বিস্তারের ক্ষেত্রে অন্যতম ছিলেন খাজা খায়ন মাহমুদ। তিনি স্থায়ীভাবে কাশ্মীরে শিয়াদের প্রভাব প্রতিপত্তি রোধ করার চেষ্টা করেন। আকবরের রাজত্বের শেষ দিকে তিনি আগ্রায় এলে অনেক প্রভাবশালী তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তবে জাহাঙ্গিরের সঙ্গে তার সম্পর্ক ভাল না থাকায় তিনি কাশ্মীরে ফিরে যান ও তিব্বতে নকশবন্দী ভাবধারা প্রচারের চেষ্টা করেন। ১৬৪২ সালে লাহোরে তাঁর মৃত্যু হয়।

৫.৪ হুমান উদ্দিন আহম্মদ

খাজা বাকি বিল্লাহের শিষ্যদের মধ্যে অন্যতম হুমান উদ্দিন আহম্মদ। তিনি কর্মজীবন শুরু করেন একজন মনসবদার হিসাবে। তিনি পরবর্তীকালে বাকি বিল্লাহর মতাদর্শে দীক্ষিত হয়ে আজীবন তাকে সেবা করেন। এমনই আর একজন খাজা বাকি বিল্লাহর শিষ্য হলেন শেখ তাজউদ্দিন। তিনি কাশিফির রশাহত-ই-আইন-উল-হায়াত নামক নকশবন্দী ধর্মীয়গ্রন্থকে ফারসি থেকে আরবি ভাষায় অনুবাদ করেন। খাজা বাকিবিল্লাহেরর অনুগামীরা ও তাঁর দুই পুত্র খাজা আদুল্লাহ বা খাজা-ই-কালান এবং খাজা উবেদুল্লাহ বা খাজা-ই-খুরদ পিতার প্রদর্শিত পথেই নকশবন্দী ভাবধারাকে এগিয়ে নিয়ে যান। এমনকি পরবর্তীকালে ঔরঙ্গজেবের সময়কালে মুঘলদের উদারনৈতিক ভাবধার বাধাপ্রাপ্ত হলে নকশবন্দী সম্প্রদায়ের প্রভাব আরও বৃদ্ধি পায়। এইভাবে মুঘল যুগে ইসলামের শুদ্ধিকরণের ক্ষেত্রে নকশবন্দী সম্প্রদায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

৫.৫ মিঁয়া মীর (Miyan Mir)

শেখ মহিউদ্দিন আবদুল কাদির জিলানী (১০৯৮-১১৬৬) বাগদাদে কাদিরি সুফি স্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করেন। এই সম্প্রদায় উদারপন্থী মতাদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। মুঘল সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে সম্ভবত আরব বণিকদের মারফত এই মতাদর্শ ভারতীয় মুসলিমদের প্রভাবিত করেছিল। কাদিরিয়া গোষ্ঠীর একজন বিখ্যাত সুফি সন্ত হলেন লাহোরের বাবা সাহিন মীর মহম্মদ সাহিব বা মীর, যার জনপ্রিয় নাম ছিল মিয়াঁ মীর (Mian Mir or Miyan Mir)। তিনি ১৫৫০ সালের ১১ই আগষ্ট বর্তমান পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশ জন্ম গ্রহণ করেন। পবরর্তীকালে লাহোরের ধরম্পুরা শহরে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। তিনি ছিলেন খলিফা ওমর-ইবন-আল-কাতাব (Khaliph Umar-Ibn-Al-Kattab) এর বংশধর। সুফি সন্ত বিবি জামাল খাতুন ছিল তার বোন। এই সুফি সাধক মীয়াঁ মির তাঁর উদারপন্থী মতাদর্শ দ্বারা বহু মানুষকে আকৃষ্ট করেছিলেন। তাঁর সুযোগ্য শিষ্য ছিলেন বাদাকশানের মোল্লাশাহ। যিনি কাশ্মীরে আসেন এবং বসবাস শুরু করেন ও মাঝে মধ্যে গুরু মিঁয়া মীরের সঙ্গে লহোরে দেখা করতেন। এমনকি মুঘল রাজ দরবারের শাহজাহানের পুত্র দারাশুকো ও তার ভগ্নী জাহানারা কাশ্মীরে এসে মিঁয়া মীরের শিষ্য মোল্লাশাহের দরবারে ১৬৩৯ সালে শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ভারতে লাহোরে মীর মহম্মদ ও কাশ্মীরের মোল্লা শাহেরতের মাধ্যমেই শিক্ষিত মুসলিমরা কাদিরি মতবাদে আকৃষ্ট হন। এই মহান মুসলিম সুফি সাধক মিয়াঁ মীরের মৃত্যু হয় ১১-ই আগষ্ট ১৬৩৫ সালে।

৫.৬ দারাশুকো/Darashukho (১৬১৫-১৬৫৯)

মুঘল সম্রাট শাহজাহান ও মমতাজ মহলের জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন দারাশুকো। ১৬১৫ সালে ২০শে মার্চ আজমীরে তার জন্ম হয়। বাল্যকাল থেকে উদার চিত্তের অধিকারী দারাশুকো আকবরের মতই সমন্বয়বাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি সুফি ও শিয়া মতের অনুরাগী হলেও হিন্দু উপনিষদের ফারসি অনুবাদ করেন। নম্র ও উদার প্রকৃতির দারাশুকোকেই সম্রাট শাহজাহান ভবিষ্যতের মুঘল সম্রাট হিসাবে ভাবতেন ও তাকেই সবচেয়ে বেশি পছন্দ করতেন। সম্রাটের প্রিয় পাত্র দারাশুকো বিভিন্ন ধর্মের ধর্মীয় গ্রন্থ পাঠ করার পাশাপাশি সুফি সন্ত মিঁয়া মীরের শিষ্য শাহজাদা দারার সঙ্গে হিন্দু যোগী ও মুসলিম ফকিরদের আত্মিক যোগাযোগ ছিল। ইসলাম ছাড়াও অন্যান্য ধর্মের মহৎ আদর্শ গ্রহণ ও প্রচারের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন উদার মনস্ক। যা তৎকালীন রক্ষণশীল মুসলিমদের মনে তার সম্পর্কে বিরূপ ধারণা তৈরি করে। যার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায় উত্তরাধিকারের যুদ্ধের সময়। সম্রাট শাহজাহান তাঁকে এতটাই পছন্দ করতেন যে সব সময় তাকে দিল্লিতেই দরবারকেন্দ্রিক পরিমণ্ডলে আবদ্ধ রাখতেন। উপযুক্ত বয়সে শাহাজাদা দারাশুকো নাদিরা বানু বেগমকে বিবাহ করেন। শিক্ষা, সংস্কৃতি সহিষ্ণুতার অনুরাগী হলেও দারাশুকোর মধ্যে রাজকীয় গুণ সমূহের অভাব ছিল বলে মনে হয়। বস্তুত সম্রাট শাহজাহানের অতিরিক্ত স্নেহ ও ভালবাসা বাস্তবে দারার দুর্বলতার কারণ হিসাবেই প্রতিপন্ন হয়। মুঘল প্রশাসনিক ক্ষেত্রে দারাশুকো পাঞ্জাব, মুলতান ও এলাহাবাদের সুবেদার স্বীকৃত হলেও প্রত্যক্ষভাবে শাসন পরিচালনার কোন অভিজ্ঞতাই দারার ছিল না। তথাপি মুঘল সম্রাট তাঁকে 'পাদশাহজাদা-ই-বুজুরগ মারতাবা' বা 'Padshahzada-i-Buzurg Martaba' নামক উপাধি প্রদান করেন।

আসলে বাস্তবতা থেকে অনেকটা দূরে সুসজ্জিত প্রাসাদের মুখ-সমৃদ্ধির জীবনে অভ্যস্ত দারাশুকো শ্রেষ্ঠ সময়কে অবহেলাভরে কাটিয়েছেন। তাঁর হয়ে রাজ্য শাসন করেছেন তার অনুগত প্রতিনিধিরা। এমনকি ৬০ হাজারি জাটের মনসবদারি ভোগ করলেও বাস্তবিক অর্থে যুদ্ধ ক্ষেত্রে তিনি যেমন কোনো অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেননি তেমনি কৃতিত্ব প্রদর্শনের কোন নজির স্থাপন করেননি। তাঁর কাছে তাঁর গুণগ্রাহী বা স্তাবকরা ছিল অতি প্রিয়। সমসাময়িক সময়ে মানুচ্চিও দারাশুকোর স্বভাব প্রসঙ্গে লিখেছেন, "নিজের বুদ্ধি-বৃত্তি সম্পর্কে ছিল তাঁর অহংকার, পরামর্শদাতাদের প্রতি ছিল চরম অবজ্ঞা। হিতকারীদের প্রতিও তিনি হঠাৎ ক্ষুব্ধ হতেন, শান্তও হতেন সঙ্গে সঙ্গে। ফলে বাস্তব সত্য অনুসন্ধানে আন্তরিক হলেও সত্য দর্শনে তাঁর কুণ্ঠা ছিল সীমাহীন"। তবে মানুচ্চির বক্তব্যের সত্যতা যাইহোক না কেন শাহজাহান ১৬৫৭ সালে গুরুতর অসুস্থ হলে তাঁর চার পুত্রের মধ্যে যে সিংহাসনকেন্দ্রিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার সূচনা হয় তাকে শেষ পর্যন্ত দারাশুকোকে প্রাণ দিতে হয় ১৬৫৯ সালের ৩০শে আগষ্ট। এ প্রসঙ্গে বলতে হয় মুঘল পরিবার প্রসঙ্গে যে প্রবাদ প্রচলিত ছিল "তখ্ত আউর তখতী" অর্থাৎ "হয় সিংহাসন অথবা কফিনের কাঠ"। এই প্রবাদ শাহজাহানের পুত্র ঔরঙ্গজেব ছাড়া সুজা, মুরাদ ও দারাশুকোর জীবনে সত্য হয়েছিল।

৫.৭ সারমাদ

সারমাদ ১৫৯০ সালে আর্মেনিয়ার একটি ইহুদি ফারসি-ভাষী বণিক পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি পারসিকদের কাছ থেকে উপযুক্ত শিক্ষা পেয়েছিলেন যা বণিক হিসাবে তাঁর কাজের জন্য প্রয়োজনীয়

ছিল। তিনি মুঘল সাম্রাজ্যের অধীনে একজন অভিবাসী ব্যবসায়ী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে পর্যন্ত মোল্লা সরদা এবং মীর ফিনদিরিসকি কাছে পড়াশুনা করেছিলেন। তিনি ফারসি ভাষায় তাঁর বেশিরভাগ গ্রন্থ রচনা করেছিলেন এবং ফারসি ভাষায় তাওরাতের (Torah) অনুবাদ প্রকাশ করেছিলেন। তিনি না ছিলেন খ্রিষ্টান, না ছিলেন মুসলিম, না ছিলেন হিন্দু। ভারতে মূল্যবান জিনিসপত্র ও শিল্পকর্মগুলি উচ্চ মূল্যে কেনা হচ্ছে শুনে, সরমাদ তার জিনিসপত্র একত্রিত করে মুঘল সাম্রাজ্য ভ্রমণ করেছিলেন এবং এখানে তিনি দ্রব্যগুলি বিক্রি করার অভিপ্রেত করেছিলেন। বর্তমান দিনে পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশের থাট্টায় (Thatta) তিনি অবস্থান করেন। তাঁর ঘনিষ্ঠ শিষ্যদের মধ্যে অভয় চাঁদ নামে পরিচিত একজন হিন্দু ছিলেন। যদিও তাদের সম্পর্কের প্রকৃতি নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। অভয় চাঁদের জীবন সম্পর্কে খুব কমই জানা যায় এবং সারমাদের নিজস্ব কবিতা ব্যতীত তাদের মুখোমুখি বিবরণ নিশ্চিত করার জন্য কোনও ঐতিহাসিক রেকর্ড নেই। কিছু পণ্ডিত যুক্তি দিয়েছিলেন যে, সারমাদ তাওরাতের (Torah) পাশাপাশি ওল্ড টেস্টামেন্ট এবং নিউ টেস্টামেন্ট অনুবাদ করার জন্য নিযুক্ত করেছিলেন অভয় চাঁদকে, সম্ভবত অভয় চাঁদ ইসলাম বা ইহুদী ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। এটি লক্ষণীয় যে, পরবর্তী বছরগুলিতে, সরমাদ সমস্ত ধর্মের সমালোচনা করে এবং আরও আধ্যাত্মিক অবস্থান নিয়েছিল, যা সুফি ঐতিহ্য ও পরম্পরার এর দর্শন বহন করে। খুব সম্ভবত, সারমাদ ও অভয় চাঁদ নানা জায়গায় ভ্রমণ করে প্রথমে লাহোর, তারপর হায়দ্রাবাদ এবং অবশেষে দিল্লীতে স্থায়ী হয়েছিলেন, তবে এই ঘটনার সত্যতা পাওয়ার কোনও বিশ্বাসযোগ্য উৎস নেই। দু'জনে এক সাথে ভ্রমণ করার সময় তিনি কবি এবং মরমী হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। শাহজাহানের জ্যেষ্ঠ পুত্র দারাশুকো সারমাদকে রাজ দরবারে আমন্ত্রণ জানাতে পিতাকে বাধ্য করেছিলেন। এই উপলক্ষে সারমাদ রাজকীয় উত্তরাধিকারী দারাশুকোকে এত গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিলেন যে তিনি তাঁর শিষ্য হওয়ার শপথ করেছিলেন। সারমাদ ফরাসি চিকিৎসক এবং ভ্রমণকারী ফ্রাঁসোয়া বার্নিয়ারের সঙ্গে সাক্ষাত হয়েছিলেন, যিনি সারমাদকে 'নগ্ন ফকির' হিসাবে মন্তব্য করেছিলেন। সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকার নিয়ে ঔরংজেব ও দারাশুকোর মধ্যেকার বিবাদ বাধে। দারাশুকোকে হত্যা করে ঔরংজেব মুঘল রাজকীয় সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন। সারমাদকে নাস্তিকতা ধর্মীয় অনুশীলনের জন্য অভিযুক্ত ও দোষী সাব্যস্ত করা হয় এবং সুফি দর্শন ও উদার ধর্মীয় মতবাদে বিশ্বাসী হওয়ার কারণে ঔরংজেব গ্রেপ্তার করেন। আওরঙ্গজেব তাঁর উলেমাদের সারমাদকে জিজ্ঞাসা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, কেন তিনি কেবল "There is no God" পুনরাবৃত্তি করেছিলেন এবং তাঁকে দ্বিতীয় অংশ "আল্লাহ ছাড়াও" আবৃত্তি করার আদেশ দিয়েছেন। তিনি জবাব দিয়েছিলেন যে, "I am still absorbed with the negative part. Why should I tell a lie? ঔরংজেব ১৬৬১ খ্রিষ্টাব্দে তাঁকে শিরচ্ছেদ করে হত্যা করেছিলেন। দিল্লির জামা মসজিদের কাছে তাঁকে কবর দেওয়া হয়েছিল।

৫.৮ উপসংহার

অতি প্রাচীন যুগ থেকে ভারতবর্ষের ইতিহাসের অন্যতম মূল বৈশিষ্ট্য হল সমন্বয়সাধন ও আত্তিকরণ। বহু ধর্মের সংমিশ্রণ ভারতে হয়েছে। তার মধ্যে অন্যতম হল ইসলাম। ইসলামের উদারপন্থী ধারার সঙ্গে হিন্দু ধর্মের উদারপন্থীর ধারার সংমিশ্রণ ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিকে ইতিহাসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে ইসলাম কোনো অনড়-অচল ধর্মীয় কাঠামো বা চিন্তাধারা ছিল না। শরিয়তি ইসলামের পাশাপাশি সুফি চিন্তাধারা ইসলামের অন্যতম বৈশিষ্ট্য বলে ঐতিহাসিকরা মনে করেন। মুঘল শাসনকালে সুফি দর্শন, চিন্তাধারা ও সংগঠনশক্তি ভারতীয় ধর্মচিন্তার বৃহত্তর ধারাটিকে পুষ্ট করে। এর মূল বৈশিষ্ট্য ছিল ঔদার্য ও সমদর্শী নীতি। মুঘল শাসকরা বহুলাংশে যে এই দুই-এর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আকবর ও জাহাঙ্গিরের আমলে যে উদার দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ ঘটেছিল, শাহজাহানা ও ঔরঙ্গজেবের সময় তা অনেকটাই ম্লান হয়ে যায়। ঔরঙ্গজেব সুন্নি ইসলামে গভীর ভাবে বিশ্বাস করতেন। তাঁর অনুসৃত নীতির মধ্যে অনেক সময়ই অনুদার ধর্মীয় চিন্তার প্রকাশ ঘটত। এরা ফলস্বরূপ মধ্যযুগের ভারতে ধর্মীয় চিন্তার মধ্যে যে বহুস্বরের অস্তিত্ব উজ্জ্বল ভাবে প্রকাশিত হত, তা আংশিক ভাবে হলেও হারিয়ে যায়। ভারতে ধর্মীয় চিন্তার বিবর্তনে এই প্রশ্নটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৫.৯ প্রশ্নাবলী

১. মুঘল আমলে ধর্মীয় সমন্বয়বাদ সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লিখুন।
২. দারাশুকোর ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে একটি টীকা রচনা করুন।
৩. মুঘল আমলের সুফি সাধকদের ভূমিকা বিশ্লেষণ করুন।

৫.১০ গ্রন্থাবলী

- Srivatava, Ashirbadi Lal (1959). *The Mughul Empire, 1526-1803*, Shiva Lal Agarwal & Co., Agra.
- Richards, John F (1993). *The Mughal Empire*, Cambridge University Press, New Delhi,
- Philip K. Hatti (1970). *History of the Arabs,* Macmilan, London.
- S.A.A. Rizvi (1993). *The Wonder that was India, Vol.-II,* Rupa and Co., New Delhi.
- Chandra, Satish (1999). *Mediival India. From Sultanate to the Mughals. Mughal Empire, 1526-1748,* Part Two, Har-Anand Publications, New Delhi.
- Chandra, Satish (2007). *Hitory of Medieval India, Orint BlackSwan,* New Delhi.
- Bhargava, Meena (2010). *Exploring Medieva lIndia, Vol II,* Orint BlackSwan, New Delhi.
- Richards, John F (1993), *The Mughal Empire,* New Delhi, Oxfort University Press.
- রায়, অনিরুদ্ধ (2020), *মুঘল সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনের ইতিহাস,* প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড, প্রগতিশীল প্রকাশনা,
- হাবিব, ইরফান (2018), *মধ্যযুগের ভারত একটি সভ্যতার পাঠ*, ন্যাশানাল বুক ট্রাস্ট।

পর্যায় ৩: ঔরঙ্গজেবের আমলে মুঘল সাম্রাজ্য
দশম পত্র : ভারতের ইতিহাস (১৬০৫-১৭০৫ খ্রীঃ)

একক ৬ ❑ ঔরঙ্গজেবের আমলে রাষ্ট্র ও ধর্ম

গঠন

৬.০ উদ্দেশ্য

৬.১ ভূমিকা

৬.২ ঔরঙ্গজেবের ধর্মনীতি

৬.৩ ইসলামিক অনুশাসন

৬.৩.১. ইসলামি অনুশাসনের কার্যকারিতা

৬.৪ হিন্দু বিরোধী অনুশাসন : মন্দির ধ্বংস

৬.৫ জিজিয়া কর পুন:প্রবর্তন (২রা এপ্রিল, ১৬৭৯ খ্রীঃ)

৬.৬ ঔরঙ্গজেবের ধর্মনীতি সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মূল্যায়ণ

৬.৭ উপসংহার

৬.৮ প্রশ্নাবলী

৬.৯ গ্রন্থপঞ্জি

৬.০ উদ্দেশ্য

বর্তমান এককের উদ্দেশ্য হল মুঘল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের আমলে রাষ্ট্র ও ধর্ম-এই দুই এর সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা। নিম্নলিখিত বিষয়গুলি এই প্রেক্ষিতে আলোচিত হবে।

- ইসলামিক অনুশাসন ও সম্রাট ঔরঙ্গজেবের ধর্মনীতি।
- ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালে ইসলামি অনুশাসনের কার্যকারিতা
- ঔরঙ্গজেবের ধর্মীয় নীতি: প্রয়োগ ও মূল্যায়ন।

৬.১ ভূমিকা

ভারতের মুসলমান শাসনের প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই রাষ্ট্রের সঙ্গে ধর্মের সম্পর্ক অথবা মুসলমান শাসকদের রাষ্ট্রনীতির উপর ধর্মের প্রভাব বিষয়টি বিতর্কের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। তুর্কী-আফগান শাসকদের আমলে ভারত রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনায় বেশিরভাগ ঐতিহাসিক একমত হয়েছেন যে তখনও রাষ্ট্রের

প্রকৃতি ধর্মাশ্রয়ী ছিল না। দিল্লি সুলতানির অনেক শাসক খলিফার কর্তৃত্ব অন্তত তত্ত্বগতভাবে স্বীকার করতেন। তবে আদর্শগত ভাবে না হলেও অধিকাংশ শাসক প্রয়োজনগতভাবে নিরপেক্ষ রাষ্ট্রনীতি অনুসরণে আগ্রহী ছিলেন। মুঘল শাসনকালে রাষ্ট্রের প্রকৃতি অনেক উদার হলেও এই বিতর্ক থেমে থাকেনি। বাবর, হুমায়ুন, জাহাঙ্গির উদার ছিলেন না। খলিফাকে না মানলেও মুঘল সম্রাটরা পবিত্র কোরান ও শরিয়াকে মানতেন। কোরান ও শরিয়ত মেনে চললেও মুঘল রাষ্ট্রকে ধর্ম-নির্ভর রাষ্ট্র বলা যায় না। কোনো ধর্মীয় নেতা এর নেতৃত্বে ছিল না। আকবরের ধর্মসহিষ্ণুতা ও সমন্বয়বাদী নীতি সর্বজনবিদিত। শাহজাহান ধর্মক্ষেত্রে উদার ছিলেন না; যদিও তাঁর ধর্মনীতি রাষ্ট্রব্যবস্থা ও রাষ্ট্রনীতিকে ততটা প্রভাবিত করেনি। কিন্তু ঔরঙ্গজেবের তথাকথিত অনুদার ধর্মনীতি রাষ্ট্রের ঐক্য ও স্থায়িত্বের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছিল,

সনাতন ঐতিহাসিকদের চিন্তা চেতনায় ঔরঙ্গজেবকে'সাম্প্রদায়িক' (Communal) বা ধর্মান্ধ (religious bigot) বলে চিহ্নিত করা হয়েছে এই অর্থে যে ঔরঙ্গজেবের গোঁড়া ধর্মনীতি আকবরের আমলে অনুসৃত ধর্মীয় সহিষ্ণুতা ও সমন্বয়ের ধারা থেকে বিচ্যুত হওয়ায় এক অস্থিরতার সৃষ্টি হয় এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের একটি বড় অংশ মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতি বিশ্বস্ততা হারান। অ-মুসলমান জনগোষ্ঠীর মধ্যে নানা ধরনের বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়, যা শেষ পর্যন্ত সাম্রাজ্যের ঐক্য ও শক্তি বিনষ্ট করে। কোনো কোনো ঐতিহাসিক মনে করেন যে, ঔরঙ্গজেবকে সাম্প্রদায়িক বা ধর্মান্ধ বলে চিহ্নিত করার পূর্বে তাঁর রাষ্ট্রনীতি ও ধর্মনীতির নতুন মূল্যায়ন প্রয়োজন। সমকালীন আর্থ-রাজনৈতিক পরিস্থিতি তাঁকে কিছু সিদ্ধান্ত নিতে প্ররোচিত করেছিল যেমন জিজিয়া কর চালু, হিন্দু মন্দির ধ্বংস অথবা হিন্দুদের প্রতি তাঁর অনুদার দৃষ্টিভঙ্গি, যা পরিণামে রাষ্ট্রের পক্ষে ক্ষতিকারক ছিল। ভারত ইতিহাসে আর কোনো শাসকের ধর্মনীতি নিয়ে এত বিতর্ক হয় নি, যা ঔরঙ্গজেবের ক্ষেত্রে ঘটেছিল। বর্তমান এককে ঔরঙ্গজেবের ধর্মনীতির পরিপ্রেক্ষিত আলোচিত হবে।

৬.২ ঔরঙ্গজেবের ধর্মনীতি

ইসলামি রাজতত্ত্ব, যার প্রতি ঔরঙ্গেজেবের একান্ত আস্থা ও বিশ্বাস ছিল, তার প্রতিপাদ্য বিষয় হল, মুসলিম রাষ্ট্র মাত্রেই ধর্মাশ্রয়ী। অর্থাৎ একজন মুসলমান শাসক আল্লার প্রতিনিধি হিসেবে একমাত্র কোরানের নির্দেশ অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা করবেন। বিধর্মীদের (কাফের) বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করবেন এবং 'দার-উল-হার্ব'-কে বিধর্মীর রাজ্য 'দার-উল-ইসলাম'-এ পরিণত করবেন। একটি প্রকৃত ইসলামীয় রাজ্যে বিধর্মীর কোন স্থান থাকতে পারে না। ইসলামীয় আদর্শ অনুযায়ী পৌত্তলিকদের প্রতি সমব্যবহার ধর্ম থেকে বিচ্যুতির নামান্তর। ঔরঙ্গজেবের পূর্ববর্তী শাসকদের কেউ আক্ষরিক অর্থে ইসলামীয় আদর্শ অনুযায়ী রাষ্ট্রনীতি নির্দ্ধারণের উদ্যোগ নেন। কোরানে বর্ণিত সামাজিক, রাজনৈতিক, আর্থিক ও ধর্মীয় আইনসমুহকে তিনি রাষ্ট্রীয় আইনের ভিত্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে চান। তিনি 'ধর্মাশ্রয়ী' রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের সুস্পষ্ট উদ্যোগ নেন। স্যার যদুনাথ সরকার বলেন, নিষ্ঠাবান ঔরঙ্গজেব বরং তাঁর সিংহাসন হারাতে প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু তিনি তাঁর ধর্ম ও শাসননীতি পরিবর্তনে প্রস্তুত ছিলেন না।

৬.৩ ইসলামীর অনুশাসন

'ইসলামের রক্ষক' ঔরঙ্গজেব ইসলামি অনুশাসন প্রবর্তনের জন্য নির্দেশনামা জারী করে মুসলিম শাস্ত্র বিরোধী রীতিনীতি নিষিদ্ধ করেন। ধর্মের প্রতি আনুগত্যের নিদর্শনস্বরূপ মুসলমান শাসকরা মুদ্রার উপর 'কলিমা' খোদাই করতেন। বিধর্মীদের (কাফের) হাতে পড়ে কলিমার পবিত্রতা নষ্ট হবে বলে ঔরঙ্গজেব এই প্রথা নিষিদ্ধ করেন। পারসিক শাসকদের অনুকরণে মুঘল সম্রাটরা পারসিক শিয়া প্রথা 'নওরোজ' (নববর্ষ) অনুষ্ঠানটি পালন করতেন। ইসলামীয় নীতি বিরুদ্ধ বলে ঔরঙ্গজেব এই অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন বন্ধ করে দেন। 'মাসির-ই-আলমগিরী'-র লেখক মুহম্মদ সাফী মুস্তাইদ খাঁ-র মতে, এই অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে সম্রাটরা প্রচুর উপঢৌকন পেতেন। শরিয়ৎ অনুযায়ী মুসলমানদের নৈতিক জীবনযাত্রার উন্নতির জন্য সম্রাট 'মুহতাসিব' নামক একশ্রেণির ধর্মীয় কর্মচারী নিয়োগ করেন। সমগ্র সাম্রাজ্য কোরানের বাণী যাতে অনুসৃত হয়, তাঁর তত্তাবধানের দায়িত্ব ছিল মুহতাসিবদের উপর। শরিয়ত বিরোধী কার্যকলাপের জন্য অভিযুক্তদের শাস্তি বিধানের অধিকার তাদেরকে দেওয়া হয়েছিল। তবে জনগণের ব্যক্তিগত জীবনে হস্তক্ষেপ করার অধিকার মুহতাসিবদের ছিল না। আকবরের আমল থেকে 'ঝরোখা দর্শন' (প্রত্যেক দিন সকালে সম্রাট প্রাসাদের অলিন্দ থেকে প্রজাদের দর্শন দিতেন) প্রচলিত ছিল, ইসলাম বিরোধী বলে ঔরঙ্গজেব তাঁর রাজত্বের একাদশ বর্ষে এই প্রথা নিষিদ্ধ করেন। আকবরের আমল থেকে হিন্দুরীতি অনুযায়ী 'তুলাদান' প্রথা (সম্রাটের জন্মদিনে সমান ওজনের সোনা-রূপা দান করা) চালু হয়। ঔরঙ্গজেব রাজত্বের দ্বাদশবর্ষে এই হিন্দুরীতি বন্ধ করে দেন। তৈমুরের সময় থেকে আকবরের আমল পর্যন্ত বাদশাহকে 'সেজদা' বা কুর্নিশ করার প্রথা প্রচলিত ছিল। শাহজাহান 'সেজদা'-র পরিবর্তে ভুমিচুম্বন রীতি প্রবর্তন করেছিলেন। ইসলামীয় রীতি বিরুদ্ধ বলে ঔরঙ্গজেব এই প্রথা নিষিদ্ধ করেন এবং পরিবর্তে 'আস সালামু আলাইকুম' বলার রীতি প্রবর্তন করেন। ১৬৬৮ খ্রীঃ দরবারে নৃত্য, গীত নিষিদ্ধ করা হয়। ইসলাম বিরোধী বলে ঔরঙ্গজেব ১৬৭৫ খ্রীঃ দরবারে জ্যোতিষচর্চা বিষিদ্ধ করেন। কোরান বিরোধী বলে তিনি তাঁর রাজত্বের সচিত্র বার্ষিক ইতিহাস রচনা বন্ধ করে দেন। 'New Cambridge History'-র লেখক বলেন, বহু চিত্রকরকে দরবার থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। হিন্দু ও মুসলিম অনুষ্ঠানে জীব-জন্তু, পুরুষ ও নারীর প্রতিমূর্তি ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়ে ছিল। পোষাক-পরিচ্ছদ ও বিলাসিতাকে তিনি নিয়ন্ত্রণ করেন। অতিরিক্ত দাড়ি রাখা নিষিদ্ধ করা হয়। মানুচ্চি লিখেছেন, অতিরিক্ত দাড়ি কেটে ফেলার জন্য সম্রাট একদল কর্মচারী নিয়োগ করেছিলেন। স্বর্ণখচিত পোষাক নিষিদ্ধ করা হয়। দরবারে কোনো রকম স্বর্ণ-রৌপ্য নির্মিত বস্তুর ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছিল বলে কাফি খাঁ উল্লেখ করেছেন। ভাঙের চাষ ও ব্যবসা, জুয়াখেলা, মদ্যপান নিষিদ্ধ করা হয়। এছাড়া কবরে সৌধ নির্মাণ এবং সুফি ও দরবেশের দরগায় নারীদের গমন নিষিদ্ধ করেন। দোলের সময় প্রকাশ্য রাস্তায় অশ্লীল আচরণ ও নৃত্যগীত এবং মহরমের সময় তাজিয়াকে কেন্দ্র করে অশান্তি বন্ধ করার জন্য ১৯৬৯ খ্রি: সম্রাট তা নিষিদ্ধ করেন। নর্তকী ও বারবনিতাদের রাজসভা থেকে বিদায় দেওয়া হয় এবং তাদেরকে সংসারধর্ম পালন করার উপদেশ দেন। ভারতীয় মুসলমাদের জন্য একটি সাধারণ আচরণবিধি তৈরির জন্য সম্রাট হানাফি মতবাদের ভিত্তিতে 'ফতোয়া-ই-আলমগিরী' নামে একটি বৃহৎ গ্রন্থ সংকলিত করেন।

৬.৩.১ ইসলামি অনুশাসনের কার্যকরিতা

অবশ্য সম্রাটের কঠোর নির্দেশ সত্ত্বেও এই সকল আদেশের অনেকগুলি কার্যকর করা সম্ভব হয়নি। মুঘল অভিজাতবর্গ মধ্যপান, জুয়াখেলা, নৃত্যগীত প্রভৃতিতে এত বেশি অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল যে, সম্রাটের নির্দেশে তা ত্যাগ করা সম্ভব ছিল না। বারবনিতারা ছিল, অভিজাতদের অন্দরমহলের রমণীরা আগের মতই সঙ্গীত চর্চা করতেন, তবে কিছুটা গোপনে এবং প্রধানত শহর থেকে দূরে যেখানে সম্রাটের কড়া নজর পড়া কিছুটা অসুবিধাজনক ছিল। Catherine Bulter Brown মন্তব্য করেছেন 'The 'ban' if at all was primarily in the form of prohibition of music in the presence of the emperor himself. This was a matter of personal renunciation and was not forced upon other connoisseurs'. ঔরঙ্গজেবের সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ ছিল। গ্রন্থাগারের পুঁথি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তিনি অনেক অর্থ ব্যয় করে ছিলেন। ঔরঙ্গজেবের দীর্ঘ ৫০ বছরের রাজত্বকালে মূঘল সাম্রাজ্য আয়তনের দিক থেকে বৃহত্তম আকার লাভ করলেও সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক ভিত্তি খুব একটা সচল ছিল না। তাঁর পুর্বসুরিদের মতো ঔরঙ্গজেব দরাজ হাতে ব্যয় করার পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁর নিজের প্রাত্যহিক জীবনযাপনও ছিল খুবই সরল। তবে তাঁর হারেম মুঘলদের মর্যাদা ও ঐতিহ্যমতই বজায় রেখে ছিলেন। অবশ্য দরবারে জাঁকজমক কমিয়ে দিয়েছিলেন। সঙ্গীতকারদের দরবার থেকে বহিষ্কার করেছিলেন কিন্তু বাদ্যকারদের করেননি। রাজকীয় নহবত যা প্রতিদিন নিয়ম করে প্রাসাদ দ্বারে বাজত তাও বন্ধ হয়নি। সম্রাটের জীবনযাত্রা ও ইসলামের বিধি ব্যবস্থার প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। সমসাময়িক প্রতিবেদকের অনেকে তাঁকে 'ভারতে ইসলাম রক্ষক' বলে চিহ্নিত করেছন। অর্থাৎ আকবরের পরধর্ম সহিষ্ণুতার নীতি তিনি বাতিল করেছিলেন। আধুনিককালের ঐতিহাসিকরা বলেন, ঔরঙ্গজেবের পূর্বসুরিদের রাজত্বকালে বহুলাংশে শিথিল প্রশাসন হিন্দুদের অবাধ্য করে তুলেছিল। সাম্রাজ্য রক্ষার তাগিদে ঔরঙ্গজেব অধিকমাত্রায় মুসলমানদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে ওঠেন এবং এর ফলে হিন্দুদের বিরুদ্ধে কিছু কঠোর ব্যবস্থা নিতে হয়। আকবরের রাজত্বকালে ধর্ম-সম্পর্কে সম্রাট ও রাষ্ট্রের যে মনোভাব প্রকাশ পেয়েছিল তা বদলে গিয়েছিল ঔরঙ্গজেবের শাসনকালে। J.F. Richards-এর মতে, সে সময় থেকেই এই ধারণা তৈরী হল যে মুঘল সাম্রাজ্য অবশ্যই ইসলামের রাষ্ট্র এবং শরিয়ত অনুসরণ করে ভারতীয় মুসলমানদের উন্নতি করাই হবে সেই রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য। তবে সতীশচন্দ্র মনে করেন যে ঔরঙ্গজেব মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন যে রাজ্য শরিয়ত মেনেই চালাতে হবে কিন্তু তা যেন শক্তিশালী হিন্দু অভিজাত ও জমিদার শ্রেণীকে আঘাত না করে।

৬.৪ হিন্দু বিরোধী অনুশাসন : মন্দির ধ্বংস

হিন্দুদের প্রতি চরম মনোভাব প্রকাশ পেয়েছিল মন্দির ধ্বংস ও জিজিয়া কর পুনরায় চালু করার মাধ্যমে। ঔরঙ্গজেব রাজত্বের শুরুতে প্রতিষ্ঠিত মন্দিরগুলি ধ্বংস করের পক্ষপাতী ছিলেন না। তবে নতুন কোনো মন্দির নির্মাণে মত দিতেন না। রাজত্বের প্রথম বছরে (১৬৫৯ খ্রীঃ) এক ফরমান দ্বারা বেনারসের জনৈক পুরোহিতকে জানিয়েছিলেন যে পবিত্র ইসলামীয় আইন অনুসারে প্রাচীন মন্দিরের

ওপর হস্তক্ষেপ করা যাবে না। তবে কোনো নুতন মন্দির নির্মাণের অনুমতি দেওয়া হবে না। ১৬৬৯ খ্রীঃ উড়িষ্যা, কটক, মেদিনীপুর ইত্যাদি অঞ্চলের স্থানীয় সরকারি কর্মচারীদের নির্দেশ দিয়েছিলেন যাবতীয় মন্দির, যা বিগত ১০-১২ বছরের মধ্যে তৈরি হয়ে ছিল, তা ধ্বংস করতে এবং পুরোনো মন্দির সংস্কার না করতে। ১৬৬৯ খ্রীঃ ৯ই এপ্রিল প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের একটি সাধারণ নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে বিধর্মীদের সকল বিদ্যালয় এবং মন্দির ধ্বংস করতে হবে এবং তাদের ধর্মীয় শিক্ষা রীতিনীতি দমন করতে হবে।

প্রাদেশিক শাসকরা সম্রাটের এই নির্দেশ কার্যকর করেন। ১৬৬৯ খ্রীঃ এর আগষ্ট মাসে বেনারসের বিশ্বনাথ মন্দির ধ্বংস করা হয়। পরের বছর ধ্বংস করা হয় মথুরার বিখ্যাত কেশব রায় মন্দির, যা প্রায় ৩৩ লক্ষ টাকা ব্যয় করে নির্মাণ করেছিলেন রাজা বীর সিং বুন্দেলা। এমনকি বিখ্যাত সোমনাথ মন্দিরও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। চরম হতাশা থেকেই হিন্দুদের মনে সাহস জন্মেছিল এবং যে মুসলিম কর্মচারীকে উজ্জয়িনীতে একটি মন্দির ধ্বংস করার জন্য পাঠানো হয়েছিল, হিন্দুরা তাকে হত্যা করেছিল। গুজরাটে হিন্দুদের প্রবল প্রতিরোধে শুক্রবারের নামাজ পড়া প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। মন্দির ধ্বংসের কারণে ঔরঙ্গজেবের সঙ্গে যোধপুরের সম্পর্ক তিক্ত হয়ে উঠেছিল। ১৬৭৯ খ্রীঃ মার্চ থেকে ১৬৮০ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারী-র মধ্যে উদয়পুর ও চিতোর-এ অনেক মন্দির ধ্বংস করা হয়েছিল। যদুনাথ সরকার 'History of Aurangzib' (৩য় খণ্ড)-এ মন্দির ধ্বংসের এক বিবরণ দিয়েছেন।

মন্দির ধ্বংসের পেছনে কেবলমাত্র ধর্মীয় কারণ বা উদ্দেশ্য কাজ করেছিল এমন ভাবা ঠিক নয়। ঔরঙ্গজেব দীর্ঘদিন জাঠ, মারাঠা প্রভৃতি স্থানীয় প্রতিপত্তিশালী হিন্দু শক্তির দ্বারা উত্যক্ত হয়েছিলেন এবং তাদের দমন করতে গিয়ে তিনি সেই সব জাতির ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকেও অপবিত্র করার ব্যবস্থা করেন। একই সঙ্গে তিনি লক্ষ্য করেন যে ঐ মন্দিরগুলি বহুক্ষেত্রে নানাভাবে রাষ্ট্রবিরোধী কাজের কেন্দ্র। ১৬৬৯ খ্রীঃ তিনি সংবাদ পান যে হঠাৎ মুলতান এবং বেনারসে বহু মন্দিরে হিন্দু এমনকি মুসলমানরাও যাতাযায়াত করে। এ বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ ছিলেন যে এইভাবে সম্রাটের বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রকাশ করার জন্য মন্দিরগুলিকে কেন্দ্র করে প্রজারা কাজ করছে। তিনি প্রজাদের নিরস্ত্র করেন। এই কারণে কাশীর বিশ্বনাথ মন্দির ও মথুরার কেশব রায়ের মন্দির ধ্বংস করে মসজিদ নির্মিত হয়। রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে ঔরঙ্গজেব সম্ভবত এই কাজ করেছিলেন। অধ্যাপক রিচার্ডস মনে করেন, ঐ মন্দিরের মাধ্যমে বুন্দেলাদের শক্তি ও গরিমা প্রকট হয়েছিল এবং তারা মধ্যভারতে সম্রাটকে নানাভাবে অবজ্ঞা করার চেষ্টা করেছিল। উল্লেখ্য, যে সময়ে তিনি মন্দির ধ্বংস করতে চেয়েছেন প্রায় সেই সময়েই তিনি কিছু মন্দিরকে ভূমিদান করছিলেন। যদিও ১৬৭২ খ্রীঃ ঔরঙ্গজেব গুজরাটে হিন্দু মন্দিরগুলিকে সয়ুরঘল (নিষ্কর) দান নিষিদ্ধ করে আদেশ দেন তথাপি তিনি বৃন্দাবনের কিছু বৈষ্ণব মঠকে এই প্রকার ভূমি দান করেন। শিখগুরু রামদাসকে দেরাদুনে গুরুদ্বার নির্মাণের জন্যও এইভাবে জমি দেওয়া হয়েছিল। তবে যে পরিমাণে মন্দির ধ্বংস হয়েছিল, সেই পরিমাণে নতুন মন্দির গড়ে ওঠেনি।

৬.৫ জিজিয়া কর পুন: প্রবর্তন (২রা এপ্রিল, ১৬৭৯ খ্রীঃ)

ঔরঙ্গজেবের ধর্মনীতির একটি উল্লেখযোগ্য দিক হল 'জিজিয়া' করের পুনঃ প্রবর্তন। কেবলমাত্র

অ-মুসলমানদের এই কর দিতে হত, সরকারি লেখকদের বক্তব্য অনুযায়ী ঔরঙ্গজেব কর্তৃক 'জিজিয়া' কর পুনঃ প্রবর্তনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল 'ইসলামের সম্প্রসারণ' এবং 'পৌত্তলিকদের দমন'। কাফি খাঁ লিখেছেন, এই করের বিরুদ্ধে অ-মুসলমানদের মধ্যে দুঃখ ও ক্ষোভ সঞ্চারিত হয়। জিজিয়া করের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে মারাঠা বীর শিবাজী ঔরঙ্গজেবকে পত্র লেখেন। কে.এম. পানিক্কর পত্র বিশ্লেষণ করে লিখেছেন যে, এতে কেবলমাত্র শিবাজী ও হিন্দুদের ক্ষোভ প্রকাশ হয়নি, জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ ভারতরাষ্ট্র গঠনের জন্য যে উদারতা ও মানসিকতার প্রয়োজন তার শিক্ষাও শিবাজী এই পত্রে সম্রাটকে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ঔরঙ্গজেবের লক্ষ্য ছিল ইসলামের সম্প্রসারণ। তাঁর বিশ্বাস ছিল, জিজিয়া দানে জর্জরিত হয়ে দরিদ্র হিন্দুরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে জিজিয়া প্রদানের হাত থেকে রেহাই পেতে চাইবে। সম্ভবত এই কারণে তিনি দরিদ্র শ্রেণির ওপর করের হার রেখেছিলেন বেশি। মানুচ্চি লিখছেন যে, জিজিয়ার চাপ এবং সরকারি কর্মচারীদের নিপীড়ন থেকে মুক্তির আশায় বহু হিন্দু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

অধ্যাপক সতীশচন্দ্রের ধারণা যে ঔরঙ্গজেব সিংহাসনে আরোহণের পরই জিজিয়া পুনরায় চালু করার পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু কিছু রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতার জন্য তিনি তা করতে পারেননি। বাইশ বছর পরে জিজিয়া ফিরিয়ে আনেন। তাঁর এই কর্মসূচি প্রমাণ করে যে ধর্মীয় কারণবশত নয়, উলেমাদের প্ররোচনায় নয়, কেবলমাত্র রাজনৈতিক কারণেই জিজিয়া চালু করে ছিলেন। ইতালীর পর্যটক মানুচ্চি বলেন যে, শূন্য রাজকোষ কিছুটা পূরণ করার জন্য ঔরঙ্গজেব জিজিয়া ফিরিয়ে আনেন অর্থাৎ অর্থভাণ্ডার হিসেবে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ কর। সমস্ত খ্রীস্টান বণিককে যেমন ইংরেজ, ওলন্দাজ, ফরাসি, পর্তুগিজ প্রভৃতিকে ভারতে আমদানিকৃত পণ্যের ওপর দেড় শতাংশ হারে এক অতিরিক্ত শুল্ক জিজিয়ার পরিবর্তে দিতে হত, পাশাপাশি দরিদ্র হিন্দুদেরও ইসলামে ধর্মান্তরিত করার একটা পরিকল্পনা ছিল, কারণ মুসলমান হলে জিজিয়া করের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যেত। উল্লেখ্য, জিজিয়া পুনঃপ্রবর্তনের মাধ্যমে রাজকোষ পূরণের যে যুক্তি দেখানো হয়েছে, সেটি গ্রাহ্য নয় কারণ জিজিয়া বাবদ আদায়কৃত অর্থ পৃথকভাবে রাখা হত, যেখান থেকে দরিদ্র মুসলমানদের সাহায্য করার জন্য বন্টিত হত। এই কাজ ইসলামের বিধি অনুসারে রাষ্ট্রের করণীয় ছিল। আকবর মুসলমান সমাজের নির্দিষ্ট কিছু শ্রেণিকে যেমন ধর্মীয় কাজে নিযুক্ত ব্যক্তি, জ্ঞানী ব্যক্তি, শিক্ষক, মৃত সেনানীর বিধবা, অনাথ ইত্যাদিদের নিষ্কর ভূমিদানের ব্যবস্থা করে ছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে ঐ পদ্ধতি কার্যত লুপ্ত হওয়ায় রাষ্ট্র নগদ অর্থে সাহায্য করতে বাধ্য ছিল। ঔরঙ্গজেব মুসলমান মৌলবাদীদের অনেকাংশকে প্রশয় দিতে থাকায় তাদের আর্থিক দায় তাঁকে বহন করতে হয়েছিল। এছাড়া ঔরঙ্গজেবের জিজিয়া-র সঙ্গে হিন্দুদের ধর্মান্তরিত করার যে উদ্দেশ্য বর্ণিত হয়েছে, সেটি বিশেষ গ্রহণযোগ্য নয়। হিন্দুরা স্বধর্মরক্ষায় আগ্রহী ছিল। জিজিয়া চালু করে যদি হিন্দুদের ধর্মান্তরিত করা সম্ভব হত তাহলে সুলতানী যুগ থেকেই জিজিয়া তা করতে পারেনি। জিজিয়া চালু করে সম্রাটের অসুবিধার পরিমাণ ছিল অনেক বেশি। এই কর হিন্দুরা ভীষণভাবে অপছন্দ করত। শহরাঞ্চলে প্রায়ই জিজিয়ার প্রতিবাদে বণিকরা একযোগে ব্যবসা বন্ধ করত এবং তার ফলে সাধারণ মানুষের দুর্দশা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ঔরঙ্গজেব সঠিক কোনো বিশ্বাস বা ধারনার দ্বারা চালিত হয়েছিলেন—তা

স্পষ্ট নয়। অবশ্য জিজিয়া পুনঃপ্রবর্তনের মাধ্যমে ঔরঙ্গজেব দার-উল-ইসলাম (ইসলামের রাজত্ব) প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন বলে সমকালীন দুই প্রতিবেদক আবুল ফজল মামুরি এবং কাফী খাঁ মন্তব্য করেছিলেন। কিন্তু ঔরঙ্গজেব কোনোভাবেই আকবরকৃত রাষ্ট্রব্যবস্থাকে পরিবর্তন করতে সক্ষম হননি।

জিজিয়া ছাড়া হিন্দুদের ওপর চাপ সৃষ্টি করার জন্য ঔরঙ্গজেব একাধিক ব্যবস্থা নেন। ১৬৬৫ খ্রিঃ এপ্রিল মাসে এক আইন জারি করে হিন্দু ও মুসলমান ব্যবসায়ীদের প্রদত্ত বাণিজ্য শুল্কের মধ্যে তারতম্য ঘটানো হয়। স্থির হয়, মুসলমান বণিকরা তাদের বাণিজ্যপণ্যের ওপর ২ শতাংশ হারে শুল্ক দেবে, কিন্তু হিন্দুদের ক্ষেত্রে এই শুল্কের হার হবে ৫ শতাংশ। ১৬৬৭ খ্রীঃ মে মাসে মুসলমান বণিকদের ক্ষেত্রে বাণিজ্য-শুল্ক রেহাই করে দেওয়া হয়। ১৬৯৫ খ্রীঃ এক নির্দেশ দ্বারা সম্রাট রাজপুত ছাড়া অন্যান্য হিন্দুদের ক্ষেত্রে পালকি চড়া, হাতি বা ঘোড়ায় চড়া এবং প্রাকশ্যে অস্ত্র বহন নিষিদ্ধ করে দেন। স্যার ওলসি হেইগ ঔরঙ্গজেবের ধর্মনীতিকে রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে ক্ষতিকারক হয়েছিল বলে মন্তব্য করেছেন।

৬.৬ ঔরঙ্গজেবের ধর্মনীতি সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মূল্যায়ন

ঔরঙ্গজেবের ধর্মনীতি সম্পর্কিত আলোচনায় প্রধানত দুই ধরনের মতামত লক্ষ্য করা যায়। যদুনাথ সরকার এবং তাঁর অনুগামীরা ঔরঙ্গজেবকে একজন নিষ্ঠাবান সুন্নি মুসলমান হিসেবে চিহ্নিত করে তাঁর নিরবচ্ছিন্ন হিন্দু বিরোধিতার কথা বলেছেন। অন্যদিকে জাহিরুদ্দিন ফারুকী, সতীশচন্দ্র, এম. আতাহার আলি প্রমুখ ঐতিহাসিক ঔরঙ্গজেবকে শুধুই হিন্দু বিদ্বেষী বলতে নারাজ। যাঁরা ঔরঙ্গজেবকে হিন্দু বিদ্বেষী বলতে চেয়েছেন, তাঁরা সম্রাট কর্তৃক হিন্দু-বিরোধী বিভিন্ন অনুশাসন জারি, মন্দিরের ধ্বংসসাধন, জিজিয়া করের পুনঃপ্রবর্তন ইত্যাদি নির্দেশ তুলে ধরেছেন। অন্যদিকে যাঁরা ঔরঙ্গজেবকে পুরোপুরি হিন্দু বিদ্বেষী বলতে নারাজ, তাঁরা বিভিন্ন যুক্তির অবতারণা করেছেন।

ঔরঙ্গজেবের পূর্ববর্তী শাসকরা ইসলামি আদর্শ অনুযায়ী রাজ্য শাসন করেননি। কিন্তু একজন নিষ্ঠাবান সুন্নি মুসলমান হিসেবে ঔরঙ্গজেব ইসলামি রাষ্ট্রতত্ত্ব অনুযায়ী রাষ্ট্রনীতি নির্ধারণ করেছিলেন। দিল্লী ও আগ্রার সংলগ্ন অঞ্চলে এবং দক্ষিণ ভারতে নানা হিন্দু বিদ্রোহ ঔরঙ্গজেবকে শঙ্কিত করেছিল এবং তিনি হিন্দুদের প্রভাব খর্ব করার জন্য এযাবৎ অনুসৃত সহনশীল নীতি পরিত্যাগ করে হিন্দু বিরোধী কিছু কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। জনৈক গবেষক জহিরুদ্দিন ফারুকী তাঁর 'Aurangzeb and His Times' গ্রন্থে বলেন যে, প্রথমদিকে ঔরঙ্গজেব উদারনৈতিক শাসক ছিলেন, কিন্তু হিন্দুদের নানা সাম্রাজ্য বিরোধী কার্যকলাপে শঙ্কিত হয়ে কোনো কোনো ক্ষেত্রে হিন্দু বিরোধী নীতি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। সতীশচন্দ্র তাঁর 'Mughal Religious Policies' গ্রন্থে ঔরঙ্গজেবের ধর্মনীতির ব্যাখ্যা করে বলেন, প্রথম পর্যায়ে অর্থাৎ ১৬৬৫ খ্রি: পযন্ত সম্রাট ধর্মান্ধতার পরিচয় দেননি। দ্বিতীয় পর্যায় অর্থাৎ ১৬৬৬-১৬৮৯ খ্রি: পর্যন্ত তিনি ধর্মীয় ক্ষেত্রে গোঁড়ামির পরিচয় দিয়েছিলেন, হিন্দু বিদ্বেষী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। এর পিছনে ধর্মীয় কারণ অর্থাৎ ব্যক্তিগত ধর্মবিশ্বাস বা উলেমাদের চাপ নয়, রাজনৈতিক কারণ ক্রিয়াশীল ছিল। এই রাজনৈতিক কারণগুলির মধ্যে ছিল জাঠ, সৎনামী, শিখ ও রাঠোরদের বিদ্রোহ এবং আফগান ও মারাঠাদের স্বাধীনতাস্পৃহা। এহেন বিপদসঙ্কুল পরিস্থিতিতে মারাঠা আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার তাগিদে

ঔরঙ্গজেব মুসলিম অভিজাত ও মৌলভীদের স্বপক্ষে ধরে রাখার জন্য নানা সুযোগ-সুবিধা দিয়েছিলেন। তৃতীয় পর্যায়ে অর্থাৎ ১৬৮৯ খ্রি: থেকে তাঁর ধর্মনীতির দিক পরিবর্তনের আভাস পাওয়া যায়। মহারাষ্ট্রের জিঞ্জী দূর্গ আক্রমণের সময় থেকে সম্রাটের একছত্র ক্ষমতা যে ক্ষীয়মান হচ্ছে তা ঔরঙ্গজেব উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি এও উপলব্ধি করেন যে হিন্দু রাজাদের বিশেষত মারাঠাদের বিদ্রোহ দমন করার শক্তি নেই। অন্যদিকে জায়গীরদারী সংকট নিয়ে ঔরঙ্গজেব চিন্তিত ছিলেন। ১৬৮৯ খ্রি: পর রাজধানী দিল্লীতে সুফিদের প্রভাব বৃদ্ধি পায়। কবি আব্দুল কাদির বেদী চিস্তি সম্প্রদায়ের ধর্মসমন্বয়বাদকে ভিত্তি করে কাব্য রচনা করেছিলেন। জিজিয়া আদায়ের ব্যাপারে ঔরঙ্গজেব ১৬৮৯ খ্রি: পর শৈথিল্য দেখান। সতীশচন্দ্র মন্তব্য করেন, জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে ঔরঙ্গজেব রাজত্বের শেষার্ধে এই পশ্চাদগামিতা শুরু হয়েছিল।

সতীশচন্দ্রের বক্তব্যের অনেকাংশ গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হলেও প্রশ্ন থেকে যায় ১৬৫৯ খ্রি: ঔরঙ্গজেব যে সব ইসলামি অনুশাসন জারি করেছিলেন তা কি ধর্মীয় গোঁড়ামীর উর্দ্ধে ছিল? কাফেরদের হাতে পড়ে কলিমার পবিত্রতা নষ্ট হবে বলে মুদ্রায় কলিমা খোদাই নিষিদ্ধ করা, কাফেরদের বিরুদ্ধে জারি করা অনুশাসনের যথার্থ প্রয়োগের জন্য মুহতাসিব নামক কর্মচারী নিয়োগ, হিন্দুরীতি বলে 'তুলাদান' প্রথা বন্ধ করা ধর্মীয় গোঁড়ামির উর্দ্ধে ছিল বলা চলে না। এছাড়া ১৬৬৬ খ্রি: থেকে ১৬৮৯ খ্রি: পর্যন্ত ঔরঙ্গজেবের ধর্মন্ধতার পেছনে রাজনৈতিক কারণকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ১৬৬৮ খ্রি: দরবারে নৃত্য-গীত নিষিদ্ধকরণ, ১৬৭৫ খ্রি: জ্যোতিষচর্চ্চা বন্ধ করা, সম্রাটের রাজত্বের দশম বর্ষে সচিত্র ইতিহাস রচনা নিষিদ্ধ করার পেছনে রাজনৈতিক কারণ কীভাবে দায়ী ছিল? বণিকদের ওপর শুল্ক ধার্যের ব্যাপারে (মুসলমানদের ক্ষেত্রে আড়াই শতাংশ হিন্দুদের ক্ষেত্রে ৫ শতাংশ) সম্ভবত ঔরঙ্গজেবের ধর্মীয় অনুদারতার প্রকাশমাত্র।

১৬৭১ খ্রি: কর্মচারী নিয়োগ সংক্রান্ত নির্দেশনামা ঔরঙ্গজেবের ধর্মনীতির একটি বিতর্কিত দিক্। এতে খলিসা অঞ্চলে একমাত্র মুসলিম রাজস্ব-সংগ্রাহক বা তহশিলদার নিয়োগ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল এবং প্রাদেশিক শাসনকর্তা ও তালুকদারদের হিন্দু প্রধান করণিক (পেশকার) ও হিসাব রক্ষক (দেওয়ান)-দের বরখাস্ত করে ঐ পদে মুসলিমদের নিয়োগের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু হিন্দু পেশকারদের সাহায্য ছাড়া প্রাদেশিক শাসনকার্য পরিচালনা করা অসম্ভব বুঝে শেষ পর্যন্ত মোট পেশকারদের সাহায্য ছাড়া প্রাদেশিক শাসনকার্য পরিচালনা করা অসম্ভব বুঝে শেষ পর্যন্ত মোট পেশকারদের অর্ধাংশ হিন্দুদের মধ্য থেকে নিয়োগ করার জন্য সম্রাট আদেশ দিয়েছিলেন। Shri Ram Sharma তাঁর 'The Religious Policy of the Mughul Emperor' গ্রন্থে বলেন, ঔরঙ্গজেবের আমলে সরকারি চাকরিতে তুলনামুলকভাবে হিন্দুদের সংখ্যা কমে গিয়েছিল। Athar Ali তাঁর 'The Mughal Nobility under Aurangzab' গ্রন্থে ঔরঙ্গজেবের আমলে রাজপুত তথা হিন্দু অভিজাতদের ব্যাপক সংখ্যা হ্রাসের যে প্রচলিত অভিযোগ তা অস্বীকার করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন ঔরঙ্গজেবের রাজত্বের সংখ্যা হ্রাসের যে প্রচলিত অভিযোগ তা অস্বীকার করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন ঔরঙ্গজেবের রাজত্বের প্রথম দিকে হিন্দু মনসবদারদের সংখ্যার চেয়ে শেষ ২৯ বছরে ঐ সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। আকবরের সময় রাজা বা রায় উপাধিধারী অভিজাতদের সংখ্যা ছিল ৫২। ঔরঙ্গজেবের সময় ঐ সংখ্যা ছিল ৬১। আকবরের আমলে

(১৫৯৫ খ্রি:) পাঁচ হাজার বা তদুর্ধ্ব মনসবদারদের মধ্যে হিন্দুর সংখ্যা হল মোট ৭ জন, তার মধ্যে ১জন, শাহজাহানের আমলে মোট ৪৯ জনের মধ্যে হিন্দু ১২ জন। ঔরঙ্গজেবের আমলে (১৬৫৮-৭৮ খ্রীঃ) ঐ সংখ্যা মোট ৫১ জন, হিন্দু ১০ জন, ১৬৭৬-১৭০৭ খ্রি: ঐ সংখ্যা মোট ৭৯ জন, হিন্দু ২৬ জন। শাহজাহানের আমলে ৫ শত থেকে ৫ হাজারী মনসবদারের মোট সংখ্যা ছিল ৫৬৩ জন। এর মধ্যে হিন্দু ছিল ১১০ জন, এবং ঔরঙ্গজেবের আমলে এমন ৫০৮ জন মনসবদারের মধ্যে হিন্দু ছিল ১০৪ জন। একথা ঠিক যে, মারাঠা যুদ্ধের সময় রাজনৈতিক প্রয়োজনে বহু মারাঠাকে মনসব প্রদান করা হয়ছিল। বলা চলে, ঔরঙ্গজেবের আমলে বহু হিন্দু তাদের যোগ্যতা অনুযায়ী সরকারী কাজে নিযুক্ত ছিল। জয়পুরের রাজা রাম সিংহ, যোধপুরের রাজা যশবন্ত সিংহ, মহারাণা রাজসিংহের পুত্র ইন্দ্র সিংহ, বাহাদুর সিংহ, রাজ মানসিংহ রাঠোর; দিলীপ রায় প্রমুখ উচ্চপদস্থ বিশস্ত কর্মচারী ছিলেন। রসিক দাস ক্রোরী ছিলেন রাজস্ববিভাগের সর্বোচ্চ পদাধিকারী। রাজস্ব বিভাগের পদগুলি ছিল হিন্দুদের একচেটিয়া।

হিন্দু মন্দিরের ধ্বংসসাধন ঔরঙ্গজেবের ধর্মান্ধতা বা হিন্দু বিদ্বেষ, অন্যদিকে মন্দিরগুলিকে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র ও বিদ্রোহের ঘাঁটিরূপে বিবেচনা করা হয়। সতীশচন্দ্র ঔরঙ্গজেবের হিন্দু মন্দির ধ্বংসের মধ্যে রাজনৈতিক কারণ অনুসন্ধান করে বলেন মারাঠা, জাঠ ইত্যাদি হিন্দু জাতিগুলি বিরোধিতার জন্যই তিনি মন্দির ধ্বংস করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। একথা ঠিক যে, ঔরঙ্গজেব যেমন বহু মন্দির ধ্বংস করেছিলেন, তেমনি আবার বহু মন্দিরকে পৃষ্ঠপোষকতাও করেছিলেন। যেমন বেনারস ফরমানে ঔরঙ্গজেবের ধর্মীয় সহনশীলতার পরিচয় মেলে। সেখানে তিনি ইসলামের নীতি (হানাফি তত্ত্ব) অনুযায়ী পুরোনো মন্দির ধ্বংস না করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। বলা যায়, মন্দির সম্পর্কিত প্রশ্নে ঔরঙ্গজেবের ধর্মীয় গোঁড়ামি ও কিছুটা উদারতার পাশাপাশি মসনদ রক্ষার স্বার্থে ক্রিয়াশীল ছিল।

১৬৭৯ খ্রি: জিজিয়া করের পুনঃ প্রবর্তন প্রসঙ্গে দরবারি লেখক মুহম্মদ সাকি মুস্তাইদ খান 'মাসির-ই-আলমগিরী' গ্রন্থে বলেন—যেহেতু ধর্মপ্রাণ সম্রাটের ঐকান্তিক উদ্দেশ্যে ছিল ইসলামীয় কানুনের প্রসার ও নাস্তিক আচরণের উচ্ছেদ, তাই তিনি কাফেরদের (জিমি) নিকট থেকে জিজিয়া আদায় করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। 'মিরাৎ-ই-আহমদী' গ্রন্থের লেখক আলি মুহাম্মদ খাঁ বলেন, যেহেতু শরিয়ৎ অনুযায়ী সম্রাট রাষ্ট্র পরিচলনা করতে চেয়েছিলেন, তাই উলেমারা সম্রাটকে বুঝিয়ে ছিলেন যে, কাফেরদের উপর জিজিয়া বলবৎ করা শরিয়ৎ অনুযায়ী অপরিহার্য। আধুনিক লেখকদের মধ্যে যদুনাথ সরকার, রমেশচন্দ্র মজুমদার, এস. আর. শর্মা প্রমুখ জিজিয়া পুনঃ প্রবর্তনের পেছনে ধর্মীয় উদ্দেশ্য বা হিন্দু নিপীড়ন লক্ষ্য করেছেন। অন্যদিকে, সতীশচন্দ্র প্রমুখ জিজিয়া পুনঃ প্রবর্তনকে আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে ব্যাখ্যা করেছেন। 'মিরাৎ-ই-আহমদী'-র লেখক আলি মুহাম্মদ খাঁ বলেন যে জিজিয়া থেকে প্রাপ্ত অর্থ দাতব্য কাজে ব্যয় করা হত। ধর্মজ্ঞ সন্ন্যাসী, বিধবা, অনাথ শিক্ষিত সম্প্রদায় ইত্যাদিকে রাষ্ট্র যে আর্থিক সহায্য করত, তা ঐ জিজিয়া থেকে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে করা হত। ঔরঙ্গজেব তাঁর রাজত্বের শেষ দিকে জিজিয়া আদায়ে শৈথিল্য দেখিয়েছিলেন। এছাড়া আসাদ খান, জুলফিকার খান, জাহানারা বেগম, শহাজাদা আকবর প্রমুখ যারা রাজনীতিতে উলেমাদের প্রভাব ক্ষতিকারক বলে মনে করতেন তাঁরাও জিজিয়ার বিরুদ্ধে অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন।

৬.৭ উপসংহার

ঔরঙ্গজেবের ধর্মনীতি রাষ্ট্রের স্বার্থের পক্ষে সহায়ক হয়নি। একটি বহু জাতি ও ধর্ম সম্বলিত রাষ্ট্রে ধর্ম সমন্বয় বা ধর্ম সহিষ্ণুতার নীতি অনুসৃত হওয়া প্রয়োজন। যুগোপযোগী না হওয়ায় ঔরঙ্গজেবের ধর্মনীতি সাম্রাজ্যের সর্বস্তরে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার জন্ম দিয়েছিল। আকবর যে ধর্মনীতি প্রণয়ণ করেছিলেন ঔরঙ্গজেবের বিধিব্যবস্থা সেই ঐতিহ্যকে নষ্ট করে দেয়। মুঘল সাম্রাজ্যের অবক্ষয়ের একটি কারণ হিসেবে ঔরঙ্গজেবের এই আচরণকে অস্বীকার করা কঠিন।

৬.৮ প্রশ্নাবলী

১. আপনি কি মনে করেন যে ঔরঙ্গজেব একজন সাম্প্রদায়িক বা ধর্মান্ধ ছিলেন?
২. ঔরঙ্গজেবের ধর্মনীতি কীভাবে আকবরের ধর্মনীতি থেকে পৃথক ছিল?
৩. আপনি কি মনে করেন ঔরঙ্গজেবের ধর্মনীতি রাষ্ট্রের ঐক্য ও স্থায়িত্বের উপর প্রভাব ফেলেছিল?
৪. ঔরঙ্গজেবের রাষ্ট্রনীতি ও ধর্মনীতির মূল্যায়ন করুন।

৬.৯ গ্রন্থপঞ্জি

- Ali-Athar–*The Mughal Nobility under Aurangzeb*, *Oxford, New Delhi, 1997*
- Ali-Athar–*The Mughal India, Studies in Polity, Ideas, Society and Culture, New Delhi, 2006*
- Chandra Satish–*History of Medieval India, Orient Black Swan, 2016*
- Nizami K.A.–*State and Culture in Medieval India, New Delhi-1985*
- Sarkar Jadunath–*History of Aurangzeb, 5 Vols, Kolkata 1928*
- Sharma S.R.–*The Religious Policy of the Mughal Emperors, Oxford, 1940*

—

একক ৭ ❑ উত্তরাধিকার দ্বন্দ্ব সংক্রান্ত সমস্যা

গঠন

৭.০ উদ্দেশ্য

৭.১ ভূমিকা

৭.২ উত্তরাধিকার দ্বন্দ্বজণিত সমস্যা
- ৭.২.১. দ্বন্দ্বের কারণ
- ৭.২.২. উত্তরাধিকার দ্বন্দ্বের পেছনে ধর্মের ভূমিকা

৭.৩ উপসংহার

৭.৪ প্রশ্নাবলী

৭.৫ গ্রন্থপঞ্জি

৭.০ উদ্দেশ্য

শাহজাহানের পুত্রদের মধ্যে সিংহাসনে আরোহণকে কেন্দ্র করে যে দ্বন্দ্ব সংঘটিত হয়েছিল তা নিয়ে ঐতিহাসিকরা ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। বর্তমান এককে ঐতিহাসিকদের দৃষ্টিভঙ্গি আলোচিত হবে—এটি বোঝার জন্য যে এই সংঘর্ষ দুটি সম্প্রদায়ের ছিল কিনা, অথবা দুটি পরস্পর বিরোধী নীতি অর্থাৎ ধর্মীয় উদারতা এবং রক্ষণশীলতাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল।

- উত্তরাধিকার সংক্রান্ত এই দ্বন্দ্বে মুঘল অভিজাতদের ভূমিকাও বিশ্লেষিত হবে।

৭.১ ভূমিকা

মুঘল বংশে উত্তরাধিকার সংক্রান্ত কোনো স্বীকৃত আইন না থাকায় বার বার রাজপুরুষদের মধ্যে সিংহাসনের কর্তৃত্বের লক্ষ্যে, সংঘাতের সূচনা হয়েছিল। তবে সিংহাসনের জন্য ভাতৃদ্বন্দ্বের সূচনা হয় জাহাঙ্গিরের মৃত্যুর পর। তাঁর দুই পুত্র শাহজাহান ও শাহরিয়ার নিজেদের সম্রাট বলে ঘোষণা করে এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিলেন। এইসব গৃহযুদ্ধের পরিণাম ছিল বিপুল লোকক্ষয় এবং অর্থ ব্যয়। মসনদ দখলকে কেন্দ্র করে এই রাজকীয় অস্থিরতা সাম্রাজ্যের শাসন কাঠামোতে ফাটল ধরিয়ে দেয়। এই সুযোগ গ্রহণ করেন উচ্চাকাঙ্খী অভিজাতগণ এবং আঞ্চলিক শাসকবর্গ। এইসব অর্ন্তদ্বন্দ্বে আমীর-ওমরাহ বা অভিজাতদের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকত।

৭.২ উত্তরাধিকার দ্বন্দ্বজণিত সমস্যা

জহিরুদ্দিন ফারুকী, আই, এইচ. কুরেশীর মত ঐতিহাসিকরা শাহজাহানের পুত্রদের মধ্যে উত্তরাধিকার সংক্রান্ত দ্বন্দ্বকে দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব হিসেবে প্রতিপন্ন করার পক্ষপাতী। শাহজাহানের জেষ্ঠপুত্র দারাশুকো ছিলেন নম্র ও উদার। শিক্ষা, দীক্ষা এবং চিন্তার উৎকর্ষে তিনি ছিলেন ভাইদের মধ্যে অগ্রণী। মহান আকবরের স্নেহশীলতার নীতির প্রভাব তাঁর উপর পড়েছিল। হিন্দুদের বেদান্ত, খ্রিস্টানদের নিউ টেস্টামেন্ট, পারিসকদের তালমুদ এবং সুফিসন্তদের বিভিন্ন গ্রন্থের সংঙ্গে তাঁর আন্তরিক পরিচয় ছিল। তাঁর চেষ্টায় অথর্ববেদ এবং উপনিষদ্ ফারসি ভাষায় অনুদিত হয়েছিল। ইসলাম ছাড়া অন্যান্য ধর্মের মহত্তর আদর্শ গ্রহণে ও প্রচারে তিনি ছিলেন উদার ও নিঃশঙ্ক। সম্ভবত দারার এই উদারতা গোঁড়া মুসলমানদের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল, যার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায় উত্তরাধিকার যুদ্ধের সময়। দারাশুকো-র হিন্দুদের প্রতি সহিষ্ণুতা ইসলামের স্বার্থ বিরোধী। ঔরঙ্গজেব ধর্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রে ছিলেন গোঁড়া সুন্নি। কোরান ও হাদিস ছিল তাঁর কণ্ঠস্ত। দারার ধর্মীয় আচরণে ঔরঙ্গজেব ক্ষুব্ধ ছিলেন। তিনি দারার উদারতা ও সমন্বয়ী ধর্ম দর্শনের মধ্যে ইসলামের বিপদ আশঙ্কা করে ধর্ম রক্ষার জন্য মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ করে দারার বিরোধিতা করতে চেয়েছিলেন। গোঁড়া সুন্নি মুসলমান নেতৃবৃন্দ শাহজাহান কর্তৃক দারাকে সম্রাট হিসাবে প্রতিভাত করার প্রচেষ্টাকে ইসলামের পক্ষে ক্ষতিকারক মনে করেছিলেন। তাঁরা ঔরঙ্গজেবকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করে এই সম্ভাব্য বিবাদ থেকে ধর্মকে রক্ষা করার পরিকল্পনা করেছিলেন। অর্থাৎ উত্তরাধিকার সংক্রান্ত দ্বন্দ্ব রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্খার সাথে সাথে গভীর ধর্মীয় অনুরাগ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। অন্যভাবে, উত্তরাধিকার সংক্রান্ত দ্বন্দ্ব ছিল দুটি বিরোধী নীতি-ধর্মীয় সহিষ্ণুতা এবং রক্ষণশীলতার লড়াই। আর. পি. ত্রিপাঠী স্বীকার করেছেন যে ধর্মের কারণে গোঁড়া সুন্নি মুসলমান নেতৃবৃন্দ ঔরঙ্গজেবের সমর্থনে সমবেত হয়েছিল।

যদি তাই হয়, তাহলে প্রশ্ন ওঠে যে ঔরঙ্গজেব সিংহাসন লাভের কারণ হিসাবে ইসলাম বিপন্ন (Islam in danger) বা ইসলাম ধর্মের রক্ষার জন্য তাঁর সিংহাসনে আরোহন জরুরী মনে করেছিলেন বা এই ব্যাপারে মুসলমানদের তাঁর প্রতি সমর্থন আদায়ে সচেষ্ট হয়েছিলেন। স্মরণ রাখা প্রয়োজন এর সঙ্গে ঔরঙ্গজেবের পরবর্তীকালে তথাকথিত ইসলামি রাষ্ট্র গঠনের প্রয়াস বা হিন্দু বিরোধী নীতি অনুসরণের সম্পর্ক নেই। এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন যে এই নতুন ধর্মচিন্তা উত্তরাধিকার দ্বন্দ্বের পেছনে প্রধান বিবেচ্য হিসেবে কাজ করেছিল কিনা।

উদয়পুরে প্রাপ্ত সরকারি তথ্য থেকে জানা যায় যে ঔরঙ্গজেব মেবারের রানা জয় সিংহকে একটি নির্দেশনামা পাঠিয়েছিলেন যেখানে তাঁর পিতা শাহজাহানের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী মণ্ডলগড় পরগণা ফিরিয়ে দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল এবং তাঁর প্রতি সহানুভূতি ব্যক্ত করেছেন। ঔরঙ্গজেব এও বলেছেন যে শক্তিশালী রাজন্যবর্গ হলেন ঔরঙ্গজেবের প্রতিভু; তাঁরা রাষ্ট্রের সম্পদ। শুধু তাই নয়, তিনি চান যে সমস্ত ধর্ম-সম্প্রদায়ের মানুষ মুঘল শাসনাধীনে বিনা বাধায় শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করুন। (*'The loyal one (i.e. The Rana) has become the recipient of thousands of roya favours. Because the persons of the great kings are shadows of God, the attention of this elevated*

class (of kings) who are the pillars of the great (i.e. God's) court, is devoted to thism that men belonging to various communities and different religions should live in the vale of peace and pass their days in prosperity, and no one should interfere with the affairs of another') ঔরঙ্গজেবের এই অভিব্যক্তি তাৎপর্যপূর্ণ কারণ এখানে ধর্মীয় বিষয়ের উপর কোন গুরুত্ব না দিয়ে সমন্বয়ের বার্তা সাম্রাজ্যের নীতি হিসাবে ঘোষিত হয়েছে।

৭.২.১ দ্বন্দ্বের কারণ

উত্তরাধিকার যুদ্ধের কারণ ও দায়িত্ব সম্পর্কে বলা যেতে পারে যে, মুসলিম আইনে বংশগত রাজতন্ত্রের স্বীকৃতি না থাকা বা জেষ্ঠপুত্রের সিংহাসন লাভের কোন নির্দেশ না থাকা, দারার প্রতি শাহজাহানের মাত্রাতিরিক্ত পক্ষপাতিত্ব এবং সাম্রাজ্যের শাসনভার দারার হস্তে অর্পণ করার সিদ্ধান্ত, দারার রাজনৈতিক অদূরর্শিতা গৃহযুদ্ধ ত্বরান্বিত করার জন্য কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। দারা পিতার অসুস্থতার কথা ভাইদের কাছে গোপন রেখেছিলেন। তিনি রাজধানী থেকে বাংলা, গুজরাট ও দাক্ষিণাত্যের পথগুলি রুদ্ধ করে দিয়ে ছিলেন যাতে সম্রাটের কোন সংবাদ প্রদেশগুলিতে না পৌঁছায়। তিনি রাজধানীতে অবস্থিত ঔরঙ্গজেবের উকিলের বাসগৃহ বাজেয়াপ্ত করেছিলেন। এছাড়া ঔরঙ্গজেব যখন বিজাপুরের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত, তখন তিনি ঔরঙ্গজেবের কর্মচারীদের রাজধানীতে ফিরে আসার নির্দেশ দিয়েছিলেন। প্রশাসনিক যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও মুঘল সিংহাসন লাভ থেকে ঔরঙ্গজেবকে বঞ্চনা এবং ঔরঙ্গজেবের সিংহাসন লাভর জন্য উচ্চাকাঙ্খা উত্তরাধিকার যুদ্ধের জন্য যেমন দায়ী ছিল, তেমনি দরবারের গোষ্ঠী রাজনীতিও কম দায়ী ছিল না। দারা সিংহাসনে আরোহণ করতে পারলে তাদের ক্ষমতা বজায় থাকবে ভেবে যেমন হিন্দু ও উদারবাদী মুসলিম অভিজাত গোষ্ঠী দারার পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন, তেমনি গোঁড়া সুন্নি গোষ্ঠী আপন স্বার্থ রক্ষার তাগিদে ঔরঙ্গজেবকে সমর্থন করেছিল। কেউ কেউ বলেন, শাহজাহান যদি অপেক্ষাকৃত শাসনকার্যে অদক্ষ দারাকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারি না করে যোগ্যতার বিচারে ঔরঙ্গজেবকে সিংহাসনে বসাতেন তাহলে হয়ত এই রক্তক্ষয়ী ভ্রাতৃঘাতী দ্বন্দ্ব এড়ানো সম্ভব হত। আবার, শাহজাহান যদি সমানভাবে তিন পুত্রের মধ্যে সাম্রাজ্য ভাগ করে দিতেন তাহলে সমস্যার সমাধান হত। এইভাবেও সমস্যার সমাধান হওয়া অসম্ভব ছিল কারণ সমগ্র সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হওয়ার বাসনা গৃহযুদ্ধের কারণ হয়ে দাঁড়াত।

৭.২.২ উত্তরাধিকার দ্বন্দ্বের পেছনে ধর্মের ভূমিকা

ঔরঙ্গজেবের বিজয়ের কারণ হিসেবে তাঁর ধর্মবোধের কথা উল্লেখ করা হয়। সামুরগড়ের যুদ্ধের পূর্বে দারার ধর্মচ্যুত ভাবভূর্তি এবং হিন্দু ও অমুসলমানদের সাথে ঘনিষ্ঠতা সুবিধাভোগী ও ক্ষমতাশালী মুসলমানদের মধ্যে এই ধারণা বদ্ধমূল করে যে দারার অধীনে সিংহাসন স্থাপিত হলে ইসলামের বিশেষ অধিকার ক্ষুন্ন হবে। তাই, কিছুটা ধর্মজয় এবং কিছুটা অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে বহু মুসলমান ঔরঙ্গজেবের পক্ষ নিয়েছিলেন। জনৈক ঐতিহাসিকের বর্ণনা অনুযায়ী বুরহানপুর থেকে যাত্রার পূর্বে ঔরঙ্গজেব বুরহানপুরে শেখ আব্দুল লতিফের আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন এই মর্মে যে তিনি 'Prince of Heretics' এর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেছেন। ধর্মাতের যুদ্ধের পর জাহানারা-র নিকট থেকে একটি চিঠির উত্তরে দারার প্রতি

তাঁর অসন্তোষ তিনি দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করেন। তিনি এও অভিযোগ করেন যে দারা ঔরঙ্গজেবের প্রতি বিদ্বেষভাবে পোষণ করতেন, এমন কি ঔরঙ্গজেবকে হত্যার পরিকল্পনাও করেছিলেন। ঔরঙ্গজেব ব্যক্ত করেন যে দারার ধর্মবোধ এবং তাঁর ধর্মীয় কার্যকলাপ ইসলাম এবং সাম্রাজ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক। একজন শাসক যিনি সাম্রাজ্যের স্বার্থবিরোধী কাজকর্মে লিপ্ত, তিনি তাঁর ধর্মীয় নীতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল নন। এই প্রসঙ্গে তিনি সাম্রাজ্যের প্রতি ক্ষতিকারক প্রভাব হিসেবে ১৬৫৭ খ্রীঃ বিজাপুর আক্রমণের সময় মুঘল বাহিনীকে ফিরে আসার নির্দেশের উল্লেখ করে বলেন দারার এই নির্দেশ যেমন সাম্রাজ্যের স্বার্থবিরোধী, তেমনি সেনাবাহিনীর পক্ষেও ক্ষতিকারক।

তবে একথা মনে করার কারণ নেই যে দারা এবং ঔরঙ্গজেবের পৃথক দৃষ্টিভঙ্গি অভিজাদের উদার এবং রক্ষণশীল এই দুই ভাগে বিভক্ত করেছিল। দারা ও ঔরঙ্গজেবের চরিত্রে মিলের চেয়ে অমিলই বেশি, দারা সুফি দরবেশ ও হিন্দু যোগীদের সঙ্গে মিশতেন, একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি বাইবেল ও বেদ পাঠ করেছিলেন, তিনি মনে করতেন বেদ ও একেশ্বরবাদের সমর্থন আছে। ঔরঙ্গজেব ছিলেন ধর্মভীরু মুসলমান, কোরান ও ধর্মশাস্ত্র পড়েছিলেন, মুসলিম আচার-আচরণ তিনি পালন করতেন। দারা ঔরঙ্গজেবকে বলতেন কপট, ভণ্ড; ঔরঙ্গজেব তাঁকে বলতেন ধর্মদ্রোহী (heretic)। কিন্তু এই কারণে অভিজাতরা ধর্মের ভিত্তিতে বিভক্ত হয়ে পড়েননি। উদারনীতিবাদী বা গোঁড়া রক্ষণশীল এই ভাবে বিভাজন হয়নি। অভিজাতরা নিজেদের ব্যক্তি বা গোষ্ঠী স্বার্থের কথা ভেবে কাজ করতেন। রাজপুত্ররা আসন্ন উত্তরাধিকার যুদ্ধের কথা মাথায় রেখে অভিজাত ও রাজপুত্র রাজাদের সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করেছিলেন। ঔরঙ্গজেব রাজপুত রানা জয়সিংহকে দলে পাওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েছিলেন।

উত্তরাধিকার যুদ্ধে অভিজাতরা ধর্মের ভিত্তিতে রাজপুতদের সমর্থনে এগিয়ে আসেননি। মহাবত খান এবং শতরশাল হাদা দারার পক্ষে যোগ দিলেও নজবত খান এবং মীর জুমলা ঔরঙ্গজেবের প্রতি অনুগত ছিলেন। শাহ নওয়াজ খান যিনি ঔরঙ্গজেবের ঘনিষ্ট ছিলেন, তিনি ওরঙ্গজেবকে উত্তরাধিকার যুদ্ধে সাহায্য করেছিলেন। তাই এটা মনে করার কারণ নেই যে মুসলমান কর্মচারীগণ ঐক্যবদ্ধভাবে ঔরঙ্গজেবের পক্ষে সমবেত হয়েছিলেন। আবার ঔরঙ্গজেব এক সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজপুতদের সহায়তা লাভে সক্ষম হয়েছিলেন। মেবারের রানা রাজ সিংহ ঔরঙ্গজেবের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। অবশ্য রাজ সিংহের সাহায্যের বিনিময়ে ঔরঙ্গজেব ১৬৫৪ খ্রীঃ রানার হৃত পরগণা ফিরিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। অভিজাতরা ধর্মের ভিত্তিতে বিবাদমান রাজপুত্রদের উত্তরাধিকার যুদ্ধে অংশ নিয়ে ছিল কিনা-এ প্রসঙ্গে সমসাময়িক তথ্যের ভিত্তিতে আথার আলী দেখিয়েছেন যে ৮৭ জন এক হাজারী মনসবদার বা তার বেশি যারা দারার সমর্থনে যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন, তাদের মধ্যে ছিল ২৩ জন ইরানি, ১৬ জন তুরানি, ১ জন আফগান, ২৩ জন অন্যান্য মুসলমান, ২২ জন রাজপুত এবং ২ জন মারাঠা। অন্যদিকে ১০০০ বা তার বেশী পদাধিকারী ১২৪ জন মনসবদারদের মধ্যে যারা ঔরঙ্গজেবের পক্ষে ছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন ২৭ জন ইরানি, ২০ জন তুরানি, ২৩ জন অন্যান্য মুসলমান, ৯ জন রাজপুত, ১০ জন মারাঠা এবং ২ জন অন্যান্য হিন্দু। সুজা-র পক্ষে ছিলেন ১০ জন এক হাজরী বা তার বেশি মনসবদার, যাদের মধ্যে ছিলেন ১ জন ইরানি, ৩ জন তুরানি, ১ জন আফগান এবং ৫ জন অন্যান্য মুসলমান। ১১ জন এক হাজারী বা তার বেশি মনসবদার যারা মুরাদের পক্ষে ছিলেন,

তাদের মধ্যে ছিলেন ১ জন ইরানি, ১ জন আফগান, ৭ জন অন্যান্য মুসলিম এবং ২ জন রাজপুত। এই পরিসংখ্যান থেকে বলা যেতে পারে যে অভিজাতরা জাতি ধর্মের ভিত্তিতে বিভক্ত হয়ে পড়েনি। প্রতিদ্বন্দ্বী রাজপুত্রগণ বিশেষত দারা এবং ঔরঙ্গজেব এক বড় সংখ্যক অভিজাতদের সহায়তা পেয়েছিলেন এবং এদের মধ্যে ছিলেন অনেকেই গুরুত্বপূর্ণ অভিজাত এবং কোনো নির্দ্দিষ্ট ধর্মীয় সম্প্রদায়ের অর্ন্তভুক্ত ছিলেন না। ২২ জন হিন্দু অভিজাত যাদের মধ্যে ১১ জন রাজপুত, ১০ জন মারাঠা, ২ জন অন্যান্য হিন্দু ঔরঙ্গজেব এবং মুরাদকে সমর্থন করেছিলেন, অন্যদিকে ২৪ জন হিন্দু অভিজাত— যাদের মধ্যে ছিলেন ২২ জন রাজপুত এবং ২ জন মারাঠা দারাকে সমর্থন জানিয়েছিলেন। এই পরিসংখ্যান থেকে স্পষ্ট যে ধর্মের ভিত্তিতে অভিজাতদের মধ্যে কোন সমঝোতা হয়নি।

ঔরঙ্গজেবের সিংহাসন লাভের প্রয়াসের ক্ষেত্রে তাঁর হিন্দু বিরোধী বা রাজপুত বিরোধী মনোভাবের অভাব অনেককে ভাবিয়ে তোলে। ঔরঙ্গজেবের পরবর্তীকালে অনুসৃত হিন্দু বিরোধী বা রাজপুত বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে যখন তিনি হিন্দু বিরোধী অনুশাসন জারি করেছিলেন, মন্দির ধ্বংস করার নির্দেশ দিয়েছিলেন, জিজিয়া করের পুনঃ-প্রবর্তন করেছিলেন বা ১৬৮০ খ্রি: মাড়ওয়ার এবং মেবারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। উল্লেখ করা যেতে পারে আকবরের পরবর্তীকালে রাজপুত বা হিন্দুরা সাম্রাজ্যে কোন গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন না। বেনারস ফরমানে ঔরঙ্গজেব রাণা জয় সিংহকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি পালন করেছিলেন এবং কেউই ধর্মীয় বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করার কথা বলা হয়েছিল। পরবর্তীকালে অবশ্য ঔরঙ্গজেবের নীতির পরিবর্তন লক্ষ্য করা গিয়েছিল।

৭.৩ উপসংহার

উত্তরাধিকার দ্বন্দ্ব সংক্রান্ত বিষয়টিকে কেন্দ্র করে ঐতিহাসিকরা বিতর্কে লিপ্ত হয়েছেন। ঐতিহাসিকরা এই দ্বন্দ্বকে দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে সংকট ছিল কিনা, বা দুটি পরস্পর বিরোধী নীতি ধর্মীয় উদারতা এবং রক্ষণশীলতাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল তা নিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন। আর. পি. ত্রিপাঠীর মত ঐতিহাসিকরা মনে করেছেন ধর্মের স্বার্থেই ঔরঙ্গজেবের সমর্থনে অভিজাতরা এগিয়ে এসেছিল। যদি তাই হয়, তাহলে প্রশ্ন ওঠে—ঔরঙ্গজেব কি ধর্ম রক্ষার কারণে সিংহাসন লাভ প্রয়োজন ব্যক্ত করেছিলেন অথবা উত্তরাধিকার দ্বন্দ্বের পেছনে কোন নতুন ধর্মীয় নীতি ঘোষণা করেছিলেন। একথা স্পষ্ট যে ওরঙ্গজেব সিংহাসনের প্রতিদ্বন্দিতা করার পেছনে কোন হিন্দু বিরোধী নীতি অনুসরণ করেননি এবং ঔরঙ্গজেবের এই হিন্দু বিরোধী বা রাজপুত বিরোধী নীতির অনুপস্থিতির সঙ্গে পরবর্তীকালে ঔরঙ্গজেবের হিন্দু মন্দির ধ্বংস, জিজিয়া করের পুনঃস্থাপন বা ১৬৮০ খ্রি: মাড়ওয়ার এবং মেবারের যুদ্ধের মধ্যে সম্পর্ক অনুসন্ধানের চেষ্টা করেন। উল্লেখ করা যেতে পারে, ঔরঙ্গজেবের ধর্মীয় নীতির ক্ষেত্রে পরবর্তীকালে পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়।

৭.৪ প্রশ্নাবলী

১. আপনি কি মনে করেন যে মধ্যযুগে ভারতে উত্তরাধিকার দ্বন্দ্ব দুটি সম্প্রদায়, দুটি পরস্পর বিরোধী নীতি ধর্মীয় উদারতা এবং ধর্মীয় মৌলবাদকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল?

২. আপনি কি মনে করেন যে উত্তরাধিকার দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে অভিজাতরা ধর্ম ও জাতির ভিত্তিতে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল?

৭.৫ গ্রন্থপঞ্জি

Ali, Athar–*The Mughal India, Studies in Polity, Ideas, Society and Culture,* Oxford, 2008

Irvine, William–*The Later Mughals, Vol. 1,* 1707-20, Calcutta, 1922

Tripathi, R.P.–*Rise and Fall of the Mughal Empire, Vol. 2,* Delhi

Qureshi, i.H–*A History of the Freedom Movement being the story of Muslim Struggie for Freedom of Hind-Pakistan, 1707-1947,* Karachi, 1967

Qureshi, I. H. (ed)–*A Short History of Pakistan,* Karachi, 1967.

—

একক ৮ ❑ ঔরঙ্গজেবের ধর্মচিন্তা এবং ধর্মীয় গোষ্ঠী ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্ক

গঠন

৮.০ উদ্দেশ্য

৮.১ ভূমিকা

৮.২ ধর্মীয় গোষ্ঠী ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতি ঔরঙ্গজেবের অনুসৃত নীতি
৮.২.১. প্রথম পর্ব (১৬৫৮-১৬৭৯ খ্রি:)
৮.২.২. দ্বিতীয় পর্ব (১৬৭৯-১৭০৭ খ্রি:)

৮.৩ উপসংহার

৮.৪ প্রশ্নাবলী

৮.৫ গ্রন্থপঞ্জি

৮.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করার মাধ্যমে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা জানতে পারবেন—

- ঔরঙ্গজেবের ধর্মীয় চিন্তা
- বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠী এবং প্রতিষ্ঠানের প্রতি আওরঙ্গজেবের দৃষ্টিভঙ্গি ও নীতি
- ঔরঙ্গজেবের ধর্মীয় নীতির বিবর্তন ও বিভিন্ন পর্ব।

৮.১ ভূমিকা

ঔরঙ্গজেবের দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর রাজত্বকালে মুঘল সাম্রাজ্য আয়তনের দিক থেকে বৃহত্তম আকার লাভ করে। উত্তরে কাশ্মীর থেকে দক্ষিণে জিঞ্জি এবং পূর্বে চট্টগ্রাম থেকে পশ্চিমে হিন্দুকুশ পাহাড় পর্যন্ত ছিল তার সাম্রাজ্যের ভৌগলিকা আকার। সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক ভিত্তি খুব একটা সচল না হলেও ঔরঙ্গজেবের দক্ষতা, সততা এবং অনলস পরিশ্রমের ফলেই সাম্রাজ্য বড় আকারে বিপর্যয় থেকে রক্ষা পেয়েছিল। স্যার যদুনাথ সরকার লিখেছেন যে বুদ্ধি, চরিত্র আর পরিশ্রমে ঔরঙ্গজেব ছিলেন সে যুগের এশিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ শাসক। তিনি ছিলেন অসাধারণ পরিশ্রমী, নীতিবাদী এবং দায়িত্বশীল। শাসক হিসাবে জাঁকজমক পছন্দ করতেন না। পূর্বসুরিদের মত ঔরঙ্গজেব দরাজ হাতে ব্যয় করার পক্ষপাতী

ছিলেন না। নিজের প্রাত্যহিক জীবনযাপনও ছিল খুবই সরল। ইসলামের বিধিব্যবস্থার প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। এই কারণে সমসাময়িক প্রতিবেদকদের অনেকেই তাঁকে 'ভারতে ইসলামের রক্ষক' বলে চিহ্নিত করেছেন। ঔরঙ্গজেব ছিলেন ইসলামি রাজতন্ত্রে বিশ্বাসী। ধর্ম বিষয়ে ছিলেন গোঁড়া এবং রক্ষণশীল। তবে শুধু ব্যক্তিগত চিন্তাভাবনা তাঁর ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি গঠন করেনি। তাঁর অনেক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও প্রশাসনিক সমস্যা ছিল। ডঃ সতীশচন্দ্র মনে করেন যে ঔরঙ্গজেব মনে প্রাণে এটাই বিশ্বাস করতেন যে রাজ্য শরিয়ত মেনেই চালাতে হবে কিন্তু তা কোনভাবেই যেন শক্তিশালী হিন্দু অভিজাত ও জমিদার শ্রেণিকে আঘাত না করে। বাস্তব পরিস্থিতি সম্পর্কে তিনি সজাগ ছিলেন। এই দ্বিধা দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে ধর্মীয় গোষ্ঠী ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল।

৮.২ ধর্মীয় গোষ্ঠী ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতি ঔরঙ্গজেবের অনুসৃত নীতি

ধর্মীয় গোষ্ঠী ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ঔরঙ্গজেবের সম্পর্ক নিয়ে ঐতিহাসিকরা নানা প্রশ্ন তুলেছেন। বলা হয়েছে যে ঔরঙ্গজেব আকবরের সহনশীল নীতির পরিবর্তন করে হিন্দুদের আনুগত্য হারিয়েছিলেন, তার শাসনকালে গণবিদ্রোহ হয়েছিল, সাম্রাজ্যের ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়েছিল। কিছু আধুনিক ঐতিহাসিকদের অভিমত হল হিন্দুদের সাম্রাজ্যের প্রতি আনুগত্য হারানোর জন্য ঔরঙ্গজেবকে দায়ী করা অযৌক্তিক। হিন্দুরা সাম্রাজ্যের প্রতি আনুগত্য হারিয়েছিলেন, নিজেদের শক্তিবৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন ঔরঙ্গজেবের পূর্বসূরিদের শাসনকার্যে অবহেলার কারণে। এই পরিস্থিতিতে ঔরঙ্গজেবকে হিন্দুদের প্রতি কঠোর হতে হয়েছিল এবং সাম্রাজ্যের স্বার্থে মুসলমানদের সমর্থন আদায়ের লক্ষ্যে তাঁর নীতি নির্ধারণ করতে হয়েছিল। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ধর্মীয় গোষ্ঠী ও প্রতিষ্ঠানের প্রতি তাঁর সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। তাঁর ধর্মনীতিকে শুধু সরল, একরৈখিক বিবর্তন হিসাবে দেখা সঠিক হবে না। শুধু ব্যক্তিগত চিন্তাভাবনা দ্বারা তিনি ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি গঠন করেননি। ব্যক্তিগতভাবে তিনি ইসলামি রাজতন্ত্রে বিশ্বাসী হলেও বাস্তব পরিস্থিতিকে অস্বীকার করে তাঁর শাসননীতি নির্ধারণ করেননি। রাজ্য শরিয়ত মেনে চালাতে চাইলেও শক্তিশালী হিন্দু অভিজাত ও জমিদার শ্রেণিকে আঘাত করতে চাননি। ঔরঙ্গজেবের ধর্ম সম্পর্কিত চিন্তা-ভাবনা ও কাজকর্মকে দুভাগে ভাগ করে আলোচনা করা যায়: ১৬৫৮-১৬৭৯ খ্রি: এবং ১৬৭৯-১৭০৭ খ্রি:।

৮.২.১. প্রথম পর্ব (১৬৫৮-১৬৭৯ খ্রি:)

সিংহাসনে আরোহনের পর ঔরঙ্গজেব কতকগুলি নৈতিক ও ধর্মীয় নিয়মবিধি প্রবর্তন করেন। তৈমুরের সময় থেকে আকবরের আমল পর্যন্ত বাদশাহকে 'সেজদা' বা কুর্নিশ করার প্রথা প্রচলিত ছিল। শাহজাহান 'সেজদা'-র পরিবর্তে ভূমিচুম্বন রীতি প্রবর্তন করেছিলেন। ইসলামি রীতিবিরুদ্ধ বলে ঔরঙ্গজেব এই প্রথা নিষিদ্ধ করেন এবং পরিবর্তে 'আস সালামু আলাইকুম' বলা রীতি প্রবর্তন করেন। উলেমার গরিষ্ঠ অংশের মতো তিনিও মনে করতেন যে এই প্রণাম একমাত্র ঈশ্বরকেই করা যেতে পারে। ধর্মের প্রতি আনুগত্যের নিদর্শন-স্বরূপ মুসলমান শাসকরা মুদ্রার ওপর কলমা খোদাই করতেন। বিধর্মীদের হাতে পড়ে কলমার পবিত্রতা নষ্ট হবে বলে ঔরঙ্গজেব এই প্রথা নিষিদ্ধ করে দেন। পারসিক শাসকদের অনুকরণে মুঘল

শাসকরা পারসিক শিয়া নববর্ষ অনুষ্ঠান (নওরোজ) পালন করতেন। ঔরঙ্গজেব 'নওরোজ' উৎসব বন্ধ করেন কারণ এর সঙ্গে ইসলামের সম্পর্ক ছিল না। শরিয়ত মেনে প্রজারা জীবন নির্বাহ করছে কিনা তা দেখার জন্য প্রতিটি প্রদেশে মুহতাসিব নিয়োগ করেন। এরা মদ্যপান, জুয়াখেলা বন্ধ করা বা শরিয়ত বিরোধী কার্যকলাপের জন্য অভিযুক্তদের শাস্তি বিধান করার অধিকার পেয়েছিলন। তবে জনগণের ব্যক্তিগত জীবনে হস্তক্ষেপ করার অধিকার মুহতাসিবদের ছিল না। ঔরঙ্গজেবের বিশ্বাস ছিল যে প্রজাদের মঙ্গল-অমঙ্গলের জন্য সম্রাটই দায়ী। ১৬৬৯ খ্রি: ঔরঙ্গজেব কতকগুলি অর্থনৈতিক, সামাজিক ও কুসংস্কার বিরোধী ব্যবস্থা নেন। তিনি দরবারে সঙ্গীত নিষিদ্ধ করেন। যদিও রাজ অন্তঃপুরের মহিলা ও অভিজাতদের ক্ষেত্রে তা বন্ধ হয়নি। এই সময় ফারসি ভাষায় ধ্রুপদী ভারতীয় সঙ্গীতের ওপর অনেক গ্রন্থ লেখা হয়। ঔরঙ্গজেব নিজে বীণাবাদনে দক্ষ ছিলেন। আকবরের আমল থেকে 'ঝরোখা দর্শন' (প্রত্যেক দিন সকালে সম্রাট প্রাসাদের অলিন্দ থেকে প্রজাদের দর্শন দিতেন) প্রচলিত ছিল। ইসলাম বিরোধী বলে ঔরঙ্গজেব তাঁর রাজত্বের একাদশ বর্ষে এই প্রথা নিষিদ্ধ করেন। আকবরের আমল থেকে হিন্দুরীতি অনুযায়ী 'তুলাদান' প্রথা (সম্রাটের জন্মদিনে সমান ওজনের সোনা-রূপা দান করা) চালু হয়। ঔরঙ্গজেব রাজত্বের দ্বাদশবর্ষে এই হিন্দুরীতি বন্ধ করে দেন। ঔরঙ্গজেব আরও কতকগুলি নৈতিক ও সামাজিক সংস্কার প্রবর্তন করেন। সম্রাট হিন্দু রাজাদের কপালে টিকা পরাতেন—এ প্রথা বন্ধ হয়। প্রকাশ্যে হোলি ও মহরমের শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ হয়। তিনি সভাসদদের রেশমী পোষাক পরতে নিষেধ করেন। সিংহাসন খুব সাধারণভাবে সাজানো হত। দরবারে কোন রকম স্বর্ণ-রৌপ্য নির্মিত বস্তুর ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছিল বলে কাফি খাঁ উল্লেখ করেছেন। কোরান বিরোধী বলে ঔরঙ্গজেব তাঁর রাজত্বের সচিত্র বার্ষিক ইতিহাস রচনা বন্ধ করেন। *New Cambridge History*-র লেখক বলেন বহু চিত্রকরকে দরবার থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। হিন্দু ও মুসলিম অনুষ্ঠানে জীব-জন্তু, পুরুষ ও নারীর প্রতিমূর্তি ব্যবহার নিষিদ্ধ হয়েছিল।

রাজ্য শাসন করতে গিয়ে ঔরঙ্গজেব লক্ষ্য করেন যে মুসলমানরা অধিকমাত্রায় সরকারের মুখাপেক্ষী, হিন্দুদের মতো তারা ব্যবসা-বাণিজ্য করতে আগ্রহী নয়। ঔরঙ্গজেব মুসলমানদের ব্যবসা বাণিজ্য করতে উৎসাহ দেন। মনে হতে পারে যে ঔরঙ্গজেব মুসলমানদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করেছেন। ১৬৭১ খ্রীঃ এই নির্দেশে প্রত্যাহার করতে হয়। বলা যেতে পারে যে ঔরঙ্গজেবের এই সব সংস্কারের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা ও ধর্মীয় গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন, বৈষম্যমূলক আচরণ করেছেন। এর ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু প্রজারা সম্রাটের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছিল।

হিন্দুদের ধর্মীয় গোষ্ঠী ও প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক মনোভাব প্রকাশ পেয়েছিল মন্দির ধ্বংস এবং জিজিয়া পুনরায় চালু করার মাধ্যমে। রাজত্বের শুরুতে অবশ্য ঔরঙ্গজেব শরিয়ত নীতি অনুসারে প্রতিষ্ঠিত মন্দিরগুলি ধ্বংস করার পক্ষপাতী ছিলেন না। তবে কোনো নতুন মন্দির নির্মাণে মত দেননি। বেনারস ও বৃন্দাবনের ব্রাহ্মণদের দেওয়া ফরমানে এই দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। রাজত্বের প্রথম বর্ষে (১৬৫৯ খ্রি:) এক ফরমান দ্বারা বেনারসের জনৈক পুরেহিতকে জানিয়েছিলেন, নূতন মন্দির নির্মাণের যে অনুমতি চেয়েছেন তা তিনি তাঁর ধর্মমতের (ইসলাম) জন্য দিতে পারবেন না। কিন্তু পুরোনো মন্দির ধ্বংসের কোন নির্দেশ নেই। ১৬৬৫ খ্রীঃ ঔরঙ্গজেব মন্দির ধ্বংসের নির্দেশ দেন। বিখ্যাত সোমনাথ মন্দিরও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

রাজত্বের শুরুতে ঔরঙ্গজেব সব মন্দির ধ্বংস করেননি। মন্দির ধ্বংসের পেছনে কেবলমাত্র ধর্মীয় কারণ বা উদ্দেশ্য কাজ করেছিল এমন ভাবা ঠিক নয়। ঔরঙ্গজেব দীর্ঘদিন জাঠ ও মারাঠা প্রভৃতি স্থানীয় প্রতিপত্তিশালী হিন্দু শক্তির দ্বারা উত্যক্ত হলে তাদের দমন করতে গিয়ে সেই সব জাতির ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে অপবিত্র করার ব্যবস্থা করেন। এটি ছিল অনেকাংশে রাজনৈতিক কৌশল। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে মন্দিরগুলি নানাভাবে রাষ্ট্রবিরোধী কাজের কেন্দ্র। ১৬৬৯ খ্রিঃ তিনি থাট্টা, মুলতান ও বেনারসের কয়েকটি মন্দিরের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেন কারণ তিনি সংবাদ পেয়েছিলেন যে এগুলিতে হিন্দু মুসলমান সকলে ব্রাহ্মণদের উপদেশ শুনতে আসে। তিনি এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ ছিলেন যে সম্রাট বিরোধী কাজে মন্দিরের ব্রাহ্মণরা লিপ্ত। তিনি সুবেদারদের কড়া নির্দেশ পাঠিয়ে এই ধরনের কাজ করা থেকে ব্রাহ্মণদের নিরস্ত্র করেন। এই কারণেই কাশী বিশ্বনাথ মন্দির এবং মথুরার কেশব রায়ের মন্দির দুটি ধ্বংস করে মসজিদ নির্মিত হয়েছিল। বীরসিংহ বুন্দেলা মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। ডঃ রিচার্ডস্-এর মতে, এই মন্দিরের মাধ্যমে বুন্দেলাদের শক্তি ও গরিমা প্রকট হয়েছিল এবং তারা মধ্য ভারতে সম্রাটকে নানাভাবে অবজ্ঞা করতে চেষ্টা করেছিল। কেশব রায়ের মন্দির ধ্বংস করে ঔরঙ্গজেব একই সঙ্গে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। ১৬৭৯-৮০ খ্রি: মাড়ওয়ারে রাঠোর বিদ্রোহ সংগঠিত হলে বা মেবারের রানা জিজিয়া-র বিরোধিতা করে অস্ত্র ধারণ করতে চাইলে ঔরঙ্গজেব বেশি পরিমাণে হিন্দু মন্দির ধ্বংসের আদেশ দিয়েছিলেন। যদুনাথ সরকার বলেন মুহতাসিবদের নাকি অন্যতম প্রধান কর্তব্য ছিল হিন্দু ভজনালয়গুলি ধ্বংস করা। ঔরঙ্গজেবের মন্দির ধ্বংসের কার্যকলাপে মুসলমানেরা এতই তৃপ্ত হয়েছিল যে পরবর্তী প্রায় পঁচিশ বছর এ ধরনের উদ্দীপনার প্রয়োজন হয় নি বলে ডঃ মাখনলাল রায়চৌধুরী তাঁর *The State and Religion in Mughal India* গ্রন্থে মন্তব্য করেন।

যে সময়ে ঔরঙ্গজেব মন্দির ধ্বংস করতে চেয়েছেন প্রায় সেই সময়েই তিনি কিছু নতুন মন্দিরকে ভূমিদান করেছেন। ১৬৭২ খ্রি: ঔরঙ্গজেব গুজরাটে হিন্দু মন্দিরগুলিকে কোনো রকম নিষ্কর দান নিষিদ্ধ করে আদেশ দিলেন ও বৃন্দাবনের কিছু বৈষ্ণব মঠকে এই প্রকার ভূমিদান করেছিলেন। এলাহাবাদের সোমেশ্বরনাথ মহাদেবের মন্দির, উজ্জয়িনীর মহাকালেশ্বর মন্দির, ছড়কুটের বালাজী মন্দির, গৌহাটীর উমানন্দ মন্দির, শত্রুঞ্জয়ের জৈন মন্দিরকে সম্রাট ভূমিসম্পত্তি দান করেছিলেন। শিখ গুরু রামদাসকে দেরাদুনে গুরুদ্বার নির্মাণের জন্যও জমি দেওয়া হয়েছিল। অবশ্য যে পরিমাণে মন্দির ধ্বংস হয়েছিল সেই পরিমাণে নতুন মন্দির গড়ে ওঠেনি। ঔরঙ্গজেবের ধর্মনিরপেক্ষ অনুশাসন সম্পর্কে ডঃ মাখনলাল রায়চৌধুরী বলেন ''These concessions were there no doubt, but they were too small a compensation for the harm he did to the liberal government of the Timurids''.

ঔরঙ্গজেবের আমলে একটি বিতর্কিত পদক্ষেপ হল জিজিয়া-র পুনঃ প্রবর্তন। শরিয়ত অনুযায়ী অমুসলমানদের জিজিয়া দেওয়া বাধ্যতামুকল। জিজিয়া পুনঃস্থাপনের মধ্য দিয়ে উলেমারা ইসলাম ও উলেমাদের সামাজিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার প্রয়াস চালিয়ে ছিলেন। অমুসলমানরা ইসলামি রাষ্ট্রে যে নিকৃষ্ট নাগরিক এবং অধীনস্ত তা বোঝানোর উপায় ছিল জিজিয়া। পিতাকে বন্দি করে ঔরঙ্গজেব যখন সিংহাসনে বসেন তখন তাঁর প্রতি সর্ব্বজনীন ভক্তি শ্রদ্ধা ছিল না। প্রধান কাজি তাঁর পিতার জীবিত অবস্থায় তাঁকে

সম্রাট হিসাবে মেনে নিতে অস্বীকার করেন। ঔরঙ্গজেব প্রধান কাজিকে পদচ্যুত করেন এবং নতুন কাজি হিসেবে আব্দুল ওহাবকে নিযুক্ত করেন। আবদুল ওহাব ঔরঙ্গজেবকে সম্রাট হিসেবে মেনে নেন। ঔরঙ্গজেব উলেমাদের খুশি করার জন্য মসজিদ, খানকা, দাতব্য প্রতিষ্ঠানগুলির সংস্কার করেন। রাষ্ট্রীয় ব্যয়ে ইমাম, মুয়াজ্জিন ও এইসব প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের নিয়োগ করেন। ঔরঙ্গজেবের এই সব কার্যকলাপের ফলে উলেমারা বেশি পরিমাণে চাকরির সুযোগ লাভ করেন এবং তারা দলবদ্ধভাবে সম্রাটকে স্বাগত জানান। উলেমারা আরও খুশি হন যখন ঔরঙ্গজেব মথুরা, কুরুক্ষেত্র প্রভৃতি হিন্দু তীর্থস্থানে তীর্থকর বসান।

উলেমাদের উৎসাহ এতটাই বৃদ্ধি পেয়েছিল যে তারা সম্রাটের ওপর নুতন করে জিজিয়া ধার্যের জন্য চাপ দেন। ডঃ সতীশচন্দ্রের অভিমত হল যে ঔরঙ্গজেব সিংহাসনে আরোহণের পরই জিজিয়া চালু করার পক্ষপাতী ছিলেন কিন্তু কিছু রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতার জন্য তিনি তা করেননি। সিংহাসনে আরোহণের বাইশ বছর পর জিজিয়া পুনঃ প্রবর্তন করেন। ইতালীয় পর্যটক মানুচ্চির বক্তব্য অনুযায়ী ঔরঙ্গজেব কর্তৃক জিজিয়া পুনঃ প্রবর্তনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ইসলামের সম্প্রসারণ এবং পৌত্তলিকদের দমন। ডঃ সতীশচন্দ্রের হিসেব অনুযায়ী মোট ভূমিরাজস্বের ১৫ শতাংশ ছিল জিজিয়া অর্থাৎ অর্থভাণ্ডার হিসেবে এই করের গুরুত্ব ছিল। সমস্ত খ্রিস্টান বণিককে যেমন ইংরেজ, ওলন্দাজ, ফরাসি, পর্তুগিজ প্রভৃতিকে ভারতে আমদানিকৃত পণ্যের উপর দেড় শতাংশ হারে এক অতিরিক্ত শুল্ক জিজিয়া-র পরিবর্তে দিতে হত। এর সঙ্গে সম্ভবত অত্যন্ত দরিদ্র হিন্দুদের ইসলামে ধর্মান্তরিত করার একটা পরিকল্পনা ছিল যেহেতু মুসলমান হলে জিজিয়ার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যেত। আধুনিক যুগের ঐতিহাসকরা মনে করেন জিজিয়া পুনঃপ্রবর্তনের পেছনে রাজকোষ পুরণের যে যুক্তি দেখানো হয়েছে সেই গ্রাহ্য নয় কারণ জিজিয়া বাবাদ আদায়িকৃত অর্থ পৃথকভাবে রাখা হত এবং সেখান থেকে দরিদ্র মুসলমানদের সাহায্য করার জন্য বন্টিত হত। এই কাজ ইসলামের বিধি অনুসারে রাষ্ট্রের করণীয় ছিল। আকবর মুসলমান সমাজের নির্দিষ্ট কিছু শ্রেণিকে যেমন ধর্মীয় কাজে নিযুক্ত ব্যক্তি, জ্ঞানী শিক্ষক, মৃত সেনানীর বিধবা, অনাথ ইত্যাদিদের নিষ্কর ভূমিদানের ব্যবস্থা করেছিলেন। পরবর্তীকালে ঐ পদ্ধতি কার্যত লুপ্ত হয়ে যাওয়ায় রাষ্ট্র নগদ অর্থে সাহায্য করতে বাধ্য ছিল। ঔরঙ্গজেব মুসলমান মৌলবাদীদের অনেকাংশকে প্রশয় দিতে থাকায় তাদের আর্থিক দায় তাঁকে বহন করতে হয়েছিল। জিজিয়া কর বাবদ প্রাপ্ত অর্থ উলেমাদের সেবায় ব্যয় করা হত।

ডঃ সতীশচন্দ্রের হিসাব অনুযায়ী অপেক্ষাকৃত দরিদ্র শ্রেণির ওপর জিজিয়া করের চাপ ধনীদের অনুপাতে যথেষ্ট বেশি ছিল। জিজিয়া ধার্য করার উদ্দশ্যে বিধর্মীদের সম্পত্তির মালিকানার ভিত্তিতে তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়েছিল—১০ হাজার দিরহাম এবং তার বেশি যাদের আয় তারা ছিল প্রথম শ্রেণিভুক্ত এবং তাদের দিতে হত বার্ষিক ৪৮ দিরহাম। দ্বিতীয় শ্রেণিভুক্ত ছিল ২০০ থেকে ১০ হাজার দিরহাম যাদের আয় এবং তাদের দিতে হত ২৪ দিরহাম। ২০০ ও তার কম আয় সম্পন্ন ব্যক্তিরা ছিল তৃতীয় শ্রেণির অন্তর্গত এবং তাদের প্রদেয় বার্ষিক জিজিয়া কর ছিল ১২ দিরহাম। টাকার অঙ্কে এই হার ছিল যথাক্রমে সাড়ে ১৩$\frac{১}{৩}$ টাকা, ৬$\frac{২}{৩}$ টাকা, ৩$\frac{১}{৩}$ টাকা। মহিলা, দরিদ্র ও সরকারি কর্মচারীদের জিজিয়া কর থেকে রেহাই দেওয়া হয়। জিজিয়া ছিল সম্পত্তির ওপর ধার্য কর, কোন ব্যক্তির আয়কর নয়। জিজিয়া

নতুন করে চালু করার পেছনে হিন্দুদের ধর্মান্তরিত করার যে উদ্দেশ্যে বর্ণিত হয়েছে সেটি বিশেষভাবে গ্রহণযোগ্য নয়। ঔরঙ্গজেবের রাজত্বের অনেক আগে থেকেই সিন্ধু, পশ্চিম পাঞ্জাব, কাশ্মীর ও পূর্ববঙ্গের হিন্দুরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল। ডঃ সতীশচন্দ্র জিজিয়া চালু করার পেছনে রাজনৈতিক কারণকে মুখ্য মনে করেছেন। দক্ষিণের দুটি মুসলমান রাজ্য—বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা তিনি গ্রাস করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সে কাজ ইসলাম বিরোধী বলে চিহ্নিত হওয়ার সম্ভবনা ছিল। তাই তিনি নিজের অবস্থান সুরক্ষিত করতে চেয়েছিলেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল যে জিজিয়া চালু হলে মুসলমান সমাজ তাঁর সমর্থক হয়ে উঠবে এবং বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা দখলও সহজ হবে।

জিজিয়া চালু হওয়ায় হিন্দুরা ভীষণভাবে অসন্তুষ্ট হন এবং প্রতিবাদ করে। মৌলবাদীদের কাছে ব্যক্তিগতভাবে কর জমা দেওয়ার সময়ে হিন্দুদের ধর্ম তথা সম্প্রদায় নিয়ে নানাভাবে অপমানের শিকার হতে হত। শহরাঞ্চলে প্রায়ই জিজিয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে বণিকরা একসঙ্গে ব্যবসা বন্ধ করত এবং তার ফলে সাধারণ মানুষের দুর্দশা বৃদ্ধি পেতে থাকে। জিজিয়া চালু হওয়ার ফলে রাষ্ট্রে অমুসলমানদের মর্যাদা হানি ঘটে।

আধুনিক ঐতিহাসিকরা মনে করেন যে জিজিয়া চালু করার মাধ্যমে অন্তত শেষবারের মত ইসলামের গৌরব এবং মুসলমানদের উচ্চতর মর্যাদা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হয়েছিল। ঔরঙ্গজেবের সমকালীন দুই প্রতিবেদক আবুল ফজল মামুরি এবং কাফী খানও মন্তব্য করেন যে জিজিয়া পুনঃপ্রবর্তনের মাধ্যমে ঔরঙ্গজেব দার-উল-ইসলাম (ইসলামের রাজত্ব) প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ঔরঙ্গজেব কোনোভাবেই আকবরকৃত রাষ্ট্র ব্যবস্থার পরিবর্তন করতে পারেননি বা মনসব থেকে হিন্দুদের সম্পূর্ণ বিতাড়ন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালের দ্বিতীয়ার্ধে হিন্দু কর্মচারীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল।

৮.২.২ দ্বিতীয় পর্ব (১৬৭৯-১৭০৭ খ্রি:)

১৬৭৯ থেকে ১৬৮৭ খ্রি: পর্যন্ত ঔরঙ্গজেব ছিলেন মুসলমানদের রক্ষাকর্তা, আশ্রয়। বিজাপুর এবং গোলকুণ্ডা অভিযান কালে তিনি নিজেকে ইসলামের এক নিষ্ঠাবান সৈনিক হিসেবে প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন কিন্তু দাক্ষিণাত্যের রাজ্যগুলির বিরুদ্ধে তাঁর অভিযান আপামর মুসলমানের সমর্থন পায়নি। যদিও এই রাজ্যগুলির বিরুদ্ধে তিনি ধর্ম বিরোধী কাজের অভিযোগ এনেছিলেন। দাক্ষিণাত্যের শাসকদের নিন্দা করা হয়েছিল কারণ তারা হল বিধর্মী মারাঠাদের বন্ধু, শাসকরা হল ব্যাভিচারী ও পাপী; ইসলাম, মুসলমান ও মসজিদের ঔজ্জ্বল্য সেখানে নেই; অপরদিকে দেব মন্দিরের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। এসব করেও দক্ষিণী শাসক ও মারাঠাদের বন্ধুত্বের মধ্যে ফাটল ধরাতে পারেননি। কোনো ভাবেই স্বপক্ষে আনতে ব্যর্থ হয়ে সম্রাট সরাসরি যুদ্ধের মাধ্যমে বিজাপুর ও গোলকুন্ডা অধিকার করতে সচেষ্ট হন। ১৬৮৮ খ্রি: সদর কাজী সৈফুল ইসলাম দাক্ষিণাত্যের মুসলিম রাষ্ট্র দুটির বিরুদ্ধে লড়াইকে আইনসম্মত বলে ফতোয়া দিতে রাজি হননি। বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা বিজয়ের পর ঐ দুটি রাজ্যে প্রচলিত যাবতীয় ইসলাম বিরোধী প্রথা নিষিদ্ধ করা হল, হিন্দু মন্দির ধ্বংস করে মসজিদ নির্মাণ করা হল। ঐ দুই রাজ্যের ইসলাম

বিরোধী কার্যকলাপ যাতে তাঁকে কোনো ভাবেই স্পর্শ করতে না পারে সেজন্য ঔরঙ্গজেব সচেতনভাবে নিজেকে ধর্মের রক্ষক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা জয়ের পর ঔরঙ্গজেব তেলেঙ্গানা ও কর্ণাটকের রাজা, নায়ক ও দেশমুখের আনুগত্য লাভের প্রয়াস চালিয়েছিলেন। তবে এই সময় তাঁর মৌলবাদী চিন্তাভাবনা অনেকটাই মলিন হয়েছিল। এই সময় তিনি পুরোনো হিন্দু মন্দির ধ্বংসের নীতি থেকে সরে আসেন, রাজনৈতিক বিরোধিতা সত্ত্বেও তিনি মন্দির ধ্বংস করেননি। সমসাময়িক জনৈক পর্যবেক্ষক ভিমসেন এই সময় বিজাপুর ও কর্ণাটকের অসংখ্য মন্দিরের অস্তিত্বের কথা উল্লেখ করে লেখেন: 'The temples in Bijapur and Hyderabadi Karnataka are beyond numbering, and each temple is like the fort of a Parenda and Sholapur. In the whole world nowhere else are there so many temples' তবে অল্প কয়েকটি ছাড়া ঔরঙ্গজেব বিরোধিতার ভয়ে মন্দির ধ্বংসের পথে অগ্রসর হননি। দক্ষিণে যুদ্ধ চলতে থাকায় মুঘলদের বিরুদ্ধে জনমত তৈরি হতে থাকে। এই অবস্থার প্রেক্ষাপটে ঔরঙ্গজেব ১৭০৪ খ্রি: দাক্ষিণাত্যে জিজিয়া প্রত্যাহার করেন। জিজিয়া কর প্রত্যাহারের পেছনে উলেমাদের বিরুদ্ধে ঔরঙ্গজেব এর অভিযোগ ছিল। রাজত্বের শুরু থেকে ঔরঙ্গজেব মক্কার দরিদ্র ও পন্ডিত ব্যক্তিদের জন্য অর্থ পাঠাতেন, কিন্তু উলেমারা তা আত্মসাৎ করত। ঔরঙ্গজেব মক্কার শরিফকে অর্থ আত্মসাৎ করার জন্য সতর্ক করেন। তিনি বলেন,'*Why should it (the money) not be distributed among the poor of the country because the manifestation of God is reflected in every country?*

কিছু আধুনিক ঐতিহাসিক মন্তব্য করেছেন যে ঔরঙ্গজেবের ধর্মনীতির উদ্দেশ্য ছিল দার-উল-হারবকে ইসলামে পরিণত করা। যদিও ঔরঙ্গজেব মনে করেছিলেন বিধর্মীদের ধর্মান্তরকরণ হল বৈধ, তবে পরিকল্পিতভাবে বৃহৎ আকারে জবরদস্তি ধর্মান্তরকরণের নজির নেই। ঔরঙ্গজেব কোনো ভাবেই আকবরকৃত রাষ্ট্রব্যবস্থার পরিবর্তন করতে সক্ষম হননি। মনসব থেকে হিন্দুদের সম্পূর্ণ বিতাড়ন সম্ভব হয়নি। আতাহার আলি তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছেন যে ঔরঙ্গজেবের রাজত্বের দ্বিতীয়ার্ধে মারাঠাসহ হিন্দু অভিজাতদের সংখ্যা মোট অভিজাতদের এক-তৃতীয়াংশ। তবে মারাঠা সর্দারদের অনেকগুলি উচ্চ মনসব দেওয়া হলেও সেনাবাহিনীর প্রধান বা গভর্নরের পদ তাদের দেওয়া হয়নি। শাসন-কাঠামোয় তাদের স্থায়ীভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি বা ঔরঙ্গজেবের সঙ্গে মারাঠাদের ব্যক্তিগত ব্য সামাজিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়নি।

৮.৩ উপসংহার

ধর্মীয় গোষ্ঠী ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ঔরঙ্গজেবের সম্পর্ক বিশ্লেষণে ঐতিহাসিকরা ভিন্নমত পোষণ করেছেন। তবে এ বিষয়ে ঐতিহাসিকরা সহমত পোষণ করেন যে ঔরঙ্গজেব আকবরের অনুসৃত নীতির পরিবর্তন ঘটিয়ে হিন্দু ধর্মীয় গোষ্ঠীর অসন্তোষের কারণ হয়েছিলেন। তাঁর রক্ষণশীল ধর্মীয় নীতি সাম্রাজ্যে তাঁর বিরুদ্ধে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার জন্ম দিয়েছিল। তবে তাঁর ধর্মনীতিকে শুধু সরল একরৈখিক বিবর্তন হিসেবে দেখা সঠিক হবে না। শুধু ব্যক্তিগত চিন্তাভাবনা দ্বারা তিনি ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি গঠন করেননি। সমসাময়িক রাজনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ধর্মীয় গোষ্ঠী ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কে গড়ে উঠেছিল।

৮.৪ প্রশ্নাবলী

১. ঔরঙ্গজেবের ধর্মনীতি আলোচনা করে দেখান যে এই নীতি আকবরের থেকে কতটা পৃথক ছিল?

২. ধর্মীয় গোষ্ঠী ও প্রতিষ্ঠানের প্রতি ঔরঙ্গজেবের দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিন।

৩. আপনি কি মনে করেন যে ঔরঙ্গজেব আকবরের ধর্মীয় সহনশীলতার নীতির পরিবর্তন ঘটিয়ে হিন্দুদের আনুগত্য হারিয়েছিলেন?

৮.৫ গ্রন্থপঞ্জি

- Lane Poole, Stanley– *Aurangzib,* Oxford, 1893
- Lane Poole, Stanley– *Aurangzib and The Decay of the Mughal Empire,* Oxford, 1901
- Sarkar, Jadunath– *History of Aurangzib,* Longman, 1920
- Sharma, Sri Ram– *The Religious Policy of the Mughal Emperors,* Oxford, 1940
- Zahiruddin, Faruki– *Aurangzib and his Times,* Bombay, 1935
- মুখোপাধ্যায়, সুবোধ কুমার—*মোঘল সাম্রাজ্য থেকে ব্রিটিশরাজ (১৫৫৬-১৮১৮ খ্রি:)*, কলকাতা, ২০১১

—

একক ৯ ❑ ঔরঙ্গজেবের রাজ্য বিস্তার ও সীমাবদ্ধতা

গঠন

৯.০ উদ্দেশ্য

৯.১ ভূমিকা

৯.২ রাজ্য বিস্তার: উত্তর-পূর্ব সীমান্ত নীতি
- ৯.২.১. উত্তর-পূর্ব সীমান্ত অভিযানের মূল্যায়ন
- ৯.২.২. উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত সমস্যা: উপজাতি বিদ্রোহ
- ৯.২.৩. ইউসুফজাই বিদ্রোহ (১৬৬৭ খ্রীঃ)
- ৯.২.৪. আফ্রিদি বিদ্রোহ (১৬৭২ খ্রীঃ)
- ৯.২.৫. খটক বিদ্রোহ (১৬৭২ খ্রীঃ)
- ৯.২.৬. বিদ্রোহের মূল্যায়ন

৯.৩ রাজপুত নীতি

৯.৪ ঔরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য নীতি
- ৯.৪.১. ঔরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য নীতির মূল্যায়ন

৯.৫ উপসংহার

৯.৬ প্রশ্নাবলী

৯.৭ গ্রন্থপঞ্জি

৯.০ উদ্দেশ্য

এই একক পাঠের মধ্য দিয়ে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলি আপনারা জানতে পারবেন :

- মুঘল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের রাজ্য বিস্তার নীতি
- ঔরঙ্গজেবের সময়কালে মুঘলদের উত্তর-পূর্ব সীমান্ত নীতি এবং তার মূল্যায়ন
- উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত সম্পর্কে ঔরঙ্গজেবের দৃষ্টিভঙ্গি ও উপজাতি বিদ্রোহ দমনে মুঘলদের ভূমিকা
- রাজপুতদের সম্পর্কে ঔরঙ্গজেবের দৃষ্টিভঙ্গি ও নীতি
- ঔরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য নীতি এবং তার মূল্যায়ন।

৯.১ ভূমিকা

যে মুঘল সাম্রাজ্যবাদের সূচনা করেছেন বাবর, বাবরের পৌত্র আকবরের আমলে যার ভিত্তি সুনিশ্চিত হয়েছে, আকবরের প্রপৌত্র ঔরঙ্গজেবের আমলে (১৬৫৮-১৭০৭ খ্রীঃ) সেই মুঘল সাম্রাজ্যবিস্তারের নীতি অব্যাহত ছিল। ঔরঙ্গজেবের আমলেই মুঘল শাসনাধীন অঞ্চলের পরিধি ছিল সব থেকে ব্যাপক। উত্তরে কাশ্মীর থেকে দক্ষিণে জিঞ্জি, পশ্চিমে হিন্দুকুশ থেকে পূর্বে চট্টগ্রাম পর্যন্ত তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। কিন্তু তাঁর রাজত্বের শেষ কুড়ি বছরে দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধ এবং উত্তর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত থাকার ফলে তিনি সাম্রাজ্যে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। ধর্মজ্ঞ, বুদ্ধিমান এবং চতুর হওয়া সত্বেও ঔরঙ্গজেব সাম্রাজ্যের বাস্তব পরিস্থিতি উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হন এবং জরুরী ভিত্তিতে সমস্যা সমাধানের জন্য সঠিক পদক্ষেপ নিতে সক্ষম হননি। রাজপুত, জাঠ, শিখ, বুন্দেলা এবং মারাঠাদের প্রতি অনুসৃত তাঁর নীতি ঔরঙ্গজেবকে তাদের আনুগত্য থেকে বঞ্চিত করে শত্রুতে পরিণত করেছিল। সাম্রাজ্যের শান্তিশৃঙ্খলা জনগণের জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা দিতে তিনি ব্যর্থ হয়েছিলেন।

৯.২ রাজ্য বিস্তার: উত্তর-পূর্ব সীমান্ত নীতি

ঔরঙ্গজেবের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ অভিযান হল উত্তর-পূর্ব সীমান্ত অভিযান। মুঘল সাম্রাজ্যের উত্তর-পূর্ব সীমান্তের একেবারে শেষ প্রান্তে ছিল কোচবিহার ও আসাম এই দুটি হিন্দু রাজ্য। গভীর জঙ্গল আর পাহাড় দ্বারা বেষ্টিত এই দুটি রাজ্য প্রকৃতিক দিক থেকে সুরক্ষিত থাকায় দীর্ঘদিন ভারতের মুসলিম শাসকদের আক্রমণ থেকে নিজেদের স্বাধীন অস্তিত্ব রক্ষা করেছিল। মঙ্গোলীয় জাতি সম্ভূত ভাগ্যান্বেষী সৈনিক বিশ্বসিংহ ১৫১৫ খ্রি: কোচবিহার রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। বিশ্বসিংহ ১৫৪০ খ্রি: পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন এবং অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে শাসনকার্য পরিচালনা করেছিলেন। কিন্তু পারিবারিক বিবাদের ফলে ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দিকে বাংলার উত্তরাঞ্চলের একটি অংশ এবং আসামের পশ্চিমাঞ্চলের একটি অংশ নিয়ে গঠিত কোচবিহারের হিন্দু রাজ্য দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। কোচবিহার রাজ্যের অভ্যান্তরীণ বিবাদের সুযোগে জাহাঙ্গির ১৬১২ খ্রি: আসামের গোয়ালপাড়া এবং কামরূপে মুঘল আধিপত্য স্থাপন করেন। মুঘল সীমানা উত্তর-পূর্বে আসাম সীমান্তে বর নদী পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। এর ফলে আসামের অহোমদের সঙ্গে মুঘলদের বিরোধ অনিবার্য হয়ে ওঠে। অহোমরা মাঝে মধ্যেই মুঘল এলাকায় আক্রমণ করত এবং বাংলা থেকে ধন-সম্পদ ও মানুষজন লুঠ করে নিয়ে যেত। অহোমরাজ সূসেনকারের রাজত্বকালে (১৬০৩-৪১ খ্রি:) মুঘলদের সঙ্গে দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম চলেছিল। দীর্ঘদিন সংঘর্ষ চলার পর ১৬৩৮ খ্রি: উভয়ের মধ্যে যে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল তাতে অহোমরাজ্য ও মুঘল সাম্রাজ্যের সীমানা নির্ধারিত হয়েছিল বর নদী।

শাজাহানের পুত্রদের মধ্যে গৃহযুদ্ধের সময় অবস্থার সুযোগ নিয়ে কোচরাজ্য ও অহোমরা একসঙ্গে মুঘল অধিকৃত কামরূপ আক্রমণ করে। অহোমরা ১৬৫৮ খ্রীঃ গৌহাটি থেকে কোচবিহারের সৈন্যদের বিতাড়িত করে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার পূর্বাঞ্চলে কতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। উত্তরাধিকার দ্বন্দ্বে জয়লাভ করে

ঔরঙ্গজেব উত্তর-পূর্ব সীমান্ত সম্পর্কে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেন এবং বাংলার নব-নিযুক্ত গভর্নর মীরজুমলাকে উত্তর-পূর্ব সীমান্তে অভিযান প্রেরণের নির্দেশ দেন। মীরজুমলা আক্রমণ করলে সামান্য প্রতিরোধের পর একে একে মোনাস নদীর মোহনায় অবস্থিত যোগীগুফা দুর্গ, বরনদীর মোহনায় গৌহাটি ও শ্রীঘাট দূর্গ, কালাং নদীর মোহনায় পান্ডু বেলতলা, কাজলি দূর্গ এবং ক্ষারালি নদীর মোহনায় সমধারা দুর্গ ও ব্রহ্মপুত্র নদের দক্ষিণ তীরস্থ সিমলাগড় দুর্গ মুঘলদের অধিকৃত হয়। অহোমরা পরাজিত হলেও ক্ষমতা ও রাজ্য পুনরুদ্ধারের আশা ত্যাগ করেনি। মীরজুমলাও তাঁর অদম্য মনোবল আর গভীর কর্তব্যবোধ দ্বারা মুঘলবাহিনীকে অনুপ্রাণিত করত। মুঘল বাহিনী অহোম রাজ জয়ধ্বজের প্রস্তাব আনুসারে উভয়ের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি অনুসারে জয়ধ্বজ ক্ষতিপূরণ হিসাবে প্রচুর অর্থ এবং বাৎসরিক কর দিতে রাজী হন। অহোম রাজ্যে সফল অভিযানের পর ঢাকা প্রত্যাবর্তনের পথে মীরজুমলার মৃত্যু হয় (৩১ মার্চ, ১৬৬৩ খ্রি:)। মীরজুমলার মৃত্যুতে ঔরঙ্গজেব তাঁর একজন বিশ্বস্ত সেনাপতিকে হারান। মীরজুমলা সম্পর্কে যদুনাথ সরকার বলেন, সে যুগে অন্য কোনো সেনাপতি মীরজুমলার মত মানবতা ও ন্যায়পরায়ণতার সঙ্গে যুদ্ধ পরিচালনা করেননি। যুদ্ধক্ষেত্রে একজন সাধারণ মানুষের মত সেনাবাহিনীর সঙ্গী ছিলেন এবং তাদের মতই কষ্ট স্বীকার করেছিলেন। যুদ্ধকালে লুঠপাঠ না করতে, জনগণকে অত্যাচার না করতে এবং নারী নিগ্রহ থেকে বিরত থাকতে তিনি সেনাবাহিনীকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। এমন একজন সেনাপতি সম্পর্কে যদুনাথ সরকার মন্তব্য করেছেন, *"With a hero like Mir Jumla, the rhetoric of the historian Talish ceases to be extravagance; his eulogy of the general is not fulsome flattery but homage deservedly paid to a born king of men."*

৯.২.১ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত অভিযানের মূল্যায়ন

মীরজুমলার উত্তর-পূর্ব সীমান্ত অভিযানের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে বলা যায় যে, প্রতিকুল অবস্থার মধ্যে ক্রমাগত যুদ্ধ করে তিনি উত্তর-পূর্ব সীমান্ত অঞ্চলে মুঘল কর্তৃত্ব বিস্তার করেছিলেন। কামরূপ ও কোচবিহারে মুঘল অধিপত্য কায়েম করলেন, আসামের একাংশ মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত হল। আসামের বাকি অংশও সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করল। বহু ধনসম্পদ লাভ করলেন। তাঁর এই অভিযান মুঘলদের আরাকান ও বর্মা বিজয়ের পথ প্রশস্ত করল। তবে উত্তর-পূর্ব সীমান্তে দীর্ঘদিন যুদ্ধ পরিচালনা করতে গিয়ে মীরজুমলা বাংলার জনগনের উপর রাজস্বের বোঝা চাপিয়ে ছিলেন। এর ফলে বহু লোক ক্রয়ক্ষমতার অভাবে অনাহারে মারা গিয়েছিল। যদুনাথ সরকার তাঁর History of Bengal (২য় খণ্ড) গ্রন্থে বলেন, শুধু রাজস্ব বৃদ্ধি নয়, মীরজুমলা বাজার থেকে কম দামে জিনিস কিনে ব্যবসায়ীদের তা বেশি দামে কিনতে বাধ্য করতেন।

মুঘলদের এই সাফল্য দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। ১৬৬৭ খ্রি: পর্যন্ত মীর জুমলা-র আসাম অভিযানের সাফল্য বজায় ছিল। জয়ধ্বজ সিংহের উত্তরাধিকারী চক্রধ্বজ-এর সেনাবাহিনী ১৬৬৭ খ্রি:-র নভেম্বরে গৌহাটি পুনরুদ্ধার করে। চক্রধ্বজ পশ্চিমদিকে মোনাস নদী পর্যন্ত তাঁর রাজ্যসীমা বিস্তার করেন। চক্রধ্বজের মৃত্যুর পর (১৬৭০ খ্রি:) পর অর্ন্তদ্বন্দ্বে অহোম রাজবংশ দুর্বল হয়ে পড়লে ১৬৭৯ খ্রি: মুঘলরা সাময়িকভাবে গৌহাটি দখল করতে সমর্থ হয়। কিন্তু দুবছরের মধ্যে ১৬৮১ খ্রি: অহোমরাজ গদাধর সিংহ কামরূপ পুর্নদখল করেন। ঔরঙ্গজেব একপ্রকার উদ্দেশ্যহীনভাবে অহোমদের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যেতে থাকেন।

১৬৬২ খ্রি: মীরজুমলা যখন আসামে ব্যস্ত, কোচবিহারের রাজা প্রাণ নারায়ণ তখন এই সুযোগে কোচবিহার দখল করেন। ১৬৬৪ খ্রি: মার্চ মাসে বাংলার পরবর্তী শাসনকর্ত্তা শায়েস্তা খাঁ রাজমহলে এলে কোচবিহারের রাজা তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করেন; ১৬৬৬ খ্রি: প্রাণ নারায়ণের মৃত্যুর পর প্রায় অর্ধশতাব্দী পরে অর্ন্তদ্বন্দ্বের ফলে কোচবিহার দুর্বল হয়ে পড়লে সেই দুর্বলতার সুযোগে মুঘলরা রংপুর এবং আসামের অন্তর্গত কামরূপের বেশ কিছু অঞ্চল দখল করে নেয়।

১৬৬৬ খ্রি: শায়েস্তা খাঁ-এর চট্টগ্রাম বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত চট্টগ্রামের উপর আরাকানের একক আধিপত্য ছিল। মুঘল সুবাদাররা চট্টগ্রাম অধিকারের ব্যর্থ প্রয়াস চালিয়ে ছিলেন। চট্টগ্রাম থেকে মগ জলদস্যুরা পর্তূগিজদের সঙ্গে একযোগে মুঘল বাংলার পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গের উপকুলে অবাধ লুটতরাজ চালাত। মুঘলরা কোনো প্রকারে এর প্রতিবিধান করতে পারেনি কারণ বাংলার রাজধানী ঢাকা ছিল চট্টগ্রাম থেকে অনেক দূরে অবস্থিত, যোগাযোগের পথ ছিল দুর্গম। বাংলার নিরাপত্তা রক্ষার জন্য মগ্ জলদস্যুদের দমন করা একান্ত প্রয়োজন ছিল। আরাকানের মগ্ রাজার অধিকৃত চট্টগ্রামের বিরুদ্ধে শায়েস্তা খাঁর পুত্র বুজুর্গ উমেদ খান এবং নৌ-অধ্যক্ষ ইবন হাসানের নেতৃত্বে একটি বিশাল শক্তিশালী বাহিনী পাঠানো হল। মুঘল বাহিনীর হাতে মগরা পরাজিত এবং বিধ্বস্ত হয়। জয়লাভের ফলে মগদের হাতে বন্দি সহস্রাধিক বাঙালী যুবক মুক্তি পায়। ব-দ্বীপ অঞ্চলে কৃষিকাজ বৃদ্ধি পায়, চট্টগ্রামে একজন মুঘল ফৌজদার নিযুক্ত হয়। এইভাবে চট্টগ্রাম অধিকৃত হলে মগ ও ফিরিঙ্গীদের দৌরাত্মের অবসান ঘটে এবং বাংলার দক্ষিণ-পূর্ব উপকুল অঞ্চলে শান্তি ফিরে আসে।

৯.২.২ উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত সমস্যা: উপজাতি বিদ্রোহ

ভারত ও আফগানিস্তানের মধ্যবর্তী অঞ্চলে এবং পার্শ্ববর্তী পার্বত্য অঞ্চলে যে তুর্ক-ইরানির গোষ্ঠীর অসংখ্য লোকের বসবাস, তারা ছিল পাঠান। ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার পরও তারা তাদের উপজাতীয় সংগঠন, রীতি-নীতি অক্ষুন্ন রেখেছিল। এই পাঠান উপজাতিরা ছিল স্বাধীনচেতা, হিংস্র, সাহসী ও যুদ্ধবাজ। পারস্পরিক বিবাদে লিপ্ত থেকে তারা নিজেদের জন্য কোনো রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। তাদের মধ্যে আদিম গোষ্ঠীতন্ত্র ছিল প্রবল। কোনো সুসংগঠিত সরকার তাদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি। অনুর্ব্বর অঞ্চলের এই পাঠানদের লুণ্ঠনবৃত্তিই ছিল প্রধান জীবিকা। এই উপজাতিগুলির মধ্যে অন্যতম প্রধান হল আফ্রিদি, ইউসুফজাই ও খটক।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত মুঘলদের কাছে সমস্যা ও উদ্বেগের কারণ ছিল। ১৫৮৬ খ্রি: আকবর উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের ইউসুফজাই ও মান্দার উপজাতিকে দমন করার জন্য রাজা বীরবলের নেতৃত্বে আট হাজার সৈনের যে অভিযান পাঠিয়েছিলেন, তা সফল হয়নি। মুঘল সম্রাটরা উপজাতিদের স্বাতন্ত্র মেনে নিয়ে তাদের লুঠপাটের ব্যাপারে উদাসীন থেকে মোটামুটি শান্তিরক্ষা করতেন। মুঘল সম্রাটদের মূল উদ্দেশ্য ছিল উত্তর-পশ্চিমের গিরিপথের নিরাপত্তা রক্ষা করা এবং নিম্নস্থ উপত্যকায় শান্তি বজায় রাখা। কিন্তু উপজাতিদের দৌরাত্ম্য সহ্যের সীমা অতিক্রম করলে ঔরঙ্গজেব তাদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান প্রেরণের সিদ্ধান্ত নেন।

৯.২.৩ ইউসুফজাই বিদ্রোহ (১৬৬৭ খ্রি:)

স্বাত, বাজাউর উপত্যকা এবং পেশোয়ারের সমতলভূমিতে বসবাসকারী ইউসুফজাই জাতি তাদের নেতা ভাগুর নেতৃত্বে ১৬৬৭ খ্রি: প্রথম দিকে মুঘলদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ভাগু ইউসুফজাই পাঠানদের নিয়ে একটি সৈনবাহিনী সংগঠিত করে আটকের কাছে সিন্ধুনদ অতিক্রম করে হাজারা জেলার পাখলি আক্রমণ করেন। তিনি এখানকার সাদমান দুর্গ দখল করেন এবং কৃষকদের নিকট থেকে রাজস্ব আদায় করেন। অন্যান্য ইউসুফজাই দলগুলি আটক ও পশ্চিম-পেশোয়ার লুঠপাঠ শুরু করে। ইউসুফজাইদের দমন করার জন্য ঔরঙ্গজেব কাবুলের শাসনকর্তা, আটকের ফৌজদারকে নির্দেশ দেন। ১৬৬৭ খ্রি: আটকের ফৌজদার কামিল খাঁ হারুন ইউসুফজাইদের আক্রমণ করে। স্বাত উপত্যকার হিজাস গ্রামকে ধ্বংস করে আমিন খাঁ ইউসুফজাইদের কিছু দিনের জন্য স্তব্ধ করে দেন। ১৬৭২ খ্রি: পর্যন্ত উত্তর-পশ্চিমে বিদ্রোহ সংঘটিত হয়নি।

৯.২.৪ আফ্রিদি বিদ্রোহ (১৬৭২ খ্রি:)

১৬৭২ খ্রি: আফ্রিদি উপজাতি প্রধান আকমল খাঁ-র নেতৃত্বে আর এক পাঠান উপজাতি আফ্রিদিরা মুঘলদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং মুঘল বিরোধী এই অভ্যুত্থানে সমস্ত পাঠান উপজাতিকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানায়। আকমল খাঁ আফগানিস্তানের মুঘল প্রশাসক আমিন খাঁকে আক্রমণ করেন এবং মুঘলদের পানীয় জলের সরবরাহের বন্ধ করে দেয়। ফলে মুঘলবাহিনী ভীষণভাবে বিপর্যস্ত হয়। আফ্রিদিরা মুঘল শিবির লুঠ করে। আকমল খাঁর খ্যাতি পার্বত্য এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে এবং বহু পাঠান যুবক অর্থ ও যশের আশায় আকমল খাঁর বাহিনীতে যোগ দেয়।

৯.২.৫ খটক বিদ্রোহ (১৬৭২ খ্রি:)

আফ্রিদিদের সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে পেশোয়ার, কোহাট এবং বান্নুর খটকরা মুঘলদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। খটকদের নেতা খুস-হল খাঁ খটকদের জাতীয় অভ্যুত্থানের উৎস হয়ে ওঠেন। কান্দাহারের থেকে আটক পর্যন্ত পাঠান অধ্যুষিত সমগ্র অঞ্চলে এই বিদ্রোহ পরিচালিত হয়। নিজস্ব পর্বত-সংকুল অঞ্চলে যুদ্ধরত শক্তিশালী পার্বত্য জাতিগুলিকে দমন করা মুঘলদের কাছে একটি জটিল সামরিক সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। এছাড়া বিদ্রোহী নেতৃবৃন্দের অনেকেই মুঘল বাহিনীতে কাজ করেছিল বলে মুঘলদের সামরিক দক্ষতা, সংগঠন ও কৌশল সম্পর্কে অবহিত ছিল।

বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে ঔরঙ্গজেব কঠোর ব্যবস্থা নেন। আমিন খাঁর ব্যর্থতায় ক্ষুব্ধ হয়ে ঔরঙ্গজেব আমিন খাঁর পরিবর্তে মহাবৎ খাঁ-কে চতুর্থ বারের জন্য কাবুলের শাসনকর্তা নিযুক্ত করে কাবুলে পাঠান। কিন্তু মহাবৎ খাঁ বিদ্রোহী পাঠানদের সঙ্গে সরাসরি সংঘর্ষের পরিবর্তে গোপন সমঝোতায় এলেন যে, কেউ কাউকে আক্রমণ করবে না। মহাবৎ খাঁর আপোষনীতিতে অসন্তুষ্ট হয়ে ঔরঙ্গজেব ১৬৭৩ খ্রি: সুজায়েত কাঁকে পাঠান এবং তাকে সাহায্য করার জন্য ছিলেন যশোবন্ত সিংহ। এই তিন সেনানায়কের মধ্যে পারস্পরিক ঈর্ষা ও অনৈক্য থাকায় ১৬৭৪ খ্রি: ব্যর্থতার দায় সম্রাটকে মেনে নিতে হয়। ১৬৭৪ খ্রি:

ফেব্রুয়ারী নাগাদ পাঠান আক্রমণ এবং প্রচণ্ড বর্ষণ ও বরফপাতের ফলে সুজায়েত খাঁ এবং তাঁর হাজার হাজার অনুগামী নিহত হন। পরিস্থিতি গুরুত্ব উপলব্ধি করে এবার ঔরঙ্গজেব স্বয়ং প্রচুর সমরাস্ত্রসহ বিশাল বাহিনী নিয়ে রাওয়ালপিন্ডি এবং পেশোয়ার মধ্যবর্তী হাসান আবদাল নামক স্থানে গেলেন এবং সেখানে দেড় বছর অবস্থান করে যুদ্ধ পরিচালনা করেন। ঔরঙ্গজেবের আগমনে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের পরিস্থিতির পরবর্তন ঘটে। বিদ্রোহীদের দমন করার জন্য তিনি যে শুধু একটা বিরাট সেনাদল ও গোলোন্দাজ বাহিনী ব্যবহার করেছিলেন তা নয়, কুটনীতির অস্ত্রও প্রয়োগ করেছিলেন। প্রচুর উপহার, রাজকীয় বৃত্তি এবং জায়গির প্রদান বহু গোষ্ঠীকে নিজ দলে আনেন এবং মুঘল বাহিনীতে নিয়োগের প্রলোভন দেখিয়ে উপজাতি প্রধানদের নিয়ন্ত্রিত করেন। এইভাবে অল্প সময়ের মধ্যেই ঘোরাই, ঘিলজাই, শিররানী এবং ইউসুফজাই ইত্যাদি অপেক্ষাকৃত কট্টর বিদ্রোহীদের পরাস্ত করা হয় এবং নিজস্ব গ্রাম থেকে বিতাড়িত করা হয়। ১৬৭৮ খ্রি: আমীর খাঁ কাবুলের সুবাদার নিযুক্ত হন। বিচক্ষণ আমীর খাঁ তাঁর বিশ বছরের (১৬৭৮-৯৮ খ্রি:) সুবেদারিতে আফগানিস্থানের সমস্যা অনেকটা মেটাতে সক্ষম হন। আমীর খাঁ বিদ্রোহী উপজাতি গোষ্ঠীর মনে মুঘল শাসন সম্পর্কে আস্থা ফিরিয়ে আনেন। একই সঙ্গে উপজাতিগুলির মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে তাদের দুর্বল করে দেন।

৯.২.৬ বিদ্রোহের মূল্যায়ন

উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের পাঠান উপজাতিগুলির মুঘল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়। এই ব্যর্থতার জন্য মূলত তাদের অর্ন্তবিরোধ অনেকাংশে দায়ী। পরস্পর বিবাদমান উপজাতিগুলি সম্মিলিতভাবে মুঘলদের বিরুদ্ধে কোন স্থায়ী প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারেনি। দারিদ্র জর্জরিত এই উপজাতিগুলির পক্ষে শক্তিশালী মুঘলদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করা অসম্ভব ছিল। দরিদ্র উপজাতিদের অনেকেই সম্রাট কর্তৃক উৎকোচ পেয়ে বিদ্রোহ থেকে সরে দাঁড়িয়ে ছিল। মুঘল বাহিনীর বিরুদ্ধে সাধারণ মানের অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে উপজাতিরা সাফল্য লাভ করতে পারেনি। তাছাড়া সমর বিদ্যায় উন্নত ও প্রচুর সমরাস্ত্রে সজ্জিত মুঘল বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে সফল হওয়ার জন্য যে নির্দিষ্ট লক্ষ্য, যোগ্য সংগঠন ও জাতীয়তাবোধ থাকা প্রয়োজন, উপজাতি বিদ্রোহে তা অনুপস্থিত ছিল।

তবে এই উপজাতি বিদ্রোহ ব্যর্থ হলেও এবং ঔরঙ্গজেব প্রত্যক্ষ সাফল্য লাভ পেলেও এই যুদ্ধে মুঘল সরকারকে কম মূল্য দিতে হয়নি। শুধু অর্থ ও লোকক্ষয় নয়, রাজনৈতিক দিক থেকেও মুঘল সম্রাজ্যকে প্রভুত ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছিল। যদুনাথ সরকার তাঁর *History of Aurangzeb* (৩য় খণ্ড) গন্থে বলেন যে, আফগান যুদ্ধ মুঘল অর্থনীতির পক্ষে বিপর্যয়কর ছিল, এই যুদ্ধের রাজনৈতিক প্রভাব ছিল আরও মারাত্মক। বিদ্রোহী উপজাতিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় বহু উপজাতি যোদ্ধা যেন প্রাণ দিয়েছেন, তেমনি অনেক মুঘল সৈন্য নিহত হয়েছিল। বিদ্রোহী উপজাতিদের উৎকোচ প্রদান করে তাদের বশ করতে গিয়ে সম্রাটকে যে অর্থ ব্যয় করতে হয়েছিল, তা সাম্রাজ্যের পক্ষে শুভকর হয়নি। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের বিদ্রোহী উপজাতিদের দমন করার জন্য দাক্ষিণাত্যে নিযুক্ত সর্বপেক্ষা সুদক্ষ যোদ্ধা ও সেনানায়কদের সরিয়ে এনে সীমান্তে পাঠানোয় দাক্ষিণাত্যে মুঘল শক্তি দুর্বল হয়ে পড়েছিল এবং

এর ফলে শিবাজীর পক্ষে গোলকুণ্ডা, বিজাপুর, কর্ণাটক ইত্যাদি অঞ্চলে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা সহজ হয়েছিল। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের উপজাতিদের মুঘল বিরোধী জাতীয়তাবাদী বিদ্রোহ প্রমাণ করেছিল যে আঞ্চলিক স্বাধীনতার দাবি শুধু হিন্দুদেরই ছিল না, মুসলমানদের মধ্যেও তা বিস্তৃত হয়েছিল।

৯.৩ রাজপুত নীতি

ঔরঙ্গজেবের ধর্মনীতির মতো তাঁর রাজপুত নীতি মুঘল ইতিহাসে একটি বিতর্কিত বিষয়। আকবরের সময় থেকে মুঘল রাষ্ট্রের সঙ্গে রাজপুতদের যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, ঔরঙ্গজেবের আমলে তার বিচ্যুতি ঘটে। প্রশ্ন ওঠে ঔরঙ্গজেব রাজপুতদের প্রতি অনুসৃত এতদিনকার নীতির কেন পরিবর্তন ঘটালেন? আচার্য যদুনাথ সরকার, ঈশ্বরী প্রসাদ, উলসী হেগ প্রমুখ ঐতিহাসিক মনে করেন যে, ঔরঙ্গজেব ধর্মীয় গোঁড়ামী বশতঃ আকবরের রাজপুত নীতি থেকে বিচ্যুত হয়েছিলেন। কিন্তু আতাহার আলি, জি.ডি. শর্মা, সতীশচন্দ্র প্রমুখ দেখিয়েছেন যে, শুধু ধর্মীয় গোঁড়ামীর জন্য ঔরঙ্গজেব রাজপুতদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হননি। রাজত্বের প্রথম কুড়ি বছর তিনি রাজপুতদের প্রতি পূর্বসুরিদের সহনশীল ও মৈত্রীর নীতিই অনুসরণ করেছিলেন। ধর্মীয় গোঁড়ামী কারণ হলে সিংহাসনে আরোহণের সময় থেকে রাজপুত বিরোধী নীতি তিনি গ্রহণ করতেন। ঔরঙ্গজেবের সঙ্গে রাজপুতদের সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ার কারণ হিসাবে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটকে দায়ী করা হয়।

ঔরঙ্গজেবের রাজপুতনীতি মুলতঃ মাড়ওয়ার ও মেবার রাজ্য দুটিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছিল। এই সময় মাড়ওয়ার ও মেবার ছিল রাজপুত রাজ্যগুলির মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী। মুলতঃ আকবরের অনুসৃত নীতির জন্যই মাড়ওয়ার মুঘলদের বন্ধুতে পরিণত হয়েছিল। মেবার প্রথম দিকে মুঘল কর্তৃত্বকে স্বীকার না করলেও পরে মুঘলদের মিত্রতাকে মেনে নিয়েছিল। মাড়ওয়ারের বন্ধুত্ব আর মেবারের স্বাতন্ত্রবোধ সাম্রাজ্যবাদী ঔরঙ্গজেবের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল না। তিনি এই দুটি রাজ্যকে সরাসরি মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করার সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। ঔরঙ্গজেবের ধর্মনীতি, জিজিয়া কর পুনঃপ্রবর্তন নিয়ে মেবারের রানার প্রতিবাদ ইত্যাদি নানা কারণে রাজপুতদের সঙ্গে ঔরঙ্গজেবের সম্পর্ক তিক্ত হয়ে উঠেছিল। ঔরঙ্গজেবের মারওয়াড় দখলের পেছনে পণ্ডিতরা কয়েকটি কারণ উল্লেখ করেছেন। এদের মধ্যে ছিল—প্রথমত, রাজপুতানায় মারওয়াড়ের মত একটি শক্তিশালী স্বশাসিত রাজ্যের অস্তিত্ব সম্রাটের কাছে কাম্য ছিল না। মারওয়াড়ের ভৌগোলিক অবস্থান এমনই ছিল যে, এই রাজ্যের মধ্য দিয়ে আগ্রা থেকে শিল্পসমৃদ্ধ শহর আমেদাবাদ ও কাম্বে বন্দরে যাওয়ার সংক্ষিপ্ত ও নিরাপদ রাস্তা ছিল। এহেন গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলের উপর সম্রাটের নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন ছিল। দ্বিতীয়ত, মারওয়াড়ের রাজা যশোবন্তের গতিবিধি সম্পর্কে সম্রাট সন্দিহান ছিলেন। ধর্মাটের যুদ্ধের দারার পক্ষ অবলম্বন, খানুয়ার যুদ্ধের প্রাক্কালে ঔরঙ্গজেবের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা এবং দেওরাইয়ের যুদ্ধে আবার বিশ্বাস ভঙ্গ করে ঔরঙ্গজেবকে সাহায্যদান প্রভৃতি ঘটনার প্রেক্ষাপটে যশোবন্ত সিংহ সম্রাটের আস্থা অর্জনে সক্ষম হননি। তবে যশোবন্তের প্রভাব প্রতিপত্তিকে তিনি গুরুত্ব দিতেন বলেই তাঁর সঙ্গে সরাসরি সংঘর্ষে যাননি। সম্রাট সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। যশোবন্তের মৃত্যুর পর তাঁর নাবালক পুত্রদের রাজত্বে যদি বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় এবং এই সুযোগে যদি

মারওয়াড় রাজ্যের শত্রুরা মারওয়াড় দখল করে তাহলে সাম্রাজ্যের সার্বভৌমত্ব একটা বিপদের সম্মুখীন হবে—এই ভাবনা সম্ভবত সম্রাটকে উদ্বিগ্ন করে তুলেছিল। ১৬৭৮ খ্রীঃ যশোবন্দ নিঃসন্তান অবস্থায় মারা গেলে মারওয়াড় দখলের এতদিনকার আকাঙ্খা পুরণের সুযোগ এসে গেল।

মৃত্যুকালে যশোবন্তের কোন পুত্রসন্তান ছিল না। তাঁর মৃত্যুর পর ঔরঙ্গজেব সমগ্র মারওয়াড়কে 'খালিসা'-র অর্ন্তভুক্ত করেন। কয়েকজন মারওয়াড় পণ্ডিত মনে করেন, যেহেতু যশোবন্ত ছিলেন একজন মনসবদার, সে হেতু অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যু ঘটলে তাঁর সমগ্র সম্পত্তির ওপর সম্রাটের অধিকার ছিল। এছাড়া পালোদি, পোখরান প্রভৃতি পরগনার বাবদ বেশ কিছু অর্থ বকেয়া রাজস্ব সম্রাটের প্রাপ্য ছিল। আবার যশোবন্ত ১৬৭২ খ্রি: গুজরাটে নিযুক্ত থাকার সময় রাজকোষ থেকে কিছু অর্থ অগ্রিম হিসেবে নিয়েছিলেন যা তিনি পরিশোধ করেননি। কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন যে মারওয়াড় তথা যোধপুর ছিল রাঠোরদের ওয়াতন এবং যে অর্থে মুঘল সম্রাটের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। বকেয়া অর্থ আদায়ের জন্য সম্রাট যোধপুরকে খালিসা-র অর্ন্তভুক্ত করতে চান কিন্তু যশোবন্তের প্রাধানা মহিষী রানী হাদি যোধপুর ত্যাগ করার পক্ষপাতী ছিলেন না। মেবারের রানা রাজ সিংহ এ বিষয়ে রানিকে সমর্থন করেন এবং রানির সুরক্ষার জন্য তিনি ৫০০০ অশ্বারোহী সেনাও যোধপুরে পাঠান।

পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করে ঔরঙ্গজেব ১৬৭৯ খ্রি: জানুয়ারী মাসের গোড়ায় আজমীরে উপস্থিত হলে রানি হাদি এবং তাঁর রাঠোর অনুগামীরা যোধপুর ত্যাগ করে। যোধপুর মুঘলদের অধিকারে আসে। সমস্যা জটিল আকার ধারন করে যখন মৃত রাজা যশোবন্তের দুই অন্তঃসত্ত্বা রানী দুটি পুত্র সন্তানের জন্ম দেন। যশোবেন্তের উত্তরাধিকারীদের দাবী অস্বীকার করে সম্রাট যশোবন্তের মৃত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অমর সিংহের পৌত্র ইন্দর সিংহকে ৩৬ লক্ষ টাকা পেশকাশ আদায়ের পর যোধপুরের অধিকার অর্পণ করেন। রাঠোর নেতৃবৃন্দ এর বিরোধিতা করেন। তারা চেয়েছিলেন প্রয়াত রাজার রানি ও উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের হাতে মারওয়াড়ের শাসনভার ন্যস্ত হোক। তারা রাজপুত শক্তির আশু অবক্ষয়ের চিন্তায় শঙ্কিত হয়ে ওঠে। ঔরঙ্গজেব যখন যশোবন্তের বিধবা পত্নীদের ও সদ্যজাত পুত্রদের নূরগড় দূর্গে আটক রাখার ব্যবস্থা করেন তখন রাজপুতদের শঙ্কা আরও ব্যাপক আকার নেয়, যশোবন্ত সিংহের শুভানুধ্যায়ী এবং জাতীয় আদর্শে উদ্বুদ্ধ রাঠোর সর্দারগণ অজিত সিংহের হাতে মারওয়াড় তুলে দেবার দাবী জানান, এক সংকটময় পরিস্থিতিতে রাঠোর সেনাপতি দুর্গাদাসের সহযোগিতায় যোধপুরের বিধবা রাণী ও পুত্রদের ঔরঙ্গজেবের কবল থেকে সরিয়ে এনে যোধপুরে আনা হলে রাঠোরদের মধ্যে নতুন উন্মাদনা দেখা দেয়। তারা যোধপুরে নিযুক্ত মুঘল ফৌজদার তাহির খানকে আক্রমণ করে, জয়তরণ ও সিওয়ান থেকে মুঘলদের উৎখাত করা হয়। অজিত সিংহ মারওয়াড়ের রাজা হিসেবে অভিষিক্ত হন।

ঔরঙ্গজেব রাঠোরদের দমন করার জন্য সরবুলন্দ খানের নেতৃত্বে এক কুটনৈতিক পদক্ষেপ নেন। তিনি ইন্দর সিংহকে সামনে রেখে অজিত সিংহের সঙ্গে সমঝোতার প্রক্রিয়া শুরু করেছিলেন। ইতিমধ্যে মুঘল বাহিনীর সঙ্গে রাঠোরদের যত্রতত্র যুদ্ধ চলেছিল, ঔরঙ্গজেব আজমীরে এসে উপস্থিত হন, মুঘলরা যোধপুর দখল করে নেয়। দুর্গাদাসের সঙ্গে অজিত সিংহ মেবারের রানা রাজ সিংহের আশ্রয়ে পলায়ন করেন। রাজ সিংহ কোন ভাবেই মুঘল আধিপত্য স্বীকার করতে চাননি। মেবারের ভৌগলিক পরিস্থিতির

কারণে আজমীর থেকে মালব এবং গুজরাট পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকায় মেবারের আধিপত্য ছিল স্বভাবিক। মুঘলরা মারওয়াড় দখল করলে মেবারের রানার পক্ষে মুঘল সম্পর্কে উদাসীন থাকা সম্ভব ছিল না। তাছাড়া রাজ সিংহ কয়েকটি কারণে সক্রিয়ভাবে মুঘল বিরোধিতার সিদ্ধান্ত নেন। প্রথমত, মারওয়াড় রাজা অজিত সিংহের স্ত্রী ছিলেন মেবারের শিশোদিয়া বংশের রাজকন্যা। তিনি মেবাররাজ রাজ সিংহের সাহায্য চাইলে মারওয়াড়ের এই বিপদে রাজ সিংহ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। দ্বিতীয়ত, রাজ সিংহ উপলব্ধি করেছিলেন যে মারওয়াড়ের পতন ঘটলে ঔরঙ্গজেবের আগ্রাসন থেকে মেবারও রক্ষা পাবে না। তৃতীয়ত, রাজ সিংহের কাছে জিজিয়া কর দাবী করায় ঔরঙ্গজেবের ওপর তিনি অসন্তুষ্ট ছিলেন। এই সকল কারণে রাজ সিংহ মারওয়াড়ের সমর্থনে মুর্ঘলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু যুদ্ধের প্রস্তুতি নেওয়ার আগেই হাসান আলির নেতৃত্বে মুঘল ফৌজ মেবার আক্রমণ করে। রাজধানী উদয়পুর এবং চিতোর দুর্গ মুঘলের হস্তগত হয়।

১৬৮০ খ্রি: রানা রাজ সিংহ মেবারের পূর্বেকার নীতি থেকে কিছুটা বিচ্যুত হন এবং রাঠোরদের ব্যাপারে নিরাসক্ত মনোভাব পোষণ করতে থাকেন। রাজপুতদের মধ্যে অনৈক্য উপলব্ধি করে ঔরঙ্গজেব মেবারের সঙ্গে সন্ধি করার শর্ত হিসেবে মণ্ডল, মণ্ডলগড় ও বিদনুর পরগণাগুলি আদায় করেন। রাজপুতানায় মুঘলদের অবস্থানে উন্নতি হয়নি। ১৬৮১ খ্রি: যুবরাজ আকবর বিদ্রোহ করলে দুর্গাদাস তাঁকে সমর্থন করেন। ১৬৮১ থেকে ১৬৮৬ খ্রীঃ পর্যন্ত দুর্গাদাস আকবরের সঙ্গে থাকায় মারওয়াড়ে কোন রকম বিদ্রোহ সংগঠিত হতে পারে নি। কিন্তু ১৬৮৬ খ্রি: অজিত সিংহকে নিয়ে দুর্গাদাস মারওয়াড়ে উপস্থিত হলে বেশ কয়েকটি যুদ্ধ শুরু হয় এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মুঘলরা পরাজিত হয়। কিন্তু যোধপুর কোনোভাবেই অজিত সিংহ দখল করতে পারেনি। ১৬৯৮ খ্রি: যোধপুরের ওপর নিজের দাবি ত্যাগ করায় অজিত সিংহকে মারওয়াড়ের স্বত্ব ও মনসব ফিরিয়ে দেওয়া হয়। তবে এর দ্বারা শান্তি ফিরে আসেনি। ১৭০১ এবং ১৭০৬ খ্রি: অজিত সিংহ মুঘলদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন, অন্যদিকে মেবারের রানা তাঁর হৃত পরগণাগুলি ফিরে পাওয়ার জন্য চেষ্টা করেছিলেন। ঔরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্যে ব্যস্ত থাকাকালীন মেবারের সঙ্গে অশান্তি চলেছিল।

মেবার ও মারওয়াড় ছাড়া অন্য রাজপুত রাজ্যগুলির সঙ্গে ঔরঙ্গজেবের সম্পর্ক ভালো ছিল। অম্বরের রাজা বিষান সিংহকে মথুরার ফৌজদার হিসেবে নিযুক্ত করলে বিষান সিংহ জাঠ বিদ্রোহ দমনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। একইভাবে বিকানীর, বুন্দী প্রভৃতি পরিবারগুলি সম্রাটের সঙ্গে দাক্ষিণাত্যের যুদ্ধে অংশ নেয়। তবে পূর্বেকার মুঘল-রাজপুত সম্পর্কে বজায় ছিল না।

মারওয়াড় ও মেবারের প্রতি ঔরঙ্গজেবের অনুসৃত নীতির পেছনে সম্ভবত ধর্মীয় গোঁড়ামী কাজ করেনি। ধর্মীয় উন্মাদনা মুখ্য উদ্দেশ্য হলে অম্বরের বিষান সিংহ, বিকানীরের অনুপ সিংহ প্রমুখ রাজপুত সেনাপতিদের সাহায্যে তিনি মারাঠাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় পেতেন না, রাজপুতদের সঙ্গে ঔরঙ্গজেবের সংঘর্ষকে তাঁর রাজনৈতিক অদূরদর্শিতা হিসেবে উল্লেখ করা হয়। যে রাজপুতরা একদা মুঘলের মিত্র হিসেবে একাধিক রণাঙ্গনে মুঘলদের সাহায্যে এগিয়ে এসেছে, সংকটের সময় ত্রাতার ভূমিকা বিশ্বস্ততার সঙ্গে পালন করেছে, ঔরঙ্গজেবের ভ্রান্তনীতির ফলে তারা মুঘলের চরম শত্রুতে পরিণত হয় বলে জনসন

ও গ্যারেট মনে করেন। যদুনাথ সরকারও ঔরঙ্গজেবের রাজপুত নীতিকে চূড়ান্ত রাজনৈতিক অজ্ঞতা বলে অভিহিত করে বলছেন মঘল সাম্রাজ্যের সামরিক ভিত্তি দুর্বল করার পক্ষে তা যথেষ্ট ছিল। আকবর যেখানে রাজপুত নীতির বলে সাম্রাজ্যের সঠিক শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়েছিলেন, ঔরঙ্গজেব সেখানে লোকক্ষয় ও আর্থিক ক্ষতি করে রাজপুতদের শত্রুতে পরিণত করে সাম্রাজ্যের প্রভূত অনিষ্ঠ সাধন করেছিলেন। ঈস্বরী প্রসাদ বলেন, 'A great empire and a little mind go ill-together, and Aurangzeb who was a zealous puritan turned friends into foes by his ungenerous treatment'. একই ভাবে সতীশচন্দ্রও মন্তব্য করেন যে, ঔরঙ্গজেবের সঙ্গে রাজপুতদের দ্বন্দ্বকে শুধু দুটি রাজনৈতিক শক্তির সংঘর্ষরূপে দেখা সমীচীন নয়, এই ঘটনার মধ্য দিয়ে ভারতীয় রাজনীতিতে বহুজাতি ও গোষ্ঠীর মধ্যে সমন্বয় সাধন প্রক্রিয়ার ব্যর্থতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

৯.৪ ঔরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য নীতি

ঔরঙ্গজেবের দীর্ঘ অর্দ্ধশতাব্দীব্যাপী রাজত্বের (১৬৫৮-১৭০৭ খ্রি:) অর্ধেক কাল (১৬৮১-১৭০৭ খ্রি:) কেটেছিল দাক্ষিণাত্যে। রাজত্বের প্রথমার্ধে তিনি মূলত উত্তর ভারত বা হিন্দুস্থানের সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। দাক্ষিণাত্যে সমস্যা ছিল তবে এ সমস্যা মেটানোর জন্য তাঁকে দাক্ষিণাত্যে যেতে হয়নি, প্রাদেশিক শানকর্তাদের হাতে তিনি দাক্ষিণাত্যের শাসনভার ছেড়ে দিয়েছিলেন। ঔরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য নীতি মূলত দুটি উদ্দশ্য দ্বারা গঠিত হয়েছিল। এগুলি হল—শিয়াপন্থী স্বাধীন সুলতানী রাজ্য গোলকুণ্ডা ও বিজাপুরকে সাম্রাজ্যভুক্ত করা এবং নবোত্থিত মারাঠা শক্তিকে পরাস্ত করে ঐ অঞ্চলে মুঘল স্বার্থ সুরক্ষিত করা। শাহজাহানের রাজত্বকালে সুবেদার হিসেবে ঔরঙ্গজেবকে দুবার দাক্ষিণাত্যে পাঠানো হয়েছিল এবং সেই সময়ে ঔরঙ্গজেব গোলকুণ্ডা ও বিজাপুর দখল করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু শাহজাহানের হস্তক্ষেপের ফলে ঔরঙ্গজেব তাঁর অভীষ্ঠ লক্ষ্যে পৌঁছতে পারেনি।

দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর ঔরঙ্গজেব ঐ দুটি সুলতানি রাজ্য গ্রাস করতে উদ্যত হন। একদিকে বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার স্বাধীন অবস্থান, মুঘল সম্রাটের পরিবর্তে পারস্যের শাহের প্রতি তাদের অনুগত্য জ্ঞাপন, অন্যদিকে শিবাজীর নেতৃত্বে মারাঠা জাতির উত্তরোত্তর ক্ষমতা বৃদ্ধি তাঁকে চিন্তিত করেছিল। প্রথমদিকে শিবাজীর উত্থানকে গুরুত্ব না দিলেও শিবাজী কর্তৃক আফজল খাঁকে হত্যা ও শায়েস্তা খাঁর শিবির আক্রমণ এবং বিদ্রোহী আকবরকে শিবাজীর পুত্র শম্ভুজীর দরবারে আশ্রয়দান পরিস্থিতিকে জটিল করে তোলে। দাক্ষিণাত্যের এহেন রাজনৈতিক পরিস্থিতি সিংহাসনের পক্ষে বিপজ্জনক বলে সম্রাট স্বয়ং দাক্ষিণাত্যে গিয়ে পরিস্থিতি নিজ নিয়ন্ত্রণে আনতে চেয়েছিলেন। এছাড়া বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা দখল করার পেছনে আর্থিক কারণও ছিল। এই দুটি রাজ্যের সম্পদের প্রতি সম্রাটের দৃষ্টি পড়েছিল। ঔরঙ্গজেব অনেক সময় সামরিক শক্তি নয়, উৎকোচ প্রদান ও ষড়যন্ত্র করে রাজ্য দখল করায় তাঁকে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়েছিল এবং রাজকোষে আর্থিক সংকট দেখা দিয়েছিল। ঔরঙ্গজেব গোলকুণ্ডা ও বিজাপুর থেকে আনুগত্য ও কর নিয়ে সন্তুষ্ট ছিলেন না। এই দুই রাজ্য সম্রা টকে নিয়মিতভাবে কর দিত না।

তাই আর্থিক সংকট দূর করার জন্য দাক্ষিণাত্য বিশেষ করে গোলকুণ্ডা ও বিজাপুরের প্রভূত সম্পদ গ্রাস করার জন্য দাক্ষিণাত্য অভিযানের প্রয়োজন অনুভূত হয়েছিল।

ঔরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য নীতিকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা যেতে পারে—(ক) ১৬৫৮-১৬৬৪ খ্রি: মধ্যে শিবাজীর উত্থান এবং শিবাজীকে দমন করার জন্য ঔরঙ্গজেবের মাতুল শায়েস্তা খাঁকে সুবাদার হিসেবে দাক্ষিণাত্যে প্রেরণ, (খ) ১৬৬৪-১৬৮০ খ্রি: সুবাদার রূপে মহারাজ মির্জা জয়সিংহের মুঘল সাম্রাজ্যের স্বার্থ সুরক্ষার চেষ্টা এবং (গ) ১৬৮০-১৭০৭ খ্রি: সম্রাটের দাক্ষিণাত্যে গমন এবং দক্ষিণী সমস্যার সমাধানের প্রয়াস। বিজাপুর ও গোলকুণ্ডাকে গ্রাস করতে সচেষ্ট হলেও ঔরঙ্গজেব শিবাজীর গতিরোধ করতে আগ্রহী ছিলেন না। কিন্তু ১৬৫৯ খ্রি: বিজাপুরের প্রখ্যাত সেনাপতি আফজল খাঁকে হত্যা করে উত্তর কোঙ্কণ ও কোলাপুর দখল করলে ঔরঙ্গজেব বিচলিত হয়ে পড়েন। ঔরঙ্গজেব তাঁর মাতুল শায়েস্তা খাঁকে শিবাজীকে ধ্বংস করার নির্দেশ দিয়ে দাক্ষিণাত্যের সুবাদার নিযুক্ত করে পাঠান। শায়েস্তা খাঁ পুনা ও কল্যাণ দখল করেন। শিবাজী সরাসরি সংঘর্ষে না গিয়ে কোঙ্কণে নিজ শক্তি বৃদ্ধি করেন এবং ১৬৬৩ খ্রি: এক অতর্কিত আক্রমণে শায়েস্তা খাঁর শিবির তছনছ করে দেন। ১৬৬৪ খ্রি: ১লা জানুয়ারি শিবাজী পশ্চিম ভারতের সমৃদ্ধ বন্দর সুরাট লুঠ করেন।

ঔরঙ্গজেব শায়েস্তা খাঁকে বাংলার সুবাদার করে পাঠান এবং বিশ্বস্ত সেনাপতি অম্বররাজ মীর্জা জয় সিংহকে দাক্ষিণাত্যে পাঠান শিবাজীকে দমন করার জন্য। জয় সিংহ শিবাজীর প্রতি এতদিনকার মুঘলদের প্রতি অনুসৃত নীতির বিপরীত পথে চলতে চাইলেন, কুটনীতির দ্বারা জয় সিংহ একদিকে শিবাজীকে মিত্রহীন করার চেষ্টা করলেন, অন্যদিকে সন্ধির প্রস্তাব দিলেন। জয় সিংহ একের পর এক শিবাজীর দুর্গগুলি দখল করেন। শিবাজীর পক্ষাবলম্বী বহু জায়গিরদার মুঘলদের পক্ষে যোগ দেয়। বিজাপুর মুঘল-মারাঠা সংঘর্ষে নিরপেক্ষ থাকে। মুঘল সৈন্য পুরন্দর দুর্গ অবরোধ করে মহারাষ্ট্রের বহু গ্রাম লুণ্ঠন করে। শিবাজী অনেকটা বাধ্য হয়ে জয়সিংহের সঙ্গে পুরন্দরের সন্ধি স্বাক্ষর করেন (জুন, ১৬৬৫ খ্রি:)। সন্ধির শর্তানুযায়ী শিবাজী তাঁর ৩৪টি দুর্গের মধ্যে ২৩টি মুঘলদের হাতে তুলে দেন, যার আদায়কৃত বাৎসরিক রাজস্ব ছিল প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা। শিবাজী মুঘলদের সঙ্গে মিত্রতার সম্পর্ক বজায় রাখতে স্বীকৃত হন। শিবাজীর পুত্র শম্ভুজীকে পাঁচ হাজারী মনসবদারী দেওয়ার কথা সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়। জয় সিংহের প্রস্তাবে শিবাজী মুঘলদের দরবারে যেতে রাজি হন এবং ঔরঙ্গজেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য ১৬৬৬ খ্রীঃ ১২ই মে আগ্রায় যান। জয় সিংহ শিবাজীকে যোগ্য সম্মান দেওয়ার জন্য সম্রাটকে অনুরোধ করলেও সম্রাট শিবাজী ও তার পুত্র শম্ভুজীকে আগ্রা দুর্গে বন্দী করেন। মীর বক্সী আমিন খাঁর সাহায্যে শিবাজী মুঘল কারাগার থেকে সপুত্র পালিয়ে যান (১৯শে আগষ্ট, ১৬৬৬ খ্রীঃ) এবং মহারাষ্ট্রে ফিরে যান। পরবর্তী তিন বছর শিবাজী মুঘলদের সঙ্গে কোনো রকম প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে না গিয়ে নিজ শক্তি বৃদ্ধি করতে আত্মনিয়োগ করেন।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে পাঠানদের বিদ্রোহে ব্যস্ত ঔরঙ্গজেব ১৬৬৮ খ্রি: শিবাজীকে 'রাজা' উপাধিতে ভূষিত করে তাঁকে সংযত করার চেষ্টা করেন। কিন্তু শিবাজী সাময়িক যুদ্ধ বিরতির পর সিংহগড়, কল্যাণ ও উত্তর কোঙ্কণের কিছু অঞ্চল দখল করেন; কোঙ্কণ থেকে মুঘল সুবাদারকে বিতাড়িত করা হয়।

দাক্ষিণাত্যের মুঘল সুবাদার শাহ আলম এবং সেনাপতি দিলীর খাঁর মতান্তরের সুযোগ নিয়ে শিবাজী একের পর এক মুঘল শিবির জ্বালিয়ে দেন এবং ১৬৭০ খ্রীঃ দ্বিতীয়বার সুরাট লুণ্ঠন করেন। মারাঠা আক্রমণে বিদ্ধস্ত হয় ঔরঙ্গাবাদ, বাগলানা, খান্দেশ, বেরার, এবং সালার দুর্গ। বিজাপুরের সুলতান দ্বিতীয় আদিল শাহের মৃত্যু হলে (১৬৭২ খ্রীঃ) বিজাপুরে যে নৈরাজ্য চলেছিল, দাক্ষিণাত্য থেকে দক্ষ সেনাপতিদের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে বিদ্রোহী আফগানদের দমন করার জন্য নিয়ে যাওয়ায় মুঘলদের যে আপাত সামরিক দুর্বলতা দেখা দিল, তার সুযোগ নিয়ে শিবাজী বহু স্থান দখলই করেননি, সুরাটের জওহর, রামনগর ইত্যাদি থেকে চৌথ পর্যন্ত আদায় করেন। ১৬৭৪ খ্রীঃ রায়গড়ে রাজ্যাভিষেকের পর শিবাজী 'ছত্রপতি' উপাধি নিয়ে মহারাষ্ট্রের সিংহাসনে আরোহন করলে মহারাষ্ট্রের সমুদ্র উপকুল দখলে রাখার জন্য পোণ্ডা ও কারবার অধিকার করেন। গোলকুন্ডার সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়ে শিবাজী জিঞ্জি, ভেলোর, কর্ণাটকের ও মহীশুরের এক বিরাট অঞ্চল দখল করেন। ১৬৮০ খ্রি: শিবাজীর মৃত্যু হয়। আমৃত্যু এই মারাঠা বীরের গতি প্রকৃত অর্থে সম্রাট রোধ করতে সক্ষম হননি।

১৬৮০ খ্রি: অবস্থার আমুল পরিবর্তন হতে থাকে। বিদ্রোহী পুত্র আকবরের পিছু ধাওয়া করে ঔরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্যে এসে উপস্থিত হন। তিনি প্রথমে শিবাজীর রাজ্য দখলের চেষ্টা করে সফল হননি। আবার মারাঠাদের বিপক্ষে দক্ষিণী রাজ্যগুলিকে স্বপক্ষে আনতেও ব্যর্থ হন। পাশাপাশি মারাঠাদের সাহায্য নিয়ে বিজাপুর ও গোলকুন্ডাও অধিকার করতেও পারেনি। এছাড়া একদিকে মুঘল অভিজাতদের মধ্যে দলাদলি এবং জায়গির নিয়ে সমস্যা এবং অপরদিকে দীর্ঘকালীন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি এই দুই সমস্যা ঔরঙ্গজেবকে বিব্রত করেছিল।

১৬৮৪ খ্রি: নাগাদ ঔরঙ্গজেব সিদ্ধান্ত নেন দক্ষিণী রাজ্য দখল করার। এই সময় অবশ্য মারাঠাদের সেরকম শক্তি ছিল না যার দ্বারা মুঘলদের নতুন করে আক্রমণ করতে পারে। এই সুযোগে ওরঙ্গজেব একই সঙ্গে বিজাপুর ও গোলকুন্ডা অবরোধ করেন যা ছিল দীর্ঘকালীন। এই সময় গোলকুণ্ডার অভ্যন্তরীণ কলহ চরমে পৌঁছায়। হিন্দু মদান্না ও অখন্নার উত্থানে বহু অভিজাত ঈর্ষান্বিত হয়। ব্রাহ্মণদের প্রতিপত্তি বৃদ্ধিতে গোলকুণ্ডা রাজ্যের অভিজাতরা ইসলাম রক্ষার প্রয়োজনে ঔরঙ্গজেবের শরণাপন্ন হন। ঔরঙ্গজেব গোলকুণ্ডার সুলতানের কাছে ইসলামকে অবমাননা করার জন্য হুমকি দেন এবং গোলকুণ্ডা অধিকার করার জন্য প্রস্তুত হন। কিন্তু একটি ইসলামীয় রাজ্যকে আক্রমণ উচিত কিনা-এ নিয়ে মুঘল পক্ষে ঐক্য ছিল না। ঔরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্যে নিজের অবস্থান সুনিশ্চিত করার জন্য দক্ষিণী ও মারাঠাদের ব্যাপকভাবে মনসব প্রদান করেন। কিন্তু এই মনসবদারদের দেওয়ার জন্য জায়গির তাঁর হাতে ছিল না। বিপুল ঘাটতি পুরণের জন্য তিনি বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা জয় করতে সচেষ্ট হন।

ঔরঙ্গজেব অত্যন্ত কৌশলে মারাঠা রাজ্যের সঙ্গে বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার যাবতীয় যোগাযোগ বন্ধ করে দেন। পাশাপাশ তিনি সিদ্দি এবং পর্তুগিজদেরও মারাঠাদের শত্রুতে পরিণত করেন। মুঘল বাহিনীর আক্রমণে মারাঠাদের পরাজয় হল এবং ১৬৮৯ খ্রি: শম্ভুজী বন্দি অবস্থায় নিহত হন। ঔরঙ্গজেব নতুন উদ্যমে মারাঠাদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। শম্ভুজীর নৃশংস হত্যাকান্ড মারাঠা সর্দারদের মনে ভীতির পরিবর্তে প্রতিশোধ স্পৃহা দৃঢ় করে। রাজারামের নেতৃত্বে জিঞ্জির দুর্ভেদ্য দুর্গে মারাঠা সর্দাররা সমবেত হয়। দীর্ঘ

আট বছর অবরোধের পরে জিঞ্জি মুঘলদের হস্তগত হয় (১৬৯৮ খ্রি:) এর পর সাতারাকে কেন্দ্র করে রাজারাম মুঘলদের বিরোধিতা চালাতে থাকেন। ১৭০০ খ্রি: সাতারা ঔরঙ্গজেবের দখলে আসে। এই বছর রাজারাম মারা গেলে তাঁর পুত্র তৃতীয় শিবাজীর অভিভাবিকা হিসেবে তাঁর পত্নী তারাবাঈকে মুঘলদের বিরুদ্ধে মারাঠাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। মুঘলদের বিরুদ্ধে মারাঠা জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করেন। সামরিক ও সাধারণ প্রশাসন উভয়ক্ষেত্রেই তারাবাঈ মৌলিক প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন। ১৭০৭ খ্রি: ৩রা মার্চ ঔরঙ্গজেব শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। জীবদ্দশায় তিনি মারাঠা শক্তির চূড়ান্ত পরাজয় দেখে যেতে পারেননি।

৯.৪.১ ঔরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য নীতির মূল্যায়ন

ঔরঙ্গজেবর বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার বিলুপ্তি সাধনের যৌক্তিকতা নিয়ে বিতর্ক আছে। ভিনসেন্ট স্মিথ, এলফিনস্টোন প্রমুখ ঐতিহাসিক মনে করেন যে এই দুটি রাজ্যের বিলোপ ঘটিয়ে ঔরঙ্গজেব অদুরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিলেন। তাদের মতে বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা ছিল উদীয়মান মারাঠা শক্তির অগ্রগতির পক্ষে বাধা স্বরূপ। সেই বাধা অপসারিত করে সম্রাট মারাঠাদের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা বৃদ্ধির সুযোগ করে দেন ফলে ক্ষুণ্ণ হয় সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা। অন্যদিকে যদুনাথ সরকার, কালিকিঙ্কর দত্ত প্রমুখ ভিন্ন মত পোষণ করেন। যদুনাথ সরকার বলেন, মুঘলদের সঙ্গে বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার মিত্রতা ছিল অসম্ভব। মুঘল সাম্রাজ্যবাদী নীতির সঙ্গে এই রাজ্য দুটির স্বাধীন সত্তার সামঞ্জস্য বিধান করা সম্ভব ছিল না। এছাড়া বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার মত ক্ষয়িষ্ণু এই দুই রাজ্যের পক্ষে জাতীয় চেতনায় উদ্ভুদ্ধ মারাঠাদের প্রতিহত করা ছিল অসম্ভব। সতীশচন্দ্রের মন্তব্য হল যে, জায়গিরদারি সংকট থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ঔরঙ্গজেব এই দুটি শিয়া রাজ্য দখল করে রাজ্যগুলিকে খালিসা জমিতে পরিণত করে মনসবদারদের কিছু জমি জায়গির দেবার কথা ভেবেছিলেন। মধ্যযুগের ভারতে ঔরঙ্গজেবই প্রথম শাসক যিনি দাক্ষিণাত্যের প্রায় সমগ্র আঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করে এক বিশাল সাম্রাজ্যের অধিশ্বর হন। আপাত দৃষ্টিতে ঔরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য নীতি সাফল্য লাভ করলেও মুঘল সাম্রাজ্যের ক্ষেত্রে তার ফল হয়েছিল সুদুরপ্রসারী। দাক্ষিণাত্যে সফল অভিযানের ফলে মুঘল শাসনের ওপর যে প্রশাসনিক দায়িত্বভার এসে পড়ল, তা বহন করার ক্ষমতা বয়োবৃদ্ধ রণক্লান্ত সম্রাটের ছিল না। ঐ বিশাল সাম্রাজ্যকে টিকিয়ে রাখার মত প্রশাসনিক শৃঙ্খলা ও আর্থিক সঙ্গতি সম্রাটের ছিল না বা এমন কোন যোগ্য উত্তরসুরি ছিল না যে সম্রাটের মৃতুর পরে ঐ সাম্রাজ্যের হাল ধরতে পারেন। ১৬৮১ থেকে ১৭০৭ খ্রি: এই দীর্ঘকাল দক্ষ প্রশাসক ও সৈন্য নিয়ে দাক্ষিণাত্য অবস্থানের ফলে উত্তর ভারতে রাজনীতিতে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছিল, তা ধীরে ধীরে নিংড়ে নিল মুঘল শাসনের প্রশাসনিক শক্তিকে। কেন্দ্রীয় শাসনের দুর্বলতার সুযোগে উচ্চাকাঙ্খী ও অর্থলোভী আমীর ওমরাহ ও ভুস্বামীরা মুঘল কর্তৃত্বকে অস্বীকার করে নিজেদের কর্তৃত্ব জাহির করার চেষ্টা করে। আফগান, জাঠ, শিখ ও রাজপুতরা কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। দাক্ষিণাত্য থেকে এই সব বিদ্রোহ দমন করা সম্রাটের পক্ষে ছিল অসম্ভব। স্মিথের ভাষায়, 'The Decan was the grave of his body as well as of his empire'.

ঔরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য নীতির আর্থিক ফলাফল ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই অভিযানের ফলে সাম্রাজ্যের সর্বত্র ব্যবসা-বাণিজ্য ও কৃষিকার্যে বিপর্যয় দেখা দিল। বিরামহীন যুদ্ধের ফলে রাজকোষ

নিঃশেষ হল। দাক্ষিণাত্য থেকে আয়ের পথ বন্ধ হয়ে গেলে ঔরঙ্গজেবকে তাঁর অভিযানের জন্য উত্তর ভারত থেকে অর্থ সংগ্রহ করতে হল। চরম আর্থিক সংকটের সময় বাংলার শাসক মুর্শিদকুলী খানের প্রেরিত অর্থই ছিল সম্রাটের এক মাত্র ভরসা। ঔরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য অভিযানের অন্যতম কারণ ছিল জায়গিরদারি সংকটের দূরীকরণ। কিন্তু মনসবদারদের সংখ্যা বৃদ্ধি এই সংকটকে আরও তীব্র করে তুলল। তাছাড়া দক্ষিণী অভিজাতরা দক্ষিণের নিম্ন মানের এবং অনুর্বর জায়গির পেয়ে আদৌ সন্তুষ্ট হননি। উপরন্তু বর্গীর হাঙ্গামা, মারাঠাগণ কর্তৃক জোরপূর্বক 'চৌথ' ও 'সরদেশমুখী' আদায়ের ফলে জায়গিরের আয় আরও হ্রাস পেল। তাই তারা উত্তর ভারতের লাভজনক উর্বর জায়গিরের দাবি করল। যদুনাথ সরকার ফরাসী সম্রাট নেপোলিয়ন বোনাপার্টের রাজনৈতিক জীবন ধারার সঙ্গে ঔরঙ্গজেবের জীবনের পরিণতি মিল খুঁজে পেয়েছেন। তিনি লিখেছেন, 'স্পেনীয় ক্ষত' যেমন নেপোলিয়নের সর্বনাশের কারণ হয়েছিল, তেমনি 'দাক্ষিণাত্য ক্ষত'-ও ঔরঙ্গজেবের সর্বনাশের অন্যতম কারণ।

৯.৫ উপসংহার

সম্রাট আকবরের সময় থেকে মুঘল সাম্রাজ্যের যে রাজনৈতিক সামারিক বিস্তার শুরু হয়েছিল, ঔরঙ্গজেবের আমলে তা সর্ব্বোচ্চ সীমায় উপনীত হয়। সমগ্র ভারতে মুঘল আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু ১৭০৭ সালে ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর মুঘল সাম্রাজ্যের সঙ্কোচন শুরু হয়। নিশ্চিতভাবে বলা যায় এর সম্পূর্ণ দায়িত্ব ঔরঙ্গজেবের না হলেও আংশিক দায়ভার তাঁর উপর বর্তায়। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে উপজাতি বিদ্রোহ, রাজপুত শক্তিবর্গের সঙ্গে ঔরঙ্গজেবের সম্পর্কে সমস্যা, এবং দক্ষিণে বিদ্রোহী মারাঠা শক্তির উত্থান ঔরঙ্গজেবের জীবৎকালেই দীর্ঘমেয়াদি ভিত্তিতে সাম্রাজ্যের ক্ষতি করেছিল। আকবরের সময় রাজপুত শক্তি ছিল মুঘলদের সবচাইতে বিশ্বস্ত মিত্র। ঔরঙ্গজেবের সময় তাঁর ভ্রান্ত নীতির কারণে তা ক্ষতিগ্রস্থ হয়। শিবাজির নেতৃত্বে মারাঠা বিদ্রোহ তিনি দমন করতে পারেননি। মারাঠা শক্তির সামরিক বিস্তারেই অর্থ ছিল মুঘল কর্তৃত্বের সঙ্কোচন। এর সঙ্গে যুক্ত ছিল জমা-হাসিলের সমস্যা, অভিজাত গোষ্ঠীগুলির দলাদলি, জায়গিরদারি সঙ্কট ইত্যাদি। ১৭০৭ এর পর মুঘল শক্তির এই সঙ্কট প্রকাশ সম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত হয় এবং পতনের সুনিশ্চিত হয়। ১৭৫০ এর পর মুঘল শক্তি নামমাত্র রূপ ধারণ করে। এর কারণগুলি লুকিয়ে ছিল ১৭০৭ এর আগের মুঘল সাম্রাজ্যিক নীতির মধ্যে।

৯.৬ প্রশ্নাবলী

১. ঔরঙ্গজেবের উত্তর-পূর্ব এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত নীতির পর্যালোচনা করুন।
২. ঔরঙ্গজেবের রাজপুত নীতির মূল্যায়ন করুন।
৩. ঔরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য নীতি আলোচনা করুন। আপনি কি মনে করেন বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা এই দুটি রাজ্যকে মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে তিনি রাজনৈতিক অদূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিলেন?
৪. ঔরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য নীতির মূল্যায়ন করুন।

৯.৭ গ্রন্থপঞ্জি

- Chandra Satish–*Parties and Politics at the Mughal Court,* 1707-1740, 4th Edition.
- Claude Markovit (ed.)–*A History of Modern India 1480-1950,* London, 2004
- Sarkar J.N.– *History of Aurangzeb, 5 vol.* Kolkata, 1928
- Srivastava A.L.–*The Mughal Empire 1526-1803,* Agra, 1952
- Truschke Audrey–*Aurangzab: The Life and Legacy of Indias Most Controversial King*. Stanford University Press, 2017

—

একক ১০ ❑ সংকটের সূচনা: ঐতিহাসিক বিতর্ক

গঠন

১০.০ উদ্দেশ্য

১০.১ ভূমিকা

১০.২ মুঘল সংকটের প্রকৃতি : ঐতিহাসিক পর্যালোচনা

১০.৩ দাক্ষিণাত্য সমস্যা

১০.৪ উপসংহার

১০.৫ প্রশ্নাবলী

১০.৬ গ্রন্থপঞ্জি

১০.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠের মধ্য দিয়ে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলি আপনারা জানতে পারবেন :

- মুঘল সম্রাজ্যের সংকট কীভাবে সৃষ্টি হল এবং তার প্রকৃতি কী ছিল
- মুঘল সংকট সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের দৃষ্টিভঙ্গি, মতামত এবং বিতর্ক।
- মুঘল শক্তির দাক্ষিণাত্য সমস্যা

১০.১ ভূমিকা

মুঘল সাম্রাজ্যর সংকট সম্পর্কিত আলোচনায় এই সাম্রাজ্যের ভাঙন এবং সাম্রাজ্যিক ব্যবস্থায় ভাঙনের সময়কাল নিয়ে উইলিয়াম আরভিন এবং যদুনাথ সরকারের সময় থেকে ঐতিহাসিকরা তাদের মতামত ব্যক্ত করেছেন। ১৯৮০-র দশকে অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে মুঘল সাম্রাজ্যের সংকট প্রসঙ্গে আলোচনায় অর্থনৈতিক কারণকে গুরুত্ব দিয়ে কৃষি উৎপাদনজনিত সমস্যা এবং কৃষক অসন্তোষের বিষটিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। ইরফান হাবিব তাঁর *The Agrarian System of Mughal India* গ্রন্থে এই বিষয়টির উপর আলোকপাত করেছেন। আবার ঔরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য বিজয়ের পর জায়গির সংকট, মনসবদারদের উচ্চাকাঙ্খা, সম্রাটদের প্রতি আনুগত্যের অভাব ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আথার আলি সতীশচন্দ্র প্রমুখ আলোচনা করেছেন। এছাড়া মুঘল শাসকদের কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের অবক্ষয়, আঞ্চলিক শক্তির উত্থানজনিত অস্থিরতা সংকটের কারণ হিসেবে ঐতিহাসিকদের আলোচনায় স্থান পেয়েছে।

১০.২ মুঘল সংকটের প্রকৃতি : ঐতিহাসিক পর্যালোচনা

সপ্তদশ শতকের প্রথমার্ধে দিল্লী ছিল মুঘল সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক কেন্দ্রবিন্দু। একে ঘিরে মুঘল

সাম্রাজ্য উত্তরে কাবুল থেকে আসাম এবং দক্ষিণে সমুদ্রের উপকুলভাগ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কিন্তু পরবর্তী পঞ্চাশ বছরের মধ্যে এই বিশল সাম্রাজ্য অতীতের ছায়ামাত্রে পরিণত হয়। উইলিয়াম আরভিন এবং যদুনাথ সরকার ভারতীয় সমাজের নৈতিক অধঃপতনকে এই অবক্ষয়ের জন্য দায়ী করেছেন। এই অধঃপতন সামরিক, প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক ব্যর্থতার পর্যবসিত হয়েছিল। রাজতন্ত্র ছিল দুর্বল, অভিজাতরা স্বার্থপর ও সংকীর্ণমনা। দুর্নীতি, অদক্ষতা ও নৈরাজ্যের মধ্যে ভারতবর্ষের সাহিত্য, শিল্প, এমনকি সত্য ধর্ম-ও ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। যদুনাথ সরকার তাঁর *History of Auranzeb* গ্রন্থে বলেন যে ঔরঙ্গজেবের শরিয়া নির্ভর রাষ্ট্র গড়ার প্রয়াসের বিরুদ্ধে হিন্দু প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। সম্রাটের অসহিষ্ণুতা, হিন্দু মন্দিরের ওপর আক্রমণ, হিন্দুদের ওপর জিজিয়া কর আরোপ ও অন্যান্য বিধিনিষেধ স্থাপন দেশের মধ্যে বিভেদ ও অশান্তি সৃষ্টি করেছিল। ধীরে ধীরে সাম্রাজিক ঐক্য ও সংহতিতে ফাটল ধরেছিল। জীবনের শেষ পঁচিশ বছর তিনি দাক্ষিণাত্যের শিয়া রাজ্য দুটি বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা এবং মারাঠাদের দমনে ব্যস্ত ছিলেন। তিনি মারাঠা দমন করতে ব্যর্থ হন। তাঁর অনুদার ও একদেশদর্শী রাষ্ট্রনীতি রাজপুত, জাঠ, শিখ, বুন্দেলা ও সৎনামীদের মুঘল সাম্রাজ্যের শত্রুতে পরিণত করে। দাক্ষিণাত্যের সাম্রাজ্যকে প্রসারিত করার লক্ষ্যে মারাঠাদের সঙ্গে ঔরঙ্গজেবের বিরোধ তীব্র আকার ধারণ করে। বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা জয় করেও ঐক্য স্থাপনের কাজ সম্পন্ন করা যায়নি। একইভাবে রাজপুতানায় কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব সুদৃঢ় করতে গিয়ে ঔরঙ্গজেব রাজপুতদের মতো দীর্ঘদিনের মিত্রদের শত্রুতে পরিণত করেন। অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদের ভিত্তি যে আঞ্চলিক শাসকবর্গ ও স্বার্থগোষ্ঠীর সহযোগিতা ও শুভেচ্ছার ওপর অনেকাংশে দাঁড়িয়ে ছিল, সেই কাঠামোটি দুর্বল হয়ে পড়ে। বার্নাড এস. কোহন এই আঞ্চলিক ও স্থানীয় শক্তিগুলির প্রভাব নিয়ে আলোচনা করেছেন। যদুনাথ সরকার ছাড়া অপর কয়েকজন ঐতিহাসিক যেমন এস. আর শর্মা *The Religious Policy of the Mughal Emperors,* ঈশ্বরী প্রসাদ, *The Mughal Empire,* জগদীশ নারায়ণ সরকার, *A Study of Eighteetnth Centuryn India* গ্রন্থে ঔরঙ্গজেবের অনুদার ধর্মীয় নীতির ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। তবে মুঘল সংকটকে শুধুমাত্র হিন্দু প্রতিক্রিয়া হিসেবে ব্যক্ত করা সমীচীন হবে না। মুসলমান অভিজাত এবং রাজ কর্মচারীদের মধ্যেও অসন্তোষ ছিল।

অষ্টাদশ শতকে মুঘল সাম্রাজ্যের অবক্ষয়ের কারণ খুঁজতে গিয়ে সতীশচন্দ্র তাঁর *The Parties and Politics at the Mughal Court, 1707-40* গ্রন্থে শাসনব্যবস্থার সংগঠনিক ত্রুটির কথা উল্লেখ করেছেন। মুঘল রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও আমলাতন্ত্রের বিষয়টি ছিল গুরুত্বপূর্ণ। মনসব এবং জায়গির ব্যবস্থা ছিল মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তি। ইরফান হাবিবও মনে করেন, মুঘল রাষ্ট্রব্যবস্থায় এককেন্দ্রিক স্বৈরাচার সুসংবদ্ধ ছিল। সারা রাজ্যের উপর সম্রাটের প্রশ্নহীন নিয়ন্ত্রণ ছিল। সম্রাট আকবরের আমলে সম্রাটের কেন্দ্রভূত শাসন ছিল যথেষ্ঠ শক্তিশালী এবং জাহাঙ্গিরের শাসনকালের মাঝামাঝি পর্যন্ত তা সক্রিয় ছিল। মনসবদারদের নিয়োগ, পদোন্নতি জায়গির বণ্টন ইত্যাদি ছিল সম্রাটের নিয়ন্ত্রণাধীন। মনসবদারদের কর্মক্ষেত্র, এবং জায়গির পরিবর্তনের মাধ্যমে সম্রাট তাঁর কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ সচল রাখতে পেরেছিলেন। ডগলাস স্ট্রাউস্যান্ড মনে করেন, মুঘল সাম্রাজ্য ছিল সম্রাট এবং মনসবদারদের মধ্যে এক ধরনের সমঝোতার ফসল। স্টিফেন ব্ল্যাক-এর অভিমত হল, আকবর মনসবদারদের মর্যাদা ও অধিকার স্বীকার করে নেওয়ায় তিনি তাদের আনুগত্য অর্জনে সক্ষম হয়েছিলেন। আকবর উপলব্ধি করেছিলেন যে অতিরিক্ত কঠোরতা এবং অতি সামান্য নিয়ন্ত্রণ তাঁর শাসনকে সংকটময় করতে পার। ঔরঙ্গজেবের সময় জায়গির ব্যবস্থায়

নানা সংকট দেখা দেয়। তাঁর রাজত্বের শেষের দিকে এই ব্যবস্থায় সংকট স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে কেন্দ্রীভূত আমলাতন্ত্র সাম্রাজ্যকে এত আয়ু দিয়েছিল, সেই ব্যবস্থায় দুর্বলতা দেখা দিল। জায়গিরদারদের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং সেই অনুপাতে জায়গিরের সংখ্যা বৃদ্ধি না পাওয়ার ফলে জায়গিদারি সংকটের মৌল সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হয়নি। আবার মুঘল অভিজাতদের বিশেষ কোন জাতি চরিত্র ছিল না। মনসবদারদের মধ্যে ইরানি, তুরানি, আফগান প্রভৃতি বহির্ভারতীয় অভিজাতদের পাশাপাশি ছিল মুসলমান ও হিন্দু। হিন্দুদের মধ্যে অবশ্য আকবরের রাজত্বকালে মূলত রাজপুত এবং ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালে মারাঠারাই ছিল। আবার মুসলমানদের মধ্যে সুন্নিদের প্রধান্য থাকলেও শিয়াদের সংখ্যা কম ছিল না। ঔরঙ্গজেব বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা জয়ের তাগিদে ঐ দুই অঞ্চলের বেশ কিছু অভিজাতকে মনসব প্রদান করায় মুঘল অভিজাতদের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি হয়। হিন্দুস্তানী ও দক্ষিণী এই দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ায় আমলাতন্ত্র দুর্বল হয়ে পড়ে এবং যোগ্য শাসকের অভাবে জায়গিদারি ব্যবস্থায় সংকট তরান্বিত হয়। বস্তুত মুঘল সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব ও অস্তিত্ব নির্ভরশীল ছিল সম্রাটের ব্যক্তিত্ব ও দক্ষতার উপর। সম্রাট তাঁর দক্ষতা ও ব্যক্তিত্ব দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠী-স্বার্থ দ্বারা পরচালিত কর্মচারী, সম্প্রদায়কে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারতেন বা রাষ্ট্রের স্বার্থে যথাযথভাবে ব্যবহার করতে পারতেন। কিন্তু সম্রাট দুর্বল হয়ে পড়লে এ কাজ করা তাঁর পক্ষে দুরুহ হয়ে ওঠে এবং সেক্ষেত্রে অভিজাত সম্প্রদায় নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ও ক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্য রাষ্ট্রের স্বার্থ বিসর্জন দিতে ইতস্ততঃ করেনি।

ইরফান হাবিব তাঁর *The Agrarian System of Mughal India* গ্রন্থে এই সংকটের কারণ হিসেবে কৃষক অসন্তোষকে দায়ী করেছেন। সপ্তদশ শতকের শেষ দিকে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে কৃষক বিদ্রেহগুলি জমিদারদের নেতৃত্বে ঘটতে থাকে। জমিদারদের মাধ্যমে রাজস্ব আদায় হত। ইরফান হাবিব মন্তব্য করেছেন যে, মুঘল ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থায় এক ধরনের সমঝোতা পরিলক্ষিত হয়েছিল। কৃষক রাজস্ব প্রদান করার পর ও নিজের পরিবারের ভরণপোষণ ও চাষের বীজ ও কৃষি সরঞ্জাম ইত্যাদির ব্যবস্থা করতে পারত। একই সঙ্গে স্থানীয় জমিদারেরও ভরণপোষণ চলত। কিন্তু জায়গিরদারি সংকট বা জায়গিরদারদের উৎপীড়ন বৃদ্ধি পেলে পূর্বের চেহারায় যেমন কৃষককে পাওয়া গেল না, তেমনি গ্রামীণ পরিবেশও পরিবর্তন দেখা দিল। জমিদারেরা যেমন উত্তরোত্তর রাজস্ব জমা দিতে অনীহা প্রকাশ করল, তেমনি প্রাদশিক শাসনকর্তারা কেন্দ্রীয় কোষাগারের প্রপ্য অর্থ দিতে সম্মত হল না। ইরফান হাবিব মনে করেন যে, আকবরের রাজত্বকাল থেকে রাজস্ব আদায়ের এক কঠোর ধারাবাহিকতা বজায় রাখা সম্ভব হয়েছিল। এর ফলে আঞ্চলিক স্তরে যেমন জমিদারের তেমনি কেন্দ্রীয় স্তরে জায়গিরদারদের শোষণ করা সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তিত পরিস্থিতিতে জায়গিরদারদের শোষণ এতটাই বেশি ছিল যে তার প্রভাব অনেক গভীরে অনুভূত হয়। মুজফ্ফর আলম দেখিয়েছেন যে অষ্টাদশ শতকের শুরু থেকেই রাজস্ব আদায়ের সংকট ঘনীভূত হতে থাকায় জায়গিরদাররা ক্রমবর্দ্ধমান হারে তাদের জায়গির ইজারা দিতে থাকে। এর ফলে শোষণের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। ইরফান হাবিব বলেন, কৃষকের ওপর রাজস্বের বোঝা মারাত্মক হওয়ায় কৃষক চাষাবাদ ছেড়ে পলায়ন করে নতুবা বিদ্রোহ করে। অধিকাংশ বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেয় স্থানীয় জমিদাররা। এভাবে সাম্রাজ্যের দীর্ঘদিনের স্বার্থগোষ্ঠীগুলির মধ্যে বোঝাপড়ার পরিবেশ নষ্ট হয়।

মুঘল রাষ্ট্রের আন্যতম সাফল্য হল সাধারণভাবে তার এক ধর্মনিরপেক্ষ চেহারা। এক্ষেত্রে আকবরের ভূমিকা অনন্য। ঔরঙ্গজেব নিজের ক্ষমতা ও বিবেচনাবোধ সম্পর্কে অগাধ আস্থা নিয়েই সম্রাট হয়েছিলেন। কিন্তু নানা মতাবলম্বীদের নিয়ে গঠিত সাম্রাজ্যের স্থায়ীত্বের জন্য যে নমনীয়তার প্রয়োজন ঔরঙ্গজেবের তা বিশেষ ছিল না। আবুল ফজল জানিয়েছেন যে আকবর আগ্রাসী আক্রমণকারী ছিলেন না। তাঁর সাম্রাজ্যবাদী নীতির একটি নৈতিক ভিত্তি ছিল। আকবর মনে করেছিলেন যে মুঘল সাম্রাজ্য হল সহনশীলতা, ন্যায় ও সাম্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। আকবর প্রতিষ্ঠিত মুঘল সাম্রাজ্যের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হল রাজপুতদের সঙ্গে বিশেষ ধরনের সম্পর্ক। রাজপুতদের শৌর্য, প্রশাসনিক দক্ষতা, আনুগত্য, সেবা ও বিশ্বস্ততা হল আকবরের রাজপুত নীতির ভিত্তি। রাজপুত শাসকরা সাম্রাজ্যের সেবায় মনোনিবেশ করেছিল।

আকবরের সময় থেকে মুঘল রাষ্ট্রের সঙ্গে রাজপুতদের যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, ঔরঙ্গজেবের সময় তার অবনতি ঘটে। রাজত্বের প্রথম দিকে ঔরঙ্গজেবের সঙ্গে রাজপুতদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় ছিল। ১৬৫৮-১৬৬৭ খ্রি: পর্যন্ত সময়কালে রাজপুতরা মুঘল দরবারে সম্মান ও মর্যাদা পেয়েছিলেন। কিন্তু রাজপুতদের সঙ্গে ঔরঙ্গজেবের সম্পর্ক ধীরে ধীরে অবনতি হয়। ১৬৬০ খ্রি: মেবারের রানা জয় সিংহ কিষেনগড় অভিযান করে সেখানকার রাজকুমারীকে বিবাহ করলে ঔরঙ্গজেব ক্ষুব্ধ হন। মেবারের প্রতি তাঁর পূর্বেকার সম্পর্ক বজায় ছিল না। আবার ১৬৬২ খ্রি: পুনায় শায়েস্তা খানের শিবির আক্রমণের জন্য পরোক্ষে মাড়ওয়ারের যশোবন্তকে এবং ১৬৬৬ খ্রি: আগ্রা থেকে শিবাজীকে পালানোর জন্য অম্বরের জয় সিংহের পুত্র রাম সিংহকে ঔরঙ্গজেব দায়ী করেছিলেন। ১৬৬৬-১৬৬৭ খ্রি: মধ্যে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহ দেখা দেওয়ায় ঔরঙ্গজেব বিব্রত হয়ে পড়েন। শিবাজীর উত্থান, সৎনামী ও আফগান বিদ্রোহ মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তি দুর্বল করে দেয়। এই সময়ে তিনি রাজপুতদের কেন্দ্র থেকে দূরে বাংলা ও আসাম অভিযানে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। রাম সিংহকে বাংলা ও আসাম অভিযানে নিযুক্ত করা হয়। ১৬৭১ খ্রি: উত্তর পশ্চিমে অশান্তি দেখা দিলে যশোবন্ত সিংহকে সেখানে পাঠানো হয়। কিন্তু এই অভিযানে যশোবন্ত সিংহের পূর্বেকার মর্যাদা বজায় রাখা হয়নি। সম্ভবত শিবাজীর পলায়নের ঘটনা ও দাক্ষিণাত্যে বিপর্যয়ের জন্য অম্বর ও যোধপুরের পরিবারকে দায়ী করেছিলেন এবং রাজপুতদের প্রতি পূর্বেকার সুসম্পর্ক বজায় রাখেনি। সতীশচন্দ্র লিখেছেন যে, ১৬৭৬ খ্রি: পর ঔরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্যে আগ্রাসী নীতি আনুসরণ করার সময়ে রাজপুতদের নিয়োজিত করেনি। রাজপুতদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের আরও অবনতি ঘটে ১৬৭৮ খ্রি: যশোবন্ত সিংহের মৃত্যুর পর। তবে মেবার ও মারওয়াড় ছাড়া অন্য রাজপুত রাজ্যগুলির সঙ্গে ঔরঙ্গজেবের সম্পর্ক বজায় ছিল। তিনি অম্বরের রাজা বিষেণ সিংহকে মথুরায় ফৌজদার হিসেবে নিয়োগ করলে বিষেণ সিংহ জাঠ বিদ্রোহ দমনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। কিন্তু আকবরের রাজত্বে মুঘল-রাজপুত সম্পর্কের পরিস্থিতি ফিরে আসেনি। যদুনাথ সরকার মন্তব্য করেছেন যে, ঔরঙ্গজেবের ব্যর্থতার কারণেই এটা ঘটেছিল এবং মুঘল সামরিক ভিত্তি দুর্বল করার পক্ষে তা যথেষ্ঠ ছিল।

১০.৩ দাক্ষিণাত্য সমস্যা

সাম্রাজ্যের দুর্বলতার পেছনে ঔরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য নীতির বিশেষ গুরুত্ব ছিল। যদুনাথ সরকারের মতে দাক্ষিণাত্যের কতখানি অংশ শাসন করা মুঘলদের পক্ষে সম্ভব তা ঔরঙ্গজেব উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। সতীশচন্দ্র মন্তব্য করেন যে দাক্ষিণাত্য নীতি প্রণয়নের পেছনে নানান সমস্যা ছিল।

যেমন, বিভিন্ন স্বার্থগোষ্ঠীর উদ্দেশ্য, সাম্রাজ্যের ঐক্যগঠনের ব্যবস্থা, অভিজাতদের আচরণ এবং সম্রাটের ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছা ইত্যাদি। দাক্ষিণাত্য বিজয় সহজ হবে না এটা আকবরের অজানা ছিল না। এজন্য যে সামরিক শক্তির প্রয়োজন মুঘলদের তা ছিল না। তাই আহমদনগর জয়ের পরই আকবর বিজাপুরের সুলতান ইব্রাহিম আদিল শাহের কাছে মিত্রতার প্রস্তাব করেন।

গোঁড়া সুন্নি মতে বিশ্বাসী ঔরঙ্গজেবের উদ্দেশ্য ছিল দুটি শিয়া রাজ্য বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা অধিকার করে মুঘল সাম্রাজ্যের বিস্তার ঘটানো এবং স্বাধীন মারাঠা রাজ্যের পতন ঘটানো। বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা অধিকার করার পেছনে আর্থিক কারণ ছিল। দাক্ষিণাত্য থেকে রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে ঘাটতি ছিল। বাইরে থেকে অর্থ সংস্থানের মাধ্যমে দাক্ষিণাত্য শাসন করা সম্ভব ছিল না। শাহজাহান গোলকুণ্ডার ওপর আর্থিক চাপ সৃষ্টি করে সমস্যা মেটাতে চেয়েছিলেন কিন্তু ঔরঙ্গজেবের উদ্দেশ্য ছিল পুরোপুরি দখল করা। মুঘলদের এতদিনের সীমিত আগ্রাসনের নীতিকে বিসর্জন দিতে চেয়েছিলেন। দাক্ষিণাত্যে নিজের অবস্থান সুনিশ্চিত করার জন্য দক্ষিণী ও মারাঠাদের ব্যাপকভাবে মনসব প্রদান করেন। অথচ এই মনবসদারদের দেওয়ার জন্য জায়গির তাঁর হাতে না থাকায় জায়গিরের সংকট শুরু হয়। বিপুল ঘাটতি পুরণের জন্য তিনি বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা জয় করতে উদগ্রীব হন। বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা জয়ের মাধ্যমে ঔরঙ্গজেব সন্তুষ্ট হতে পারেননি। তিনি সমগ্র কর্ণাটক দখল করার পরকল্পনা করেন। এবং এতে সমস্যার সূত্রপাত হয়। কর্ণাটকের আঞ্চলিক শাসকরা যথেষ্ট শক্তিশালী হওয়ায় তাদের নিকট থেকে বার্ষিক কিছু নজরানা ছাড়া বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা বিশেষ কিছু আদায় করতে পারে নি। 'নায়ক', 'রেড্ডি' ইত্যাদি নামক শাসকরা বিজয়নগর সাম্রাজ্যের সময় থেকেই যথেষ্ট প্রভাব প্রতিপত্তি অর্জন করেছিল। ঔরঙ্গজেব এদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে লিপ্ত হন। আবার মারাঠাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালানোর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ না থাকায় ঔরঙ্গজেব সমস্যা সমাধানের জন্য বিজাপুর ও গোলকুণ্ডায় ব্যাপক অঞ্চল খালিসা করে দেন ফলে মনসবদারদের জন্য জায়গিরের পরিমাণ সংকুচিত হয়। যেসব অঞ্চল জায়গীর হিসেবে বন্টনের জন্য রাখা হয়েছিল সেগুলি থেকে বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার সুলতানরা আগেই রাজস্ব আদায়ে ব্যর্থ হয়েছিলেন। এর ফলে জায়গিরের সংকট নতুন মাত্র পায়। মনসবদারদের মধ্যে দলাদলি, দক্ষতায় ঘাটতি, সৈন্যসংখ্যায় কারচুপি ইত্যাদি বিষয় স্পষ্ট হল।

স্মিথ, এলফিনষ্টোন প্রমুখ ঐতিহাসিক মনে করেন যে এই দুই রাজ্য দখল করে ঔরঙ্গজেব রাজনৈতিক অদূরদর্শিতার পরিচয় দিয়ে ছিলেন, নিজের বিপদ ডেকে এনেছিলেন। তাদের মতে, গোলকুণ্ডা ও বিজাপুর ছিল উদীয়মান মারাঠা শক্তির অগ্রগতির পথে বাধাস্বরূপ। সেই বাধা অপসারিত করে সম্রাট মারাঠাদের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা বৃদ্ধির সুযোগ করে দিয়ে মুঘল সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ করেন। এই দুই রাজ্য স্বাধীন থাকলে নিজেদের নিরাপত্তার জন্য তারা মারাঠাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করত। বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা বিজিত হওয়ার ফলে সেখানকার কর্মচ্যুত সেনারা মারাঠা শিবিরে যোগ দেওয়ায় মারাঠাদের শক্তি বৃদ্ধি পায়। অপরদিকে স্যার যদুনাথ সরকার বলেন, যেদিন থেকে আকবর বিন্ধ পর্বত অতিক্রম করে দাক্ষিণাত্যে অগ্রসর হয়েছেন, সেদিন থেকেই সেখানকার পাঠান সুলতানি রাজ্যগুলির সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্ভবনা শেষ হয়ে গেছে। উত্তর ভারত দখল করার পর আকবরের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করে দাক্ষিণাত্যে সাম্রাজ্য বিস্তারের চেষ্টা ঔরঙ্গজেবের ক্ষেত্রে ছিল খুবই স্বাভাবিক। তাই মিত্রতা নয়, উভয়ের মধ্যে সংঘাত ছিল ইতিহাসের অনিবার্য পরিণতি।

১০.৪ উপসংহার

দাক্ষিণাত্য সফল অভিযানের ফলে মুঘল শাসনের উপর যে প্রশাসনিক দায়িত্বভার এসে পড়ল তা বহন করার মত বয়োবৃদ্ধ, রণক্লান্ত সম্রাটের ছিল না। ঐ বিশাল সাম্রাজ্য টিকিয়ে রাখার মত প্রশাসনিক ক্ষমতা শৃঙ্খলা ও আর্থিক সঙ্গতি সম্রাটের ছিল না। এবং কোন যোগ্য উত্তরসুরিও ছিল না যে সম্রাটের মৃত্যুর পর ঐ সাম্রজ্যের হাল ধরতে পারে। দীর্ঘদিন দক্ষ প্রশাসক ও সৈন্য নিয়ে দাক্ষিণাত্যে অবস্থানের ফলে উত্তর ভারতের রাজনীতিতে শূন্যতার সৃষ্টি হয় এবং মুঘল শাসনের প্রাণশক্তিকে কেড়ে নেয়। কেন্দ্রীয় শাসনের দুর্বলতার সুযোগে উচ্চাকাঙ্খী ও অর্থলোভী আমির ওমরাহ ও ভূস্বামীরা মুঘল কর্তৃত্বকে অস্বীকার করে। আফগান জাঠ, শিখ ও রাজপুতরা প্রশাসনিক কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। দাক্ষিণাত্যে বিরামহীন যুদ্ধের ফলে রাজকোষ নিঃশেষ হয়ে পড়ে। দাক্ষিণাত্যে প্রবেশের পরেও সম্রাটের প্রধান দুর্বলতা ছিল মারাঠা শক্তির সম্যক মূল্যায়নে ব্যর্থতা। শিবাজীকে তিনি মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখেননি। শিবাজীর আগ্রায় আসার সময়ও তিনি মারাঠাদের সঙ্গে দীর্ঘকালীন মৈত্রীর গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারেননি। শিবাজীকে পুরোপুরি কাজে লাগিয়ে ঔরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্যের সংকট থেকে রক্ষা পেতে পারতেন।

১০.৫ প্রশ্নাবলী

১. ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালে মুঘল শাসনের সংকটের স্বরূপ ব্যাখ্যা করুন।

২. অধ্যাপক সতীশচন্দ্র কীভাবে মুঘল সংকটকে ব্যক্ত করেছেন? এ প্রসঙ্গে আপনার অভিমত আলোচনা করুন।

৩. মুঘল সংকটে ঔরঙ্গজেবের ভূমিকা আলোচনা করুন।

১০.৬ গ্রন্থপঞ্জি

- Asraf, K.M., *The Mughal Nobility under Auranzeb, Oxford 2001*
- Chandra, Satish, *Parties and Politics at the Mughal Court, 1707-40, Oxford 2002*
- Habib, Irfan, *The Agrarian system of Mughal India 1556-1707, Oxford 2013*
- Prasad, Iswari, *The Mughal Empire, Churgh Publications, 1974*
- Sarkar, Jadunath, *Fall of the Mughal Empire, Vol-1, Calcutta 1932*
- Sankar, Jagadish Narayana, *A study of Eighteenth Century Indian Vol-1, Political History (1707-1761), Calcutta 1976*
- Sharma, S.R., *The Religious Policy of the Mughal Emperors, Oxford, 1940*
- Richards, J.F., *Mughal Administration in Golkunda, Oxford, 1975*

—

একক ১১ ❑ জায়গিরদারি সমস্যা এবং কৃষক বিদ্রোহ

গঠন

১১.০ উদ্দেশ্য

১১.১ ভূমিকা

১১.২ জায়গির সংকট

১১.৩ কৃষক বিদ্রোহ

১১.৩.১. জাঠ বিদ্রোহ

১১.৩.২. সৎনামী কৃষক বিদ্রোহ (১৬৭২ খ্রীঃ)

১১.৩.৩. আফগান উপজাতি আন্দোলন (১৬৭০-৮০ খ্রীঃ)

১১.৩.৪. শিখ বিদ্রোহ

১১.৪ উপসংহার

১১.৫ প্রশ্নাবলী

১১.৬ গ্রন্থপঞ্জি

১১.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠের মধ্য দিয়ে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলি আপনারা জানতে পারবেন :

- মুঘল শাসন কাঠামোতে জায়গিরদারি সংকট
- মুঘল সাম্রাজ্যিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কৃষক বিদ্রোহ এবং কৃষক প্রতিরোধ
- মুঘল সাম্রাজ্যের উপর জায়গিরদারি সংকট এবং কৃষক বিদ্রোহের প্রভাব

১১.১ ভূমিকা

ঔরঙ্গজেবের শাসনকাল থেকে মুঘল সংকটের লক্ষণগুলি স্পষ্ট হতে থাকে। তাঁর মৃত্যু এবং পরবর্তী কোনো যোগ্য শাসকের আবির্ভাব না হওয়ায় এই সংকটের মাত্রা বৃদ্ধি পায় এবং সাম্রাজ্যের পতন তরান্বিত হয়। ঐতিহাসিকরা জায়গিরদারি সংকটকে মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের অন্যতম কারণ বলে মনে করেন। সপ্তদশ শতকের শেষ এবং অষ্টাদশ শতকে জায়গিরদারি ব্যবস্থায় সংকট ঘনীভূত হয়। জায়গিরদারি ব্যবস্থায় সাফল্য নির্ভরশীল ছিল সেনাবাহিনীর ভরণপোষণের জন্য জায়গিরদার কর্তৃক সঠিকভাবে রাজস্ব আদায় করা, 'জমা' বা নির্ধারিত রাজস্বের পরিমাণের সঙ্গে হাসিল অর্থাৎ আদায়কৃত রাজস্বের ভারসাম্য রক্ষা করা। রাজনৈতিক অস্থিরতা ও সাংগঠনিক দুর্বলতাজনিত নানা কারণে জায়গিরদারদের পক্ষে ভূমি-রাজস্ব

আদায় কঠিন হওয়ায় 'জমা' এবং 'হাসিল'-এর মধ্যে ভারসাম্যক বজায় রইল না, আদায়কৃত রাজস্বের পরিমাণ অনেক হ্রাস পায়। জায়গিরদাররা তাদের আয় বৃদ্ধির জন্য বর্ধিত রাজস্ব আদায় করতে বদ্ধপরিকর হওয়ায় সমস্ত চাপ গিয়ে পড়েছিল জমিদার ও কৃষকদের ওপর। অতিরিক্ত শোষণ ও অত্যাচারের চাপে অসহায় কৃষকরা নিজেদের এলাকা ছেড়ে চলে যেত এবং কোনো বিদ্রোহী জমিদারের এলাকায় বসতি স্থাপন করে মুঘল-বিরোধী বিদ্রোহে যোগ দিত। মুঘল শাসনের শুরু থেকেই কৃষক ও জমিদারের বিদ্রোহ ঘটত। তবে সকল বিদ্রোহের চরিত্র এক ছিল না। কখনো অর্থনৈতিক শোষণ, কখনো সামাজিক মর্যাদাবোধ, কখনো ধর্মীয় উন্মাদনা—এই সকল বিদ্রোহের মূল উপাদান হিসেবে কাজ করেছে।

১১.২ জায়গির সংকট

মুঘল রাষ্ট্রকাঠামো ও সমাজে দুটি শ্রেণির প্রধান্য ছিল—জমিদার ও জায়গিরদার। দুটি শ্রেণিই কৃষকের উদ্বৃত্তের ওপর ভাগ বসিয়ে নিজেদের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি বিস্তার করেছিল। মূঘল রাষ্ট্র শুধুমাত্র শোষণকারীর রক্ষক ছিল না, রাষ্ট্রের মাধ্যমে শোষকরা আড়াল থেকে সম্পদ আহরণ করত। সম্রাট ও তার পরিষদবর্গ নিজেরাই শোষক শ্রেণিতে পরিণত হয়েছিল। যে অঞ্চলে রাজস্ব আমলাদের মধ্যে বিতরণ করা হত, তার নাম ছিল জায়গির এবং এই জাতীয় রাজস্বের অধিকারীকে বলা হত জায়গিরদার। জায়গিরদাররা ছিল সম্রাটের অধীনস্ত কর্মচারী এবং তাদের বেতনের পরিবর্তে জায়গির য়েওয়া হত। জায়গিরদার উদ্বৃত্ত উৎপাদনের একাংশ ভোগ করত; যদিও এর ফলে জমির ওপর কোনো মালিকানা স্বত্ত্ব সৃষ্টি হত না।

মুঘল শাসন ব্যবস্থায় 'মনসব' বা পদের মাধ্যমে এই সমস্ত জায়গিরদারদের স্থান নির্ণয় হত। মনসবদারি প্রথা চালু করে সম্রাট আকবর সরকারি কর্মচারীদের সুসংগঠিত করতে চেয়েছিলেন। এই মনসবদারদের বেতন কখনও নগদ টাকায় আবার কখনও জায়গিরের মাধ্যমে দেওয়া হত। যারা জায়গিরের অধিকারী হতেন তাদের বলা হত জায়গিরদার। এই জায়গিরদাররা তাদের ওপর ন্যস্ত জায়গির থেকে রাষ্ট্র নির্ধারিত কর আদায় করতেন। মুঘল আমলে প্রত্যেক মনসবদার সরাসরি সম্রাটের অধীন ছিল। মনসবের দুটো দিক ছিল—'জাঠ' ও 'সওয়ার'। জাঠ ছিল মুঘল সামরিক ব্যবস্থায় মনসবদারের ব্যক্তিগত পদমর্যাদা এবং প্রচলিত আয়-ক্রমের পরিপ্রক্ষিতে তার নিজস্ব মাহিনার সূচক মাত্র। 'সওয়ার' সূচক দিয়ে মনসবদারের অধীনে কতগুলি ঘোড়সওয়ার ও সৈন্য থাকবে তা বোঝা যেত। এই জাঠ ও সওয়ারের ভিত্তিতে মুঘল মনসবদারদের বেতন নির্ধারণ করা হত। এই বেতন যখন তারা নগদ অর্থে পেত তখন তাদের বলা হত 'নগদি'। মনসবদারদের বেতন 'নগদ' বা 'জায়গির'-এর মাধ্যমে দেওয়া হবে, তা নির্ভর করত সম্রাটের ওপর। জায়গিরের দুটো ভাগ ছিল—'তনখা জায়গির' ও 'ওয়াতন জায়গির'। বেতনের পরিবর্তে যে জায়গির দেওয়া হত তার নাম 'তনখা জায়গির'। 'ওয়াতন জায়গির' ছিল হিন্দু সামন্তরাজার রাজ্য যাদের অস্তিত্ব মুঘল সাম্রাজ্যের আগে থেকেই ছিল এবং যারা আকবরের সময় থেকেই মুঘল শাসন ব্যবস্থায় সামিল হয়েছিল। তাদের মনসবের আয় তারা নিজেদের রাজ্য থেকেই সংগ্রহ করত এবং সেই আয় উত্তরাধিকার সূত্রে ভোগ করতে পারত। 'ওয়াতন' শব্দের অর্থ বাস্তুভিটা। হিন্দু জমিদার বা রাজাদের

রাজ্যগুলি ছিল স্বয়ংশাসিত। তারাই রাজ্যের রাজস্ব নির্ধারণ করত। মুঘল রাজস্ব ব্যবস্থায় 'জমা' এবং তদনুযায়ী মনসব বিতরণের সঙ্গে এর কোন সরাসরি সম্পর্ক ছিল না। 'ওয়াতন জায়গির' বংশানুক্রমিক ভাবে ভোগ করা চলত এবং সেখানে কোনো বদলি করা চলত না। এই কারণে পরবর্তীকালে বহু জায়গিরদার তাদের 'তনখা' জায়গিরকে 'ওয়াতন জায়গিরে' রূপান্তরিত করতে চেয়েছিলেন। তনখা জায়গিরগুলিতে প্রচলিত বদলির নীতি কতকগুলি জটিলতার সৃষ্টি করেছিল। অধ্যাপক ইরফান হাবিব দেখিয়েছেন যে জায়গিরদারদের বছরে যে কোন সময়ে বদলি করার ফলে তারা অসুবিধার সম্মুখীন হতেন কারণ অনেক সময় তখনও হয়ত তাদের নির্ধারিত ভূমিরাজস্ব আদায় করা হত না। তাছাড়া মনসব লাভের বা উচ্চতর মনসবে উন্নীত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই জায়গির পেয়ে যেতেন তা নয়। যতদিন তারা জায়গির না পেতেন সেই সময়ের জন্য মনসবদারেরা তাদের ব্যয় নির্বাহ করার জন্য রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে টাকা নিতে পারতেন, কিন্তু ঔরঙ্গজেব এই নিয়ম বন্ধ করে দেওয়ায় জায়গিরদাররা তাদের আয়ের অনিশ্চয়তার জন্য তারা কৃষকদের ওপর নির্দয় হয়ে উঠেছিলেন এবং কৃষকদের শোষণ করে নিজেদের আয় বাড়াতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। কৃষকদের স্বার্থরক্ষায় নজর দিতেন না।

মুঘল সাম্রাজ্যের স্থায়িত্বের জন্য সুদক্ষ জায়গিরদার ব্যবস্থার ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু ঔরঙ্গজেবের শাসনকালের অন্তিমলগ্নে সুদক্ষ জায়গিরদার ব্যবস্থা প্রায় ভেঙে পড়ে এবং এর দুর্বলতাগুলি স্পষ্ট হয়। ঔরঙ্গজেবের রাজত্বের শেষ দিকে মুঘল সাম্রাজ্য যে চরম অর্থনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক সংকটের সম্মুখীন হয় সেই সংকট হল জায়গিরদারি সমস্যা; যা মুঘল সাম্রাজ্যের পতনকে তরান্বিত করে। জায়গিরদার সমস্যার কারণ হল যে, যেটুকু উদ্বৃত্ত জমি পাওয়া যেত, তা দিয়ে প্রশাসনিক ব্যয়, যুদ্ধের খরচ এবং রাজকর্মচারীদের জীবনযাত্রার উপযুক্ত মান বজায় রাখা অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। একদিকে টাকার মূল্য হ্রাস, অন্যদিকে প্রশাসনিক ব্যয়বৃদ্ধি সম্রাট সহ শাসকশ্রেণির জীবনযাত্রার মান উর্দ্ধমুখী হওয়া-এগুলির সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য প্রয়োজন ছিল কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধি। প্রয়োজন অনুপাতে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়নি। জমা বা নির্ধারিত রাজস্ব এবং হাসিল বা আদায়কৃত রাজস্বের মধ্যে ফারাক হত। আবার মনসবদারদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও জায়গিরের সংখ্যা সমানুপাতিক হারে বাড়ানো সম্ভব ছিল না। ফলে উৎকৃষ্ট জায়গিরের জন্য মনসবদারদের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয় এবং সূত্রপাত হয় জায়গিরদারি সংকটের।

ক্রমবর্ধমান ব্যয়বৃদ্ধি ও সম্পদের মধ্যে সমতা রক্ষা করার জন্য জাহাঙ্গির এবং শাহজাহান কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করলেও সংকটের মূলে আঘাত করতে পারেনি। ঔরঙ্গজেব খরচ কমিয়ে, নতুন কর ধার্য করে কৃষির উন্নতির জন্য নির্দেশ জারী করেও অর্থনৈতিক সংকট কাটিয়ে উঠতে পারেননি। আবার ঔরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য নীতির ফলে সমস্যা আরও বৃদ্ধি পায়। ঔরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য অভিযানের সময় তিনি বিরোধীদের মুঘল শাসনতন্ত্রে অঙ্গীভূত করার জন্য এবং দক্ষিণী রাজ্যগুলির উচ্চাকাঙ্খা বিনষ্ট করার জন্য উদার হাতে মনসব বন্টন করেন। কিন্তু মনসবদারদের সংখ্যা বৃদ্ধি হলেও রাজস্বের এলকার পরিমাণ সমানুপাতিক হারে বাড়ানো সম্ভব ছিল না। ঔরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য অভিযানের সময় থেকে বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার যেসব রাজকর্মচারী মুঘল রাজপদে নিযুক্ত হলেন তাদের বলা হত দক্ষিণী মনসবদার। এরা দক্ষিণ ভারতে মনসব নিতে চাইতেন না কারণ দক্ষিণ ভারতে রাজস্ব পুর্ণমাত্রায় আদায় করা সম্ভব

হত না। তাই, তাদের অনেককেই দক্ষিণ ভারতের বাইরে সাম্রাজ্যের অন্যান্য অঞ্চলে জায়গির দেওয়া হত। এছাড়া এইসব নবাগত মনসবদার যাদের মধ্যে বেশিরভাগ ছিল মারাঠা এবং আফগান তাদের শাসকশ্রেণির অন্তর্ভুক্তির ফলে পুরোনো মনসবদারদের ঈর্ষার পাত্র হয়ে ওঠেন। সতীশচন্দ্র বলেছেন যে, দাক্ষিণাত্য ছিল ঘাটতি এলাকা। দক্ষিণ ভারতে অ-দক্ষিণী জায়গিরদারদের সংখ্যা এতই বেশি ছিল যে নতুন দক্ষিণী মনসবদারদের মধ্যে সীমিত পরিমাণ উৎকৃষ্ট জাগিরের জন্য রেষারেষি ও প্রতিযোগিতা নজিরবিহীন সংকটের সৃষ্টি করেছিল। জায়গিরের অসম বন্টন ও মুষ্টিমেয় মনসবদারের হাতে সম্পদের ভারসাম্যহীন কেন্দ্রীকরণ এই সংকটকে তীব্রতর করেছিল। আবার উৎকৃষ্ট জায়গির পেতে অনেক সময় লেগে যাওয়া বা অনেক চেষ্টার পরে জায়গির পেলেও তা থেকে নির্ধারিত রাজস্ব আদায় করা অসম্ভব হয়ে পড়ায় অনেক মনসবদার সঠিক সংখ্যায় সৈন্য রাখত না, এমন কি কেউ কেউ মারাঠাদের সঙ্গে একটা বোঝাপড়াও করে নেয়। সমস্ত মনসবদারি প্রথা ভেঙে পড়তে থাকে।

১১.৩ কৃষক বিদ্রোহ

শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে কৃষকের শেষ অস্ত্র ছিল প্রতিরোধ আন্দোলন। মুঘল যুগে কৃষকরা প্রতাপশালী মুঘল শাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। ঔরঙ্গজেব বা তাঁর উত্তরাধিকারীদের আমলে হঠাৎ কিছু ঘটেনি। তবে প্রতিরোধ আন্দোলনের তীব্রতা ও ব্যাপকতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ঔরঙ্গজেবের শাসন কালে কৃষক বিদ্রোহের নতুন বৈশিষ্ট্য ছিল তীব্র মানসিকতা, প্রতিরোধ ও স্থানীয় ভূম্যধিকারী বা ধর্মীয় নেতাদের দ্বারা গঠিত উন্নততর সংগঠন। প্রাক্-ঔরঙ্গজেব আমলে প্রতিরোধ আন্দোলনের কয়েকটি রূপ যেমন বিশুদ্ধ কৃষক বিদ্রোহ, সামন্ত বিদ্রোহ, জমিদার ও কৃষক বিদ্রোহ, উপজাতিদের মধ্যে বিদ্রোহ-যেখানে প্রতিবাদী ধর্মীয় আন্দোলন ও বর্ণব্যবস্থার উপরে ওঠার প্রশ্নও জড়িত। এ সমস্ত বিষয়েই ঔরঙ্গজেব ও তার পরবর্তী সময়ের প্রতিরোধ আন্দোলনে লক্ষ্য করা যায়। ঐতিহাসিকদের মধ্যে ঔরঙ্গজেবের শাসনকালে সংগঠিত বিদ্রোহগুলিকে ঔরঙ্গজেবের ধর্মনীতির বিরুদ্ধে হিন্দুদের প্রতিক্রিয়া ও ক্রমবর্ধমান আর্থিক শোষণে বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসেবে দেখার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। এই সব গণসংগ্রামগুলিতে ধর্ম ও আর্থিক শোষণের ভূমিকাকে অস্বীকার করা যায় না তবে জাঠ ও শিখদের বিদ্রোহের ফলে ভিন্ন আঞ্চলিক রাষ্ট্র গড়ে ওঠে। একটি পৃথক উপজাতীয় রাষ্ট্র গড়ে তোলার জন্য আফগানদের সংগ্রাম দমন করা হয়। পরবর্তীকালে ভিন্ন পরিস্থিতিতে একটি আফগান রাষ্ট্র গড়ে ওঠে।

১১.৩.১ জাঠ বিদ্রোহ

ঔরঙ্গজেবের শাসনকাল জমিদারদের নেতৃত্বে সংগঠিত কৃষক বিদ্রোহ হিসেবে দিল্লী ও মথুরা অঞ্চলে জাঠ বিদ্রোহের (১৬৬৯ খ্রি:)-কথা উল্লেখ করা যায়। প্রাক্-ঔরঙ্গজেবের আমলে এই অঞ্চলের কৃষকদের চির-বিদ্রোহী বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। জাহাঙ্গির ও শাহজাহানের আমলে এই অঞ্চলের গ্রামবাসীরা কর দিতে অস্বীকার করায় এদের বিরুদ্ধে বারবার অভিযান চালানো হয়। জাঠরা মূলত কৃষিজীবী শ্রেণি। তিলপথের জমিদার গোকলা জাঠ গ্রামাঞ্চলের কৃষকদের সংঘবদ্ধ করে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। বিদ্রোহের

কারণ ছিল—মথুরার ফৌজদার আবদুল নবীর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ। গোকলার মৃত্যুর পর রাজারাম এবং পরে চূড়ামন জাঠের নেতৃত্বে বিদ্রোহ চলতে থাকে। অধ্যাপক গৌতম ভদ্র জাঠ বিদ্রোহের দুটি দিকের কথা উল্লেখ করেছেন। একদিকে চূড়ামন জাঠ নিজে নিচু জাতিভূক্ত চামারদের সাহায্য নিয়ে ভরতপুর এলাকায় দুর্ভেদ্য জঙ্গল পরিস্কার করে নিজের ক্ষমতায় স্থায়ী এলাকা গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। অন্যদিকে তিনি গোটা অঞ্চল জুড়ে ব্যবসায়ীদের এলাকায় লুঠতরাজ করে সম্পদ সংগ্রহ এবং তাদের ওপর কর ধার্য করতে শুরু করেন। পরে ফরুকশিয়ারের রাজত্বে চূড়ামনকেই ঐ অঞ্চলের কর আদায়ের ভার দেওয়া হয় এবং জাঠ ক্ষমতাকে ধীরে ধীরে মুঘল রাষ্ট্র-ক্ষমতা স্বীকার করে নেওয়া হল।

জাঠ প্রতিরোধ আন্দোলন শক্তিশালী হওয়ার পেছনে নিচু জাতের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। ভরতপুর দুর্গের পরিখা রক্ষণাবেক্ষণের ভার চূড়ামন চামারদের দিয়েছিলেন। জাঠ জমিদারদের উঠে আসার পটভূমি হিসেবে কাজ করেছিল মুঘল রাজস্বব্যবস্থার বিরুদ্ধে কৃষকদের সশস্ত্র বিক্ষোভ। সামাজিকভাবে অপেক্ষাকৃত নিচু জাঠ জমিদাররা কৃষক বিক্ষোভের সঙ্গে নিজেদের উচ্চাভিলাষ যোগ করেই ক্ষমতা দখল করতে সক্ষম হয়েছে। জাঠ বিদ্রোহ বর্ণ-সংহতি, পুরোনো গোষ্ঠীকে অবদমন করে নতুন গোষ্ঠীর উত্থান, আঞ্চলিক কৃষক বিক্ষোভের প্রকাশ দেখা যায়। গোকলা ও চুড়ামনের পেছনে জাঠ কৃষকদের একটা বর্ণগত সমর্থন ছিল। তারা ঐ অঞ্চলের কৃষকদের রাজস্ব না দেবার মনোভাবকে অর্থাৎ রাষ্ট্রশক্তির বিরোধিতাকে কাজে লাগিয়েছিল। কৃষক অসন্তোষের সঙ্গে এরা নিজেদের উচ্চাভিলাষকে যুক্ত করেছিল।

১১.৩.২ সৎনামী কৃষক বিদ্রোহ (১৬৭২ খ্রি:)

মুঘল আমলে আর একটি ব্যাপক কৃষক বিদ্রোহ করেছিল সৎনামীরা। এরা ছিল একটি প্রতিবাদী ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মানুষ। এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বীরভান নামক এক ধর্মপ্রচারক। কাফি খান এদের সম্পর্কে বলেছেন যে এই হিন্দু ফকিররা যদিও বৈষ্ণবদের মত পোষাক পরিধান করত, তথাপি তাদের বেশির ভাগের পেশাই ছিল চাষ এবং অল্প পুঁজি নিয়ে ব্যবসা করা। তারা নিজেদের সম্প্রদায়ের লোকেদের সৎভাবে জীবন যাপন করতে উদ্বুদ্ধ করত। সৎ উপায়ে প্রাপ্ত সম্পদ ছাড়া অসৎ উপায়ে অর্জিত সম্পদ আদৌ চাইত না। তবে কেউ যদি এদের ওপর অত্যাচার বা জুলুম চালাত, তবে এরা সহ্য করত না। এদের অনেকে অস্ত্র ধারণ করত। এদের সঙ্গে রাষ্ট্রশক্তির সংঘাতে কোন রকম ধর্মীয় বিদ্বেষের কোনো ভূমিকা ছিল না। এর কারণ ছিল বস্তুগত। কাফি খানের বর্ণনা অনুযায়ী, একদিন নারনুলের একজন সৎনামী চাষীর সঙ্গে ক্ষেত রক্ষণাবেক্ষণকারী এক পেয়াদার তীব্র বিরোধের ফলে পেয়াদা কৃষককে হত্যা করলে একদল সৎনামী একত্রিত হয়ে পেয়াদাকে প্রহার করে। পরে শিকদার সৎনামীদের গ্রেফতার করতে একদল পেয়াদা পাঠালে সৎনামীরা পোয়াদাদের নিকট থেকে অস্ত্র কেড়ে নেয়। এরপর শুরু হয় ব্যাপক বিদ্রোহ। নারনুল শহরের ফৌজদার এদের হাতে নিহত হন এবং শহর এদের দখলে চলে যায়, এই বিদ্রোহের নায়ক ছিলেন গরিবদাস হাডা। এরা নিজেদের থানা স্থাপন করে এবং কর সংগ্রহ করতে থাকে। এদের বিরুদ্ধে বিশাল সৈন্যবাহিনী পাঠানো হয় এবং তীব্র যুদ্ধের পরে এদের দমন করা সম্ভব হয়।

সৎনামীদের বিদ্রোহের তীব্রতা ও বীরত্বের কথা সমসাময়িক ইতিহাসবিদদের দ্বারা স্বীকৃত হয়েছে। কাখি খান বলেছেন যে, রাজকীয় সৈন্যরা সৎনামীদের ভয়ে ভীত ছিল এবং বিদ্রোহ দ্রুত প্রসারলাভ

করেছিল। বলা যেতে পারে যে, অল্প পুঁজিসম্বল ব্যবসায়ী ও গ্রামীণ কারিগরদের বিদ্রোহের বিশুদ্ধরূপ সৎনামী বিদ্রোহে প্রতিফলিত হয়েছে। মুঘল অর্থনীতির সংকটে কৃষকদের সঙ্গে শিকদার পেয়াদাদের সংঘর্ষই এই বিদ্রোহের জন্ম দেয়। এখানে একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সংহতি ও চেতনা কৃষকদের মধ্যে লড়াকু মনোভাব এনে দেয়।

১১.৩.৩ আফগান উপজাতি আন্দোলন (১৬৭০-৮০ খ্রি:)

ঔরঙ্গজেবের আমলে প্রধান উপজাতি আন্দোলন হল খটক উপজাতির বিদ্রোহ। খটক উপজাতি আকবরের সময় থেকে মুঘল রাষ্ট্রের মিত্রশক্তি ও বিদ্রোহের নেতা খুশহল খান এক সময় মুঘল মনসবদার ছিলেন। মুঘল রাষ্ট্রকে সেবা করার পরিবর্তে খটকরা শাহজাহানের আমল পর্যন্ত নানা সুবিধা পেত। রোশনিয়া আন্দোলন দমনে এরা মুঘল রাষ্ট্রশক্তির প্রধান সহযোগী হয়। রোশনিয়া আন্দোলন স্তগিত হওয়ার পরে ঔরঙ্গজেব খটকদের প্রতি তোষণ নীতি বর্জন করেন। খটকরা এই ধরনের মনোভাবকে বিশ্বাসঘাতকতা মনে করে এবং আফ্রিদিদের সহায়তায় লান্ডি, কোটাল, খপোক, খাইবার ইত্যাদি অঞ্চলে হাঙ্গামা শুরু করে। উদ্বৃত্ত সম্পদের ওপর নিয়ন্ত্রণ নিয়ে খটক উপজাতি ও মুঘল রাষ্ট্রশক্তিরর বিরোধই ছিল এই বিদ্রোহের প্রধান কারন। ঔরঙ্গজেবকে অধিকারভঙ্গ বা চুক্তিভঙ্গের দায়ে অভিযুক্ত করা হয় কারন তিনি তাঁর পূর্বপুরুষদের দ্বারা দেয় ও খটকের স্ব-উপার্জিত অধিকার কেড়ে নিয়েছেন। এই বিদ্রোহের সঙ্গে তাদের বাঁচার প্রশ্ন জড়িত ছিল। বাণিজ্যপথের পাহারা দেওয়া ছিল এদের উপজীবিকা এবং তার পরিবর্তে উপজাতির লোকেরা শুল্কের অংশ পেত।

ঔরঙ্গজেবের শাসনকালে ১৬৬৭ খ্রি: ইউসুফজাই উপজাতি নেতা ভাগুর নেতৃত্বে পরিচালিত বিদ্রোহ বন্ধ করা সম্ভব হয়। এই সংগ্রাম বন্ধ করা সম্ভব হলেও ১৬৭২ খ্রি: দ্বিতীয়বার আফগান বিদ্রোহ দেখা দেয়। এই সময় বিদ্রোহের নেতৃত্বে দেন আফ্রিদি নেতা আকমল খান। তিনি মুঘলদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন এবং তার সঙ্গে যোগ দেবার জন্য আফগানদের আহ্বান জানান। শেষ পর্যন্ত মুঘল বাহিনী আকমল খানকে পরাজিত করে। ১৬৭৪ খ্রি: অপর একজন মুঘল উচ্চপদস্থ কর্মচারী সুজাত খান খাইবার অঞ্চলে আফগান আক্রমণের সম্মুখীন হন। ১৬৭৪ খ্রি: ঔরঙ্গজেব নিজে পেশোয়ারে যান এবং ১৬৭৫ খ্রি: পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করেন। শক্তি ও কুটনীতির দ্বারা তিনি আফগানদের সংহতি বিনষ্ট করেন এবং এই অঞ্চলে শান্তি ফিরে আসে। এক্ষেত্রে কাবুলে নবনিযুক্ত মুঘল গভর্নর আমীর খান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। আফগান বিদ্রোহে মুঘল শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। এই বিদ্রোহ প্রমাণ করে যে স্বাধীনতার আকাঙ্খা শুধুমাত্র হিন্দু যেমন জাঠ, মারাঠা এদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। এছাড়া আফগান বিদ্রোহ এক সংকটপূর্ণ অবস্থায় শিবাজীকে মুঘল আক্রমণের তীব্রতা থেকে রক্ষা করে ছিল। এই সুযোগে শিবাজী নিজেকে রাজা হিসেবে ঘোষণা করতে পেরেছিলেন এবং বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার সঙ্গে মিত্রতার সম্পর্কে গড়ে তুলেছিলেন।

১১.৩.৪ শিখ বিদ্রোহ

গুরু নানকের অনুপ্রেরণায় পাঞ্জাবের একটি একেশ্বরবাদী, গণতান্ত্রিক আন্দোলন শিখদের মধ্যে এক

নতুন স্বাধীন চিন্তার জন্ম দেয়। নানকের উত্তরাধিকারী শিখ গুরুদের সঙ্গে আকবরের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকলেও বিদ্রোহী রাজপুত্র খসরুকে সাহায্য করায় শিখগুরু অর্জুনের সঙ্গে জাহাঙ্গিরের বিরোধ শুরু হয়। আর. পি. ত্রিপাঠী মুঘল-শিখ বিরোধের কারণ হিসেবে বলেন, পাঞ্জাবের গুরুর প্রতি নিষ্ঠাবান একটি নির্দিষ্ট জাতিগত ও ধর্মীয় আদর্শে উদ্বুদ্ধ এবং সমস্ত রকম অবিচারের প্রতিবাদ করতে দৃঢ়সংকল্প একটি ক্ষুদ্র অথচ ক্রমবর্ধমান সম্প্রদায়ের উত্থানে প্রতিষ্ঠিত কর্তৃত্বের সঙ্গে সংঘাতের সম্ভবনা দেখা দেয়। শিখ গুরুদের ক্রমবর্ধমান ক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন হওয়ার পর তাদের প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রণ করতে মুঘল সম্রাটরা সচেষ্ট হন।

সিংহাসন নিয়ে ভ্রাতৃবিরোধের সময় সমসাময়িক শিখ পন্থের গুরু হর রায় (১৬৪৫-৬১ খ্রি:) দারা শুকোহকে সমর্থন ও সাহায্য করায় ঔরঙ্গজেব ক্রুদ্ধ হন। দারার পরাজয়ের পর ঔরঙ্গজেবের নির্দেশে হর রায়কে মুঘল দরবারে ডেকে পাঠানো হলে হর রায় তার জ্যেষ্টপুত্র রাম রায়কে পাঠান। রাম রায় ঔরঙ্গজেবের পক্ষ অবলম্বন করায় হর রায় শিখ পন্থের গুরু রূপে তাঁর দাবি নাকচ করে দ্বিতীয় পুত্র হরকিষণকে উত্তরাধিকারী নির্বাচন করেন। গুরু হরকষণের মৃত্যুর পর শিখ পন্থে কিছুটা বিশৃঙ্খল দেখা দেয়। শিখ পন্থের গুরু পদ নিয়ে ২২ জন দাবিদারের মধ্যে অশান্তি দেখা দিলে শেষ পর্যন্ত শিখরা হরগোবিন্দের কনিষ্ঠ পুত্র তেগবাহাদুরকে শিখদের নবম গুরুপদে বসায় (১৬৬৪ খ্রি:)। তেগবাহাদুর গুরু পদে মনোনীত হওয়ায় অশান্তির সৃষ্টি হওয়ায় তেগবাহাদুর বর্ত্তমান চন্ডীগড়ের অনতিদূরে আনন্দপুরে তাঁর কর্মকান্ডের কেন্দ্রস্থল বেছে নিয়েছিলেন। ১৬৭৫ খ্রি: তেগবাহাদুরকে ঔরঙ্গজেব দিল্লীতে ডেকে পাঠান এবং হত্যা করেন। তেগবাহাদুরের হত্যার ফলে পাঞ্জাবে মুঘল শক্তির বিরুদ্ধে শিখদের জাতীয়তাবাদ এক নতুন প্রেরণায় উদ্দীপিত হয়।

তেগবাহাদুরের হত্যা নিয়ে অনেকে ভিন্ন ভিন্ন কারণ নির্দেশ করেন। গোলাম হুসেন তাঁর সিয়ার-উল-মূতাক্ষরিন গ্রন্থে বলেন তেবগাহাদুর হাফিজ আদম নামে জনৈক পাঠান নেতার সঙ্গে মিলিত হয়ে পাঞ্জাবে মুঘল শক্তির বিরুদ্ধাচরণ করেছিল বলে ঔরঙ্গজেব তাঁকে হত্যা করেছিলেন। ব্রাউন তাঁর 'India Tracts' গ্রন্থে বলেন, তেগবাহাদুর 'সাচ্চা বাদশাহ' (যথার্থ রাজা) এবং গরিমা সূচক 'বাহাদুর' উপাধি গ্রহণ করলে এবং লুঠপাঠের দ্বারা তাঁর এবং সশস্ত্র অনুচরদের ভরণপোষণ চালালে ঔরঙ্গজেব ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। কেউ কেউ তেগবাহাদুর কর্তৃক বহু মুসলমানকে শিখ ধর্মে ধর্মান্তরিত করলে ঔরঙ্গজেব তাঁকে হত্যা করেন। গুরু গোবিন্দ তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন যে, ঔরঙ্গজেবের ধর্মান্তকরণের নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার অপরাধে তেগবাহাদুরকে দিল্লীতে ডেকে এনে তাঁকে হয় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ নয় মৃত্যুবরণ—যে কোনো একটি গ্রহণ করতে বলা হলে তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে অস্বীকার করলে তাঁকে হত্যা করা হয়। খুশবন্ত সিংহ বলেছেন, ঔরঙ্গজেব পৌত্তলিকা বিরোধী অর্থাৎ মন্দির ও মূর্তি ভাঙার নীতি গ্রহণ করায় শিখরা শঙ্কিত হয়ে পড়েছিল। গুরু তেগবাহাদুর শিখদের মধ্যে আত্মপ্রত্যয় ফিরিয়ে এনেছিলেন। বহু হিন্দু ধর্মরক্ষার জন্য তাঁর শরণাপন্ন হয়েছিল। তেগবাহাদুরের এইসব কাজকর্মে ঔরঙ্গজেব অসন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে হত্যা করেন। শিখ সূত্র অনুযায়ী তিনি ধর্ম যুদ্ধের জন্য শহীদ হয়েছিলেন।

তেগবাহাদুরের মৃত্যু শিখ-মুঘল সংঘাত এক নতুন মাত্রা পায়। মুঘল সেনারা তেগবাহাদুরকে দিল্লীতে নিয়ে যাওয়ার সময় তিনি হরগোবিন্দের তরবারি পুত্র গোবিন্দকে অর্পণ করে তাঁকে গুরুপদে অভিষিক্ত

করে যান এবং পুত্রকে প্রতিশোধ গ্রহণের কথা বলে যান। কানিংহাম লিখেছেন, পিতার প্রাণদণ্ড এবং স্বদেশের শোচনীয় অবস্থার কথা চিন্তা করে তিনি মুসলমানদের চির শত্রুতে পরিণত হলেন এবং বিধ্বস্ত হিন্দুদের একটি বিজিগীষু জাতিতে পরিণত করার মহৎ স্বপ্নে অনুপ্রাণিত হলেন। ১৬৯৯ খ্রি: গুরু গোবিন্দ ধর্মসংস্কারের কাজ শুরু করেন। শিখদের এক সম্মেলনে আহ্বান করে গুরু গোবিন্দ পাঁচজনকে মনোনীত করেন। এরা শিখ ধর্মের মর্যাদারক্ষার জন্য প্রাণ বিসর্জন অঙ্গীকার করেন। এদের বলা হয় 'পঞ্চ পিয়ারে'। তিনি ঘোষণা করেন 'খালাসা'-ই হবে শিখ পন্থের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ। খালসা শব্দের অর্থ পবিত্র বা মুক্ত। তিনি বলেন, 'এখন থেকে খালসাই গুরু, গুরুই খালসা'। জাতিভেদ বা অন্যান্য সামাজিক ভেদাভেদ তুলে দেওয়া হয়। তিনি সকল শিখের জন্য 'সিংহ' বা 'সিং' উপাধি ধারণ এবং শিখদের মধ্যে ঐক্য ও সৌভ্রাতৃত্বের সুদৃঢ় করণের লক্ষ্যে পঞ্চ 'ক' ধারনের নির্দেশ দেন। এগুলি কাচ্চা (চাপা পাজামা), কড়া (লোহার বালা), কৃপাণ (ছোরা), কাঙ্গা (চিরুনী) এবং কেশ (চুল ও দাড়ি) গুরু গোবিন্দের সংগঠন শিখদের মধ্যে ধর্মবিশ্বাস ও সামরিক কর্তব্যের মধ্যে সমন্বয়সাধন করে শিখ সম্প্রদায়ের মধ্যে দুর্দমনীয় চিত্তোন্মত্ততা সৃষ্টি করে। সতীশচন্দ্র 'খালসা বা সামরিক ভ্রাতৃসংঘ প্রতিষ্ঠার পটভূমি হিসেবে গুরু গোবিন্দ কর্তৃক পাঞ্জাবের পার্বত্য অঞ্চলে শিখ রাজ্য স্থাপনের প্রচষ্টোর কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, 'সমস্ত প্রকার উৎপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের আয়ুধ হিসেবে নিয়োজিত হবার আদর্শ থাকলেও খালসার আর একটি আদর্শ ছিল একটি গুরু শাসিত রাজ্যের প্রতিষ্ঠা।

মুঘল বিরোধী কার্যকলাপ পরিচালনের জন্য পাঞ্জাবের পার্বত্য অঞ্চলের পাদদেশে প্রধান কার্যালয় স্থাপন করেন এবং আনন্দপুর, পাওনাটা ও চামকৌর নামে কয়েকটি দুর্গ নির্মাণ করেন। এই সকল দুর্গ থেকে তিনি স্থানীয় অর্ধ-স্বাধীন রাজ্যগুলির ওপর প্রভাব বিস্তারে সচেষ্ট হন কারণ তাঁর বিশ্বাস ছিল যে দুর্গম পার্বত্য এলাকায় আধিপত্য স্থাপনের মধ্যে দিয়ে মুঘল শাসনের উচ্ছেদ সম্ভব হবে। গুরু গোবিন্দের সাফল্যে বা ক্ষমতা বৃদ্ধিতে শঙ্কিত হয়ে পার্বত্য এলাকায় রাজারা ঔরঙ্গজেবের শরণাপন্ন হলে ঔরঙ্গজেব লাহোর ও সরহিন্দের শাসকদের গুরু গোবিন্দের বিরুদ্ধে অভিযান চালানোর নির্দেশ দেন। মুঘল সৈন্য আনন্দপুরে গুরুকে অবেরোধ করে। সংঘর্ষে গুরুর দুই পুত্র মারা যান। বহু অনুগামী ভয়ে পালিয়ে যায়। গুরু গোবিন্দ কোনোক্রমে শেষ পর্যন্ত ভাতিন্দায় পালিয়ে যান এবং 'খালসা' বাহিনীকে সংগঠিত করেন। ঔরঙ্গজেব তাঁকে সাক্ষাতের জন্য আহ্বান জানান। ঔরঙ্গজেবের সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্য যাত্রাকালে গুরু গোবিন্দ ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুসংবাদ পান।

১৭০৮ খ্রি: নান্দোরে এক আফগান আততায়ীর হাতে গুরু গোবিন্দ নিহত হলে তাঁর শিখ রাজ্য স্থাপনের স্বপ্ন সফল হয়নি ঠিকই, কিন্তু মুঘল প্রতিরোধের ঐতিহ্য সৃষ্টি করে, শিখদের 'খালসা' বাহিনীকে সংগঠিত করে পরবর্তীকালে শিখরাজ্য গঠনের পথ সুগম করেছিলেন। শিখ আন্দোলন প্রমাণ করে যে কীভাবে একটি ধর্মীয় আন্দোলন রাজনৈতিক ও সামরিক আন্দোলনে রূপান্তরিত হতে পারে।

১১.৪ উপসংহার

এই আলোচনা থেকে স্পষ্ট অনুমান করা যায় যে অষ্টাদশ শতকে মুঘল সাম্রাজ্যে যে সংকট সৃষ্টি হয়েছিল তা কোনো একটি কারণে হয়নি; এর পিছনে কাজ করেছিল অনেক ধরণের উপাদান। 'জমা'

ও 'হাসিলে'র পার্থক্য, উন্নতমানের জায়গিরের অভাব, মুঘল অভিজাতদের মধ্যে দলাদলি এবং কৃষক শ্রেণির প্রতিরোধ ১৭০৭-এর আগে থেকেই সাম্রাজ্যের কাঠামোতে ক্ষয় সৃষ্টি করেছিল। ১৭০৭ খ্রি: ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর অবক্ষয় ও পতনের গতি দ্রুততর হয়। মুঘল সামরিক বাহিনী যে অপরাজেয় নয় তা বিদ্রোহী শক্তিগুলি অনুধাবন করে। এর ফলে ১৭০৭ থেকে ১৭৫০-এর মধ্যে মুঘল সাম্রাজ্য সম্পূর্ণ শক্তিহীন হয়ে পড়ে এবং সাম্রাজ্যের পতন ঘটে।

১১.৫ প্রশ্নাবলী

১. 'জায়গিরদারি সংকট' বলতে কি বোঝায়? এই সমস্যার সমাধান কি সম্ভব ছিল?

২. সপ্তদশ শতকের দ্বিতীয়ার্দ্ধে মুঘল শাসনের বিরুদ্ধে কৃষকদের প্রতিরোধ আন্দোলনের একটি বিবরণ দিন। এই বিদ্রোহগুলিকে কি ঔরঙ্গজেবের ধর্মান্ধ নীতির বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া হিসেবে ব্যক্ত করা যায়?

৩. মুঘল-শিখ বিরোধিতার কারণ কী ছিল?

১১.৬ গ্রন্থপঞ্জি

- Chandra, Satish, *Medieval India, Society, the Jagirdari Crisis and the Village, Delhi, 1982*
- Habib, Irfan, *The Agrarian System of Mughal India 1556-1707, Oxford 2013*
- Sharma, Sri Ram, *The Religious Policy of the Mughal Emperors, Oxford, 1940*
- Srivastava A. L. *The Mughal Empire,1526-1803, Agra, 1952*
- Tripathi R.P., *Rise and Fall of the Mughal Empire, Vol-2, Delhi*
- গৌতম ভদ্র, *মুঘল যুগে কৃষি-অর্থনীতি ও কৃষক বিদ্রোহ,* কলকাতা, ১৯৮৩
- শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, *অষ্টাদশ শতকের মুঘল সংকট ও আধুনিক ইতিহাস চিন্তা,* কলকাতা, ২০০০

পর্যায় ৪:
দৃশ্য সংস্কৃতি: চিত্রকলা ও স্থাপত্য
দশম পত্র : ভারতের ইতিহাস (১৬০৫-১৭০৫ খ্রীঃ)

একক ১২ ❑ চিত্রকলা

গঠন

১২.০ উদ্দেশ্য

১২.১ ভূমিকা

১২.২ জাহাঙ্গীরের আমল

১২.৩ মুঘল চিত্রকলার ওপর ইউরোপীয় প্রভাব

১২.৪ শাহজাহানের আমলে চিত্রশিল্প

১২.৫ ঔরঙ্গজেবের আমলে চিত্রশিল্প

১২.৬ উপসংহার

১২.৭ প্রশ্নাবলী

১২.৮ গ্রন্থপঞ্জি

১২.০ উদ্দেশ্য

এই এককের মূল আলোচ্য বিষয়বস্তু হল মুঘল যুগের দৃশ্য সংস্কৃতি সম্পর্কে ধারণা তৈরি করা। দৃশ্য সংস্কৃতি বলতে সাধারণ ভাবে বোঝায় চিত্রকলা ও স্থাপত্য। এই এককে আমরা মুঘল চিত্রকলার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের অবহিত করব। এই বিষয়গুলি হল :

- মুঘল চিত্রকলার বিকাশ ও বিবর্তন
- বিভিন্ন মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীর, শাহজাহান ও ঔরঙ্গজেবের সময় মুঘল চিত্রশিল্পের বিকাশ
- মুঘল চিত্রকলার উপর ইউরোপীয় প্রভাব

১২.১ ভূমিকা

ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে শিল্পকলা এক স্বতন্ত্র মর্যদার অধিকারী। স্থাপত্য, ভাস্কর্যের সাথে সাথে চিত্রশিল্পও বিশ্বের দরবারে ভারতের নাম উজ্জ্বল করেছে। প্রাচীন ভারতের মত মধ্যযুগেও শিল্পের ক্ষেত্রে বিশেষ উৎকর্ষতা লক্ষ্য করা যায়। মুঘল আমলে ভারতে চিত্রশিল্প বিদেশী ভাবধারায় জারিত হয়ে নতুনধারার চিত্রকলা সৃষ্টি করে। মুঘল চিত্রকলা ও তার শিল্পীদের সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনই বর্তমান পাঠের উদ্দেশ্য।

সুপ্রাচীন কাল থেকেই ভারতবর্ষ চিত্রকলার সুমহান উত্তরাধিকার বহন করে আসছে। অজন্তা, ইলোরা, বাঘগুহার গুহাচিত্রাবলী তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তবে যুগে যুগে চিত্রশিল্পের এই ধারা অব্যাহত থাকলেও সময়ের সাথে সাথে তার আঙ্গিক, বিষয়বস্তু ও চিত্ররীতি পরিবর্তিত হয়েছে। মুঘল আমলে ভারতে

যে দরবারি চিত্রকলার বিকাশ ঘটে তা মুঘল চিত্রকলা নামে পরিচিত। মুঘল চিত্রকলার ঘরানার সৃষ্টি হয় মূলত আকবরের আমল থেকেই। যদিও এর শুভ সূচনা ঘটে হুমায়ুনের আমলেই। ভারতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে পারসিক শিল্প ঐতিহ্যের সংমিশ্রণে গড়ে ওঠা এই শিল্পের পূর্ণ বিকাশ লক্ষ্য করা যায় সপ্তদশ শতকে।

মুঘল সম্রাট বাবর চিত্রকলার উৎসাহী সমর্থক ছিলেন। তার আত্মজীবনীতে ভারতবর্ষের ফুল, ফল, জীবজন্তুর বর্ণনা থাকলেও, তার সমকালীন কোনো চিত্রের সন্ধান মেলেনি।

বাবরের উত্তরাধিকারী হুমায়ুন দিল্লির সিংহাসনচ্যুত হয়ে আশ্রয় নেন পারস্যের সাফাভি সম্রাট শাহ তহমাপ্‌সের দরবারে। সেখানে অনেক শিল্পীর সঙ্গে পরিচয় হয় হুমায়ুনের। তাদের ছবি দেখে মুগ্ধ হন। এদেরই অন্যতম ছিলেন মীর মুসাবির, মীর সৈয়দ আলি ও আব্দুস সামাদ।

হুমায়ুন যখন পারস্যে ছিলেন সেখানকার বিখ্যাত চিত্রকর ছিলেন বিহজাদ। বিহজাদের দুই শিষ্য ছিলেন মীর সৈয়দ আলি ও আব্দুস সামাদ। হুমায়ুন ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের পর তার দরবারে এই পারসিক চিত্রকরদের আমন্ত্রণ জানান। সে আহ্বানে সাড়া দিয়ে তারা মুঘল দরবারে এসে যোগ দেন। তাদের হাত ধরেই মুঘল সুরৎখানার (চিত্রকারখানার) পত্তন ঘটে। সেখানে যে ছবিগুলি সৃষ্টি হয়, তা-ই মুঘল দরবারি চিত্রকলা নামে পরিচিত। হুমায়ুনের আমলে দরবারে চিত্রশিল্পীরা যে নিযুক্ত হয়েছিলেন তার প্রমাণ মেলে সে আমলের গ্রন্থ 'বায়াজিৎ বায়াত' থেকে। মীর সৈয়দ আলি, খাজা আব্দুস সামাদ, মৌলানা দোস্ত, মৌলানা দরবেশ মহম্মদ ও মৌলানা ইউসুফ প্রমুখ হুমায়ুনের আমলে মুঘল চিত্রশালায় নিযুক্ত ছিলেন। মীর সৈয়দ আলি এসেছিলেন অব্রিজ থেকে আর আব্দুস সামাদ শিরাজ থেকে। আব্দুস সামাদ ও মীর সৈয়দ আলি ধ্রুপদী পারসিক রীতিতে চিত্রাঙ্কন করতেন। মুঘল দরবারেও তারা সেই রীতিই অনুসরণ করেন। ফলে প্রথম যুগের মুঘল চিত্রবলীর মধ্যে বিষয় ও আঙ্গিকের পারসিক প্রভাব লক্ষণীয়। তবে আকবরের আমলে বিভিন্ন ধরণের শিল্পীরা মুঘল চিত্রশালায় কাজ করায় মুঘল দরবারি চিত্ররীতির উদ্ভব ঘটে যা স্বকীয়তায় উজ্জ্বল। আকবরের আমলেও চিত্রশালার নেতৃত্বে ছিলেন আব্দুস সামাদ ও মীর সৈয়দ আলি। আবদুস সামাদ ভারতে আসার পূর্বেই শিল্প শিক্ষা করেছিলেন ঠিকই, তবে আকবরের পরামার্শেই তিনি শুধু বিষয়ের আকৃতি নয়, বিষয়ের অন্তর্নিহিত অর্থ ফুটিয়ে তোলার ওপরও জোর দেন। তার ছাত্ররাও পরবর্তীকালে দক্ষ শিল্পী হয়ে উঠেছিলেন। অনুচিত্র সৃষ্টির দক্ষতার জন্য তাকে 'শিরিন কলম' নামে অভিহিত করা হত।

আব্দুস সামাদের কাজের মধ্যে 'হামজনামা'-র অলংকরণগুলিই সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। প্রথমে এ কাজের দায়িত্ব ছিল মীর সৈয়দ আলির উপর। আকবরের দরবারের বিখ্যাত শিল্পী ছিলেন এই মীর সৈয়দ আলি হজ করতে মক্কা যাত্রা করেন। কিন্তু তিনি আর ফিরে না এলে এ দায়িত্ব এসে পড়ে আব্দুস সামাদের উপর। আব্দুস সামাদ অনেক উল্লেখযোগ্য ছবি চিত্রিত করেন। আকবর তাকে চারশো মনসবদার পদ দেন। পরবর্তীকালে তিনি টাকশালের অধিকর্তা হন। এমনকি আরও পরে ১৫৮৭ নাগাদ আকবর তাঁকে মুলতানের দেওয়ান পদে নিযুক্ত করেন। মুঘল দরবারী শিল্পীরা কেবল ছবিই আঁকতেন না, তদের অনেকেই ছিলেন দক্ষ লিপিকার বা রত্নখোদাইকর। আব্দুস সামাদ এমনই এক শিল্পী ছিলেন, হুমায়ুন ও আকবর দু'জনকেই তিনি শিল্প শিক্ষা দান করেছিলেন। সে দিক থেকে মুঘল দরবারে তাঁর বিশেষ মর্যাদা ছিল। তার পুত্র মুহাম্মদ শরিফও মুঘল দরবারি চিত্রশিল্পী ছিলেন।

আকবরের আমলে মুঘল চিত্রশালায় অনেক হিন্দু শিল্পী নিযুক্ত হন। তাঁর আমলে হিন্দু শিল্পীরা সংখ্যায় ছিলেন ১৪৫ আর মুসলিমরা ১১৫ জন। পরবর্তীকালে জাহাঙ্গিরের আমলে শিল্পীর সংখ্যা হ্রাস পায়। ৪৩ জন হিন্দু ও ৪১ জন মুসলমান শিল্প দরবারি কাজে নিযুক্ত হন। বস্তুত আকবর ছিলেন মুঘল চিত্রকলার প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। শাসন ব্যবস্থায় যে ভারতীয়করণ আকবর করেছিলেন, চিত্রকলার ক্ষেত্রেও তেমনি পারসিক শিল্পরীতির সাথে স্থানীয় প্রাণতা সংযুক্ত হয়ে তা মুঘল চিত্রকলায় উত্তীর্ণ হয়। আকবরের আমলে দরবারি চিত্রকারখানায় সমষ্টিগত কাজ শুরু হয়। একই চিত্রের বিভিন্ন অংশের কাজ বিভিন্ন দক্ষ শিল্পের হাতের ছোঁয়ায় জীবন্ত হয়ে ওঠে। ১৫৮০ সালের পর থেকে মুঘল চিত্রকলায় ইউরোপীয় শিল্প আঙ্গিকের অনুপ্রবেশ ঘটে।

আকবরের আমলে মুঘল চিত্রকরদের কেহ জাতিতে পটুয়া ছিলেন না। তাঁরা ছিলেন নিম্নবর্ণ সম্ভুত। তাঁর আমলে বিখ্যাত চিত্রকর দশবন্ত ছিলেন কাহার সম্প্রদায়ের মানুষ। রাস্তা থেকে তাঁকে এনে আব্দুস সামাদের হাতে তুলে দেন। তার কাছেই দশবন্তের শিল্প শিক্ষা হয় অচিরেই তিনি এক শ্রেষ্ঠ চিত্রকর হয়ে ওঠেন। 'তুতিনামা'র কিছু চিত্রে, তারিখ-ই-তিমুরিয়া-র বালক তৈমুরের প্রতিকৃতি অঙ্কনে ও কিছু সাধুর প্রতিকৃতি অঙ্কনে দশবন্ত অসাধারণ দক্ষতার স্বাক্ষর রাখেন। এস.পি. ভার্মার মতে দশবন্তের চিত্রের উপর পাশ্চাত্য প্রভাব লক্ষণীয়। তবে সেই সাথে তার ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা ও হিন্দু মহাকাব্যিক জ্ঞান তার ছবিগুলিতে বাঙ্ময় হয়ে ওঠে। মানুষ, জীবজন্তু, ভীড়ের দৃশ্য, সবকিছুর মধ্যেই প্রতিটি প্রাণীর স্বকীয় ভঙ্গিমা, দশবন্তের ছবিতে স্পষ্ট, যা সমকালীন অন্যান্য সমষ্টিগত প্রয়াসের চিত্রাবলীর মধ্যে অনুপস্থিত। সম্মিলিত কাজের মধ্যেও এই যে নিজস্ব প্রতিভার স্বাক্ষর, তা দশবন্তের মত অন্য কেউই রেখে যেতে পারেন নি।

আকবরের আমলে অন্যসব বিখ্যাত চিত্রকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন বসাওয়ান, কেসু বা কেশব ও ফারুক বেগ। চিত্রের প্রেক্ষাপটে রচনা, রঙের ব্যবহার ও প্রতিকৃতি অঙ্কনে বসওয়ান ছিলেন অনবদ্য। আবুল ফজল যে সব শিল্পীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ বসওয়ান তাদের অন্যতম। যে সব দীর্ঘমেয়াদী চিত্রপ্রকল্প আকবরের আমলে গ্রহণ করা হয়েছিল, যেমন 'হামজানামা', 'রজমনামা', 'তারিখ-ই-তিমুরিয়া' প্রভৃতি গ্রন্থ চিত্রণ ও পুথি অলংকরণ, সবক্ষেত্রেই বসওয়ান অংশগ্রহণ করেছিলেন। তবে লাইন ড্রইং-এ ছিল তার প্রধান দক্ষতা। এস. পি. ভার্মার মতে মুঘল দরবারি চিত্রসমূহে মোট ৬জন কেশবের উপস্থিতি লক্ষ্যণীয়, এদের মধ্যে দু'জন—কেশব ও কেশবদাসের চিত্র পাওয়া যায় জাহাঙ্গিরের আমল পর্যন্ত। তাঁরা দুজনেই পাশ্চাত্য শিল্প আঙ্গিকের চিত্র রচনায় দক্ষতা দেখান। কেশবদাস একাধিক ইউরোপীয় ছবির অনুকরণ করেন। তাঁর অঙ্কিত মুঘল রমণীর ছবিতে মাতা-মেরীর আদল লক্ষ্য করা যায়।

আবুল ফজল লিখেছেন, আকবর প্রতি সপ্তাহে একবার তাঁর চিত্রশিল্পীদের কাজ পরিদর্শন করতেন। দারোগারা প্রতি সপ্তাহে উৎপাদিত চিত্রসমূহ তাঁর সম্মুখে উপস্থাপন করতেন, সম্রাট তাদের কাজে সন্তুষ্ট হলে পুরস্কার প্রদান করতেন। কারও বা মাস মাহিনা বৃদ্ধি পেত।

মুঘল যুগে শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় রং, তুলি, কাগজ, সোনা, রূপা—এ সব কিছুই সরবরাহ করতেন পৃষ্ঠপোষকগণ। সম্রাটরা নিজেরাই অনেকে চিত্রকলা বিদ্যা শিক্ষা করেছিলেন। হুমায়ুন ও আকবরে কথা

প্রসঙ্গত উল্লেখ। আব্দুস সামাদ ও মীর সৈয়দ আলির কাছে আকবর চিত্রাঙ্কন বিদ্যা শেখেন। গোঁড়া উলেমাপন্থীদের চিত্রকলা সম্পর্কিত নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে তিনি এ শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন।

যারা চিত্রকলা অপছন্দ করতেন, আকবর তাদের ঘৃণা করতেন। তিনি বলেছিলেন, 'আমি মনে করি শিল্পী তাঁর নিজস্ব উপায়ে ঈশ্বরকে স্মরণ করেন। যখন তিনি একটি জীবন্ত প্রাণীর প্রতিকৃতি আঁকেন, তখন নিশ্চয় তাঁর মনে পড়ে যায় সেই ঈশ্বরকে যিনি জীবে প্রাণ দান করেন।" মুঘল যুগের শ্রেষ্ঠ শাসক এভাবে শিল্পীদের যে স্বাধীনতা প্রদান করেছিলেন, তা ইতিপুর্বে তাঁরা কল্পনাও করতে পারতো না।

১২.২ জাহাঙ্গিরের আমল

জাহাঙ্গিরের আমলে মুঘল চিত্রকলার আরও উৎকর্ষতা লাভ করে। তবে চিত্রকারখানায় শিল্পীর সংখ্যা হ্রাস পায়। সম্রাট এক একজন শিল্পীকে এক এক ধরনের চিত্র অঙ্কনের দায়িত্ব দেন। ফলে একজন শিল্পী বিশেষ ধরনের চিত্র অঙ্কনে দক্ষতা অর্জন করেন। ওস্তাদ মনসুর হয়ে ওঠেন ফুল, ফল, জীবজন্তু আকায় দক্ষ, আবুল হাসান প্রতিকৃতি অঙ্কনে দক্ষ, জাহাঙ্গিরের আমলে পারস্য থেকে আসেন আঁকা রিজা। জাহাঙ্গির আকবরের বিরুদ্ধে ঘোষণা করে এলাহাবাদের অবস্থান কালে সেখানে চিত্রকারখানা স্থাপন করেন। সেখানেই চিত্র অঙ্গনে নিযুক্ত হন আঁকা রেজা। প্রতিকৃতি অঙ্কনে তিনি অসামান্য দক্ষতা দেখান। তবে জাহাঙ্গিরের আমলে দুই শ্রেষ্ঠ চিত্রকর হলেন আবুল হাসান ও ওস্তাদ মনসুর। এদের মধ্যে আবুল হাসানকে জাহাঙ্গির নাদির-উজ-জামান অভিধায় ভূষিত করেন। এই শিল্পী ফুল, ফল, জীবজন্তুর ছবি আঁকলেও তার প্রধান কাজ ছিল প্রতিকৃতি অঙ্কন। বাস্তবধর্মী তাঁর প্রতিকৃতি চিত্রণের ওপর ইউরোপীয় প্রভাব লক্ষণীয়। জাহাঙ্গির, শাহজাহানের প্রতিকৃতি তিনি অঙ্কন করেন। মুঘল আমলে যে সব শিল্পী বিশেষ দক্ষতা প্রদর্শন করেন তাদের ওস্তাদ, নাদির-উজ-জামান, নাদির-অল্-অম্‌র ইত্যাদি উপাধিগুলি প্রদান করা হত। এই উপাধিধারীরা বিশেষ সাম্মানিক মর্যদা ভোগ করতেন এবং শাসকগোষ্ঠীর নিজস্ব বৃত্তের মধ্যে তারা অবস্থান করতেন।

মুঘল রাজপ্রসাদের নির্দিষ্ট স্থানে এসব চিত্রশিল্পীদের কাজের জায়গা করা হত, একে বলা হত কারখানা। পোশাক, রত্ন-অলংকার ইত্যাদির মত ছবিও প্রস্তুত হত সম্রাটের নিজস্ব কারখানায়। ফলে ছবিতে ফুটে উঠতো সম্রাটদের নিজস্ব ইচ্ছা, আকাঙ্খা, ভালোলাগা। তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া মুঘল চিত্রকলার বিকাশ সম্ভব ছিল না। তবে সম্রাট ছাড়াও অভিজাত শ্রেণির ব্যক্তিরাও চিত্রের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এই পৃষ্ঠপোষকবৃন্দ কেবল আর্থিক দায়ভারই গ্রহণ করতেন না। তারা শিল্পের বোদ্ধাও ছিলেন। জাহাঙ্গির সম্পর্কে দরবারি শিল্পীরা বলতেন, 'জিল্লইলাহি' (ভগবানের ছায়া) দুনিয়ার সব বাতি জ্বালানোর মালিক। যিনি খাঁটি জুহুরির মতো শিল্পীর গুণ যাচাই করতে পারেন। এই ব্যক্তি যার পৃষ্ঠপোষক তিনি সত্যই ভগবান।' ইউরোপীয় পর্যটকরা মুঘল সম্রাট ও অভিজাতদের সে বিলাসিতার কথা বলেছেন, তা সম্ভব হয়েছিল একদিকে তাদের শোষণ-নিপীড়নের কারণে আর অন্যদিকে ব্যয়সাধ্য কারখানাগুলিকে চালু রেখে। এর জন্য ব্যয় হত সম্রাটের সংসার খরচের দুই-তৃতীয়াংশ। মুঘল অভিজাতরাও অভিনব বস্তু সংগ্রহে আগ্রহী ছিলেন। ছবি ছিল তাদের আগ্রহের অন্যতম বস্তু। স্বাভাবিকভাবেই তারা চিত্রশিল্পীদের

পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। মাসির-ই-রহিমি'র মত অভিজাতদের জীবনীগ্রন্থ থেকে মনে হয় যে, তাঁরাও তাদেরও গৃহসংলগ্ন স্থানে চিত্র কারখানা গড়ে তুলতেন। এদের অনেকে আবার শিল্পের সমজদারও ছিলেন। বার্ণিয়ের মুঘল অভিজাতদের শোষণের নিন্দায় মুখর হলেও স্বীকার করেছেন যে, 'ইন্ডিস'-এর কারুশিল্প টিকে থাকত না যদি না ওমরাহরা তাদের গৃহ-কারখানাগুলিতে শিল্পীদের স্থান না দিতেন। মাসির-ই-রহিমি-তে আব্দুর রহিম খান-ই-খানানের জীবনীকার আব্দুর রহিমের শিল্প অনুরাগের পরিচয় দিয়েছেন। একবার এক শিল্পী তার চিত্রসম্ভার আবদুর রহিমের সামনে বিক্রির জন্য হাজির করলে অবদুর রহিম একটি ছবি দেখে খুশি হয়ে তাকে বেশী অর্থ প্রদান করতে চাইলে তিনি তা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানান ও পরিবর্তে সে তার কাছে দাবি করেন যে, ছবিখানির সূত্রকর্ষ সূত্র তিনি নির্দেশ করবেন। খান-ই-খানান তা দেখিয়ে দিলে শিল্পী সন্তুষ্ট হয়ে ছবির দামই কেবল নিলেন না, তার ইনামও গ্রহণ করলেন।

মুঘল চিত্রকারখানায় গ্রন্থ চিত্রণ ও প্রতিকৃতি অঙ্কন প্রাধান্য লাভ করেছিল। একাধিক পারসিক কাব্যগ্রন্থের মত হিন্দু মহাকাব্যগুলি অনুবাদ হয় ও এদের মধ্যে 'রজস্‌নামা' (মহাভারতের পারসিক অনুবাদ) হরিবংশ, রামায়ণ প্রভৃতি চিত্রিত হয়। আকবর নিজে এই গ্রন্থচিত্রণে কাজ তত্ত্বাবধান করতেন। তবে আকবরের আমলে সবচেয়ে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা ছিল 'দাস্তান-এ- আমারহামজা' অলংকরণ। কিংবদন্তি নির্ভর এই বৃহৎ গ্রন্থের অলংকরণে বহু শিল্পী অংশ নিয়েছিলেন। অনেকের মতে এই 'হামজানামা'র চিত্রিত করার কাজ শুরু হয় হুমায়ুনের আমলে। কিন্তু হুমায়ুনের সময়ে মুঘলদের এত লোকবল বা অর্থবল ছিল না যে তা দিয়ে হামজানামার মত বৃহৎ চিত্রসম্ভার গড়ে তোলা সম্ভব। ১৫৬৩ খ্রিস্টাব্দে এই গ্রন্থচিত্রণ শুরু হয় এবং তা চলে পনেরো বছর ধরে। তবে কার্ল খান্ডালওয়ালা-র মতে ১৫৬৭ থেকে ১৫৮২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে 'হামজানামা'র চিত্রগুলি অঙ্কিত হয়েছিল। অশোক দাস মনে করেন, ১৫৬৭ সালের মধ্যেই 'হামজানামা'র কাজ শেষ হয়ে গিয়েছিল।

১৫৬৭ থেকে ১৫৭০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে যা অলংকরণ করা হয়েছিল তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য— 'গুলিস্তান', 'দুর্বল রাণী খিজির খান' এবং 'আনয়ার-ই-সুহেলি' প্রভৃতি গ্রন্থের অলংকরণ করা হয়েছিল।

হজরত মহম্মদের আত্মীয় হামজার অলৌকিক ক্ষমতাকে কেন্দ্র করে রচিত 'হামজানামা' চৌদ্দটি খণ্ডে সম্পূর্ণ। যদিও কোনও খণ্ডের সম্পূর্ণ অংশ পাওয়া যায়নি। তবে সে সমস্ত চিত্র এই গ্রন্থে সংশ্লিষ্ট করা হয়েছিল, তার মধ্যে মাত্র ১৫০টি উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। দৈর্ঘে আড়াই ফুট ও প্রস্থে ২ ফুট মাপের কাপড়ের ওপর এই ছবিগুলি অঙ্কিত হয়েছিল। পারসিক লিপিবিদ খ্বাজা আতাউল্লা মুনশি কাজভিনী প্রতি ছবির পশ্চাতে নাস্তালিক লিপিতে ছবির বিবরণ লিখেছিলেন। প্রথমে ছবি আঁকার মূল দায়িত্বে ছিলেন পারসিক শিল্পী মীর সৈয়দ আলি। পঞ্চাশজন শিল্পীকে নিয়ে সাত বছর কাজ করে তিনি মাত্র চারটি খণ্ডের চিত্র অঙ্কন করেছিলেন। আকবর অতঃপর তাকে হজ যাত্রায় পাঠিয়ে দিয়ে আবদুস সামাদের ওপর দায়িত্ব দেন। পরবর্তী আট বছর ধরে কাজ করে তিনি 'হামজানামা'র চিত্রাবলীর কাজ শেষ করেন। এই চিত্রগুলিতে প্রাথমিক পর্যায়ে পারসিক আলংকারিক রীতির প্রভাব দেখা যায়, পরের ছবিগুলিতে প্রাকৃতিক বস্তু অনুচিত্রে রূপান্তরের ছাপ স্পষ্ট হয়। মানুষের মুখ, অবয়ব, গায়ের রং প্রভৃতি বাস্তব জগতে যেমন দৃশ্যমান হয়, শিল্পী তেমনই ফুটিয়ে তুলেছেন। পারসিক চিত্ররীতিতে লক্ষণীয় এক বিশেষ

ধরনের মানুষ-এর মুখ ও গাছ যা গতানুগতিক হয়ে উঠেছিল, হামজানামা'র পরের দিকের চিত্রগুলিতে ক্রমশঃ তা পরিবর্তিত হতে থাকে। ছবিতে স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে দৃষ্টিগ্রাহ্য জগতের বৈশিষ্ট্য—মানুষের শরীরে, গাছে কাণ্ডে বা সবুজ পাতার বিন্যাসে। 'হামজানামা'র চিত্রাবলী অঙ্কনে অনেক হিন্দু শিল্পীও নিযুক্ত হয়েছিলেন। আবুল ফজল লিখেছেন, এই সব হিন্দু শিল্পীরা অনেকেই মুঘল দরবারি করাখানায় শিক্ষালাভ করে বিখ্যাত পারসিক শিল্পী বেহ্জাদের সমকক্ষ হয়ে উঠেছিলেন।

এই গ্রন্থ ছাড়াও পরবর্তীকালে 'দরবারনামা', 'বাহারিস্তান', নিজামি-র 'খামসা', আদি-র 'কালিয়াৎ' ও নাফাহাত-অল্-উন্স' প্রভৃতি পারসিক কাব্যগুলিও চিত্রিত করার কাজ সম্পন্ন হয়েছিল। আবু তাহির তারসুমি রচিত 'দরবারনামা'-র জন্য ১৭৫টি ছবি আঁকেন আকবরের চিত্রশালার বসওয়ান, কেসু, মধু জগন, মহেশ, তাঁরা ও সাঁওলা, ধরমদাস, মুশকিন, নানহা প্রমুখ।

আকবরের আমলে একাধিক হিন্দু ধর্মগ্রন্থের অনুবাদ করে তাতে চিত্র সংযোজন করা হয়। যেমন—রজম্নামা (মহাভারতের পারসিক অনুবাদ), রামায়ণ, হরিবংশ। ১৫৯০ সালে 'আকবরনামা'-র রচনাকাল শেষ হলে সম্রাটের হুকুমে তা চিত্রিত করা শুরু হয়। এই গ্রন্থের দু'টি চিত্র রূপ পাওয়া গেছে—একটি সংরক্ষিত আছে লণ্ডনের ভিক্টোরিয়া অ্যাণ্ড অ্যালবার্ট মিউজিয়ামে আর একটির অংশবিশেষ আছে ডাবলিনের চেস্টার বিয়ার্টি লাইব্রেরিতে। একই সময়ে 'বাবরনামা'র চিত্রিত রূপ প্রস্তুত করা হয়েছিল। আকবরনামায় অনেক বাস্তব ঘটনাকে চিত্রায়িত করা হয়েছে। যেমন আকবরের আদেশে আধম খানকে দোতলা থেকে ফেলে দেওয়ার ঘটনা চিত্রিত হয়েছে। পারসিক রীতি অনুসারে আখ্যানমূলক চিত্রণ করা হলেও মুঘল শিল্পীরা আকবরের জীবনাবলীর নাটকীয় ঘটনা চিত্রে ফুটিয়ে তোলার ওপর জোর দিয়েছেন। অন্যদিকে বাবারনামা'র চিত্রগুলি অনেক বেশী পুঁথি নির্ভর ও কল্পনা নির্ভর।

গোড়া ইসলামীয় অনুশাসনের বিরুদ্ধে আকবর যে গিয়েছিলেন মুঘল চিত্রবলীর মধ্যে তার ছাপ রয়েছে। এসব চিত্রের কোথাও আল্লাহর কাছে প্রার্থনারত আকবরকে যেমন দেখা যাচ্ছে তেমনি কোনো চিত্রে তিনি জেসুইট পাদ্রীদের সঙ্গে ইবাদতখানায় আলোচনায় রত। মুঘল চিত্রের মধ্যে মেরী ও যীশুর ছবিও পাওয়া গিয়েছে। সেই সাথে মহাভারত ও রামায়ণের বিষয়ও চিত্রিত হয়েছে।

পিতার ন্যায় জাহাঙ্গিরও তার জীবনের ঘটনাবলী শিল্পীদের দিয়ে চিত্রত করেছিলেন। যেমন তাঁর রাজ্যলাভ, উৎসব, জন্মদিনের ওজন নেওয়ার অনুষ্ঠান, শিকার ইত্যাদির ঘটনা ছবিতে ফুটিয়ে তোলা হতে থাকে। জাহাঙ্গিরের আমলের চিত্রকরদের মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন ওস্তাদ মনসুর, আবুল হাসান। মনসুর বিরল প্রজাতির পশুপাখির ছবি আঁকায় মুন্সিয়ানা দেখিয়েছিলেন। আঁকা রিজার ছেলে আবুল হাসান চিত্রে জাহাঙ্গিরের অতিমানবীয় চেহারা তুলে ধরেন।

তুজুক-ই-জাহাঙ্গির-এর চিত্র বিশ্লেষণে যেমন বিষয়-কেন্দ্রিক বৈচিত্র দেখা যায়, তেমনি চিত্রশৈলীতে অনেক পরিণতবোধ পরিলক্ষিত হয়। পরবীর্তকালে শাহজাহানের 'পাদশাহনামা'তেও কিছু নূতন সূক্ষ্মতর কাজের পরিচয় মেলে। লক্ষণীয় যে এই সময় থেকে শিল্প সৃষ্টি সৃজনশীলতার চেয়ে ম্যানারিজম দ্বারাই বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। এই সময় থেকেই একটি বিশেষ চিত্র শৈলী আত্মপ্রকাশ করে। চিত্র-পট বা দূর-নিকটের আভাস, রঙের বিন্যাস এবং রেখার বহুমুখী প্রকাশে পারস্য চিত্রটির আদর্শটি থাকলেও এমন সব বিশিষ্ট সংযুক্ত হয় যা সম্পূর্ণত মুঘল ও ভারতীয়।

সম্রট আকবর প্রতিকৃতি অঙ্কনের ব্যাপারে খুব উৎসাহী ছিলেন। জাহাঙ্গীরও তা-ই। আবুল ফজলের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, সম্রাট আবকর সমস্ত সভাসদদের প্রতিকৃতি আঁকিয়েছিলেন। তবে উভয়ে উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন। আকবর তার আমলের ব্যক্তিবর্গের একটি দলিল তৈরি করতে চেয়েছিলেন। আর জাহাঙ্গিরের উৎসাহের পেছনে ছিল মনস্তাত্বিক কারণ। প্রশাসনিক কারণে প্রতিকৃতি অঙ্কনে জোর দিয়েছিলেন তিনি। সভাসদদের প্রকৃত মানসিকতা অনুধাবনের জন্য তিনি তাদের প্রতিকৃতি আঁকিয়েছিলেন।

১২.৩ মুঘল চিত্রকলার ওপর ইউরোপীয় প্রভাব

১৫৮০-র পর থেকে মুঘল চিত্রকলার ওপর ইউরোপীয় প্রভাব পড়ে। কেশবদাসের ছবিতে ইউরোপীয় প্রভাব দেখা যায়, অন্যদের ছবিতেও এই প্রভাব পড়ে। ফলে মুঘল চিত্রকলায় মানুষের শরীর ও দৃষ্টিগ্রাহ্য প্রাকৃতিক জগৎকে ফুটিয়ে তোলার প্রবণতা দেখা দেয়। আবুল ফজলও লিখেছেন যে, পারসিক রীতি ছাড়া এ সময়ের মুঘল ছবির মধ্যে ইউরোপীয় প্রভাব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সেলিম ইউরোপীয় চিত্রগুলির একটা নিজস্ব সংগ্রহ গড়ে তুলেছিলেন। প্রথমদিকে শিল্পীরা ছবিতে মুঘল রং-এর সঙ্গে ইউরোপীয় শৈলী ব্যবহার করতেন। ক্রমশ তারা চিত্রে ইউরোপীয় পটভূমিকা যেমন, ইউরোপীয় শহরের বা ইউরোপীয় ব্যক্তিকে ছবির মাঝে হাজির করতেন। জাহাঙ্গিরের আমলে শিল্পীরা ছবিতে খ্রিস্টান ধর্মের প্রতীক ও চিহ্ন ব্যবহার করতেন। পটভূমিকা রচনায় ও রং-এর ব্যবহারে ইউরোপীয় শৈলীর অনুকরণ করে মুঘল শিল্পীরা ইউরোপীয় শৈলীর সাথে মুঘল শৈলীর সংমিশ্রণ ঘটিয়েছিলেন। ইউরোপীয় নিঃসর্গ দৃশ্যকে পটভূমি করে যেমন পারসিক কাহিনী আঁকা হয়েছে তেমনি কোরানের প্রতিলিপির পাশে রয়েছে ফ্লেমিশ শিল্পীদের আঁকা কৃষক পরিবার ও মেরীর ছবি।

১২.৪ শাহজাহানের আমলে চিত্রশিল্প

জাহাঙ্গিরের মৃত্যুর পর মুঘল চিত্রকলার অবক্ষয়ের সূচনা ঘটে। যুবরাজ খুররম পুঁথিচিত্র সংগ্রহে উৎসাহ দেখালও পরবর্তীকালে সম্রাট শাহজাহান হয়ে তাঁর আগ্রহ স্থাপত্য ভাস্কর্যের দিকে আকর্ষিত হয়। তবে সিংহাসন লাভের প্রথম কয়েক বছর শাহজাহান চিত্রশিল্পীদের আগের মতই কাজের স্বাধীনতা দিয়েছিলেন।

শাহজাহানের সময় প্রতিকৃতি অঙ্কনের ওপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। দরবারে অভিজাতদের এমনকি সঙ্গীত শিল্পীদেরও প্রতিকৃতি আঁকা শুরু হয়। ১৬৫৭ খ্রিস্টাব্দে 'শাহজাহানামা'র জন্য চিত্র অঙ্কিত হয়। শাহজাহান সূফিসন্তদের নাচ দেখছেন বা দারাশুকো মরমিয়া সাধুদের সঙ্গে আলোচনায় রত এমন বিষয়ভিত্তিক ছবি এই পুঁথিচিত্রে সংশ্লিষ্ট আছে। একটি ছবিতে আবার নৃত্যরত দরবেশদের দেখা যায়। জাহাঙ্গিরের আমলের মুঘল চিত্রাবলীতে যেমন সজীবতা বা প্রাণবন্ত ভাব ফুটে উঠেছে, শাহজাহানের আমলে অঙ্কিত ছবিগুলি আবার প্রাণহীন কিন্তু জৌলুসপূর্ণ। মহম্মদ আমিন-বিন-আবুল-হাসান কসতিনির লিখিত 'বাদশাহনামা' শাহজাহানের রাজত্বকালের বর্ণনা সম্বলিত গ্রন্থ। এই গ্রন্থ অলংকরণের সময় সম্রাট প্রতিটি পৃষ্ঠা খুটিয়ে দেখতেন। সমকালীন লিপিকারদের সম্মান ছিল শিল্পীদের সমান। 'বাদশাহনামা'-র

চিত্রিত গ্রন্থটির রচনায় শাহজাহানের নিজস্ব পরিকল্পনা কাজ করেছিল বলে ঐতিহাসিকরা মনে করেন। এই জীবনীচিত্রের দরবারে বিভিন্ন প্রতিকৃতিগুলি অঙ্কনে যে মুন্সিয়ানার পরিচয় শিল্পীরা দিয়েছিলেন, তা অতুলনীয়। এ গ্রন্থের ছবি আঁকার প্রধান দায়িত্ব ছিলেন মকর। গ্রন্থের একাধিক ছবিতে দেখা যায় শাহজাহান গ্লোবের উপর দাঁড়িয়ে আছেন, দেবদূতরা তাঁর মাথায় মুকুট ধরে আছেন। এ রূপ ছবি তৈরির সময় শিল্পীরা নিশ্চয়ই পাশ্চাত্য ছবির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। শাহজাহানের আমলে সে সব দরবারি শিল্পী বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছিলেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন বিচিত্র, চিতরমান, অনুপছত্তর, মহম্মদ নাদির প্রমুখ। এদের অঙ্কিত শাহজাহানের 'ঝরোখা প্রতিকৃতি' চিত্রগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সম্রাট প্রতিদিন জনসাধারণকে যে 'রাজদর্শন' দিতেন তাকে 'ঝরোখা দর্শন' বলা হত। এই ঝারোখা দর্শন ছিল এই চিত্রগুলির বিষয়বস্তু। 'বাদশাহানাম' চিত্রগ্রন্থের প্রায় ১/৩ অংশ জুড়েই রয়েছে এই ঝারোখা চিত্রগুলি। শাহজাহানের আমলে যুদ্ধকে বিষয় করে অনেক চিত্র অঙ্কিত হয়, যেমন 'ওয়াচার অধিগ্রহণ' ও 'দৌলাতাবাদের যুদ্ধ' চিত্রে ফুটিয়ে তোলা হয়েছিল এ আমলে। তাঁর আমলের মুঘল শিল্পীদের চিত্রকর্ম একাধিক অ্যালবামে পাওয়া যায়। এইসব অ্যালবামে প্রতিকৃতি চিত্রের সঙ্গে নিসর্গদৃশ্য ছবিতে পাওয়া যায়। মুঘল চিত্রকলায় সচারচর যে ভাবে জীবজন্তু, গাছপালা, ফুলফল উপস্থাপন করা হয়, নৈসর্গিক দৃশ্য সেভাবে করা হয় না। বরং নগর, প্রান্তর, জনপদ বা বনভূমি কাহিনির রূপায়ণে পটভূমি রূপেই চিত্রিত হয়। শিল্পীরা এ সময়ে বাস্তব জগৎকে যেন নুতনভাবে উপস্থিত করেন।

১২.৫ ঔরঙ্গজেবের আমলে চিত্রশিল্প

ঔরঙ্গজেব গোড়া সুন্নি ছিলেন, তিনি চিত্রবিভাগ বন্ধ করে দেন। দরবারের চিত্রশিল্পীরা তখন প্রাদেশিক ও আঞ্চলিক দরবারে গিয়ে উপস্থিত হয়। এরাই পাঞ্জাব ও রাজস্থানে গিয়ে নতুন শৈলী গড়ে তোলেন। পশ্চিম ভারতের জৈন শিল্প ঐতিহ্যের সাথে মুঘল রীতির মিশ্রণে রাজস্থানী শৈলী সৃষ্টি হয়। তাছাড়া অষ্টাদশ শতকে অনেক দরবারি শিল্পীরা আশ্রয় নেন অযোধ্যা, হায়দারাবাদ বা বাংলায়।

১২.৬ উপসংহার

মুঘল চিত্রকলা মূলত পাণ্ডুলিপি চিত্রায়ন ও মোরাক্কা বিন্যাসের উপর নির্ভর করে বিকশিত হয়েছিল। হুমায়ুন বেহজিদের চিত্রশালা থেকে যে সব শিল্পীদের ভারতে এনেছিলেন তাদের চিত্রশৈলীতে পারস্য শৈলীর যে প্রভাব লক্ষ্য করা যায়, পরবর্তীকালে মুঘল চিত্রে তার আর বিশেষ প্রভাব দেখ যায় না। পরিবর্তে চিত্রকলায় স্বাধীন শৈলীর উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। হুমায়ুননামাতে যারা চিত্রাঙ্কন করেছিলেন তাদের পারস্য শিল্পরীতির গৌধূলী বেলার ছবি। পরবর্তী মুঘল চিত্রে রঙের যে উজ্জ্বলতা দেখা যায়, তা হুমায়ুননামায় অনুপোস্থিত। চিত্রপটের পরিকল্পনাতে পারসিক পদ্ধতির প্রভাবে সীমানার বন্ধন এতটাই সুদ্যৃঢ় যে মনে হয় যেন ছবির কণ্ঠরোধ হচ্ছে। একদিকে শিল্পীদের পারস্য শৈলীর সংস্কার আর অন্য দিকে ভারতীয় পৃষ্ঠপোষকের রাজনৈতিক সামাজিক বিভিন্নতার সূত্রবদ্ধতা শিল্প চিন্তায় যেন এক দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেছিল বলে মনে হয়। তবে পারসিক প্রভাব মুক্ত হয়ে স্বাধীন মুঘল চিত্ররীতির প্রথম নির্দশন

হল আকবরনামা। ভারতীয় ন্যাশানাল মিউজিয়ামের রক্ষিত বাবরনামা পাণ্ডুলিপি চিত্রের সাথে আকবরের আমলে চিত্রিত রজমনামা (যা জয়পুর প্রাসাদ লাইব্রেরিতে রক্ষিত)। চিত্রাবলীর যদি তুলনামূলক আলোচনা করা যায় তবে মুঘল চিত্র শৈলী বিবর্তনের রূপটি বোঝা যাবে। মুঘল চিত্রের নিজস্ব বৈশিষ্ট প্রকাশ পায় আকবরের আমলে। টুটিনামা, হামজানামা, রজমনামা, আনওয়ার-ই-সুহেইলি এবং সর্বশেষে আকবরনামার পাণ্ডুলিপিতে যে সব চিত্রের সমাবেশ ঘটেছে তা বিষোয় ও শৈলী উভয় দিক থেকেই মুঘল চিত্রকলাকে স্থায়ীত্ব প্রদান করেছে। আকবরনামা ছাড়া বাকি সবগুলিই বিভিন্ন কাহিনি—কখনো সেগুলি পারস্যের গল্প বা কখনো বা রামায়ণ বা মহাভারতের ফারসি অনুবাদ। ফলে চিত্রাঙ্কনের এক প্রসারিত ক্ষেত্র রচিত হয়। আকবরের জীবনের বহুবিধ কর্মকাণ্ডকে বিষয় করে রচিত হয় আকবরনামা। আকবরনামার একাধিক পাণ্ডুলিপিতে (ভিক্টোরিয়া ও এলবার্ট মিউজিয়ামে রক্ষিত) যে চিত্র পাওয়া যায় তাতে মুঘল শিল্পচেতনার ন্যারেটিভ রচিত হয়।

তুজুক-ই-জাহাঙ্গিরের চিত্র বিশ্লেষণে যেমন বিষয়কেন্দ্রিক দেখা যায়, তেমনি চিত্র শৈলীতে অনেক পরিণতবোধ পরিলক্ষিত হয়। পরবর্তীকালে শাহজাহানের পাদ্‌শাহনামাতেও কিছু নূতন ও সূক্ষ্মতর কাজের পরিচয় মেলে। লক্ষণীয় যে এই সময় থেকে শিল্প সৃষ্টি সৃজনশীলতার চেয়ে ম্যানারিজম দ্বারাই বিশেষ ভাবে প্রভাবিত হয়। এ সময় থেকেই একটি বিশেষ চিত্রশৈলী আত্মপ্রকাশ করে।। চিত্রপটে দূর নিকটের আভাস, রঙের বিন্যাস এবং রেখার বহুমুখী প্রকাশে পারসিক বৈশিষ্ট্য থাকলেও এমন সব বৈশিষ্ট্য সংযুক্ত হয় যা সম্পূর্ণ মুঘল ও ভারতীয়। মনে রাখতে হবে, চিত্র-শিল্প সম্পর্কে জাহাঙ্গিরের বিষয়-জ্ঞান ছিল। তুজুক-ই-জাহাঙ্গিরে তার পরিচয় মেলে। প্রথম দিকে জাহাঙ্গির শিকারের চিত্র অঙ্কনের দিকে বিশেষ নজর দেন। ফলে চিত্রে প্রকৃতির দৃশ্যাবলী চিত্রায়িত করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। পশু-পাখী, ফুল, গাছ ইত্যাদি ফুটিয়ে তোলা হয় বিভিন্ন ছবিতে। পরবর্তীকালে তিনি প্রতিকৃতি অঙ্কনের উপর বিশেষ জোর দেন। সে কারণে জাহাঙ্গিরের আমলে এক শ্রেণির চিত্রশিল্পী প্রতিকৃতি অঙ্কনে বিশেষ দক্ষ হয়ে ওঠেন। যেমন ইনায়েৎ, মনসুর প্রমুখ। তবে এব্যাপারে সবচেয়ে কীর্তিমান শিল্পী ছিলেন হাসিম। তাকে 'নাদির-অল-জামান' উপাধিতে ভূষিত করেন জাহাঙ্গির। তার আমলে প্রতিকৃতির মধ্যে ব্যক্তি-চরিত্র ফুটিয়ে তোলার যে প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়, তা আকবরের আমলে দেখা যায় না।

জাহাঙ্গিরের আমলের শিল্পীদের অনেকেই আকবরের আমলের শিল্পীদের বংশধর ছিলেন। যেমন বসওয়ানের পুত্র ছিলেন মনোহর। তেমনি গোবর্ধন, বিজন্দাস, আবুলহাসান প্রমূখ পারিবারিক সূত্রে পূর্ববর্তী আমলের শিল্পীদের আত্মীয় ছিলেন। জাহাঙ্গির শিল্পীদের গুণগত মানের ভিত্তিতে স্তরভেদ করেছিলেন। তার বিচারে হাসিম ছিলেন শ্রেষ্ঠ শিল্পী। তার পরেই মহম্মদ মনসুরের স্থান। আবার বিচিত্তির, গোবর্ধন, মনোহর, হাসান প্রভৃতি শিল্পীদের স্থান ছিল মনসুরের পরে। হাসিম শাহজাহান, জাহাঙ্গির মুমূর্ষ ইনায়েৎ খাঁ-র প্রতিকৃতি অঙ্কন করেন। বিচিত্তির অঙ্কিত প্রতিকৃতির মধ্যে ব্যক্তি-সত্ত্বাটি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা দেখা যায়। রোমান্টিক চিত্র অঙ্কনে দক্ষ ছিলেন গোবর্ধন। সূক্ষ্মতুলির ব্যবহারে দক্ষতা দেখিয়েছিলেন তিনি। গোবর্ধন ও বিচিত্তি-র ছবির ওপর ইউরোপীয় চিত্রশৈলীর প্রভাব লক্ষণীয়।

১২.৭ প্রশ্নাবলী

১. মুঘল চিত্রশিল্পের বিকাশ আলোচনা করুন।
২. মুঘল চিত্রকলার উপর পারসিক ও ইউরোপীয় প্রভাব আলোচনা করুন।

১২.৮ গ্রন্থপঞ্জি

❑ রায়চৌধুরী, তাপস কুমার (২০১৩), *সময় চেতনা ও শিল্পচেতনা*, কলকাতা।
❑ চট্টোপাধ্যায়, রত্নাবলী (২০১৫), *দরবারি শিল্পের স্বরূপ মুঘল চিত্রকলা*, থীমা।

একক ১৩ ❑ মুঘল স্থাপত্য

গঠন

১৩.০ উদ্দেশ্য

১৩.১ ভূমিকা

১৩.২ মুঘল স্থাপত্যের সুচনা

১৩.৩ আকবরি আমল

১৩.৪ জাহাঙ্গিরের আমল

১৩.৫ শাহজাহানের আমল

১৩.৬ ঔরঙ্গজেবের সময়কাল

১৩.৭ উপসংহার

১৩.৮ প্রশ্নাবলী

১৩.৯ গ্রন্থপঞ্জি

১৩.০ উদ্দেশ্য

বর্তমান এককের উদ্দেশ্য হল নিম্নে বর্ণিত বিষয়গুলির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে শিক্ষার্থীদের মুঘল স্থাপত্যের ঐতিহাসিক বিবর্তন সম্পর্কে অবহিত করা:

- মুঘল স্থাপত্যের সূচনা ও প্রাথমিক বিকাশ
- মুঘল স্থাপত্যকলার ঐতিহাসিক বিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায়

স্থাপত্য নির্মাণে মুঘল যুগ বিশেষ মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত। এযুগে নির্মিত তাজমহল আজও বিশ্বের সপ্তম আশ্চর্যের অন্যতম। পারসিক ভাবধারাকে অঙ্গীভূত করে যে ইন্দো-পরসিক স্থাপত্য রীতির বিকাশ ঘটে এসময়ে তার উজ্জ্বল নিদর্শন বিভিন্ন সমাধি সৌধ ও স্থাপত্য কীর্তি। সে যুগের স্থাপত্য শৈলী, স্থাপত্য নির্দশন, সম্রাটদের পৃষ্ঠপোষকতার স্বরূপ ইত্যাদি সম্পর্কে অবহিত হওয়া এই পাঠের উদ্দেশ্য।

১৩.১ ভূমিকা

মুঘলরা ভারতে প্রায় আড়াইশো বছর রাজত্ব করেছিল। বাবরের হাত ধরে যে সাম্রাজ্যের সূচনা হয়েছিল আকবর, জাহাঙ্গির, শাহজাহান ও ঔরংজেবের আমলে তা' সুবৃহৎ আকার ধারণ করে। সুদক্ষ

শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ায় আভ্যন্তরীণ শান্তি ও অর্থনৈতিক সুস্থিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। মুঘল সম্রাটেরা দীর্ঘ দিন শাসনকার্য চালাবার সুযোগ পান। অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ ও ব্যক্তিগত রুচিবোধ তাদের নগর ও স্থাপত্য নির্মাণে উৎসাহিত করে। আকবর ফতেপুরসিক্রি, আগ্রাকে রাজধানী হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন, জাহাঙ্গির লাহোরকে, আবার শাহজাহান দিল্লিতে শাহজাহানাবাদ নগর নির্মাণ করে তাকে রাজধানীতে পরিণত করেন। নব প্রতিষ্ঠিত এসব রাজধানীকে তারা নয়নাভিরাম ইমারত নির্মাণ করে সাজিয়েছিলেন যার মধ্যে মুঘল স্থাপত্যশৈলী বাঙ্ময় হয়ে উঠেছিল। আজও বিশ্বের দরবার তা স্বকীয় মহিমায় উজ্জ্বল।

১৩.২ মুঘল স্থাপত্যের সুচনা

মুঘল স্থাপত্য রীতিতে দুটি পৃথক যুগ স্পষ্ট।—প্রথমটি বাবর থেকে আকবরের রাজত্বের শেষ পর্যন্ত। এই সময়ে লাল বেলেপাথরের ব্যবহার হয়েছিল স্থাপত্য নির্মাণে। আর দ্বিতীয়টি শাহজাহানের রাজত্বের শেষ পর্যন্ত ব্যপ্ত-যখন সাদা মার্বেল পাথরের ব্যবহার অধিক লক্ষণীয়। মুঘল সাম্রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা আকবরের আমল থেকে মুঘল স্থাপত্য ঘরানা নিজস্ব রূপ গ্রহণ করলেও, এর শুভ সূচনা ঘটেছিল বাবরের ও হুমায়ুনের সময়কাল থেকেই। বাবার তার স্বল্পকালীন রাজত্বে শিল্প নিদর্শন গড়ে তোলার বেশি সময় না পেলেও তিনি স্থাপত্য নির্মাণে একেবারে উদাসীন ছিলেন না। পানিপথের কাবুলিবাগ মসজিদ ও দিল্লীর পূর্বে সম্বল শহরে জামা মসজিদ তৈরি করেন ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে। সম্ভবত আগ্রার পুরানো লোদী দূর্গের মধ্যে বাবর আরেকটি মসজিদ নির্মাণ করেন। ভারতের স্থাপত্য কারিগরদের নৈপুণ্য সম্পর্কে তিনি সশ্রদ্ধ ছিলেন। তবে ভারতের সৌধগুলির পরিকল্পনাহীনতা ও সমতাবিহীনতা তিনি পছন্দ করতেন না। প্রখ্যাত আলবানিয়ান স্থপতি সিনানের কয়েকজন ছাত্রকে তিনি এদেশে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। তারা সম্ভবত আসেননি। কারণ মুঘল স্থাপত্য পারসিক রীতিতে প্রভাবিত হয়েছিল। যেখানে তুর্কী প্রভাব নেই বললেই চলে।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের পূজারী বাবার আগ্রা ও লাহোরে কতগুলি উদ্যান নির্মাণ করেছিলেন। যদিও সেগুলির অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়নি।

বাবর মুঘল স্থাপত্যে বিশেষ ছাপ রেখে যেতে পারেননি। হুমায়ুনের ক্ষেত্রেও একই কথা বলা যেতে পারে। পিতার প্রতিষ্ঠিত রাজ্য হারিয়ে তিনি জীবনে বেশ সমস্যায় পড়েছিলেন। পারস্যের শাহ তাহমস্পের অধীনে তকে জীবনের বেশ কিছুটা সময় কাটাতে হয়েছিল। তবে দিল্লীর সিংহাসন হারাবার পূর্বে তিনি দু'টি মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। একটি আগ্রার কাছে এবং অন্যটি পাঞ্জাবের হিসার জেলার অন্তর্গত ফতেহবাদে। পারসিক রীতিতে নির্মিত কলাই করা টালিতে সজ্জিত এই মসজিদের নির্মাণশৈলী মুঘল স্থাপত্যকে প্রভাবিত করতে পারেনি ঠিকই, তবে হুমায়ুন পারস্য থেকে এ দেশে প্রত্যাবর্তন করে দিল্লীতে মুঘল শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠা করলে পারসিক স্থাপত্যরীতি সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন যা' পরবর্তীকালের মুঘল স্থাপত্য সৌধ নির্মাণে প্রভাব ফেলেছিল।

মুঘল স্থাপত্যের প্রথম উল্লেখযোগ্য নিদর্শন হল হুমায়ুনের সমাধিসৌধ, যা তার মৃত্যুর আট বছর পর তার সহধর্মিনী হাজী বেগমের উৎসাহে নির্মিত হয়। হুমায়ুন দিল্লিতে যমুনার তীরে যে শহর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন—দীনপনাহ (১৫৩৩), এই সমাধি তার সন্নিকটে গড়ে তোলা হয়। দীনপনাহ-র কোনো অস্তিত্ব এখন আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। শের শাহ হুমায়ুনকে পরাজিত করে দীনপনাহ ধ্বংস করেন আর তার জায়গায় প্রতিষ্ঠা করেন নিজ রাজধানী শহর 'শের শাহী'। বর্তমানে এটি দক্ষিণ দিল্লির পুরানা কিলা ফোর্ট নামে পরিচিত। হাজি বেগম মীর্জা গিয়াস নাম্নী এক পারসিক স্থপতিকে এই মসজিদ নির্মাণের দায়িত্ব দেন। ফলস্বরূপ হুমায়ুনের সমাধিতে পারসিক ও ভারতীয় স্থাপত্য রীতির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। বৃহৎ উদ্যানের মধ্যস্থলে সমাধিটি নির্মিত। প্রধান সৌধটি একটা বড় বেলেপাথরের চাতালের মাঝে বসানো। চারপাশে খিলানযুক্ত তোরণ। আর চাতালের মধ্যস্থলে সমাধিটি বর্তমান। সমাধিটি ১৪০ ফুট উঁচু গম্বুজ যুক্ত, যার সাথে রয়েছে স্তম্ভযুক্ত ছত্রী। সমাধিটিতে অষ্টকোণ যুক্ত অনেকেগুলি ঘর সন্নিবিষ্ট, ঘরগুলি জাফরি যুক্ত। লাল বেলেপাথরের সাথে সাদা মার্বেল পাথরের মেলবন্ধন ঘটেছে এই সৌধে। অধ্যাপক সরসী কুমার সরস্বতীর মতে, এটি হল তুর্কী স্থাপত্য রীতির অনুকরণ। পার্সী ব্রাউন জানিয়েছেন যে, পারস্যশৈলীর ভারতীয়করণ হল এই সমাধিসৌধ। এই সৌধে পারস্য শৈলীর নিদর্শন হল সৌধের ওপরে দু'টি ডোমের পাশাপাশি অবস্থান। পারস্যরীতির প্রভাব—এই সৌধের আভ্যন্তরীণ বিন্যাসেও লক্ষ্য করা যায়। ভারতীয় শৈলীর নিদর্শন অনুসারে একটি উদ্যানের মধ্যে সৌধটি নির্মিত। ডোমকে রক্ষা করার জন্য ছোট ছোট মিনার তৈরি হয়েছে, যা গুজরাটি স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য। আর উপরের সুন্দর ছত্রীগুলি হল রাজস্থান শৈলীর চিহ্ন।

১৫৬২ খ্রিস্টাব্দে দিল্লীতে আরও একটি সমাধি-সৌধ নির্মিত হয়—সেটি আতকা খানের। এটি নিজামুদ্দিন আউলিয়ার সমাধি সৌধের মধ্যে অবস্থিত। আকারে ছোট হলেও এটি রঙিন মার্বেল পাথর খচিত। ভাস্কর্য মণ্ডিত এই সমাধিসৌধ মুঘল সমাধিসৌধের অন্যতম আদর্শ দৃষ্টান্ত।

১৩.৩ আকবরি আমল

হুমায়ুনের সমাধি যখন নির্মিত হয়, সে সময় আকবর আগ্রা দুর্গ নির্মাণের কাজে হাত দেন। আকবরের সম্পদের অভাব ছিল না। অভাব ছিল না স্থাপত্য কীর্তি নির্মাণে উৎসাহেরও। লাল বেলেপাথরকে ভিত্তি করে আকবরি স্থাপত্যগুলি নির্মিত হয়েছিল। তবে তার মাঝে শ্বেত-পাথরের ব্যবহার ছিল চোখে পড়ার মত। আগ্রা দুর্গ নির্মাণের কাজ হয়েছিল ১৫৬৫ খ্রিঃ থেকে ১৫৭৩ খ্রিঃ পর্যন্ত। লাহোর, আজমীর ও এলাহাবাদেও আগ্রা দুর্গের স্থাপত্য শৈলীর অনুকরণে দুর্গ নির্মিত হয়। আগ্রা দুর্গের দুটি দরওয়াজা দক্ষিণের দরওয়াজা ছিল ব্যক্তিগত প্রবেশ দ্বার। আর পশ্চিমেরা দরওয়াজাকে বলা হত দিল্লি দরওয়াজা; আবুল ফজল লিখেছেন যে, আগ্রা দুর্গের অভ্যন্তর ভাগে আকবর পাঁচ'শ বাড়ি বানিয়েছিলেন। যেগুলি লাল পাথরের তৈরি এবং বাংলা ও গুজরাটি স্থাপত্য রীতিতে নির্মিত। শাহজাহানের সময় মার্বেল পাথরের

সৌধ করার জন্য এই বাড়িগুলি ভেঙ্গে ফেলা হয়েছিল। এই বাড়িগুলির একটি ছিল জাহাঙ্গির মহল। সম্ভবত যুবরাজ সেলিমের বাসস্থান ছিল এটি। এর মধ্যের হল ও অন্যান্য ঘরগুলি অনিয়মিত ভাবে তৈরি হয়েছিল। কোনো সমতা ছিল না। জাহাঙ্গির মহল মুঘল স্থাপত্য যুগের পরিবর্তনশীল সময়ের নিদর্শন। পঞ্চদশ শতকের শেষদিকে তৈরি গোয়ালিয়ার ও মানমন্দিরের সঙ্গে এর তুলনা করা যায়।

১৫৭০ খ্রিঃ আকবর আজমীর দুর্গ নির্মাণ করেন। এটি লাহোর দুর্গ বা গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমস্থলে অবস্থিত এলাহাবাদ দুর্গের থেকে গঠনগত দিক থেকে পৃথক। ছোট হলেও আজমীর দুর্গ শক্ত করে নির্মিত হয়েছিল। দুটি চওড়া পাঁচিল দিয়ে ঘেরা এই দুর্গ আকবরের আজমীর ভ্রমণের সময় বাসস্থান হিসাবে ব্যবহার করার জন্য নির্মিত হয়। এর মাঝে ছিল স্তম্ভযুক্ত একটি হল ঘর দোতলা এই বাড়ীতে দু'সারি স্তম্ভ ছিল। আর এর প্রতি কোণে ছিল ঘর। তবে মাঝের ঘরটি সবচেয়ে বড়। সেখানেই সম্রাট থাকতেন।

তবে আকবরের সবচেয়ে বিখ্যাত স্থাপত্যকীর্তির নিদর্শন রয়েছে ফতেপুরসিক্রীতে। আগ্রা থেকে ২৬ মাইল দূরে প্রায় ১০ কিলোমিটার ব্যাসার্ধ নিয়ে এই নগর তিনি নির্মাণ করেন প্রায় পনেরো বছর ধরে। এর মধ্যে ছিল বাসস্থান, সরকারি দপ্তর, ধর্মালোচনার গৃহ, পশুশালা ইত্যাদি। দ্বাদশ বৎসর কাল আকবর এখানে অতিবাহিত করেছিলেন। সেলিম চিস্তির সমাধিকে ঘিরে ফতেপুর সিক্রী গড়ে ওঠে। লাল পাথরে তৈরি এই নগর উত্তর-পূর্ব দিক থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে প্রসারিত। ঐ অঞ্চলে পাথর কেটে তা দিয়েই প্রসাদগুলি তৈরি করা হয়েছিল। একটি উঁচু প্রাচীর প্রায় ছ'কিলোমিটার ধরে উত্তর থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে শহরটিকে ঘিরে রেখেছে। পশ্চিম দিকে অবস্থিত একটি বৃহৎ হ্রদ শহরকে সুরক্ষিত করেছে। ভেতরে প্রবেশের জন্য আগ্রা দরজা ছাড়া অন্যান্য প্রবেশপথ ছিল। শহরের বাড়িগুলি উত্তর-পূর্ব থেকে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে প্রসারিত। এখানেই গড়ে ওঠে দেওয়ান-ই-আম বা আকবরের অফিস ও দৌলতখানা বা রাজপ্রাসাদ। দৌলতখানার অভ্যন্তরীণ ভাগে বড় দু'কামরার মত এক বড় ঘর। ঐটি দেওয়ানী-ই-খাস। এছাড়া ছিল সম্রাটের থাকবার ঘর খোয়াবগাহ, হাম্মান বা স্নানঘর। দৌলতখানার পাশে ছিল ইবাদতখানা, ফর্দখানা বা অতিথিদের আবাসগৃহ, হারামসরা (মহিলাদের বাসস্থান)। হারামসরার মধ্যেই ছিল যোধাবাঈ-এর প্রাসাদ। হারামসরা আদতে ছিল এক বৃহৎ অট্টালিকা। বাড়িটির গুজরাটি হিন্দু স্থাপত্যের আদলে গড়া যার মধ্যে, শিকল, পদ্ম ইত্যদি হিন্দু অলংকরণ লক্ষ্য করা যায়। এর সন্নিকটেই অবস্থিত হাওয়ামহল এবং পঞ্চ মহল। চারতলা উঁচু সৌধটি স্তম্ভের উপর ভিত্তি করে দণ্ডায়মান। এছাড়া ছিল বীরবলের প্রাসাদ, মারিয়মের প্রাসাদ, তুর্কী সুলতানার প্রাসাদ। এ ছাড়াও অন্যান্য সেসব ইমারত ছিল ফতেপুসিক্রীতে সেগুলি সবেই সৌন্দর্যমণ্ডিত, গঠনগত দিক থেকে সুরুচিবোধের পরিচায়ক। তবে এ সবের মধ্যে মুঘল স্থাপত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হল দেওয়ান-ই-খাস। বিশাল হলের মধ্যে এর থামগুলি সম্রাটের আসনকে আড়াল করেনি। পরিকল্পিত নির্মাণ ও ভারতীয় অলঙ্করণ রীতিতে প্রস্তুত এই ইমারত মুঘল স্থাপত্যের গৌরব।

ফতেপুর সিক্রীর টিলার সবচেয়ে উঁচু জায়গার নাম ছিল জামা মসজিদ। পাঁচ বছর ধরে তৈরি এই মসজিদের সব নির্মাণ সম্পূর্ণ হয় ১৫৭১-৭২ সালে, এবং পূর্বদিকের প্রবেশপথে ছিল বাদশাহি দরওয়াজা এর পরেই ছিল বিস্তৃত উঠান ও সেলিম চিস্তির মার্বেল পাথরের সমাধি। তবে এই মসজিদে প্রবেশের প্রধান দরজা ছিল বুলন্দ দরওয়াজা। গুজরাট বিজয়ের স্মারক হিসাবে আকবর এই দরওয়াজাটি নির্মাণ করেন ১৫৭০-৭৩ খ্রিস্টাব্দে। এর উচ্চতা মাটি থেকে প্রায় ১৭৬ ফুট। জামা মসজিদের বিশাল

চত্বর, আর্চ, ডোম, ছত্রী দিয়ে এই মসজিদটি সাজানো। পার্সি ব্রাউনের মতে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে এর পরিকল্পনা রচিত ও তার বাস্তবায়ন একে সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছে। ফার্গুসনের মতে, ফতেপুরসিক্রীর সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় সৌধ হল মহাৎ ও রাজকীয় এই জামা মসজিদ।

১৩.৪ জাহাঙ্গীরের আমল

স্থাপত্যের নির্মাণের চেয়ে চিত্রশিল্পের জাহাঙ্গিরের আগ্রহ ছিল বেশী। তবুও তাঁর আমলের কিছু স্থাপত্য নিদর্শন পাওয়া গেছে। এর মধ্যে প্রথম উল্লেখযোগ্য হল আগ্রার সন্নিকটে সেকেন্দ্রায় আকবরের সমাধিসৌধ। এর স্থান নির্বাচন ও পরিকল্পনা সম্ভবত আকবরই করে গিয়েছিলেন। জাহাঙ্গিরের আমলে এই সৌধ নির্মিত হয়। ১৬১৩ খ্রিস্টাব্দে এর নির্মাণ সমাপ্ত হয়। চারপাশে প্রাচীর বেষ্টিত বৃহৎ এক উদ্যানের মাঝে ৩২০ ফুট চতুষ্কোণ বিশিষ্ট এই সমাধিসৌধ অবস্থিত। উচ্চতা ১০০ ফুট। দক্ষিণ দিকে এর প্রধান প্রবেশ পথ পাথরের অলঙ্কার খোচিত, সৌন্দর্যমণ্ডিত। এর চার কোণায় চারটি মার্বেল পাথরের মিনার বর্তমান। আকবরের সমাধি ছাড়া জাহাঙ্গিরের আমলে আরও কয়েকটা স্থাপত্য নিদর্শন গড়ে ওঠে। যেমন জলন্ধরের সরাই-এর এক দরজা। এছাড়া শেষ জীবনে জাহাঙ্গির লাহোরের কাছে শহদরায় নিজের সমাধিসৌধ নির্মাণ শুরু করেন। তার মৃত্যুর পর স্ত্রী নূরজাহান তা সম্পূর্ণ করেন। রাভি নদীর পাড়ে প্রাচীর বেষ্টিত এক বৃহৎ চতুষ্কোণ বাগানের মাঝে এই সমাধি অবস্থিত। একতলা এই সৌধের প্রতি কোণে একটি মিনার অবস্থিত। মূল্যবান রত্ন খোচিত সাদা মার্বেল পাথরে ঢাকা কবর ও উপরের ছাদের মধ্যে এক ছোট গহ্বর দিয়ে আলো আসর সুবন্দোবস্ত করা। সমাধির দেওয়ালগাত্র ফ্রাস্কো চিত্র শোভিত ও মূল্যবান পাথর খোচিত। এছাড়া রয়েছে মহার্ঘ মোজাইকের কাজ।

মুঘল স্থাপত্যের ইতিহাসে জাহাঙ্গিরের রাজত্বকাল এক যুগ সন্ধিক্ষণ হিসাবে চিহ্নিত। এটি আকবরি যুগের সাথে শাহজাহানী যুগের সংযোগ ঘটিয়েছে। স্থাপত্য নির্মাণের উপকরণ হিসেবে জাহাঙ্গির আকবরি আমলের লাল বেলেপাথরের সাথে শাহজাহান আমলের শ্বেত পাথরও ব্যবহার করেন। মুসলিম খিলানরীতি ও হিন্দু স্তম্ভ-মর্দল রীতির প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায় তার আমলের শিল্প-স্থাপত্যে। আলংকরণের কাজে খোদাই নক্সার আধিক্য অত্যাধিক সৌন্দর্যের সন্নিবেশ এ যুগের শিল্প বৈশিষ্ট্য। এ সময়ের অপর এক উল্লেখযোগ্য স্থাপত্য রীতি হল ইতিমদদৌল্লার সমাধিসৌধ। জাহাঙ্গিরের মহিষী নূরজাহান তাঁর পিতা ইতিমদদৌল্লার স্মৃতিতে এ সমাধি নির্মাণ করেন ১৬২৬ খ্রিস্টাব্দে। আগ্রার সন্নিকটে যমুনার বাম পার্শ্বে অবস্থিত আয়তনে ছোট অপূর্ব কারুকার্যশোভিত ইমারতটি সম্পূর্ণ সাদা মার্বেল পাথরে ঢাকা। সাদা মার্বেলের ওপর ল্যাপিস লাজুলী, কর্ণেলিয়া, জ্যাপসার, টোপাজ ইত্যাদি পাথর বসানো অলঙ্কার এই সৌধের বিশেষ বৈশিষ্ট্য যা 'পিয়েট্রা ডুরা' নামে পরিচিত। পরবর্তীকালে মুঘল স্থাপত্যে পাথরের উপর যে মণিমুক্ত বাসানোর রেওয়াজ শুরু হয়েছিল ইতিমদদৌল্লার সমাধি থেকেই তার সূচনা হয়। লক্ষণীয় যে, লাল বেলেপাথরের সৌধ নির্মাণের চিরাচরিত রীতি এক্ষেত্রে অনুসৃত হয়নি। লাহোর প্রাসাদ, লাহোরের জাহাঙ্গিরের সমাধিসৌধ এ যুগেরই অন্যতম স্থাপত্য নিদর্শন। খান-ই-খানান আব্দুর

রহিমের স্মৃতিসৌধ জাহাঙ্গিরের রাজত্বকালের শেষ দিকে নির্মিত হয় দিল্লিতে। মুঘল স্মৃতিসৌধের বিবর্তনের ধারাকে লক্ষ্য করলে এটিকে শ্রেষ্ঠত্বের স্তরের পূর্বাভাস বলা যেতে পারে।

১৩.৫ শাহজাহানের আমল

শাহজাহানের রাজত্বকালে মুঘল স্থাপত্যরীতি পূর্ববর্তী যুগ থেকে এক নতুন যুগে প্রবেশ করে। এই পর্বে লাল বেলেপাথরের স্থানে সাদা মার্বেল পাথরের ব্যবহার শুরু হয়। ফলে আকবরি আমলের স্থাপত্য ধারা এ যুগে ক্রমে পরিবর্তিত হয়। যোধপুরের মাকরাণার উৎকৃষ্ঠ ও নরম মার্বেল পাথরের ব্যবহার শুরু হয় স্থাপত্যকর্মে। এই মার্বেলের ওপর বসানো হত নানান বর্ণের পাথর। ফলে স্থাপত্য নিদর্শনগুলি হত বেশ জমকালো। সিংহাসনে বসার পর শাহজাহান আগ্রা ও লাহোর দুর্গপ্রসাদে মার্বেল বসাতে শুরু করেন। শুরুতে আগ্রা দুর্গের দেওয়ান-ই-আমের সংস্কার করেন। দশ বছর পর দেওয়ান-ই-খাস এর পরিবর্তন করেন। এই সময়ে তিনি মার্বেল পাথরের জোড়া স্তম্ভ নির্মাণ করেন। এখানে শাহজাহান নির্মিত অন্যান্য স্থাপত্য নিদর্শনগুলি হল মোতি মসজিদ, শীশ মহল, নাগিনা মসজিদ ও মুসাম্মান বুরুজ ও আঙ্গুরি বাগ, মাছনি ভবন, মোতি মসজিদ। লাহোর দুর্গপ্রসাদেও একই ধরণের পরিবর্তন ঘটান। দুর্গের উত্তর দিকে অবস্থিত দেওয়া-ই-আম, খোয়াবগাহ, শীশমহল, মুসাম্মান বরুজ এবং নওলাখা-তে তিনি নতুন ভাবে মার্বেল বসান।

আগ্রা দুর্গের অভ্যন্তরে অবস্থিত মোতি মসজিদ শাহজাহানের স্থাপত্যকর্মের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি। আয়তনে ছোট হলেও এর সৌন্দর্য নয়নাভিরাম। মাথার ওপর তিন গম্বুজ শোভিত এ মসজিদের চার কোণায় চারিট অষ্টকোণী মিনার এর শোভা বধর্ন করে। মর্মর প্রস্তরে নির্মিত এই মসজিদ সম্পর্কে ফার্গুসন বলেছেন, ''One of the purest and most elegent building of its class to be found anywhere.''

শাহজাহান দিল্লিতে শাহজাহানাবাদ নামে নতুন শহর বানিয়েছিলেন এবং সেখানে এক দুর্গপ্রাসাদ নির্মাণ করে আগ্রা থেকে রাজধানী সরিয়ে নিয়ে যান। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আকবর (১৫৫৬-১৬০৫) ও জাহাঙ্গির (১৬০৫-১৬২৭) সমগ্র মুঘল সাম্রাজ্যকে শাসন করতেন আগ্রা থেকে। ১৬৩৯ সালে শাহজাহান নতুন এক শহর নির্মাণের জন্য তার স্থপতি, জ্যোতির্বিদদের আগ্রা থেকে লাহোরের মধ্যে মৃদু আবহাওয়ার কোনো স্থান নির্বাচনের নির্দেশ দেন। তারা যমুনার তীরে পুরানা কেল্লার ঠিক উত্তরে অবস্থিত একটি স্থান নির্বাচন করেন। এখানেই গড়ে ওঠে তার নতুন রাজধানী শহর শাহজাহানাবাদ। বর্তমানে পুরানো দিল্লিতে (Old Delhi) এর অবস্থান। এখানে তার নির্মিত স্থাপত্যে ইসলামীয় ও হিন্দু প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ফতেপুরসিক্রির লালপাথর ব্যবহার করে তিনি এই দুর্গ-প্রাসাদ নির্মাণ করেন। নাম উর্দু-ই-মুয়াল্লা। বর্তমানে এটি 'লালকেল্লা' নামে পরিচিত। এর বিশালতা ও উচ্চতা বিস্ময়ের উদ্রেক করে। লালকেল্লা সম্পর্কে অধ্যাপক সরস্বতী মন্তব্য করেছেন: ''It excels the other Moghul places in the largeness

of its conception, in the uniformity of its arrangements and in the magnificence of its execution.'' আট বছর ধরে নির্মিত এই দুর্গের নির্মাণ সম্পূর্ণ হয় ১৬৪৮ খ্রিস্টাব্দে এবং ১৯শে এপ্রিল সম্রাট তার নতুন রাজধানীতে প্রবেশ করেন। এই দুর্গনগরীর দুটি প্রবেশ পথ—পশ্চিম দিকে 'লাহোর গেট' এবং দক্ষিণের প্রবেশ পথ 'দিল্লী গেট'। এটির আভ্যন্তরীণ পরিধি আগ্রা দুর্গের চাইতে বৃহৎ। দুর্গের অভ্যন্তরে দেওয়ান-ই-আম, দেওয়ান-ই-খাস, হাম্মাম, রংমহল সবই তৈরি হয়েছিল অতি মনোরম ভাবে। দুর্গের অভ্যন্তরে দ্বিতল বিশিষ্ট নহবৎখানা। তারপর আয়তকার প্রসারিত উন্মুক্ত স্থানের পূর্ব দিকে অবস্থিত দেওয়ান-ই-আম'। বেলেপাথরে নির্মিত এই হল ঘর ছিল সাধারণ মানুষের সাথে সম্রাটের মিলন ক্ষেত্র। স্তম্ভ যুক্ত এই ঘরের তিন দিক উন্মুক্ত। ঘরে সাদা মার্বেলে মোড়া উচু বেদি যার উপরে থাকত সম্রাটের সিংহাসন। এই বেদিকে বলা হত 'নাশিহমাম-ই-জিল-ই-ইলাহি' বা 'ভগবানের ছায়ার আসন'।

দিল্লির লালকেল্লার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল এর দেওয়ান-ই-আম। হিন্দু স্থাপত্যরীতির প্রভাব এতে স্পষ্ট। দেওয়ানী-আমের থাম ও গম্বুজ এমন পরিকল্পনা মাফিক করা হয়েছিল যে, যে কোনো স্থান থেকে সিংহাসনরূঢ় সম্রাটের দর্শন লাভ করা যাবে। এখানে সংস্থাপিত ছিল ময়ূর সিংহাসন। দুর্গ প্রাসাদের বাইরে শাহজাহান তৈরি করেন জামা মসজিদ। লাল বেলেপাথরে তৈরি সমকোণী চতুর্ভূজ আকৃতির এই মসজিদ সাম্রাজ্যের বৃহত্তম মসজিদ।

দেওয়ন-ই-খাস মহার্ঘ অলংকরণের জন্য খ্যাত ছিল। মর্মরপ্রস্তরে নির্মিত এই সৌধের ছাদের নীচের অংশ রূপার পাত দিয়ে মোড়া। খোলামেলা এই ইমারতের সম্মুখভাগের দেওয়াল পাঁচটি সমান মাপের বহুভূজাকার খিলান দ্বারা গঠিত। মেঝে মর্মরপ্রস্তরে আবৃত। আর এর দেওয়ালে ফারসি-তে উৎকীর্ণ সেই বিখ্যাত স্তোত্র:

আগর ফেরদৌস বারু-ই জামিন অস্ত
উ-হমন্ অস্ত, উ-হমন্ অস্ত, উ-হমন্ অস্ত।

অর্থাৎ পৃথিবীতে যদি কোথাও স্বর্গ থেকে থাকে তবে তা এখানে, এখানে তা' এখানে। ফার্গুসন তাই লিখেছেন, ''এটি শাহজাহান নির্মিত সৌধগুলির মধ্যে সুন্দরতম না হলেও, সর্বাধিক অলংকৃত সৌধের মধ্যে অন্যতম ছিল।

কন্যা জাহানারা বেগমের সম্মানে শাহজাহান আগ্রাতেও একটি জামা মসজিদ তৈরি করেন। দিল্লির মসজিদের থেকে এটি অনেক ছোট। লম্বায় ১৩০ ফুট ও চওড়ায় ১০০ ফুট। এর মাথায় তিনটে গম্বুজ। আকারে ছোট হলেও এর সৌন্দর্য ও কমনীয়তা ছিল নজরকাড়া।

আগ্রা ও দিল্লির জামি মসজিদের তুলনা করে ডঃ সরস্বতী লিখেছেন : ''The Jami Masjid at Agra has an emotional character, in contrast to the severe and imperious appearance of its counterpart at Delhi.''

শাহজাহানের আমলে পাথর ও মার্বেলের সংমিশ্রণে বিভিন্ন সৌধ নির্মিত হয়েছিল। পাঞ্জাবের বিশেষত লাহোরে সে সময়ে এক ধরনের ইমারত গড়ে উঠেছিল। যেগুলি প্রধানত ইঁটের ও বেলেপাথর দ্বারা নির্মিত হয়েছিল। এই ইমারতগুলি নির্মাণে ব্যবহারকরা হত লাল টালি, যেগুলি সম্ভবত পারসিক শিল্পে ব্যবহৃত হত। তবে ভুললে চলবে না পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ দিকে বাংলাতেও প্রচুর ইট ও টালির ব্যবহারের ইমারত নির্মিত হয়েছিল। লাহোরের ওয়াজির খানের মসজিদ ও আগ্রায় আফজল খানের সমাধি এই রীতিতে নির্মিত হয়।

শাহজাহানের আমলের স্থাপত্য নিদর্শন তাজমহল। এটি আরজুমন্দ বানু বেগম তথা মমতাজমহল-এর স্মৃতিতে শাহজাহান এটি নির্মাণ করেন। আগ্রার দক্ষিণে যমুনা নদীর তীরে রাজা মান সিংহের একটি জমি ও বাড়ি ছিল। তার মালিক ছিলেন মান সিংহের দৌহিত্র রাজা জয় সিংহ। শাহজাহান সে বাড়ি ও জমি ক্রয় করেন। ১৬৩১ এর ডিসেম্বরে কাজ শুরু হয় তাজমহলের। প্রথমে ঐ জমির উত্তর-পশ্চিম কোণে এক ছোট সৌধের মধ্যে সাময়িকভাবে মমতাজের দেহ রাখা হয়। ১৬৪৩ সালে তাজমহল নির্মাণ শেষ হলে মূল ভবনে দেহ সমাহিত করা হয়। পাদ্রী সেবাস্টিয়ান মানরিখের মতে, তাজমহলের প্রধান বাস্তুকার ছিলেন ইতালীয় জেরেলিমো ভেরোনিও। কিন্তু বর্তমানে এ মত আর গ্রাহ্য নয়। তাজমহল যদি ইউরোপীয় বাস্তুকার দ্বারা নির্মত হত, তবে নিশ্চয়ই এর ওপর পাশ্চাত্য স্থাপত্য প্রভাব লক্ষ্য করা যেত। কিন্তু তাজমহলে ইন্দো-পারসিক স্থাপত্য রীতির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

তাজমহল তৈরি করেছিলেন ওস্তাদ হামিদ, যিনি আবার লালকেল্লা নির্মাণের সাথেও যুক্ত ছিলেন। প্রকৃত ঘটনা হল তাজমহলের বিভিন্ন অংশের কাজ বিভিন্ন স্থানের শিল্পীদের দিয়ে করানো হয়েছিল— যেমন আভ্যন্তরীণ অলংকরণের কাজ করেছিল মুলতান ও কনৌজের শিল্পীরা। বাগিচা তৈরির দায়িত্বে ছিলেন কাশ্মীরের হিন্দু বাগিচা বিশারদ রণমল, খোদাইয়ের কাজ করেছেন কান্দাহারের শিল্পী আমনত খাঁ, গম্বুজের কাজ করেছেন কনস্ট্যান্টিপোপাল থেকে আগত ইসমাইল খাঁ।

এই সৌধ নির্মাণে দুটি স্থাপত্যের প্রভাব ছিল। একটি হল হুমায়ুনের সমাধি এবং অন্যটি দিল্লির আব্দুর রহিম খান-ই-খানান এর সমাধি সৌধ। বিশেষত তাজমহলের ভিতরের দিক হুমায়ুনের সমাধির অনুকরণে গড়া হয়েছিল। তবে এই সমাধির প্রধান বৈশিষ্ট্য এর বহির্দেশের সৌন্দর্য। এর মার্বেলের মসৃণতা ও উজ্জ্বল্য আজও তাজমহলকে রমণীয় করে রেখেছে। শাহজাহান তাজমহলের বিপরীতে তাঁর নিজের সমাধিসৌধ নির্মাণে আগ্রহী ছিলেন। কাজও শুরু হয়েছিল। কিন্তু তার পুত্রদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ শুরু হওয়ায় শেষ পর্যন্ত তা আর হয়ে ওঠে নি। ঔরঙ্গজেবও শাহজাহানের কোনো সমাধি সৌধ নির্মাণ করেননি। তাজমহলের অভ্যন্তরেই শাহজাহানের দেহ সমাহিত করা হয়।

১৩.৬ ঔরঙ্গজেবের সময়কাল

ঔরঙ্গজেবের সময়কাল মুঘল স্থাপত্যের অবনমনের কাল। এ সময়ে মুঘল স্থাপত্য শিল্পের অবনমন

ঘটে। স্থাপত্যের সংখ্যাও উল্লেখযোগ্য ভাবে হ্রাস পায়। ঔরঙ্গজেব দীর্ঘকাল যুদ্ধ বিগ্রহে ব্যাপৃত থাকায় এবং দীর্ঘ ২৫ বছর দাক্ষিণাত্যে অবস্থান করায় স্থাপত্য নির্মাণের দিকে তেমন নজর দিতে পারেন নি। তাছাড়া পরিস্থিতির বিবেচনায় তিনি ব্যয় সংকোচের নীতি নেন। দাক্ষিণাত্যে অবস্থান কালে ঔরঙ্গাবাদের তাঁর রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানে তিনি এক দুর্গ তৈরি করেন। দাক্ষিণাত্যেই শেষ শক্তিশালী মুঘল সম্রাটের বেগম রাবেয়া-উদ্-দুরানীর মৃত্যু হয়। ঔরাঙ্গাবাদেই তাঁর ছেলে মা'য়ের সমাধিসৌধ নির্মাণ করেন। এই সৌধটি মমতাজমহলের ব্যর্থ অনুকরণ মাত্র। এর আয়তন তাজমহলের অর্ধেক। অলঙ্করণও অতি সাধারণ। ছোট বড় গম্বুজগুলি সামঞ্জস্যহীণ। তাজমহলের কোমলতা এখানে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। ধর্মপ্রাণ মানুষ ঔরঙ্গজেব নিজ ধর্মচর্চ্চার জন্য দিল্লি দুর্গের অভ্যন্তরে মোতি মসজিদ নির্মাণ করেন। তবে আগ্রার মোতি মসজিদের সঙ্গে এর কোনো তুলনাই চলে না। লাহোরে জামি মসজিদ তাঁর আমলেই নির্মিত হয় যার ছাদের ওপর উপস্থিত অষ্টমিনার মসজিদটিকে বিশিষ্টতা প্রদান করেছে। লাল বেলে পাথরের মাঝে মর্মর পাথরের কারুকার্য শোভিত এই 'বাদশাহি মসজিদ' আয়তনে বিশাল।

ঔরঙ্গজেবের আমলে আরও কয়েকটি স্থাপত্য নিদর্শন পাওয়া যায়। এর মধ্যে বারাণসীর মসজিদ, মথুরার জামা মসজিদ বিখ্যাত। বারাণসীর মসজিদের বিশেষ কোনো বৈশিষ্ট্য নেই। তবে মথুরার জামা মসজিদ দ্বিতল বিশিষ্ট এবং নানা বর্ণের টালি শোভিত। এর মিনার মসজিদের সৌন্দর্যকে উজ্জ্বল করেছে।

১৩.৭ উপসংহার

সপ্তদশ শতকের শেষের দিকে বা অষ্টাদশ শতকের সূচনায় মুঘল স্থাপত্যের আর তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য নিদর্শন মেলে না। তবে এ সময়ে প্রাদেশিক স্তরে বেশ কিছু স্থাপত্য নিদর্শন গড়ে ওঠে স্থানীয় নৃপতিদের উদ্যোগে যেগুলি মুঘল ঐতিহ্যের যোগ্য ও গৌরবোজ্জ্বল উত্তরাধিকার বহন না করলেও সেগুলির মধ্যেই ভারতীয় শিল্প ঐতিহ্যের পরম্পরা টিকে ছিল। ১৭৫৪ খ্রিস্টাব্দে দিল্লিতে নির্মিত হয় সফদরজং-এর সমাধি। এর নির্মাণ সৌষ্ঠবের মধ্যে মুঘল স্থাপত্য রীতিকে অনুসরণ করার এক প্রয়াস দেখা যায় যদিও তা কখনোই মুঘল স্থাপত্য গৌরবকে স্পর্শ করতে পারেনি।

১৩.৮ প্রশ্নাবলী

১. ভারতবর্ষে মুঘল স্থাপত্য রীতির সূচনা কীভাবে হয়েছিল?
২. আকবরের রাজত্বকালে মুঘল স্থাপত্য রীতি সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লিখুন।
৩. জাহাঙ্গিরের রাজত্বকালে মুঘল স্থাপত্যের বিকাশ সম্পর্কে কী জানেন?
৪. শাহজাহানের রাজত্বকাল কি মুঘল স্থাপত্যের ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা গৌরবজ্জ্বল?
৫. শাহজাহানের রাজত্বকালে মুঘল স্থাপত্যের একটি মূল্যায়ন করুন।
৬. মুঘল স্থাপত্যের ইতিহাসে সম্রাট ঔরঙ্গজেবের কার্যকলাপ সম্পর্কে একটি টীকা লিখুন।

১৩.৯ গ্রন্থপঞ্জি

- Majumdar, R.C. (1974), *History and Culture of the Indian People: The Mughal Empire,* Vol. VII, Bharatiya Vidya Bhavan.
- Asher, Catherine Blanshard (1992), *Architecture of Mughal India,* Cambridge University Press.
- Koch, Ebba (2002), *Mughal Architecture : An Outline of its History and Development, 1526-1858,* Primus Book.
- Bhargava, Meena (2010) *Exploring Medieval India : Sixteenth to Eighteenth Centuries,* Culture, Gendre, Regional Patterns, Vol II, Orient BlackSwan.

—

পর্যায় ৫:
আঞ্চলিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা

একক ১৪ ❑ রাজপুত রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও রাষ্ট্র গঠন

গঠন

১৪.০ উদ্দেশ্য

১৪.১ ভূমিকা

১৪.২ রাজপুত রাষ্ট্রব্যবস্থা

১৪.৩ রাষ্ট্রের প্রকৃতি

১৪.৪ উপসংহার

১৪.৫ প্রশ্নাবলী

১৪.৬ গ্রন্থপঞ্জি

১৪.০ উদ্দেশ্য

এই একটি পাঠ করে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা অবহিত হবেন :

- রাজপুত শক্তির রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও রাষ্ট্রগঠন প্রক্রিয়া কীভাবে হয়েছিল।
- রাজপুত রাষ্ট্রের প্রকৃতি কেমন ছিল।
- সামন্ততন্ত্রের বিকাশের সঙ্গে রাজপুত রাষ্ট্রের সম্পর্ক কী ছিল।

১৪.১ ভূমিকা

গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের ফলে যে রাজনৈতিক শূন্যতার সৃষ্টি হয়, তার সুযোগ নিয়ে স্থানীয় শাসকরা নিজেদের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়। এর ফলশ্রুতি হিসেবে পুষ্যভূতি বংশের উত্থান ঘটে এবং হর্ষবর্দ্ধনের সুদক্ষ শাসনে এই বংশের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায়। হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যুর পর আবার এক বিশৃঙ্খল অধ্যায়ের সূচনা হয় এবং রাজপুত বংশোদ্ভুত গুর্জর প্রতিহারদের আবির্ভাবের আগে পর্যন্ত উত্তর ভারতে রাজনৈতিক স্থায়িত্বের পরিবেশ গড়ে ওঠেনি। গুর্জর প্রতিহাররা যে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে তা পুষ্যভূতিদের থেকেও ছিল বৃহৎ এবং শক্তিশালী। এই এককে মধ্যযুগের ভারতে এক যোদ্ধা জাতি হিসেবে রাজপুতদের রাজনৈতিক অবস্থার পরিচয় দেওয়া হবে। জেমস টডের বিবরণ অনুযায়ী রাজপুতদের রাজনৈতিক কাঠামো ছিল ইউরোপের মত সামন্ততান্ত্রিক। রাজা ভূমির অধিকার দিতেন এজন্য এর পরিবর্তে রাজস্ব আদায় করতেন। এই ব্যবস্থায় সামন্তপ্রভুরা শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং রাজা নামমাত্র প্রধান হিসেবে নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখেন। আদি মধ্যযুগের ভারতবর্ষের বৈশিষ্ট্য ছিল ছোটো ছোটো বিচ্ছিন্ন রাজ্যের অস্তিত্ব। রাজপুত রাষ্ট্রব্যবস্থায় রাজ্য জাতির নামে পরিচিত হত। রাজ্যগুলির শাসনব্যবস্থা শুধুমাত্র জাতি ব্যবস্থা

দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল তা নয়, রাজস্থানের রাজনৈতিক ঐক্যকেও এটি প্রভাবিত করেছিল। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, রাজনৈতিক কর্তৃত্বের অবক্ষয়ের প্রেক্ষাপক্ষে ইউরোপে সামন্ততন্ত্রের উত্থান হলেও মধ্যযুগে রাজস্থানের ক্ষেত্রে এই প্রেক্ষাপট অনুপস্থিত ছিল।

১৪.২ রাজপুত রাষ্ট্রব্যবস্থা

আদি মধ্যযুগের ভারতে রাজপুতদের আবির্ভাব ইতিহাসের একটি বিশেষ অধ্যায়। বেশ কয়েক শতাব্দী ধরে তারা ভারতীয় রাজনৈতিক ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যুর পর থেকে উত্তর ভারতে মুসলমানদের বিজয় পর্যন্ত এই সময়কালে রাজপুত জাতির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। Vincent Smith বলেন, *'They (i.e. The Rajput clans) became so prominent that the centuries from the death of Harsha to the Muslim conquest of Northern India, extending in round numbers from the middle of the seventh to the close of the twelfth century, might be called the propriety of the Rajput period'* অবশ্য রাজপুত জাতির কর্তৃত্ব উত্তর এবং পশ্চিম ভারতে সীমাবদ্ধ ছিল।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট এবং অর্থনৈতিক অবস্থার তাগিদে রাজপুত রাজ্যগুলি জাতিগত ভিত্তিতে এক একটি এককে সংগঠিত হয়েছিল। S. C. Dutt বলেন, *'The ruling class belongs to a particular clan....The humblest members of the clan considered themselves along with the ruler as the sons of the same father enjoying their patrimony by the same right as the ruler himself. The latter was thus nothing but a primus inter pares...The state in fact did not belong to the ruler...it belonged to the clan as a whole.'* রাজপুত রাষ্ট্র ব্যবস্থার রাজ্যগুলির সঙ্গে জাতি বা রাজবংশ জড়িয়ে থাকায় রাজ্যগুলির অভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থা যেমন প্রভাবিত হয়েছিল তেমনি রাজপুতানার রাজনৈতিক ঐক্যের উপর এর প্রভাব পড়েছিল। জাতি বা বংশগত বিবাদ রাজপুত ইতিহাসের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতবর্ষেও এর ব্যতিক্রম হয়নি বলে J. N. Sarkar মনে করেন। J. N. Sarkar বলেন, 'The jealous rivalry between the Rathors and the Kachhwas the dominating factor of Rajput society even under British rule' রানা সঙ্গ যাকে রাজপুত কাহিনিকারগণ গর্বের সঙ্গে হিন্দুপাট (Hindupat) নামে অভিহিত করেছেন, তিনি খানুয়ার যুদ্ধের সময় প্রত্যক্ষ করেন যে রাজপুতরা ঐক্যবদ্ধভাবে তাদের শত্রুর বিরুদ্ধে মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত নয়। সংগ্রাম সিংহ রাজপুত্রদের মধ্যে ঐক্য গড়ে তোলার সচেষ্ট হলেও তা রাজপুতদের ঐতিহ্যগত সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামোর সঙ্গে সম্পৃক্ত না হওয়ায় তা কার্যকরী হয়নি। যদি কোনো রাজপুত্র সমগ্র রাজস্থানকে নিয়ে একটি রাজ্য গঠনে সক্ষম হতেন তাহলে হয়ত মুসলমানদের সাম্রাজ্য বিস্তারে রাজপুতরা বড় রকমের প্রতিবন্ধকতার কাজ করতে পারত, রাজপুতরা তাদের সংকীর্ণ গোষ্ঠীস্বার্থের উর্দ্ধে উঠে মুসলমান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে সক্ষম হয়নি। গোষ্ঠী স্বার্থ তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনকেও প্রভাবিত করেছিল। সমাজে রাজপুতদের স্থান নির্ণিত হত দুটি বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে। একটি হল তাঁর জন্ম এবং অপরটি হল সে যে ভূমি

বা জমির অধিকারী তার মূল্যের ওপর। প্রতিটি রাজ্যের শাসকশ্রেণি জমির আয়ের উপর নির্ভরশীল ছিলেন, ব্যবসা বাণিজ্য পরিচালনা করত অপর গোষ্ঠীভূক্ত জনগণ। রাজপুতানার ভুখণ্ড অনুর্বর হওয়ার কারণে রাজকীয় ভরণপোষণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ যোগাড় করা অল্প জমি বা ভূখণ্ড থেকে সম্ভব হত না। তাই রাজপরিবারের মধ্যে ভূমি দখলের লড়াই অব্যাহত ছিল। রাজকোষে অর্থের অভাবে কোনো স্থায়ী সৈন্যের ভরণপোষণ সম্ভব ছিল না। এর জন্য সৈন্যদের ভূমি বন্দোবস্তও সম্ভব ছিল না কারণ খালিসা জমি ছাড়া অবশিষ্ট জমি ছিল অভিজাতদের দখলে। রাজাকে তাই প্রয়োজনের সময় অভিজাতবর্গের সশস্ত্র অনুগামীদের সাহায্য নিতে হত।

জাতি ব্যবস্থার এই সর্বব্যাপী প্রভাব আরও তীব্রতা হারিয়েছিল অষ্টাদশ শতকে। উচ্চাকাঙ্ক্ষী রাজারা তাঁদের ক্ষমতা সুদৃঢ়করণের লক্ষ্যে মুঘল অভিজাতব্যবস্থা অনুসরণে সচেষ্ট হন এবং রাজ্যে প্রভাবশালী অভিজাতদের দমন করার লক্ষ্যে কিছু বহিরাগতদের অভিজাতর মর্যাদা দেন। Tod বলেন, 'Chief of Rathorem, Chauhan, Pramara, Solanki and Bhatti tribes were intermingled' দেশীয় পুরোনো অভিজাতদের থেকে নূতন অভিজাতদের অপেক্ষাকৃত কম নিরাপত্তার কারণে এরা অস্তিত্বের তাগিদে রাজার প্রতি বেশী অনুগত ছিল। ভূমিপুত্র না হওয়ায় অর্থাৎ এরা পুরোনো অভিজাতদের মত প্রভাবশালী না হওয়ায় রাজা ও এদের উপর বিশেষ আস্থা রাখতে পেরেছিলেন। এ সত্ত্বেও পুরোনো অভিজাতদের ক্ষমতা বিশেষ খর্ব করা সম্ভব হয়নি।

সকল রাজপুত রাজ্যগুলিতে রাজার পর পদমর্যাদার দিক থেকে রাজার নীচেই ছিল এলাকার প্রধানদের স্থান যারা সরাসরি রাজার নিকট থেকে তাদের অধিকার লাভ করেছে। এরা ছিল সকলেই রাজপুত। এছাড়া ছিল একটি পৃথক শ্রেণি যাদের 'official fief' বলা হয়েছে।। Tod বলেছেন, 'Titles are granted, and even fiefs of office, to ministers and civil servants not Rajputs; they are, however, but official, and never confer hereditary right. In Mewar, the Princes' architect, painter, physician, bard, genealogist, heralds, and all generation of the foster brothers, hold lands'. রাজার দুর্বলতার সুযোগ নিয়েও কিছু নূতন 'fief'-এর সৃষ্টি হয়েছে। প্রধানরা তাদের আয় এবং মর্যাদা অনুসারে রাজদরবার নির্দিষ্ট স্থান অধিকার করেছিল। কিছু শক্তিশালী এবং সম্পদশালী প্রধানগণ রাজকীয় আদব কায়দায় জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল। এরা নিজেদের এলাকায় প্রায় স্বাধীনভাবে অর্থনৈতিক কার্যকলাপ, প্রশাসন নিয়ন্ত্রণ করত, রাজার প্রত্যন্ত শাসন বা সরকারি কর্মচারীরা এতে হস্তক্ষেপ করত না।

১৪.৩ রাষ্ট্রের প্রকৃতি

মধ্যযুগে রাজপুত রাজ্যগুলির এই রাজনৈতিক এবং সামরিক ব্যবস্থা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের আঘাতে ভেঙে পড়ে। টড রাজপুতানায় প্রচলিত এই ব্যবস্থাকে সামন্ত্রতান্ত্রিক বলে আখ্যা দিয়েছেন। এই ব্যবস্থাকে সামন্ততান্ত্রিক বলা যায় কিনা তার উত্তরে ১৮৭৯ খ্রি: রাজপুতানা গেজেটিয়ারের প্রথম খণ্ডে বলা হয়েছে, সেভাবে ভূমি বণ্টিত হত, তার মধ্যে সামন্তব্যবস্থার সামঞ্জস্য ছিল না যদিও কোনো কোনো রাজ্যে এই ব্যবস্থা সেভাবে বিকাশলাভ করেছিল, তা সামন্ততন্ত্রের মতই বলে মনে হয়। রাজপুতানা গেজেটিয়ারে

(১৮৭৯, ১ম খণ্ড) বলা হয়েছে—'*In fact, the system upon which the land is distributed among the branch families and other great hereditary landholders, is the basis of the political constitution of a Rajput state and forms its characteristic distinction. And this system is not, speaking accurately, feudel, though it has grown in certain states ... something very like feudalism. The tenure of the great classmen involves military service and payment of finacial aids, but its source is to be found in the original clan–occupation of the lands, and in the principles of kinship and a purity of descent from the original occupants or conqueroes.*'

মধ্যযুগীয় রাজপুত ব্যবস্থার মূল বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করে দেখা প্রয়োজন যে ব্যবস্থাটির কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য অনেকটা সামন্ততন্ত্রের মত (something very like feudalism) এবং এই বিষয়টির প্রেক্ষিতে টড বিশ্বাস করেছেন যে রাজস্থানে একটি পূর্ণাঙ্গ সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার বিকাশ ঘটেছিল। এটিও অনুসন্ধানের প্রয়োজন যে এই ব্যবস্থার উদ্ভবের পেছনে কী কারণ বা কোন পরিস্থিতি দায়ী ছিল যার দ্বারা এটিও অনুধাবন করা যায় যে ইউরোপীয় সামন্ততন্ত্রের উদ্ভবের পেছনে যে পরিস্থিতি দায়ী ছিল, সেই পরিস্থিতির সঙ্গে এর সামঞ্জস্য ছিল কিনা?

প্রকৃতপক্ষে sub-infeudation মধ্যস্বত্বভোগের বিষয়টি রাজপুতানায় অজানা ছিল, কিন্তু সাধারণত বৃহৎ এলাকায় প্রধানদের গ্রাম দান করা হত তাদের সন্তান এবং ভাইদের ভরণপোষণের জন্য। Tod-এর ভাষায়, 'In all the large estates, the chief must provide for his sons or brothers, according to his means and number of immediate descendants' এই প্রথাটি অভিজাতদের দুর্বলতার কারণ হয়েছিল, এবং কখনও বা জনগণের মঙ্গলের পক্ষে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মাঝে মাঝে এটি ছিল সামগ্রিকভাবে রাজ্যের স্বার্থবিরুদ্ধ। রাজপুত সাংগঠনিক কাঠামোর শক্তি ও প্রকৃতি দুটি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল ছিল—একটি হল রাজা এবং প্রধানের মধ্যে পারস্পরিক দায়িত্ব এবং অপরটি হল প্রধান এবং তাঁর সাব-ভ্যাসাল (অনুগামী) এর মধ্যে সম্পর্কের নিরিখে। টড এই বিষয়টি দুটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের সাহায্যে ব্যক্ত করেছেন। একটিতে মেওয়ার-এর প্রধান এবং অন্যটিতে দেওগড়ে-র উপ-সামন্ত এর অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছে। মেওয়ার রাজ মানসিংহের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগের সুরে বলেন—'শ্রীমহারাজ এবং প্রধানরা একই বংশোদ্ভুত-সকলেই রাঠোর। রাজার স্থান সকলের ওপরে। আমরা সকলেই বিশ্বস্ত অনুগামী'। তিনি আরও বলেন, 'যতক্ষণ আমাদের সেবা গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হবে, ততক্ষণ তিনি আমাদের প্রভু; যখন নয়, তখন আমরা তাঁর ভাই, স্বজাতি, দাবীদার, ভূমির উপর কর্তৃত্বের অধিকারী।' (Sri Maharaja and ourselves are of one stock, all Rathors. He is our head, we his servants...when our services are acceptable, then he is he our lord/ when not, we are again his brothers and kindred, claimants and laying claim to the land) এই বক্তব্য থেকে রাজা এবং প্রধানদের পারস্পরিক দায় দায়িত্বের স্পষ্ট সংজ্ঞা পাওয়া যায় না। একইভাবে দেওগড়ের উপ-সামন্তদের তাদের প্রধানদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে—'যখন দেওগড়ের প্রতিষ্ঠা হয়, তখনই আমাদের বরাদ্দ নির্দিষ্ট করা হয়েছে। প্রধানের যেমন উত্তরাধিকার স্বীকৃত, তেমনি আমাদেরও, রানার অধীনে প্রধানদের মত আমাদের সকল অধিকার, সকল সুযোগ সুবিধা একই রকমের।' (When Deogarh

was established, at the same time were our allotments; as his patrimony, so is our patrimony... our rights and privileges in his family are the same as his in the family of the presence (i.e.the Rana)'

সাব-ভ্যাসাল-দের অধিকার ভোগের সঙ্গে কর্ত্তব্যও রছিল। এমনকি রাজআদেশ অমান্য করেও বা প্রধানদের প্রতি তাদের দায়বদ্ধ থাকতে হত। টড বলেছেন, 'If the question was put to a Rajput to whom his sevice in due, whether to his chief or his sovereign, the reply would...imply that his own immediate chief is the only authority he regards.' কোনো উপ-সামন্ত তাঁর উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে রাজন্যবর্গের প্রতি সেবা প্রদর্শন করতে পারত না বা রাজা বাধ্য করতে পারতেন না। রাজা এবং উপ-সামন্তদের মধ্যে বন্ধনের এই শিথিলতার কারণে রাজ্যের রাজনৈতিক কাঠামো যেমন দুর্বল হয়ে পড়েছিল, তেমনি সামরিক সংগঠনের উপরও এর প্রভাব পড়েছিল। বস্তুত, রাজপুত রাজ্যে কোনো স্থায়ী সৈন্যবাহিনী ছিল না, জরুরী অবস্থায় রাজাকে এই অবস্থায় প্রধানদের সাহায্য নিতে হত। এক্ষেত্রে রাজার সঙ্গে প্রধানদের সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক প্রয়োজনীয় ছিল কারণ প্রধানরা চাইলে তাঁর অধীনস্ত উপ-সামন্তদের এ কাজে ব্যবহার করতে পারত। তবে এই ব্যবস্থাটি অষ্টাদশ শতকে রাজনৈতিক এবং সামরিক চাপের কাছে ভেঙে পড়েছিল।

ইউরোপীয় সামন্ততন্ত্রের উত্থান ঘটেছিল রাজনৈতিক কর্তৃত্বে দুর্বলতার প্রেক্ষাপটে। রাজতন্ত্র যখন জনগণের ন্যূনতম চাহিদা 'সুরক্ষা' দিতে ব্যর্থ হয়েছিল, তখন জনগণ এর পরিবর্তে অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী অভিজাতকে আশ্রয় করে সুরক্ষা পেতে চেয়েছিল। সার্বভৌম ক্ষমতার দুর্বলতার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে অভিজাতবর্গ রাজার অধিকার এবং ক্ষমতা আত্মসাৎ করার পথ খুঁজে পেয়েছিল। কিন্তু এই ধরনের প্রেক্ষাপট মধ্যযুগের রাজস্থানে অনুপস্থিত ছিল। একথা বলা হয় যে, দ্বাদশ শতকের শেষের দিকে উত্তর ভারতের হিন্দু শাসকবর্গ উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে আগত তুর্কী আক্রমণের অভিঘাতে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু এই বিপর্যয় মেওরাজ রাজ্যের উপর প্রভাব ফেলতে পারেনি। মারওয়াড় ও অম্বর রাজ্যকে প্রভাবিত করেনি, এদের আবির্ভাব পরে হয়েছিল। তাই একথা বলা যায় না যে ভারতবর্ষের এই অংশের শাসকদের কর্তৃত্ব দুর্বল হয়ে পড়ায় সামন্ততান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের আবির্ভাব প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছিল। দীর্ঘকাল মেওয়ার ও মারওয়াড় ঔরঙ্গজেবের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত থাকলেও অন্যান্য রাজপুত রাজ্যগুলিতে মুঘলদের অধীনে শান্তি বজায় ছিল। সামাজিক ও রাজনৈতিক শৃঙ্খলা বজায় ছিল। এমনকি সুলতানি আমলে আলাউদ্দিনের চিতোর আক্রমণজনিত অশান্তি ছাড়া রাজপুতানায় সামগ্রিকভাবে শান্ত পরিবেশ বজায় ছিল।

বস্তুত, জাতি বা বংশগত ব্যবস্থার অস্তিত্ব রাজপুতদের মধ্যে বর্তমান থাকায় যে ভারসাম্য বিঘ্নিত হয়েছিল, তার প্রেক্ষাপটে টড সামন্ততন্ত্রের ব্যাখ্যা উপস্থাপিত করেছেন। যে ঘটনাগুলি টড উল্লেখ করেছেন, সেগুলি পিতৃতান্ত্রিক ধারণার সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল যা রাজপুতদের মননকে প্রভাবিত করেছিল এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়গুলি নিয়ন্ত্রণ করেছিল। Saran যথার্থই মন্তব্য করেছেন, *"Many of the institutions and mutual obligations and duties between the chief and his vassals in Rajputana arose from their patriarchal basis of society, unlike Europe where they arose out of a contract entered into by two parties (not the same family of tirbe), viz. the lord and his client."* মধ্যযুগের ইউরোপে রাজা এবং ব্যারনদের মধ্যে চুক্তিই ছিল এদের

সম্পর্কের ভিত্তি। চুক্তির মেয়াদ শেষ হলেই ব্যারন রাজার প্রতি তাঁর কর্ত্তব্য এবং আনুগত্য প্রদর্শন থেকে মুক্তি পেত। রাজস্থানের ক্ষেত্রে অবশ্য কোনো চুক্তি এই ধরনের সম্পর্ককে নির্ধারণ করেনি, কিন্তু এখানে পিতৃতন্ত্র বা গোষ্ঠীপতি শাসিত সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পৃক্ত অধিকার এবং দায়িত্বের ধারণা রাজা এবং অভিজাত বা জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে সম্পর্ক নির্দ্ধারণ করেছিল। বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘাত প্রতিঘাতেও মূল বিষয়টি ব্রিটিশ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার সময় পর্যন্ত অপরিবর্তিত থেকে গিয়েছিল।

১৪.৪ উপসংহার

মধ্যযুগে রাজস্থানের রাজ্যগুলির রাজনৈতিক ও সামরিক ব্যবস্থা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে জেমস টড ইউরোপীয় সামন্ততন্ত্রের কিছু বৈশিষ্ট্য এখানে লক্ষ্য করেছেন। কিন্তু বিষয়টি সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে ইউরোপীয় সামন্ততন্ত্রের আবির্ভাব ঘটেছিল রাজনৈতিক কর্তৃত্বের দুর্বলতার প্রেক্ষাপক্ষে। রাজতন্ত্র জনগণের নূন্যতম চাহিদা সুরক্ষা বা নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হওয়ার কারণে জনগণ এর পরিবর্তে অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী অভিজাতবর্গকে আশ্রয় করে সুরক্ষা পেতে চেয়েছিল। সার্বভৌম ক্ষমতার দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়ে অভিজাতবর্গ রাজার অধিকার ও ক্ষমতা আত্মসাৎ করার পথ খুঁজে পেয়েছিল। কিন্তু এই ধরনের প্রেক্ষাপট মধ্যযুগের রাজস্থানে অনুপস্থিত ছিল।

১৪.৫ প্রশ্নাবলী

১. মধ্যযুগের রাজস্থানের রাজনৈতিক অবস্থার একটি বিবরণ দিন।
২. আপনি জেমস টড-এর মত সমর্থন করেন যে, ইউরোপের মত রাজপুত রাজ্যগুলির রাজনৈতিক কাঠামো সামন্ততন্ত্রের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল?
৩. মধ্যযুগে রাজস্থানের রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রকৃতি বর্ণনা করুন।

১৪.৬ গ্রন্থপঞ্জি

- Banerjee, Anil Chandra. *Aspects of Rajput state and Society,* New Delhi, 1983.
- Chandra, Satish. *State, Pluralism and the Indian Historical Tradition,* Oxford, 2008.
- Gupta R. K. & Bakshi, S. R. *Studies in Indian History, Rajasthan Throught the Ages; The Heritage of Rajputs,* Sarup & Sons, 2008.
- Freitag, Jason. *Serving Empire, Serving Nation, James Tod and the Rajputs of Rajasthan,* Leiden, 2009.
- Naravane, M.S. *The Rajputs of Rajputana: A Glimpse of Medieval Rajasthan, 2014.*

——

একক ১৫ ❑ দক্ষিণ ভারত: মারাঠা জাতির অভ্যুত্থান: শিবাজী

গঠন

১৫.০ উদ্দেশ্য

১৫.১ ভূমিকা

১৫.২ শিবাজীর উত্থানের প্রেক্ষপট

১৫.৩ শিবাজীর নেতৃত্বে জাতীয় রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা

১৫.৩.১ মুঘল-মারাঠা সংঘাত

১৫.৪ শিবাজীর অভিষেক

১৫.৫ শিবাজীর স্বরাজ্য

১৫.৬ উপসংহার

১৫.৭ প্রশ্নাবলী

১৫.৮ গ্রন্থপঞ্জি

১৫.০ উদ্দেশ্য

এই এককের মূল উদ্দেশ্য হল দক্ষিণ ভারতে শিবাজীর নেতৃত্বে মারাঠা জাতির অভ্যুত্থানকে অনুধাবন করা। এই আলোচনাটি করার সময় আমরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর গুরুত্ব আরোপ করব :

- কোন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে শিবাজীর উত্থান ঘটেছিল।
- মুঘল সহ অন্যান্য শক্তির মোকাবিলা করে শিবাজী কীভাবে জাতীয় রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।
- শিবাজীর স্বরাজ্য-র প্রকৃতি কেমন ছিল।

১৫.১ ভূমিকা

ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালে মারাঠা জাতির উত্থানের ফলে দাক্ষিণাত্যের পরিস্থিতি অশান্ত হয়ে ওঠে। ঔরঙ্গজেব তাঁর রাজত্বালের প্রায় অর্ধেক সময় (১৬৮২-১৭-০৭ খ্রিঃ) অর্থাৎ ২৫ বছর দাক্ষিণাত্যে অতিবাহিত করেন। তাঁর দাক্ষিণাত্য নীতির দুটি উদ্দেশ্য ছিল—একটি হল দাক্ষিণাত্যের দুটি স্বাধীন সুলতানি রাজ্য বিজাপুর ও গোলকুণ্ডাকে মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে সাম্রাজ্যের সীমা সম্প্রসারিত করা এবং অপরটি হল মারাঠা জাতিকে দমন করে ঐ অঞ্চলে মুঘলের স্বার্থ সুরক্ষিত করা। মধ্যযুগের ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে মারাঠা জাতি ভারতের রাজনীতির মূলস্রোতের সঙ্গে যুক্ত হয়ে প্রায় নিয়ন্ত্রণের ভূমিকা নিয়েছিল।

মারাঠা বীর শিবাজী মারাঠা জাতির উত্থানে প্রধান ভূমিকা নিয়েছিলেন। তাঁর সাহস, দেশপ্রেম, আত্মত্যাগ, সংগঠন প্রতিভা এবং ব্যক্তিগত উচ্চাশা একটি বিচ্ছিন্ন, অনুন্নত এবং অর্ন্তদ্বন্দ্বে লিপ্ত জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে জাতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখাতে সক্ষম হয়েছিল।

এই এককে সপ্তদশ শতকে শিবাজীর নেতৃত্বে মারাঠা জাতির অভ্যুত্থান-এর প্রেক্ষাপট, তাঁর রাজ্যজয়ের পেছনে শুধু সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা—নাকি তিনি কোনো উচ্চতর আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন এবং কীভাবে তিনি মারাঠাদের একটি স্বাধীন, আত্মবিশ্বাসী, ঐক্যবদ্ধ জাতিতে উন্নীত করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন তার পরিচয় দেওয়া হবে।

১৫.২ শিবাজীর উত্থানের প্রেক্ষপট

ষোড়শ শতকে দাক্ষিণাত্য উপত্যকার পশ্চিম প্রান্ত পরিচিত ছিল মহারাষ্ট্র নামে। নাসিক, পুনা, সাতারা জেলা, আহম্মদনগর ও শোলাপুরের একাংশ এবং সম্ভবত ঔরঙ্গাবাদের পশ্চিম কোন্ ছিল মহারাষ্ট্রের অন্তর্গত। এই অঞ্চলের একটি জাতি বা বর্ণের মানুষ ছিল মারাঠা। এছাড়া পশ্চিমঘাট পর্বত থেকে আরব সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত সংকীর্ণ অঞ্চল বা কোঙ্কনে তাদের বসবাস ছিল। স্বাভাবিক বৃষ্টিপাতের অনিশ্চয়তার কারণে এই অঞ্চল ছিল চাষ আবাদের অনুপযুক্ত। ছোট ছোট পাহাড় ও জঙ্গলে পূর্ণ অনুর্বর এই অঞ্চল স্বাভাবিকভাবে মারাঠাদের সাহসী ও কষ্টসহিষ্ণু করে তুলেছিল। কৃষি উৎপাদনে নিশ্চয়তা না থাকায় সৎ, দক্ষ ও পরিশ্রমী মহারাষ্ট্রবাসী মধ্য দাক্ষিণাত্যের রাজ্যগুলিতে সৈনিকের বৃত্তি গ্রহণ করে। বিজাপুর, গোলকুণ্ডা, বিদর, আহম্মদনগর প্রভৃতি দাক্ষিণাত্যের রাজ্যগুলিতে সামরিক ও প্রশাসনিক কাজে অংশ নিয়ে তারা রাজনৈতিক কার্যকলাপের সঙ্গে পরিচিত হয়। মারাঠি ব্রাহ্মণ গোষ্ঠী মূলত প্রশাসনিক কাজে নিয়োজিত হয়। মারাঠা ও কুনবী কৃষকশ্রেণি সামরিক বৃত্তি গ্রহণ করায় তাদের মধ্যে মর্যাদা ও সাম্যবোধ জন্ম নেয়। আহম্মদনগরের প্রধান মন্ত্রী মালিক অম্বর মারাঠি কৃষকদের গেরিলা যুদ্ধ পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের অপ্রতিরোধ্য করে তোলেন।

সুলতানী যুগে বাহমনী রাজ্যের অধীনে মূলত মারাঠাদের সামরিক শক্তির বিস্তার ঘটে। বাহমনীদের পতন ঘটিয়ে আহম্মদনগর বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা রাজ্য গঠিত হলে মারাঠাদের স্থানীয় স্তরে প্রভাব আরও বৃদ্ধি পায়। শিবাজী এদের ঐক্যবদ্ধ করে সুসংহত শক্তিতে পরিণত করেন। তবে এর পিছনে দীর্ঘদিনের শ্রম ও কৌশল কাজ করেছিল। শিবাজীর পূর্বপুরুষ মালোজী ও ভিটোজী দৌলতাবাদের বসতি স্থাপন করে সিন্ধুখেড়ের যাদবদের অধীনে অশ্বারোহী বাহিনীর প্রধান পদে নিযুক্ত ছিলেন। পরবর্তীকালে মালোজী আহমদনগরে মালিক অম্বরের অধীনে চাকরি নেন। ১৬২২ খ্রি: মালোজীর পুত্র শাহজী (শিবাজীর পিতা) মালিক অম্বর শোলাপুর ও পুনা পরগনা দুটি জায়গির হিসেবে প্রদান করায় শাহজীর জীবনে আমুল পরিবর্ত্তন আসে। কিন্তু আহমদনগর দরবারে রাজনীতির শিকার হয়ে শাহজীর শ্বশুর লুকাজী ১৬৩০ খ্রিঃ নিহত হলে শাহজী শাহজাহানের আহ্বানে মুঘল শিবিরে যোগ দিয়ে নতুন করে পুনরার জায়গির লাভ করেন। কিন্তু শাহজী বেশিদিন মুঘল শিবিরে থাকেননি। ১৬৩২ খ্রি: তিনি পুনরায় বিজাপুর শিবিরে যোগ দেন এবং আহমদনগরের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তোলেন এবং সেই রাজ্যের কিছু অঞ্চল অধিকার

করেন। ১৬৩৬ খ্রিঃ বিজাপুর মুঘলদের সঙ্গে সন্ধি করায় তিনি আহমদনগরের অঞ্চলগুলি বিজাপুর সুলতানকে ছেড়ে দিয়ে দক্ষিণে কর্ণাটক জায়গির লাভ করেন। সেই সময়ে বিজাপুরের দুর্বলতার সুযোগে শাহজী ব্যাঙ্গালোরে একটি নিজস্ব রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রয়াস চালান। কর্ণাটকে ব্যস্ত থাকার কারণে তিনি পুনার জায়গির তাঁর স্ত্রী জিজাবাঈ এবং তাঁর নাবালক পুত্র শিবাজীকে অর্পণ করেন।

বাল্যকাল থেকে শিবাজী ছিলেন পিতার স্নেহ ও শিক্ষা থেকে বঞ্চিত। শিবাজী তাঁর মাতা জিজাবাঈ ও অভিভাবক দাদাজী কোণ্ডদেবের সাহচর্যে উচ্চাভিলাষী হয়ে ওঠেন। সামান্য পুনার জায়গির নিয়ে সন্তুষ্ট থাকেননি। মাত্র ১৮ বছর বয়সে তিনি পুনা, রায়গড় তোর্ষা প্রভৃতি অধিকার করেন। ১৬৪৭ খ্রি: দাদাজীর মৃত্যু হলে তিনি নিজেই নিজের প্রভু হয়ে ওঠেন। বাঙ্গালোরে শাহজী যেমন নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছিলেন, শিবাজী তেমনই মহারাষ্ট্রে একই কাজ করেছিলেন। বিজাপুর সুলতান শাহজীকে বন্দি করেন। তবে মুঘলদের সাহায্য নিয়ে শিবাজী পিতার মুক্তির ব্যবস্থা করেন। ১৬৫৬ খ্রিঃ শাহজীর মৃত্যু হলে শিবাজী নূতন বিক্রমে এলাকা দখলে উদ্যোগী হন। ভাগ্যান্বেষী সৈনিক হিসেবে বিচ্ছিন্ন মারাঠা জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে জাতীয় রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেন।

শিবাজীর নেতৃত্বে রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে মারাঠাদের উত্থান কোন আকস্মিক ঘটনা ছিল না। M.G. Ranade তাঁর 'Rise of the Maratha Power' গ্রন্থে শিবাজীর উত্থান প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন। শিবাজীর উত্থান ও সাফল্যের পেছনে মহারাষ্ট্রের মারাঠা, কুনবী, কোলি, ও অন্যান্য উপজাতীয় কৃষকশ্রেণীর বিশেষ ভূমিকা ছিল। এই সকল কৃষিজীবী মানুষ সৈনিক হিসেবে শিবাজীর সাফল্যের ভিত রচনা করেছিল। সপ্তদশ শতকে মারাঠাদের অভ্যুত্থানের অন্যতম উপাদান হিসেবে মারাঠাদের সামাজিক সাম্যবোধের ভূমিকা ছিল। ষোড়শ শতকে ভক্তি আন্দোলন মারাঠাদের মধ্যে সাম্য ও জাতীয় ঐক্য সুদৃঢ় করে। মহারাষ্ট্রের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের দার্শনিক ভিত্তি সমকালীন উদারপন্থী ধর্মীয় আন্দোলনের মধ্যে অনুসন্ধান করা যায়। তুকারাম, রামদাস, বামন পণ্ডিত, একনাথ প্রমুখ ভক্তিবাদী সাধকের বাণী মহারাষ্ট্রের সাধারণ মানুষের মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। মারাঠা ঐক্যবোধ জাগরণের একটি উপাদান ছিল মহারাষ্ট্রের সাহিত্য, মহারাষ্ট্রের প্রাচীন ঐতিহ্য গৌরব এবং বীরত্বের কাহিনীভিত্তিক বহু গাথা রচিত হয়েছিল। মহারাষ্ট্রের চারণ কবিরা গ্রামে এই সকল গাথা সুর করে গাইত এবং এই সকল গৌরবগাথা মারাঠাদের মনে গভীর দেশপ্রেম জাগ্রত করে। J.N. Sarkar মন্তব্য করেছেন, *'Nature developed in them 'self reliance', courage, perseverence, a stern simplicity, a rough straight-forwardness, a sense of social equality and consequently pride in the dignity of man as man–thus a remarkable community of language, creed and life was attained in the Maharashtra in the 17th century, even before political unity was conferred by Shivaji'*

মারাঠাদের জাতীয়তাবোধের উদ্ভবের প্রেক্ষাপট হিসেবে এই কারণগুলি সাধারণভাবে গৃহীত হলেও অনেক পণ্ডিত ভিন্ন মত পোষণ করেন। J.N. Sarkar এবং G.S. Sardesai ঔরঙ্গজেবের ধর্মনীতির বিরুদ্ধে হিন্দু প্রতিক্রিয়া হিসেবে ব্যক্ত করেছেন। ইরফান হাবিব অত্যাচারিত কৃষকদের বিদ্রোহী মানসিকতার সঙ্গে মারাঠাদের উত্থানের যোগসূত্র অনুসন্ধান করেছেন। কৃষির সঙ্গে যুক্ত জনগণ তাদের সামাজিক

মর্যাদা বৃদ্ধির তাগিদ অনুভব করতে পারেন। তুকারাম, রামদাস, একনাথ প্রমুখ ভক্তিসাধকগণ বিচ্ছিন্ন মারাঠাদের মধ্যে সাম্যবাদের বাতাবরণ তৈরি করেছিল, নেতৃপদে শিবাজীর উত্থানের কাজে তাদের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। M. G. Ranade এবং V. K. Rajwade এক উচ্চতর আদর্শ-হিন্দু জাতীয়তাবাদ বা বিচ্ছিন্ন হিন্দুজাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে সার্বভৌম হিন্দু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাকে মারাঠাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষার কারণ ছিল বলে মনে করেছেন। গুরু রামদাস তাঁর গ্রন্থ 'আনন্দভুবনে' এই আদর্শের কথা তুলে ধরেছেন।

১৫.৩ শিবাজীর নেতৃত্বে জাতীয় রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা

শিবাজীর উত্থান ও জাতীয় রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার পেছনে সমকালীন পুনা ও মহারাষ্ট্রের সামাজিক পরিস্থিতির বিশেষ ভূমিকা ছিল। পিতা শাহজী প্রদত্ত জায়গির এর সূত্রে তিনি পুনায় বসবাস করতেন। এই সময় পুনার অসংখ্য ছোট ছোট তালুকে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত বা জোরপূর্বক দখল করা এক একটি তালুকে মারাঠা নায়করা ভূমি রাজস্ব আদায় করতেন। মারাঠা নায়কদের মধ্যে সংঘাত ছিল নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা। পুনা অঞ্চলে এই ধরনের অস্থিরতা দূরীকরণে দাদাজী কোণ্ডদেব এবং পরে শিবাজী আত্মনিয়োগ করেন। শিবাজী যেভাবে দৃঢ়তার সঙ্গে পুনা অঞ্চলে এই ধরনের অস্থিরতা দূরীকরণ এবং ন্যায় প্রতিষ্ঠার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তার ফলে স্থানীয় পরিবারগুলির মধ্যে শিবাজীর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। শিবাজী মারাঠা নায়কদের আস্থাভাজন হয়ে ওঠেন। শিবাজীর ন্যায়পরায়ণতা, সত্যনিষ্ঠা, দুর্বলের প্রতি সহানুভূতি ইত্যাদি গুণাবলীর দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে মহারাষ্ট্রের গ্রাম থেকে গ্রামান্তরের মানুষ দলে দলে তাঁর পতাকাতলে সমবেত হয়। শিবাজী ক্রমে ক্রমে মারাঠাদের মধ্যে জাতীয় ঐক্যের চেতনা সঞ্চার করে স্বরাজ প্রতিষ্ঠার পথে অগ্রসর হন।

১৫.৩.১ মুঘল-মারাঠা সংঘাত

শিবাজীর রাজনৈতিক সংঘাতের প্রথম প্রতিপক্ষ ছিল বিজাপুর রাজ্য। শিবাজীর কার্যকলাপে ভীত হয়ে বিজাপুর সুলতান শিবাজীর বিরুদ্ধে সমরসজ্জা শুরু করলে একই সময়ে ১৬৫৭ খ্রিঃ ঔরঙ্গজেবের নেতৃত্বে মুঘল বাহিনী বিজাপুরের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। শিবাজী বিজাপুর দখলে ঔরঙ্গজেবকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে মুঘলদের সঙ্গে মৈত্রী করে ও সুযোগ বুঝে সেই মৈত্রী অস্বীকার করে মুঘল এলাকায় ব্যাপক লুঠতরাজ চালিয়ে প্রভূত ধনসম্পদ সংগ্রহ করেন। ঔরঙ্গজেব উত্তরাধিকার সংক্রান্ত যুদ্ধের জন্য দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করলে চতুর শিবাজী কৌশল ও সামরিক দক্ষতার সমন্বয় ঘটিয়ে কোঙ্কণ সহ বিজাপুরের বহু দুর্গ হস্তগত করেন। ১৬৫৯ খ্রিঃ মধ্যে পুনা জেলার দক্ষিণভাগ উত্তর-কোঙ্কণ শিবাজীর শাসনাধীনে স্থাপিত হয়। বিজাপুর সুলতান সমস্যার মীমাংসার জন্য সুদক্ষ সেনাপতি আফজল খাঁর নেতৃত্বে ১০ হাজার সেনা শিবাজীর উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। শিবাজী সম্মুখ যুদ্ধ এড়িয়ে যাওয়া স্থির করেন কারণ তাঁর সেনা তেমন ছিল না। তিনি সন্ধির প্রস্তাব করেন। ১৬৪৯ খ্রিঃ আফজলের তাঁবুর মধ্যেই গোপন বাঘনখের সাহায্যে শিবাজী আফজল খাঁকে হত্যা করেন। বিজাপুর সেনাদল ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে যাওয়ার সময় পলায়নরত সেনাদের লুঠ করে শিবাজী বিপুল সমরাস্ত্র এবং রসদ দখল করে নেন।

আফজল খাঁর হত্যা প্রত্যেককে স্তম্ভিত করে। সামান্য এক জাগিরদার-এর পুত্র কীভাবে বিজাপুরের মতো দাক্ষিণাত্যের সার্বিক শক্তিশালী রাজ্যের সেনাপতিকে হত্যা করতে পারেন—এই বিষয়টি সকলকে ভাবিয়ে তোলে। দলে দলে মারাঠা সৈন্য ছাড়া বিজাপুরের বহু আফগান সেনাও তার দলভুক্ত হতে থাকে। এরপর শিবাজী কোলাপুর আক্রমণ করে পানহালা দূর্গ দখল করেন। অপর এক অভিযান করে কোঙ্কণ অধিকার করেন এবং কোঙ্কণের গ্রাম ও বন্দর লুঠ করেন। ১৬৬২ খ্রিঃ বিজাপুর সুলতান শিবাজীর সঙ্গে বিরোধ মিটিয়ে নেন এবং তাঁর রাজ্যের উত্তর পশ্চিমাংশে শিবাজীর অধিকার স্বীকার করেন।

১৬৫৯ খ্রিঃ ঔরঙ্গজেব সিংহাসনে আরোহন করে দাক্ষিণাত্যে মারাঠা দখলের কাজে মনোনিবেশ করেন। মারাঠাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে মুঘলের পাশে দাঁড়ানোর জন্য সম্রাট বিজাপুর সুলতানকে নির্দেশ দেন। শিবাজীকে দমন করার জন্য দাক্ষিণাত্যের সুবাদার শায়েস্তা খানকে নির্দেশ দেন। বিপুল সেনাদলের আক্রমণের মোকাবিলা করা শিবাজীর পক্ষে সম্ভব না হওয়ায় পুনাসহ বহু মারাঠা অঞ্চল শিবাজীর হস্তচ্যুত হয়। চাকনসহ একাধিক দুর্গও মুঘল বাহিনী দখল করে নেয়। শিবাজী প্রত্যক্ষ সংঘাতের পরিবর্তে গোপনে আকস্মিক আক্রমণ করে শায়েস্তা খানের পুত্র ও এক সেনাপতিকে হত্যা করেন। শায়েস্তা খান কোনোক্রমে রকমে প্রাণরক্ষা করেন, এর পরে শিবাজী ভারতের শ্রেষ্ঠ মুঘল বন্দর সুরাট আক্রমণ করে প্রচুর নগদ অর্থ ও ধনসম্পদ লুঠ করেন।

শিবাজীর ক্রমবর্দ্ধমান উত্থান এবং মুঘলদের অপমানজনক অবস্থা ঔরঙ্গজেবকে চিন্তিত করে। তিনি শিবাজীর মোকাবিলার জন্য জয় সিংহকে ১৬৬৪ খ্রিঃ দাক্ষিণাত্যে প্রেরণ করেন। জয় সিংহ ছিলেন অভিজ্ঞ সেনাপতি এবং চতুর কূটনীতিক। শিবাজীর শত্রুদের নানাবিধ প্রলোভন দেখিয়ে নিজপক্ষে আনার ব্যবস্থা করেন। বিজাপুর সুলতানসহ অনেক মরাঠা সর্দারকে আসন্ন যুদ্ধে মুঘলের পক্ষে আনার ব্যবস্থা করেন। এর পর তিনি পুরন্দর দুর্গ অবরোধ করেন। ১৬৬৫ খ্রিঃ দীর্ঘ অবরোধের ফলে ভীত হয়ে শিবাজী জয় সিংহের সঙ্গে সন্ধি করতে বাধ্য হন। পুরন্দরের সন্ধি দ্বারা স্থির হয় যে শিবাজী বার্ষিক চারলক্ষ হুন আয়বিশিষ্ট ২৩টি দুর্গ মুঘলদের ছেড়ে দেবেন। শিবাজী মুঘলের প্রতি আনুগত্য ও সেবা প্রদানের বিনিময়ে বার্ষিক এক লক্ষ হুন আয়বিশিষ্ট ১২টি দূর্গ নিজ তত্ত্বাবধানে রাখতে পারবেন। শিবাজীর পুত্র শম্ভুজী পাঁচ হাজারী মনসব লাভ করেন। এছাড়া স্থির হয় যে, শিবাজী নিম্ন কোঙ্কণ অঞ্চলের চার লক্ষ হুন আয়বিশিষ্ট এবং বালাঘাট অঞ্চলে পাঁচ লক্ষ হুন আয়বিশিষ্ট তালুক পাবেন। মুঘল কর্তৃক বিজাপুর দখলের পর শিবাজী এই অঞ্চল পাবেন এবং বিনিময়ে তিনি মুঘল সম্রাটকে কয়েকটি কিস্তিতে চল্লিশ লক্ষ হুন প্রদান করবেন।

সতীশচন্দ্র মনে করেন যে জয়সিংহের লক্ষ্য ছিল সুদূরপ্রসারী। তিনি শিবাজীকে কাজে লাগিয়ে দাক্ষিণাত্যে আগ্রাসী নীতি অবলম্বন করতে চেয়েছিলেন কারণ শিবাজীর একার পক্ষে বিজাপুর রাজ্যের সেই এলাকা দখল করা অসম্ভব ছিল। সেখান থেকে প্রতি বছর চার লক্ষ করে হুন আদায়ের আশাও ছিল। জয় সিংহ সম্রাটের নিকট থেকে বিজাপুর দখলের অনুমতিও চেয়েছিলেন। কিন্তু জয় সিংহের পক্ষে বিজাপুর দখল সহজ ছিল না। গোলকুণ্ডার সুলতান বিজাপুর রক্ষার জন্য ১২ হাজার অশ্বারোহী সহ ৪০ হাজার পদাতিক সেনাও পাঠিয়েছিলেন। জয়সিংহের নিকট প্রয়োজনীয় সেনা ও গোলাবারুদ না থাকায় তিনি বিজাপুরে সফল হননি। এই পরিস্থিতিতে নিজের অবস্থান সুরক্ষিত করা এবং সম্রাটের

ক্রোধ প্রশমনের জন্য জয় সিংহ শিবাজীকে আগ্রায় ঔরঙ্গজেবের দরবারে পাঠাতে মনস্থ করেন। উদ্দেশ্য ছিল, শিবাজী ও সম্রাটের মধ্যে একটা বোঝাপড়া করা। মুঘল দরবারে শিবাজীর যথাযোগ্য সম্মান ও নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিয়ে শিবাজীকে রাজী করানো হয়, কিন্তু দরবারে সম্রাট শিবাজীর প্রতি কোনোরূপ বিশেষ আগ্রহ বা সম্মান প্রদর্শন থেকে বিরত থাকেন এবং শিবাজীকে হত্যার সিদ্ধান্ত নেন। ঔরঙ্গজেব বংশ কৌলীন্যহীন শিবাজীকে আদৌ সম্মান জানানোর পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁর কাছে শিবাজী কেবলমাত্র একজন জমিদার ছাড়া আর কিছু ছিলেন না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত চতুর শিবাজীর বুদ্ধিমত্তার কাছে বিশ্বাসঘাতক মুঘল সম্রাটের ইচ্ছার পরাজয় ঘটে। শিবাজী গোপনে এবং ছদ্মবেশে মুঘল দূর্গ থেকে পালিয়ে যান।

ঔরঙ্গজেবের কঠোর মনোভাবের কারণে শিবাজী নূতন করে তাঁর রাজ্যজয়ের নীতি গ্রহণ করেন। ১৬৭০ খ্রিঃ কোঙ্কন সমেত কয়েকটি গিরিদুর্গ যেগুলি পুরন্দরের সন্ধি অনুযারী ফেরৎ দেওয়া হয়েছিল, সেগুলি দখল করে নেন। দ্বিতীয় পর্যায়ে তিনি সুরাট আক্রমণ করেন। শক্তিশালী পুরন্দর দুর্গ দখলে নিয়ে একে একে বেরার ও খান্দেশের মত মুঘল এলাকাতেও প্রবেশ করেন। বিজাপুর এলাকায় উৎকোচের মাধ্যমে সাতারা এবং পানহালা হস্তগত করে কর্ণাটকের কিছু অংশ মারাঠা দখলে আনেন।

১৫.৪ শিবাজীর অভিষেক

মুঘল শক্তি ও বিজাপুর রাজ্যের বিরুদ্ধে পর পর সাফল্যের পরিপ্রেক্ষিতে শিবাজী তাঁর রাজনৈতিক অবস্থানকে বৈধরূপ দেওয়ার চেষ্টা করেন। সামরিক শক্তি দ্বারা বহু ভূখণ্ড ও দূর্গ দখল করলেও, কিংবা একটি সমৃদ্ধ অর্থভাণ্ডার ও শক্তিশালী সৈন্যবাহিনীর অধিকারী হলেও মুঘল সরকারের দৃষ্টিতে তিনি ছিলেন একজন সাধারণ জমিদার। বিজাপুরের কাছে ছিলেন একজন অধীনস্থ জাগীরদারের পুত্র। কোনোরকম রাজ-ঐতিহ্য তাঁর ছিল না। যদুনাথ সরকারের মতে, নিজেকে স্বাধীন সার্বভৌম হিসেবে প্রথাগতভাবে প্রতিষ্ঠিত না করার কারণে শিবাজীর নানা সমস্যা হয়েছিল। এই সব সমস্যার সমাধানের একমাত্র পথ ছিল নিজের অভিষেককর্ম সমাধান করে ছত্রপতি বা রাজা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু এই রাজপদে অভিষেকের পথে ধর্মীয় ও সামাজিক বাধা ছিল। হিন্দুরীতি অনুযায়ী কেবল একজন ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভূত ব্যক্তিই রাজপদে আসীন হতে সক্ষম, কিন্তু ভোঁসলেরা সাধারণভাবে শূদ্র বলে পরিচিত ছিল। শিবাজী তৎকালীন মহারাষ্ট্রের সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত গঙ্গা ভট্টের নিকট থেকে মীমাংসাপত্র আদায় করেন। গঙ্গা ভট্ট শিবাজীকে মেবারের রানাদের বংশজাত বলে মেনে নেওয়ায় শিবাজীর রাজপদে অভিষেকের ধর্মীয় ও সামাজিক বাধা দূর হয়। হিন্দুদের যাবতীয় শাস্ত্রগত বিধান পালনের পর ১৬৭৪ খ্রিঃ ৬ জুন রামগড়ে শিবাজীর অবিষেক সম্পন্ন হয়। শিবাজী 'ছত্রপতি' উপাধি নিয়ে সিংহাসনে বসেন।

১৫.৫ শিবাজীর স্বরাজ্য

১৭১৯ খ্রিঃ বালাজী বিশ্বনাথের উদ্যোগে মুঘল সম্রাট মুহম্মদ শাহ শাহুকে মারাঠা রাজ্যের স্বীকৃতি স্বরূপ সে সনদ দেন তার মধ্যে মারাঠা স্বরাজ্য-র এলাকার উল্লেখ পাওয়া যায়। ঐতিহাসিকরা মোটামুটি একমত যে শিবাজী তাঁর জীবদ্দশায় যেসব অঞ্চল থেকে রাজস্ব আদায় করতেন সেটিই ছিল শিবাজীর

স্বরাজ্য, ড: এ. আর কুলকার্নি শিবাজীর স্বরাজ্য-র এলাকা চিহ্নিত করেছেন। এটি হল—(ক) কল্যাণ ভিওয়ান্দি থেকে কোলবান, বরঘাট বা ঘাটের উত্তরাংশ সলহেরি এবং লোহাগড় থেকে গুন্নরের মধ্যবর্তী ১২টি মহল। এটি ছিল স্বরাজ্য-র উত্তরাংশ, (খ) স্বরাজ-র দক্ষিণাংশ হল কোঙ্কণ এলাকা যার মধ্যে ছিল চাউল থেকে দালোভ পর্যন্ত অঞ্চল, রাজানুর, বান্দে, ফোস্তা থেকে কোপ্পল পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চল। একে বলা হত তালঘাট বা ঘাটের নিম্নাংশ। (গ) স্বরাজ্য-র দক্ষিণ পূর্ব অংশে ছিল বরঘাট থেকে কর্ণাটকের কোপ্পল তুঙ্গভদ্রা পর্যন্ত এলাকা। ১৬৭৪ খ্রিঃ ছত্রপতি হিসেবে শিবাজীর অভিষেকের সময় এই ভৌগলিক সীমাকে স্বরাজ্য বলে মেনে নেওয়া হয়।

১৫.৬ উপসংহার

শিবাজীর রাজ্যজয়ের মাধ্যমে শুধুমাত্র একটি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা বা উচ্চতর হিন্দু জাতীয়তাবাদ অর্থাৎ বিচ্ছিন্ন হিন্দু জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে সার্বভৌম হিন্দুরাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠা করা উদ্দেশ্য ছিল কিনা তা নিয়ে ঐতিহাসিকরা ভিন্নমত পোষণ করেছেন। G.S. Sardesai-এর মতে শিবাজীরর লক্ষ্য অঞ্চল বিজয় নয়, হিন্দুদের ধর্মীয় স্বাধীনতাকে নিরাপত্তা দেওয়া। তিনি শুধু মহারাষ্ট্র নয়, সমগ্র ভারতবর্ষের হিন্দুদের স্বাধীন করতে চেয়েছিলেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন মুসলমান শাসনের অধীনে হিন্দুদের অস্তিত্ব নিরাপদ নয়। কুতুবশাহী ও আদিলশাহী বংশের বিরুদ্ধে তাঁর সামরিক অভিযানগুলিকে শিবাজীর ধর্মকেন্দ্রিক রাজনৈতিক কর্তৃত্ব স্থাপনের দৃষ্টান্ত বলে সরদেশাই মনে করেন। শিবাজীর ওপর গুরু রামদাসের প্রভাব, ব্রাহ্মণদের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধাবোধ ইত্যাদি ছিল শিবাজীর ধর্মীয় আদর্শের প্রমাণ। রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মারাঠা জাতির স্বাতন্ত্র ও অস্তিত্ব রক্ষা করার ধর্মীয় প্রেরণা গুরু রামদাসের নিকট থেকে শিবাজী পেয়েছিলেন। শিবাজী নিজেকে হিন্দু ধর্ম ও গো-ব্রাহ্মণ প্রতিপালক রূপে প্রচার করেছেন। এইভাবে তিনি এক সাংস্কৃতিক রূপান্তর ঘটান এবং তার স্বরাজ্য-র তত্ত্বগত ভিত্তি রচনা করেন। শিবাজীর উপাস্য দেবতা ছিলেন তুলজা ভবানী, বিঠোবা এবং মহাদেব। এই সব দেবতাদের প্রতি মারাঠাদের শ্রদ্ধা ও ভক্তি ছিল নিরঙ্কুশ। তাঁর সেনাদের রণহুঙ্কারই ছিল—'হর হর মহাদেব'। এইভাবে শিবাজীর স্বরাজ্য এক ধর্মীয় ও সামরিক চরিত্র অর্জন করেছিল। শিবাজী ব্রাহ্মণদের প্রাচীন সামাজিক মর্যাদা পুনঃ প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী ছিলেন। ধর্মান্তরিত হিন্দুদের তিনি পুনরায় হিন্দু ধর্মে ফিরে আসার জন্য উৎসাহিত করেছিলেন। রাজপুতদের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হননি। তাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা করেছিলেন।

অপরদিকে যদুনাথ সরকার, ঈশ্বরীপ্রসাদ প্রমুখ ঐতিহাসিকের মনে করেন যে একটা মহৎ রাজনৈতিক আদর্শ অনুসরণ করে তাকে বাস্তবায়িত করার মত শক্তি ও সময় শিবাজীর ছিল না। শিবাজী তাঁর রাজনৈতিক স্বার্থের বিরোধী হিন্দু ও মুসলমানদের একইভাবে আচরণ করতেন। হিন্দুদের নিকট থেকে ও চৌথ আদায় করা হত। সুরাট লুণ্ঠনের সময় হিন্দু ব্যবসায়ীরাও মারাঠাদের হাত থেকে রেহাই পায়নি। আবার তাঁর প্রশাসনেও সামরিক বাহিনীতে বহু দক্ষ মুসলমান নিযুক্ত হয়েছিল। মুঘলের বিরুদ্ধে মুসলমান রাজ্য বিজাপুরের সাহায্য নিয়েছিলেন। শিবাজীর লক্ষ্য ছিল দক্ষিণের রাজ্যগুলি; মুঘলের বিরুদ্ধে সারা ভারতব্যাপী আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্য তাঁর ছিল না। মুঘলের বিরুদ্ধে জাঠ, সৎনামী এবং শিখদের

বিদ্রোহের সঙ্গে তাঁর কোন যোগ ছিল না। হিন্দু রাষ্ট্র গড়ে তোলার উৎসাহ দিয়ে রাজপুত সর্দারদের সঙ্গে কোন মিত্রতার সম্পর্ক গড়ে তোলেননি বা মুঘলদের বিরুদ্ধে কোনো রাজপুত সর্দারের সাহায্যের জন্য সচেষ্ট হননি। বলা যেতে পারে যে, সর্বভারতীয় হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠা নয়, মহারাষ্ট্রে মারাঠা জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা দিতে চেয়েছিলেন।

১৫.৭ প্রশ্নাবলী

১. শিবাজীর নেতৃত্বে মারাঠাদের উত্থানের পটভূমি বর্ণনা করুন।

২. শিবাজীর রাজ্যজয়ের পেছনে শুধু সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা-নাকি তিনি কোনো উচ্চতর আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন?

৩. মুঘল-মারাঠা সংঘাতের কারণ কী ছিল এবং এর ফল কী হয়েছিল?

১৫.৮ গ্রন্থপঞ্জি

- Gordon, Stewart. *The Marathas 1600-1818, Cambridge, 1993*
- Kulkarni, A. R. *Maharashtra in the Age of Shivaji, 2008*
- Ranade, M.G. *Rise of the Maratha Power, 1900*
- Sardesai G. S. *New History of the Marathas, 3 vols, 1946.*
- Sarkar, Jadunath. *Shivaji and His Times, London, 2nd Edn., 1920*
- Sarkar, Jadunath. *History of Aurangzeb, Longmans, 1920.*
- Srivastava, A. L. *The Mughal Empire, 1526-1803, Agra, 1952.*

—

একক ১৬ ❑ পেশোয়াদের অধীনে মারাঠা সাম্রাজ্যের বিস্তার

গঠন

১৬.০ উদ্দেশ্য

১৬.১ ভূমিকা

১৬.২ বালাজী বিশ্বনাথ (১৭১৩—১৭২০ খ্রি:)

১৬.৩ প্রথম বাজীরাও (১৭২০—১৭৪০ খ্রি:)

১৬.৪ বালাজী বাজী রাও (১৭৪০—১৭৬১ খ্রি:)

১৬.৪.১ বালাজী বাজী রাও-এর কৃতিত্ব

১৬.৫ উপসংহার

১৬.৬ প্রশ্নাবলী

১৬.৭ গ্রন্থপঞ্জি

১৬.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে শিক্ষার্থীরা ১৭১৩ থেকে ১৭৬১ পর্যন্ত পেশোয়াদের নেতৃত্বে মারাঠা সাম্রাজ্যের বিস্তার সম্পর্কে অবহিত হবে। এই আলোচনা প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর গুরুত্ব আরোপ করে বিশ্লেষণ করা হবে :

- ১৭১৩ থেকে ১৭২০ পর্যন্ত বালাজী বিশ্বনাথের সময় পেশোয়াতন্ত্রের উত্থান এবং শিবাজী-উত্তর সময়ে মারাঠা শক্তির প্রসারণের সূচনা।
- প্রথম বাজী রাও-এর রাজত্বকালে ১৭২০ থেকে ১৭৪০ পর্যন্ত মারাঠা শক্তির রাজনৈতিক সামরিক সম্প্রসারণ ও পেশোয়া রূপে প্রথম বাজী রাও-এর কৃতিত্ব বিচার।
- ১৭৪০ থেকে পানিপথের যুদ্ধ অর্থাৎ ১৭৬১ পর্যন্ত বালাজী বাজী রাও-এর নেতৃত্বে মারাঠা শক্তির পূর্ণ সম্প্রসারণ এবং তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধে আফগান শক্তির কাছে মারাঠাদের পরাজয়।
- বালাজী বাজী রাও-এর কৃতিত্ব বিচার।

১৬.১ ভূমিকা

১৬৮০ খ্রিস্টাব্দে ছত্রপতি শিবাজীর মৃত্যুর পর মারাঠাদের সাময়িক বিপর্যয় ঘটলেও অষ্টাদশ শতকে পেশোয়াদের নেতৃত্বে মারাঠারা পুনরায় নিজেদের সুসংগঠিত করতে সক্ষম হয়। শিবাজীর বংশধরগণ

আত্মকলহে লিপ্ত হয়ে মারাঠাদের অতীত ঐতিহ্য এবং গুরুত্ব নষ্ট করে ফেলেন। এই পরিস্থিতিতে শাসকের সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয় পেশোয়ার হাতে যদিও পেশোয়া ছত্রপতির অধীনস্ত কর্মচারী হিসেবেই গণ্য হতেন বা ছত্রপতিই ছিলেন পেশোয়ার নিয়োগকর্তা। মহারাষ্ট্রের অভ্যন্তরে শিবাজীর পরিবার উত্তরাধিকার দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে সাতারা ও কোলাপুর এই দুই শাখায় বিভক্ত হয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত বালাজী বিশ্বনাথের সহযোগিতায় শম্ভুজীর পুত্র শাহু ছত্রপতির মর্যাদা ভোগ করতে সক্ষম হন। বস্তুত শাহুর মধ্যে শিবাজীর গুণাবলী আদৌ ছিল না। চারিত্রিক দৃঢ়তা বা সামরিক অভিজ্ঞতা না থাকায় মুঘলদের সঙ্গে সম্পর্কের প্রশ্নে বা অন্যান্য মারাঠাদের সঙ্গে বিরোধে তিনি বিব্রত হয়ে পড়েন। তিনি ক্রমশ পেশোয়া বালাজী বিশ্বনাথের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন এবং মৃত্যুর পূর্বে পেশোয়াকে মারাঠা রাজ্যের সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব দান করে যান। মারাঠা রাজনীতিতে পেশোয়াতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়। ১৭১৩-১৭৬১ খ্রি: মধ্যে তিনজন পেশোয়া যথাক্রমে বালাজী বিশ্বনাথ, প্রথম বাজী রাও এবং বালাজী বাজীরাও-এর নেতৃত্বে মারাঠা সাম্রাজ্য ভারতের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলে প্রসার লাভ করে এবং মারাঠা জাতির মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।

১৬.২ বালাজী বিশ্বনাথ (১৭১৩—১৭২০ খ্রি:)

মারাঠা ঐতিহাসিকরা বালাজী বিশ্বনাথকে মারাঠা রাজ্যের দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠাতা বলে মনে করেছেন। বালাজী বিশ্বনাথ ছিলেন কোঙ্কণের এক ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান। ১৭০৮ খ্রিঃ ছত্রপতি শিবাজীর সেনাপতি ধনাজী যাদবের অধীনে একজন রাজস্ব কর্মচারী হিসেবে সরকারি কাজে নিযুক্ত হন। বিচক্ষণ কূটনীতিবিদ ও অভিজ্ঞ প্রশাসক এই চিৎপাবন ব্রাহ্মণ মারাঠাদের গৃহবিবাদের সময় শাহুর পক্ষ অবলম্বন করেন এবং অধিকাংশ মারাঠা সর্দারকে শাহুর পক্ষে আনেন। মহারাষ্ট্রের অভ্যন্তরে শিবাজীর পরিবারে গৃহযুদ্ধ দেখা দিলে মারাঠা সর্দাররা এই সুযোগে নিজেদের প্রভাব প্রতিপত্তি বিস্তার করেছিলেন। বালাজী বিশ্বনাথ তাদের মধ্যে শৃঙ্খলা এবং জাতীয় ঐক্যের ধারণা ফিরিয়ে আনতে অনেকাংশে সফল হন। বালাজীর কর্মদক্ষতায় আকৃষ্ট হয়ে শাহু তাঁকে 'পেশোয়া' বা প্রধানমন্ত্রী পদে উন্নীত করেন। পেশোয়া পদ গ্রহণের পরেই বালাজী বিশ্বনাথ ঐ পদের রাজনৈতিক গুরুত্ব বৃদ্ধি করতে সচেষ্ট হন। কিছুদিনের মধ্যে মারাঠা রাষ্ট্রব্যবস্থায় ছত্রপতি গৌণ এবং পেশোয়া মুখ্য হয়ে ওঠেন। মুঘলদের গৃহবিবাদ ও দলাদলির সুযোগে শিবাজীর আদর্শ ও লক্ষ্যপূরণ করা সম্ভব এটি তাঁর মনে হয়েছিল। শাহু নীতিগতভাবে এবং ব্যক্তিগতভাবে মুঘল বিরোধিতায় রাজী ছিলেন না। কিন্তু মারাঠারাজ্যের অস্তিত্ব স্থায়ী করার জন্য এর প্রয়োজন ছিল। প্রকৃতপক্ষে বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ বা সমরকুশলী যোদ্ধার কোন গুণ শাহুর মধ্যে না থাকায় তিনি নিজের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তাই তিনি রাজ্যের সমস্ত দায়িত্ব বালাজী বিশ্বনাথের ওপর ছেড়ে দেন। মারাঠাদের রাজনৈতিক ইতিহাসে পেশোয়াতন্ত্রের উত্থান ঘটে।

পেশোয়া পদে নিযুক্ত হয়ে বালাজী বিশ্বনাথ মারাঠা সর্দারদের মধ্যে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে এনে সমগ্র মহারাষ্ট্রে সর্দারদের সমর্থন ছত্রপতি শাহুর পক্ষে নিয়ে আসার লক্ষ্যে তিনি তাদের ক্ষমতা ও আর্থিক সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করেন। বালাজী বিশ্বনাথ এই নিয়ম প্রবর্তন করেন যে, সমগ্র আদায়ীকৃত চৌথের ২৫ শতাংশ পাবেন ছত্রপতি। ৯ শতাংশ ছত্রপতি নিজের ইচ্ছামত যে কোনো কর্মচারীকে দেবেন, অবশিষ্ট

৬৬ শতাংশ মারাঠা সর্দারদের মধ্যে বণ্টিত হবে। তবে সরদেশমুখীর সমগ্রটাই পাবেন ছত্রপতি। এই ব্যবস্থা মারাঠা সর্দারদের সন্তুষ্ট করে। শাহু তাদের আনুগত্য লাভ করেন এবং বালাজী বিশ্বনাথের প্রভাব বৃদ্ধি পায়। তবে এই ব্যবস্থার সুদূরপ্রসারী ফল ছিল মারাঠা রাজ্যের অসংহতির কারণ, চৌথের বেশির ভাগ অংশ ভোগের অধিকার লাভ করায় সর্দারদের ক্ষমতা, প্রতিপত্তি ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা বেড়ে যায় এবং বিশেষভাবে দুর্বল পেশোয়াদের আমলে সর্দারদের হাতে এই অতিক্ষমতার কেন্দ্রীয়করণ জাতীয় সংহতির পরিপন্থী হয়ে দাঁড়ায়।

মুঘল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর দরবারে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের সুযোগ নিয়ে বালাজী মারাঠা শক্তি বৃদ্ধি করেন। সম্রাট ফারুকশিয়ারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় অর্থাৎ সৈয়দ আবদুল্লা এবং সৈয়দ হুসেন আলী মারাঠাদের সাহায্য চাইলে বালাজী বিশ্বানাথ রাজি হন। এই দুই ভাই কয়েক বছর ধরে সম্রাট তৈরি করার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। বালাজী বিশ্বনাথ মুঘল দরবারে সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রভাব প্রতিপত্তি সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। তিনি উপলব্ধি করেন যে সৈয়দ হুসেন আলীর সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করতে পারলে মারাঠা শক্তির ক্ষমতা ও মর্যাদা অনেকাংশে বৃদ্ধি পারে। শাহুর পক্ষে বালাজী বিশ্বনাথ ১৭১৪ খ্রিঃ সৈয়দ হুসেন আলীর সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন করেন। এই চুক্তি দ্বারা স্থির হয় যে, (১) শিবাজীর রাজ্যের যে অঞ্চলগুলি মুঘলরা দখল করে নিয়েছিল তা শাহুকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। (২) খান্দেশ, গণ্ডোয়ানা, বেরার, কর্নাটক প্রভৃতি যে সমস্ত অঞ্চল মারাঠারা জয় করেছিল সেগুলির ওপর মারাঠারাজ শাহুর পূর্ণ কর্তৃত্ব মুঘলরা স্বীকার করে নেবে। (৩) দাক্ষিণাত্যের ছয়টি মুঘল সুবা থেকে চৌথ ও সরদেশমুখী আদায়ের অধিকার মারাঠারা লাভ করবে, তবে এই অঞ্চলগুলিতে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য পনের হাজার মুঘল অশ্বারোহী সেনা মোতায়েন করা হবে। এই বাহিনীর ব্যয়ভার বহন করবেন মুঘল সম্রাট। (৪) ছত্রপতি শাহু মুঘল সম্রাটের করদ সামন্ত হিসেবে সম্রাটের বশ্যতা নামেমাত্র স্বীকার করে নিলেও স্থির হয় যে তিনি স্বাধীনভাবেই রাজত্ব করবেন এবং মুঘল সম্রাটকে বাৎসরিক ১০ লক্ষ টাকা নজরানা হিসেবে দেবেন, (৫) শাহু প্রতিশ্রুতি দেন যে তিনি কোলাপুরের মহারাজা দ্বিতীয় শম্ভুজীর রাজ্য আক্রমণ করবেন না। ১৭১৯ খ্রিঃ ফেব্রুয়ারী মাসে সৈয়দ হুসেন আলী তাঁর নূতন মিত্র মারাঠাদের সঙ্গে নিয়ে দিল্লী প্রবেশ করেন এবং ফারুকশিয়ারকে সিংহাসনচ্যুত করে একজন পুতুল সম্রাট রফি-উদ্-দরাজাতকে সিংহাসনে বসান। এই সম্রাটের দ্বারা ১৭১৮ খ্রিঃ চুক্তি অনুমোদিত হয় এবং বালাজী বিশ্বনাথ চুক্তিপত্র এবং রাজপরিবারের মুক্তিপ্রাপ্ত সদস্যদের (শাহুর মা যেসুবাই, শাহুর স্ত্রী, মদন সিং এবং মারাঠা রাজ পরিবারের অন্যান্য সদস্যবৃন্দ) নিয়ে মহারাষ্ট্র ফিরে আসেন।

স্যার রিচার্ড টেম্পল ১৭১৯ খ্রিঃ সম্পাদিত চুক্তিকে 'Magna Carta of the Maratha dominion' বলে উল্লেখ করলেও বা ঐতিহাসিক জি.এস. সরদেশাই এই চুক্তিকে 'বালাজী বিশ্বনাথের দুরদর্শিতা ও গভীর রাজনৈতিক পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক' মনে করলেও অন্য একদল ঐতিহাসিক মনে করেন যে, এই চুক্তি স্বাক্ষর করে বালাজী বিশ্বনাথ শিবাজীর স্বরাজ্যের আদর্শ বিসর্জন দিয়েছিলেন। মারাঠারা দু-দশক ধরে স্বাধীনতার যুদ্ধ চালিয়েছিল, স্বাধীনতা ছিল মারাঠা জাতীয়তাবোধের আদর্শ ও অনুপ্রেরণা, বালাজী তা রক্ষা করতে পারেননি। মুঘল সাম্রাজ্য অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল, বালাজী বিশ্বনাথ এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে মারাঠা সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে পারতেন। চুক্তির সমর্থকরা মনে করেন

যে বালাজী বিশ্বনাথ বিচক্ষণতার সঙ্গে মুঘলদের অন্তঃসারশূন্য সাম্রাজ্য গরিমাকে স্বীকার করে নিয়ে প্রকৃত ক্ষমতা মারাঠাদের হাতে তুলে নেন। চৌথ এবং সরদেশমুখী আদায়ের সঙ্গে সঙ্গে দাক্ষিণাত্যের ওপর মারাঠাদের আধিপত্য স্থাপিত হয়।

তবে ১৭১৯ খ্রিঃ চুক্তিকে কেন্দ্র করে বালাজী বিশ্বনাথ যে ব্যবস্থা গঠন করেন তার মধ্যে মারাঠা সাম্রাজ্যের দুর্বলতার বীজ নিহিত ছিল। তিনি দাক্ষিণাত্যের ছয়টি সুবার রাজস্ব আদায়ের জন্য এই অঞ্চলগুলি মারাঠা সর্দারদের মধ্যে ভাগ করে দেন। মারাঠা সর্দারদের দায়িত্ব দেওয়া হয় নিজ নিজ অঞ্চলে রাজস্ব আদায়ের সঙ্গে সেই অঞ্চল শাসন করা বা সৈন্যবাহিনী রক্ষণাবেক্ষণ করা। সংগৃহীত রাজস্বের একটি নির্দিষ্ট অংশ তারা শাহুকে দেবেন সরদেশমুখী হিসাবে। এছাড়া চৌথের ৩৪ শতাংশ শাহুকে দেবেন। এর ফলে মারাঠা রাজ্যে সামন্ততান্ত্রিক প্রবণতা শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

১৬.৩ প্রথম বাজীরাও (১৭২০—১৭৪০ খ্রি:)

১৭২০ খ্রিঃ বালাজী বিশ্বনাথের মৃত্যুর পর পুত্র প্রথম বাজী রাও পেশোয়া পদে অধিষ্ঠিত হন। বাজী রাও ছিলেন একজন কুশলী অশ্বারোহী যোদ্ধা, কূটনীতিক এবং দূরদর্শী রাষ্ট্র নেতা, অল্প বয়সেই বিভিন্ন সমরাভিযানে পিতার সহযোগী হিসেবে বাজী রাও তাঁর সামরিক প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছিলেন। ঐতিহাসিক গ্রাণ্ট ডাফ তাঁকে 'মারাঠা নেপোলিয়ন' নামে আখ্যায়িত করেছিলেন। রাজনৈতিক দূরদর্শিতা তাঁর সাম্রাজ্যবাদ নীতি নির্ধারণে সাহায্য করেছিল। মুঘল সম্রাজ্যের ভগ্নদশা এবং অভিজাতদের মধ্যে দলাদলির সুযোগ নিয়ে নর্মদা নদীর উত্তরে রাজ্যবিস্তার করে মুঘল সাম্রাজ্যের হৃৎপিণ্ড পর্যন্ত মারাঠা প্রভাব বিস্তার করতে চেয়েছিলেন। মারাঠা সর্দারদের অনেকেই আগে মারাঠা শক্তিকে দাক্ষিণাত্যে সুদৃঢ় করে তারপর উত্তর ভারত অভিযানের পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত বলে অভিমত প্রকাশ করলেও বাজী রাও উত্তর ভারত অভিযান স্থগিত রাখতে চাননি। বাজী রাও এ ব্যাপারে ছত্রপতি শাহুর অনুমতি আদায় করেছিলেন। মুঘল সাম্রাজ্যকে একটি মরণাপন্ন বৃক্ষের সঙ্গে তুলনা করে বলেন—'আমাদের মরণাপন্ন বৃক্ষের কাণ্ডে আঘাত করা উচিত, তার শাখাগুলি আপনা থেকেই পড়ে যাবে। তখনই কৃষ্ণা থেকে সিন্ধু পর্যন্ত মারাঠা পতাকা উড্ডীন থাকবে।'

মারাঠা সম্প্রসারণবাদী নীতি অনুসরণের প্রাক্কালে তিনি হিন্দুপাদ-পাদশাহী আদর্শের কথা ঘোষণা করেছিলেন। সম্ভবত তাঁর উদ্দেশ্য ছিল ভারতের হিন্দু রাজাদের সঙ্গে সহযোগিতায় হিন্দুপাদ-পাদশাহী স্থাপন করা। শুধু মহারাষ্ট্র বা মারাঠা জাতির নেতা হিসেবে নয়, সমগ্র ভারতবর্ষের এবং বিশেষত হিন্দু সমাজের পরিত্রাতা হিসেবে তিনি নিজেকে তুলে ধরেন। তাঁর হিন্দু রাজ্যের আদর্শ দেশের হিন্দু নেতৃত্বকে পেশোয়ার অনুগত হতে অনুপ্রাণিত করেছিল। ১৭২৩ খ্রিঃ ডিসেম্বর মাসে বাজী রাও মালব আক্রমণ করলে স্থানীয় হিন্দু জমিদারেরা হিন্দু সাম্রাজ্য গঠনের আকাঙ্ক্ষায় তাঁকে সমর্থন জানায়। গুজরাটের মুঘল সুবাদার সরবুলান্দ খানের অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে গুজরাটিরা মারাঠাদের স্বাগত জানায়। সরবুলান্দ খান মারাঠা আক্রমণ প্রতিরোধ করতে ব্যর্থ হয়ে ১৭৩০ খ্রিঃ মারাঠাদের সঙ্গে একটি সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষর করে গুজরাটে পেশোয়ার চৌথ ও সরদেশমুখী আদায়ের অধিকার স্বীকার করেন।

তবে বাজীরাও এর সাফল্য মারাঠা রাজ্যের বংশানুক্রমিক সেনাপতি ত্রিম্বক রাও ধাবাড়েকে ঈর্ষান্বিত করে এবং তিনি বাজী রাও এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। হায়দ্রাবাদের নিজাম-উল্-মুলক্ ও মারাঠাদের অগ্রগতিতে শঙ্কিত ও ঈর্ষান্বিত ছিলেন। কোলাপুর রাজ দ্বিতীয় শম্ভুজী এবং নিজাম-উল-মুলক ত্রিম্বক রাও ধাবাড়ের সঙ্গে হাত মিলিয়ে একটি পেশায়াবিরোধী জোট গড়ে তোলেন। বাজী রাও জানতেন যে, নিজামের ক্ষমতা খর্ব করতে পারলে দক্ষিণ ভারতে তাঁর বিরোধী গোষ্ঠী দুর্বল হয়ে পড়বে। পেশোয়া প্রথম বাজী রাও ১৭২৮ খ্রিঃ বালখেদের যুদ্ধে নিজামকে পরাজিত করেন। নিজাম বাজী রাও এর সঙ্গে মুঙ্গিশিবগাঁওয়ের চুক্তি স্বাক্ষর করতে বাধ্য হন। এই চুক্তির শর্তানুযায়ী নিজাম-উল-মুল্ক ছত্রপতি শাহুকে মহারাষ্ট্র অঞ্চলের নৃপতি হিসেবে স্বীকার করেন এবং সমগ্র দাক্ষিণাত্যে চৌথ ও সরদেশমুখী আদায়ের ক্ষেত্রে শাহুর অধিকার স্বীকার করেন। তিনি কোলাপুর গোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পর্ক না রাখারও প্রতিশ্রুতি দেন। জঞ্জিরার সিদ্দি সম্প্রদায় ও গোয়ায় পর্তুগিজদের পরাজিত করে তিনি মহারাষ্ট্রের উপকুল অঞ্চলে পেশোয়ার কর্তৃত্ব নিরঙ্কুশ করেন। মালব ও গুজরাটে মারাঠা কর্তৃত্ব স্থাপিত হয়। এরপর ১৭৩১ খ্রিঃ ১লা এপ্রিল ধাবলের নিকট বিল্হাপুরের যুদ্ধে ত্রিম্বক রাও ধাবাড়েকে পরাজিত ও হত্যা করেন। মারাঠা পেশোয়াতন্ত্রের ইতিহাসে বাজীরাও-এই বিজয় একটি অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হিসেবে পরিচিত। এই বিজয়ের ফলে পেশোয়ার মারাঠা অঞ্চলে কোন রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী থাকল না। কোলাপুরের দ্বিতীয় শম্ভুজীও ১৭৩১ খ্রীঃ পেশোয়ার বশ্যতা স্বীকার করে নিয়ে তাঁর সঙ্গে ওয়ার্নার-এর সন্ধিচুক্তিতে আবদ্ধ হতে বাধ্য হন। তাছাড়া নিজাম ও পেশোয়ার মধ্যে স্বাক্ষরিত অপর একটি সন্ধি চুক্তিতে স্থির হয় যে দক্ষিণ ভারতে নিজামের অঞ্চলে মারাঠারা হস্তক্ষেপ করবে না, অন্যদিকে উত্তর ভারতে পেশোয়ার শক্তিবৃদ্ধিতে নিজাম প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করবে না।

এরপর প্রথম বাজী রাও উত্তর-ভারতে মারাঠা আধিপত্য বিস্তার করতে উদ্যোগী হন। এক্ষেত্রে তিনি অম্বরের রাজা দ্বিতীয় জয়সিংহ সোয়াই এবং বুন্দেলখণ্ডের ছত্রশাল বুন্দেলার সহায়তা লাভে সাহায্য করেছিল। বাজীরাও-এর নেতৃত্বে মারাঠা বাহিনী দিল্লীর নিকট উপস্থিত হন। এখানে বসবাসকারী জাঠ, মেওয়াটি সম্প্রদায়ের মানুষ মারাঠাদের সমর্থন করে, মারাঠা আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য মুঘল সম্রাট মহম্মদ শাহ নিজাম-উল-মুলককে আহ্বান জানান। কিন্তু 'ভূপালের যুদ্ধে' নিজাম-উল মুলকের বাহিনী পরাজিত হয়। 'দুহরা সরাইর চুক্তি' (১৭৩৮খ্রিঃ) দ্বারা নিজাম মালব এবং নর্মদা ও চম্বল নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে মারাঠাদের কর্তৃত্ব মেনে নেন। এছাড়া নিজাম যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ ৫০ লক্ষ টাকা মুঘল সম্রাটের নিকট থেকে পেশোয়ার জন্য আদায় করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন।

প্রথম বাজী রাও ১৭৩৩ খ্রিঃ কোঙ্কণ উপকূলের শক্তিশালী সামুদ্রিক দূর্গ জঞ্জিরা অবরোধ করেন। জঞ্জিরার দুর্গ ছিল সিদ্দির অর্থাৎ আবিসিনীয় মুসলমানদের অধীনস্থ। বাজী রাওর সেনাবাহিনী জঞ্জিরা দখল না করলেও জঞ্জিরার নিকটবর্তী যাবতীয় অঞ্চল যা সিদ্দিদের দখলে ছিল, সেগুলি দখল করে। ১৭৩০ এর দশকের শেষদিকে মারাঠা সেনাবাহিনী কোঙ্কণ অঞ্চলে পর্তুগীজদের পরাজিত করে সলসেট, বেসিন ও চাউল বন্দরগুলি দখল করে। এই সময় নাদির শাহ ভারত আক্রমণ করলে বাজী রাও চিন্তিত হয়ে পড়েন এবং বিদেশী আক্রমণের বিরুদ্ধে সমস্ত ভারতবাসীকে ঐক্যবদ্ধ করার কর্মসূচি নেন। কিন্তু এই পরিকল্পনা চূড়ান্ত রূপ পাওয়ার আগেই ১৭৪০ খ্রিঃ মাত্র চল্লিশ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়।

সরদেশাই, ভি.জি. দিঘে, স্টুয়ার্ট গর্ডন প্রমুখ ঐতিহাসিক মারাঠা সাম্রাজ্য গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বাজী রাও-এর অবদান বিশেষ করে তাঁর সামরিক প্রতিভা এবং কূটনৈতিক বুদ্ধির প্রশংসা করেছেন। সরদেশাই বাজী রাওকে 'বৃহত্তর মহারাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা' বলে মনে করেছেন। মাত্র কুড়ি বছরের মধ্যে বাজী রাও মারাঠা রাষ্ট্রের বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটিয়েছিলেন। তবে সমরবিদ ও রাজনীতিক হিসেবে প্রথম বাজী রাও মৌলিকতার পরিচয় দিলেও সংগঠক ও প্রশাসক হিসেবে তিনি সফল হননি বলে কোনো কোনো ঐতিহাসিক মনে করেছেন। একজন সফল সামরিক নেতা হিসেবে একটি বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তুললেও সাম্রাজ্যকে স্থায়িত্ব দিতে পারেননি। সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে ক্ষুদ্র অথচ শক্তিশালী কিছু রাজ্যের অস্তিত্ব বা আধা-স্বাধীন অঞ্চলের অস্তিত্ব একটি দক্ষ কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছিল। মারাঠা রাজ্যের অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রথম বাজী রাও কোন সদর্থক পদক্ষেপ নেননি। কৃষি, বাণিজ্যের উন্নতির দিকে তিনি প্রয়োজনীয় দৃষ্টি দেননি। তাঁর মূল নির্ভরতা ছিল চৌথ ও সরদেশমুখীর উপর। এই কর অনৈতিক এবং জোরপূর্বক আদায় করার ফলে মারাঠাদের প্রতি সাধারণ মানুষের অসন্তোষ বৃদ্ধি পেয়েছিল। লুণ্ঠনের উপর ভিত্তি করে সংগৃহীত অর্থ কোন রাষ্ট্রের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতে পারে না। মারাঠা সর্দাররা জোরপূর্বক চৌথ ও সরদেশমুখী আদায় করায় তাদের হাতে অর্থ, ক্ষমতা এবং আঞ্চলিক কর্তৃত্ব এসেছিল। এর ফলে মারাঠা রাষ্ট্রসংঘের সংহতি বিনষ্ট হয়েছিল। গাইকোয়াড়, ভোঁসলে, সিন্ধিয়া প্রভৃতি গোষ্ঠীর সর্দারগণ পেশোয়ার সমমর্যাদা ও কর্তৃত্ব ভোগ করতে আগ্রহী ছিলেন। বাজী রাও এ ব্যাপারে কোন সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি। ঐতিহাসিক সুরেন্দ্রনাথ সেন বাজী রাও-এর হিন্দুপাদ-পাদশাহির আদর্শ খাঁটি ছিল না বলে মন্তব্য করেছেন।

১৬.৪ বালাজী বাজী রাও (১৭৪০—১৭৬১ খ্রি:)

প্রথম বাজী রাও-এর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র বালাজী বাজী রাও যিনি নানাসাহেব নামে পরিচিত, মাত্র উনিশ বছর বয়সে পেশোয়া পদে নিযুক্ত হন। পেশোয়া পদে নিযুক্ত হওয়ার পূর্বে সাম্রাজ্যবিস্তার এবং শাসনকার্যে তিনি তাঁর পিতাকে সাহায্য করায় তিনি এ বিষয়ে অভিজ্ঞ ছিলেন। তাই কিছু প্রভাবশালী মারাঠা সর্দারের আপত্তি সত্ত্বেও ছত্রপতি শাহু তাতে কর্ণপাত না করে বালাজী বাজী রাওকে পেশোয়া পদে নিয়োগ করেন এবং এর ফলে পেশোয়া পদে বংশানুক্রমিক অধিকার-তত্ত্ব দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। পেশোয়া পদে অভিষিক্ত হওয়ার পর বালাজী বাজী রাও সাম্রাজ্য সংগঠিত করার কাজ শুরু করেন। এছাড়া বিজিত অঞ্চল থেকে ঠিকমত চৌথ ও সরদেশমুখী আদায় করা, পিতৃঋণ পরিশোধ করার দায়িত্ব নিতে হয়েছিল। এর জন্য প্রয়োজন ছিল অবিরাম যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার, এর সঙ্গে ছিল গৃহবিবাদ জনিত জটিল সমস্যা, যার সমাধানের উপর নির্ভর করেছিল পেশোয়া হিসেবে নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী হওয়া।

বালাজী বাজী রাও পিতার সাম্রাজ্যবাদী আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সমগ্র ভারতবর্ষব্যাপী অভিযান পরিচালনা করেন। তিনি ঘোষণা করেন, 'দক্ষিণে কটক থেকে উত্তর-পশ্চিমে আটক পর্যন্ত পতাকা উড্ডীয়মান থাকবে'। তবে লক্ষ্য এক হওয়া সত্ত্বেও দুইদিক দিয়ে পিতার নীতি থেকে তাঁর বিচ্যুতি ঘটেছিল। প্রথমত, মারাঠা সৈন্যবাহিনীতে ভাড়াটে সৈন্য নিয়োগ করায় মারাঠা বাহিনীর ঐক্য, সংহতি ও শৃঙ্খলা নষ্ট হয়। দ্বিতীয়ত, পিতার 'হিন্দু পাদ-পাদশাহী'র আদর্শ বিসর্জন দিয়ে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে বিজিত অঞ্চল

থেকে জোরপূর্বক চৌথ ও সরদেশমুখী আদায় করেন। প্রথম বাজী রাও চৌথ ও সরদেশমুখী প্রভৃতি করের হাত থেকে উত্তর ভারতের হিন্দু রাজাদের রেহাই দিয়েছিলেন, কিন্তু বালাজী বাজী রাও এর এই পদক্ষেপের ফলে হিন্দুরাজাদের মধ্যে বিশেষত রাজপুতদের মধ্যে মারাঠা বিরোধী মনোভাব গড়ে ওঠে।

বালাজী বাজী রাও-এর কর্মবহুল জীবনের প্রথম পর্যায়ের (১৭৪০-১৭৪৯ খ্রিঃ) মূল বৈশিষ্ট্য হল পেশোয়ার নিরঙ্কুশ ক্ষমতা লাভ এবং মারাঠাদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রধান কেন্দ্র হিসাবে পুনার উত্থান, মারাঠাদের মালব বিজয় এবং কর্ণাটক অভিযানের সূচনা। দ্বিতীয় পর্যায়ে (১৭৪৯-১৭৬১ খ্রিঃ) বাংলায় মারাঠা আক্রমণের ফলশ্রুতি হিসাবে ১৭৫১ খ্রিঃ ওড়িশা অধিকার, শাহুর উত্তরাধিকারী রাজারামের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্তিলাভ, উত্তর ভারতের রাজপুতানা এবং পাঞ্জাব পর্যন্ত মারাঠা শক্তির বিস্তার। তবে এই সাম্রাজ্যবিস্তৃতির মধ্যেই মারাঠা শক্তির পতনের কারণ নিহিত ছিল। কারণ পাঞ্জাবে মারাঠা শক্তির বিস্তার। পাঞ্জাবে মারাঠা শক্তির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে মারাঠাদের সঙ্গে আহম্মদ শাহ আবদালির সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে ওঠে। ১৭৬১ খ্রিঃ তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধে আবদালির হাতে মারাঠাদের চূড়ান্ত পরাজয়ের ফলে মারাঠা অগ্রগতি ব্যাহত হয়।

বালাজীর উদ্যোগের ফলে মারাঠা আধিপত্য উত্তর, দক্ষিণ ও মধ্য ভারতে দ্রুত প্রসার লাভ করতে থাকে। ১৭৪১ খ্রিঃ মুঘল সম্রাটের এক ফর্মান-বলে মালব ও বুন্দেলখণ্ডের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। জাঠ, বুন্দেলাদের নিকট থেকে মারাঠারা চৌথ আদায় করে। মারাঠা আক্রমণ, ধ্বংসলীলা এবং লুণ্ঠন বাংলাদেশের জনজীবনকে বিধ্বস্ত করে তুলেছিল। আলিবর্দি খান মারাঠাদের সঙ্গে একটি সমঝোতায় আসতে বাধ্য হন এবং ১৭৫১ খ্রিঃ স্বাক্ষরিত একটি চুক্তির মাধ্যমে তিনি মারাঠাদের বাৎসরিক ১২ লক্ষ টাকা চৌথ হিসেবে দিতে এবং তাদের ওড়িশা ছেড়ে দিতে স্বীকৃত হন।

১৭৫০ এর দশকের শেষার্দ্ধে বালাজী উত্তর ভারত ও দাক্ষিণাত্যে সাম্রাজ্য-বিস্তারের লক্ষ্যে সামরিক অভিযান প্রেরণ করেন। ১৭৫৭ খ্রিঃ মার্চ মাসে এক বিশাল মারাঠা বাহিনী-কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণে অবস্থিত ক্ষুদ্র রাজ্যগুলির নিকট থেকে বলপূর্বক প্রচুর ধনসম্পত্তি আদায় করে। ১৭৬০ খ্রিঃ পেশোয়ার ভাইপো সদাশিব রাও উদ্‌গিরের যুদ্ধে নিজামকে পরাজিত করেন। মারাঠাদের সঙ্গে নিজামের স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী বিজাপুর প্রদেশ, প্রায় সমগ্র আওরঙ্গাবাদ, বিদরের একাংশ এবং দৌলতাবাদের গুরুত্বপূর্ণ দুর্গসহ বেশ কিছু দুর্গ মারাঠাদের হস্তগত হয়। দাক্ষিণাত্যে মারাঠা শক্তির উল্লেখযোগ্য বিস্তারের পর বালাজী উত্তর ভারতে মারাঠা শক্তি বিস্তারে দৃষ্টি দেন। কালীকিঙ্কর দত্ত উত্তর ভারতে মারাঠা শক্তির বিস্তার আরও গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছেন। ১৭৫৬ খ্রিঃ শেষদিকে সখারাম বাপুর নেতৃত্বে এক বিশাল মারাঠা বাহিনী দোয়াব অঞ্চলে অধিকার করে। ১৭৫৭ খ্রিঃ আগস্ট মাসে মারাঠা বাহিনী দিল্লি আক্রমণ করে এবং নাজিব-উদ্-দৌল্লাকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করে। ১৭৫৮ খ্রিঃ এপ্রিল মাসে মারাঠারা সিরহিন্দ এবং লাহোর অধিকার করে আদিনা বেগ খান নামে জনৈক অভিজ্ঞ স্থানীয় অভিজাতকে পাঞ্জাবের শাসনকর্তা নিযুক্ত করে। আদিগা বেগ খান মারাঠাদের বার্ষিক ৭০ লক্ষ টাকা নজরানা হিসেবে দিতে প্রতিশ্রুতি দেন।

মারাঠাদের পাঞ্জাব দখলের বিষয়টিকে যদুনাথ সরকার অর্থনৈতিক দিক দিয়ে নিষ্ফল প্রয়াস এবং রাজনৈতিক জ্ঞানহীন একটি পদক্ষেপ বলে আখ্যা দিয়েছেন। মারাঠাদের পাঞ্জাব অভিযানের ব্যয় নির্বাহ করতে গিয়ে ৮০ লক্ষ টাকা ঋণের বোঝা মারাঠাদের উপর চেপে বসে। রাজনৈতিক দিক থেকে এই

অভিযান মারাঠাদের সঙ্গে আহমদ শাহ আবদালির যুদ্ধ অনিবার্য করে তোলে। পানিপথের প্রান্তরে অবদালির সঙ্গে মারাঠাদের চূড়ান্ত সংঘর্ষ হয় (১৭৬১ খ্রিঃ)। মারাঠারা চৌথ ও সরদেশমুখী আদায়ের ব্যাপারে সারা ভারতবর্ষব্যাপী এতটাই ত্রাসের সঞ্চার করেছিল যে প্রায় সকলেই তাদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছিল। রাজপুত ও জাঠেরা মারাঠা-আফগান দ্বন্দ্বে নিরপেক্ষতা অবলম্বন করেছিল এবং শিখরাও মারাঠাদের সমর্থনে এগিয়ে আসেনি। এই পরিস্থিতিতে আফগান নেতা আহমদ শাহ আবদালির হতে মারাঠারা চূড়ান্তভাবে পরাজিত হয়। পেশোয়ার পুত্র এবং ভাইপো এই যুদ্ধে নিহত হন, প্রচুর মারাঠা সৈন্য হতাহত হয়। পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে পরাজয়ের গ্লানি ও প্রিয়জনের মৃত্যু সহ্য করতে না পেরে মাত্র অল্প কয়েকদিনের মধ্যে ১৭৬১ খ্রিঃ জুন মাসে ভগ্নহৃদয় পেশোয়া বালাজী বাজী রাও প্রাণ ত্যাগ করেন।

১৬.৪.১ বালাজী বাজী রাও-এর কৃতিত্ব

বালাজী বাজী রাও-এর নেতৃত্বে মারাঠা শক্তির চরম বিকাশ ঘটেছিল। পেশোয়ার সর্বময় কর্তৃত্ব তথা মারাঠা জাতির মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছিল। বালাজী বাজী রাও সম্পর্কে বলা হয়েছে যে তিনি ছিলেন একজন হৃদয়বান ও সংস্কৃতিবান মানুষ। তিনি পুনাকে শুধু দক্ষিণ ভারতের রাজধানী নয়, সংস্কৃতির পীঠস্থান হিসেবে গড়ে তোলেন। পেশোয়ার অধীনস্থ অঞ্চলগুলি সুশাসনের ব্যবস্থা করেন। প্রত্যেক জেলায় কামবিসদার নিযুক্ত করা হয় যারা সরকারকে তাদের অধীনস্থ অঞ্চলের কৃষি, শিল্প ও অন্যান্য তথ্য সরবরাহ করত এবং এইসব তথ্যের উপর নির্ভর করে পেশোয়া রাজস্বের পরিমাণ ধার্য করতেন। বালাজী বাজী রাও-এর অনেক অর্থের প্রয়োজন ছিল। পিতৃঋণ ছিল পঞ্চাশ লক্ষ টাকা। কিন্তু যুদ্ধ বিধ্বস্ত দাক্ষিণাত্য থেকে বেশি অর্থ সংগ্রহ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। মারাঠা সেনাবাহিনীকে নিয়মিত বেতন দিতে পারতেন না। সৈন্যবাহিনীতে ভাড়াটে সৈন্য গ্রহণ করেন। বিদেশীদের সেনাবাহিনীতে গ্রহণ করার ফলে মারাঠা বাহিনীর জাতীয় চরিত্র নষ্ট হয়ে যায়। অর্থের জন্য ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে চৌথ ও সরদেশমুখী আদায় করতে গিয়ে মারাঠা সর্দাররা যে নির্মম লুণ্ঠন নীতি গ্রহণ করেছিলেন, তা নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা পেশোয়ার ছিল না। উত্তর ভারতের রাজনীতি সম্পর্কেও তাঁর সম্যক ধারণা ছিল না। মারাঠা সর্দারের অর্ন্তবিরোধের জন্য তারা সুষ্ঠু নীতি অনুসরণ করতে পারেননি। আবদালির সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ার ঘটনা তাঁর রাজনৈতিক অদূরদর্শিতার সাক্ষ্য বহন করে। নানা ত্রুটি বিচ্যুতি সত্ত্বেও একথা অবশ্যই স্বীকার্য যে তাঁর সময়েই মারাঠা শক্তির চরম বিকাশ ঘটেছিল।

১৬.৫ উপসংহার

মারাঠা শক্তির ইতিহাসে পেশোয়াতন্ত্রের উত্থান, বিকাশ ও ক্ষমতা সংহতকরণ এবং সর্বভারতীয় রাজনৈতিক পরিসরে মারাঠাদের প্রভাব প্রতিষ্ঠা অষ্টাদশ শতকের ভারতের ইতিহাসে অন্যতম তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। পেশোয়াতন্ত্রের উত্থান শুধু মহারাষ্ট্রের বা দক্ষিণ ভারতের ইতিহাসকে প্রভাবিত করেছিল তা নয়, উত্তর ভারতের রাজনৈতিক-সামরিক সমীকরণকে প্রভাবিত করেছিল। পেশোয়াদের সময় মারাঠা শক্তি একদিকে যেমন দক্ষিণ ভারতের রাজনীতিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শক্তি রূপে আবির্ভূত হয়েছিল, তেমনি উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ ভূমিতে মারাঠারা ক্রমশ অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে। অবক্ষয়ী মুঘল শক্তির

বিকল্প রূপে মারাঠারা এগিয়ে আসে। মারাঠাদের এই রাজনৈতিক-সামরিক সম্প্রসারণের পিছনে পেশোয়াদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল। মারাঠাদের এই উত্থান আফগান শক্তির সঙ্গে তাদের দ্বন্দ্ব অনিবার্য করে তোলে, যার পরিণতি তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধ। ১৭৬১ সালের এই যুদ্ধে পরাজয় মারাঠাদের পক্ষে ছিল বিপুল বিপর্যয়। এর ফলে মারাঠা শক্তি যেমন রাজনৈতিক-সামরিক ভাবে বহুলাংশে দুর্বল হয়ে পড়েছিল, তেমনি পেশোয়াদের মর্যাদা ও কর্তৃত্ব কিছুটা হলেও ধাক্কা খেয়েছিল। তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধের অব্যবহিত পরে ১৭৬১ খ্রি: পেশোয়া বালাজী বাজী রাও ভগ্ন হৃদয়ে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। উত্তর ভারতের রাজনীতি থেকে মারাঠাদের সাময়িক অপসারণ ঘটে। মারাঠা শক্তির ক্ষমতা পুন:প্রতিষ্ঠিত হয় পেশোয়া মাধব রাও, নানা ফড়নেবিশ এবং মহাদজি সিন্ধিয়ার নেতৃত্বে ১৭৭০ ও ১৭৮০ এর দশকে।

১৬.৬ প্রশ্নাবলী

১. আপনি কি বালাজী বিশ্বনাথকে প্রকৃতপক্ষে মারাঠা সাম্রাজ্যে দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠাতা মনে করেন?
২. আপনি কি মনে করেন যে বালাজী বিশ্বনাথের আমলে যে পেশোয়াতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়, মারাঠা রাজনীতিতে তা এক নূতন যুগের সূচনা করেছিল?
৩. পেশোয়া প্রথম বাজী রাওকে কি একজন কূটনীতিক এবং দূরদর্শী রাষ্ট্র নেতা হিসাবে অভিহিত করা যায়?
৪. আপনি কি প্রথম বাজী রাওকে 'বৃহত্তর মহারাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা' বলে মনে করেন?
৫. পেশোয়া বালাজী বাজী রাও-এর কৃতিত্বের মূল্যায়ণ করুন।

১৬.৭ গ্রন্থপঞ্জি

- Chaurasia, R.S. *History of the Marathas,* New Delhi, 2004
- Chhabra, G. S. *Advancel Study in the History of Modern India,* Vol. I. 1707-1803, Lotus Press, 2005
- Gordon, Stewart. *The Marathas, 1600-1818, New Cambridge History of India, Voll, II,* Cambridge University Press, 1993.
- Sardesai, G. *A New History of the Marathas, 2 Vols.,* Bombay, 1946-1948.
- Srivastava A.L. *The Mughal Empire, 1526-1803, Agra, 1952.*

—

একক ১৭ ❑ মুঘল সাম্রাজ্যের পতন

গঠন

১৭.০ উদ্দেশ্য

১৭.১ ভূমিকা

১৭.২ মুঘল সাম্রাজ্যের ভাঙন: ঔরঙ্গজেবের উত্তরাধিকারীগণ

১৭.৩ সাম্রাজ্যের পতনে অভিজাতদের ভূমিকা

১৭.৪ নাদির শাহ-র আক্রমণ (১৭৩৮-৩৯ খ্রি:)

১৭.৫ উপসংহার

১৭.৬ প্রশ্নাবলী

১৭.৭ গ্রন্থপঞ্জি

১৭.০ উদ্দেশ্য

এই এককটির উদ্দেশ্য হল মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের প্রক্রিয়াকে শিক্ষর্থীদের সামনে উপস্থিত করা। নিম্নলিখিত তিনটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করে মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের প্রক্রিয়াকে অনুধাবন করার চেষ্টা করব :

- ঔরঙ্গজেবের পরবর্তী মুঘল সম্রাটগণের সময় মুঘল সাম্রাজ্যের অবক্ষয় ও ভাঙন
- মুঘল সাম্রাজ্যের অবক্ষয় ও ভাঙনে অভিজাত শ্রেণির ভূমিকা
- পতনোন্মুখ মুঘল সাম্রাজ্যের উপর নাদির শাহের আক্রমণ ও তার প্রভাব

১৭.১ ভূমিকা

১৫২৬ খ্রিঃ পানিপথের প্রথম যুদ্ধে জয়লাভ করে জহিরুদ্দিন বাবর যে সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, নানা সাংগঠনিক দুর্বলতা সত্ত্বেও প্রায় দুইশত বছর তার অস্তিত্ব বজায় ছিল। যে কোনো বৃহৎ সাম্রাজ্যের মতই মুঘল সাম্রাজ্যের ও শাসনতান্ত্রিক দক্ষতা ও স্থায়িত্ব অনেকাংশে নির্ভর করেছিল সম্রাটের ব্যক্তিগত দক্ষতার ওপর। প্রথম পর্বের মুঘল সম্রাটগণ বিশেষত বাবর থেকে শাহজাহান পর্যন্ত প্রত্যেক মুঘল সম্রাটের ব্যক্তিগত দক্ষতা, যোগ্যতা ও দূরদৃষ্টির ফলে সাম্রাজ্যের বহিঃকাঠামো বজায় ছিল, সাম্রাজ্যের বিস্তার ঘটেছিল। এমনকি ঔরঙ্গজেবের রাজত্বের প্রথম দিকে মুঘল সাম্রাজ্যের সাংগঠনিক কাঠামোয় নিহিত দুর্বলতাগুলি প্রকট হয়ে ওঠেনি। ঔরঙ্গজেবের শাসনের শেষ দিকে এবং তাঁর দুর্বল উত্তরাধিকারীদের

আমলে এই দুর্বলতাগুলি প্রকট হয়ে ওঠে। নূতন করে সাম্রাজ্যের বিস্তার শুধু নয়, উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত অধিকারটুকু বজায় রাখাও পরবর্তী বংশধরদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর মাত্র পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই সুদূর বিস্তৃত মুঘল সাম্রাজ্য কেবলমাত্র দিল্লী ও আগ্রার মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে।

১৭.২ মুঘল সাম্রাজ্যের ভাঙন: ঔরঙ্গজেবের উত্তরাধিকারীগণ

মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ঐতিহাসিকেরা নানা অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যদুনাথ সরকার এবং আরভিন ঔরঙ্গজেবের ধর্মনীতি, পরবর্তী মুঘল সম্রাটদের দক্ষতার অভাব এবং মুঘল অভিজাতগণের নৈতিক অধঃপতনকে দায়ী করেছেন। ইরফান হাবিবের আলোচনায় অতিরিক্ত রাজস্ব আদায়ের জন্য জমিদার ও কৃষকদের ওপর রাষ্ট্রের নির্যাতন মুঘল সাম্রাজ্যে একের পর এক জমিদার-কৃষক বিদ্রোহের প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। এই বিদ্রোহগুলি মুঘল সাম্রাজ্যের পতনকে ত্বরান্বিত করেছে। সতীশচন্দ্র মনসবদারি প্রথার ভাঙন, জায়গিরদারি প্রথায় সংকট এবং ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর মুঘল দরবারে অভিজাতদের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের মধ্যে মুঘল সাম্রাজ্যের অবক্ষয়ের কারণ অনুসন্ধান করেছেন। আতাহার আলী মন্তব্য করেছেন যে অষ্টাদশ শতকের ইউরোপীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার ক্ষমতা মুঘল সাম্রাজ্যের ছিল না। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ইসলামিক দুনিয়ার ব্যর্থতার মধ্য দিয়ে তিনি মুঘল সাম্রাজ্যের পতনকে ব্যাখ্যা করেছেন। মুজাফ্ফর আলম ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে আঞ্চলিক শক্তির উত্থান অতিরিক্ত পরিমাণে কেন্দ্রীভূত মুঘল সাম্রাজ্যকে দুর্বল করে তুলেছিল বলে মন্তব্য করেন। কোনো কোনো ঐতিহাসিক মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের জন্য দুর্বল নৌশক্তি এবং বৈদেশিক আক্রমণকে চিহ্নিত করেছেন।

মুঘল সম্রাটের ব্যক্তিগত দক্ষতা এবং যোগ্যতার উপর মুঘল শাসনতান্ত্রিক সংগঠন এবং সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব অনেকাংশে নির্ভরশীল ছিল। আকবর থেকে ঔরঙ্গজেব পর্যন্ত মুঘল সম্রাটেরা তাদের দক্ষতা ও যোগ্যতার সাহায্যে সাম্রাজ্যের আপাত সংহতি ও স্থায়িত্ব টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হলেও ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালে অন্তিমলগ্নে এবং বিশেষ করে তাঁর দুর্বল উত্তরাধিকারদের আমলে সাম্রাজ্যের দুর্বলতাগুলি প্রকট হয়ে ওঠে এবং একদা পরাক্রান্ত মুঘল সাম্রাজ্য ক্রমে পতনোন্মুখ হয়ে পড়ে। সম্রাটদের দুর্বলতার সুযোগে মুঘল রাজদরবারে অভিজাতদের মধ্যে তীব্র গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ও দলাদলি মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। সাম্রাজ্যের প্রতি সেবার মধ্য দিয়ে তাদের কর্তব্যপালনের কথা বিস্মৃত হন।

ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পরেই তাঁর তিন পুত্রের মধ্যে সিংহাসনের উত্তরাধিকার নিয়ে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। সিংহাসনের জন্য পুত্রদের মধ্যে এই সংঘাতের আশঙ্কা করে ঔরঙ্গজেবের জীবিতাবস্থাতেই এক দলিল দ্বারা নিজ সাম্রাজ্যকে পুত্রদের মধ্যে বণ্ঠন করে দিয়েছিলেন। দলিল অনুযায়ী তিনি পুত্র মুয়াজ্জম, আজম ও কামবক্স যথাক্রমে কাবুল, গুজরাট ও দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তার পদ লাভ করেন। কিন্তু ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর এই উইল একটি মূল্যহীন কাগজে রূপান্তরিত হয় এবং পুত্রগণ যুদ্ধে লিপ্ত হন। মুয়াজ্জম আজম ও কামবক্সকে হত্যা করে বাহাদুর শাহ বা শাহ আলম উপাধি নিয়ে দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করেন ১৭০৮ খ্রিঃ।

বাহাদুর শাহ ছিলেন একজন শিক্ষিত, আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ও দক্ষপ্রশাসক। রাজ্য শাসনের ক্ষেত্রে তিনি ঔরঙ্গজেবের গোঁড়ামি ও পক্ষপাতমূলক নীতি বর্জন করে পারস্পরিক সমঝোতা ও সহযোগিতার নীতি গ্রহণ করেন। রাজত্বের প্রথম দিকে যুদ্ধ দ্বারা অম্বর ও মেবারের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট হলেও শীঘ্রই তিনি রাজপুত মৈত্রীর গুরুত্ব উপলব্ধি করেন এবং এই দুটি রাজ্যের সঙ্গে আপোষ মীমাংসা করে নেন। তবে শিখ ও মারাঠাদের প্রতি তিনি সমঝোতা ও যুদ্ধ—এই দুই নীতি অনুসরণ করেছিলেন। গুরু গোবিন্দ সিংহকে যথাযোগ্য স্বীকৃতি প্রদান করে তিনি শিখ জাতির বৈরিতা অনেকাংশে হ্রাস করতে সক্ষম হলেও গুরু গোবিন্দের মৃত্যুর পর বান্দা বাহাদুর পুনরায় মুঘল বিরোধিতা শুরু করলে বাহাদুর শাহ তা কঠোর হাতে দমন করেন। লোহাগড় সহ অনেক শিখ দুর্গ তিনি দখল করেন। মারাঠা সর্দারদের প্রতি তাঁর নীতি ছিল অসম্পূর্ণ। দাক্ষিণাত্যের মারাঠাদের সরদেশমুখী মেনে নিলেও চৌথ না মানায় তিনি তাদের সন্তুষ্ট করতে পারেননি। শাহুকে তিনি শিবাজীর ন্যায়সঙ্গত উত্তরাধিকার রূপে স্বীকৃতি দেননি। ফলে মারাঠা রাজ্যের অধিকার নিয়ে তারাবাঈ এবং শাহুর মধ্যে লড়াই শুরু হয়। দাক্ষিণাত্যে অরাজকতা দেখা দেয় এবং শাহু এবং মারাঠা সর্দাররা সম্রাটের উপর অসন্তুষ্ট হয়। মারাঠা সর্দারদের পরস্পরের মধ্যে এবং মুঘল কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে মারাঠাদের লড়াই এর ফলে দাক্ষিণাত্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়নি। বুন্দেলরাজ ছত্রশাল এবং জাঠ নেতা চূড়ামনের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করে বাহাদুর দূরদৃষ্টির পরিচয় দেন। এ সত্ত্বেও সাম্রাজ্যের ক্ষয় রোধ করা সম্ভব হয়নি। ১৭১২ খ্রীঃ তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ভ্রাতৃদ্বন্দ্বে মুঘল রাজনীতি অশান্ত হয়ে ওঠে।

বাহাদুর শাহের রাজত্বকালে মুঘল প্রশাসনে আরও অবনতি দেখা দেয়। মাত্র পাঁচ বছরের রাজত্বকালে বাহাদুর শাহর দরবার অভিজাতদের দলালির কেন্দ্র হয়ে ওঠে। সতীশচন্দ্র ঔরঙ্গজেবের রাজত্বের শেষ পর্বে দুটি পরস্পর বিরোধী অভিজাতগোষ্ঠী দরবারে উপস্থিত ছিল। একটির নেতৃত্বে ছিল আসাদ খান ১৬৭৬ খ্রিঃ ওয়াজির পদে নিযুক্ত হন। ৭০০০ মনসব পদমর্যাদা নিয়ে ১৭০৭ খ্রি: পর্যন্ত ঐ পদে নিযুক্ত ছিলেন। আসাদ খানের পুত্র জুলফিকার খান মারাঠাদের বিরুদ্ধে অভিযানে দক্ষতা প্রদর্শন করেন এবং ১৭০২ খ্রি: মীরবক্সী-র পদ লাভ করেন। এইভাবে পিতা-পুত্র মিলে সাম্রাজ্যে গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক ক্ষমতা কুক্ষিগত করে নেন। অপরদিকে আসাদ ও জুলফিকারের বিরুদ্ধে গাজীউদ্দিন খান ফিরুজ জঙ্গ ও তাঁর পুত্র চিনকুলিচ খান (নিজাম-উল-মুলক) ও মুহম্মদ আমিল খান চিন মিলে চিন গোষ্ঠী গঠন করেন।

বাহাদুর শাহ সম্রাট হয়ে ঘোষণা করেন, যে সব অভিজাত এতদিন আজমের অনুগামী ছিলেন তাঁরা বাহাদুর শাহর অনুগত হলে পুরোনো মনসব ফিরে পাবেন। আসাদ খান ও তাঁর পুত্র পরিবর্ত্তিত পরিস্থিতিতে আজমের পক্ষ ত্যাগ করে বাহাদুর শাহর আনুগত্য স্বীকার করেন। জুলফিকার খান স্বপদে বহাল থাকেন। বাহাদুর শাহের সিংহাসন আরোহণের সময় মুনিম খান তাঁকে সাহায্য করেছিলেন। বাহাদুর শাহ মুনিম খানকে উচ্চপদ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। জুলফিকার খান মীর বক্সীর পদ ফিরে পাওয়ায় মুনিম খানকে ৭০০০ মানসব দিয়ে ওয়াজির হিসেবে নিযুক্ত করেন। আসাদ খানকে ৮০০০ মনসব দিয়ে ওয়াকিল-ই-মুতলুক পদ ও আসাফ-উদ-দৌল্লা উপাধি দেওয়া হয়। মুনিম খানের উপর আসাদকে বসানোয় মুনিম খানের সঙ্গে আসাদ খানের বিরোধ তীব্র হয়। এছাড়া বাহাদুর শাহ-র রাজত্বকালে বহু

পদোন্নতি ও বেপরোয়া ভাবে জায়গীর বন্টনের ফলে সাম্রাজ্যের আর্থিক অবস্থা শোচনীয় হয়।

বাহাদুর শাহ-র মৃত্যুর পর প্রথম পুত্র জাহাঙ্গির শাহ তাঁর তিন ভ্রাতা আজিম-উম-শান, জাহান শাহ ও রফি-উস-শান-কে হত্যা করে মসনদ দখল করেন। এই সময় সিংহাসন উত্তরাধিকারের লড়াই-এ একটি নতুন মাত্রা যোগ হয়। এর আগে ক্ষমতা দখলেনর প্রতিযোগিতায় শুধুমাত্র রাজপুত্ররা অংশ নিত, এবং অভিজাতরা যে কোনো একজন সিংহাসনের দাবীদারের পক্ষ নিত। কিন্তু এই সময় থেকে কেবল রাজরক্ত সম্পর্কিত ব্যক্তিরাই নন, দরবারের প্রতিপত্তিশালী আমির-ওমরাহগণও বাদশাহি নির্বাচনে ও প্রশাসনে সক্রিয় ভূমিকা নিতে শুরু করেন। অযোগ্য, দুর্বলচিত্ত ও মাদকাসক্ত জাহান্দার শাহ-র প্রধান পরিচালক ছিলেন তাঁর প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার খান। ১৭১২ খ্রিঃ ২৯শে মার্চ তিনি জাহান্দার শাহকে মুঘল সম্রাট করেন এবং নিজে তখন প্রকৃত শাসকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। 'ওয়াজির' পদ লাভ করা ছাড়া ও দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তার পদ তিনি নিজের হাতে তুলে নেন। পিতা আসাদ খানকে ১২,০০০ 'জাট' সম্পন্ন মনসবদার পদে উন্নীত করেন।

জুলফিকার খান ছিলেন খুবই দক্ষ এবং কর্মক্ষম। তাঁর বিশ্বাস ছিল যে রাজদরবারে তাঁর নিজের অবস্থান শক্ত এবং রাজত্ব নিরাপদ রাখার জন্য রাজপুত রাজা এবং মারাঠা সর্দার ও হিন্দু দলপতিদের সঙ্গে সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক রাখা প্রয়োজন। এই কারণে তিনি ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালের মৌলবাদী ধরণাগুলির প্রকোপ থেকে প্রশাসনকে মুক্ত করতে শুরু করেন। জিজিয়া প্রত্যাহার করেন। অম্বরের জয় সিংহ এবং মারওয়াড়ের অজিত সিংহের মনসব পদে বৃদ্ধি ঘটান। রাজারামের পুত্র দ্বিতীয় শিবাজীকে মনসব বন্টন করেন। জুলফিকার খান মারাঠা রাজ শাহুর সঙ্গে সমঝোতা করেন। এই সমঝোতার ফলে তিনি মারাঠা রাজাকে সরদেশমুখী এবং চৌথ কর দিতে রাজী হন। চুড়ামন জাঠ ও ছত্রশাল বুন্দেলার সঙ্গে সমঝোতা করলেও বান্দা এবং শিখদের প্রতি জুলফিকার দমন নীতি চালু রেখেছিলেন।

জায়গিরের সমস্যা নিয়ে কোনোরকম মীমাংসা করা যায়নি। বাহাদুর শাহ-র স্বল্পকালীন রাজত্বকালে নির্বিচারে মনসব বিতরণ করায় জায়গির দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠেছিল। জায়গিরদারগণও আর্থিক দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। রাজস্ব আদায় আশানুরূপ না হওয়ায় এবং এই সঙ্গে আমিতব্যয়িতার কারণে রাজকোষ শুন্য হয়ে যায়। সামগ্রিকভাবে মনসবদারদের সঙ্গে প্রশাসনের এক গভীর অবিশ্বাসের সম্পর্ক তৈরি হয়। এর সঙ্গে যুক্ত হয় চিন কুলিচ খানের সঙ্গে তিক্ততার সম্পর্ক। চিন-কুলিচ খান আজিম-উস-শাসনের পক্ষ অবলম্বন করায় জুলফিকার তাঁকে বিরোধী বলে গণ্য করতেন। দরবারী রাজনীতিতে অন্য বিরোধী পক্ষও ছিল। জুলফিকারের অন্যতম বিরোধী ছিলেন সাম্রাজ্ঞী তথা একদা নর্তকী লাল কুঁয়র। সম্রাটের অসীম অনুরাগ লাভ করে তিনি ক্ষমতাবান হয়ে ওঠেন এবং নানা বিষয়ে জুলফিকারের সঙ্গে তাঁর বিরোধ ছিল নিত্যদিনের ঘটনা। এভাবেই দরবারের রাজনীতি মুঘল সাম্রাজ্যের আমলাতন্ত্রকে দুর্বল করে এবং সম্রাটকে নামসর্বস্ব করে তোলে।

জাহান্দার শার আমলে মুঘল দরবারে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব তীব্র আকার ধাসদমকরণ করেছিল। এছাড়া এই সময় রাজকোষ ছিল শূন্য। সৈন্যরা ঠিকমত বেতন না পাওয়ায় সেনাবাহিনীতে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। এই সুযোগে আজিম-উস-শানের পুত্র ফারুকশিয়ার জাহান্দার শাহকে পরাস্ত করে ১৭১৩ খ্রিঃ দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করেন। দিল্লির সিংহাসন লাভ করার ক্ষেত্রে ফারুকশিয়ারকে সাহায্য করেছিলেন

বারহার সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় অর্থাৎ এলাহাবাদের শাসনকর্তা হাসান আলি আবদুল্লা এবং বিহারের শাসনকর্তা হুসেন আলি। ফারুকশিয়ার হাসান আলি আবদুল্লাকে ওয়াজির পদে এবং হুসেন আলিকে মীর বক্সী পদে নিয়ুক্ত করেন। ফলে মুঘল দরবারে সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রভাব বৃদ্ধি পায়। সৈয়দ ভ্রাতারা পুরোনো অভিজাতদের সন্তুষ্ট রাখতে চেয়েছিলেন। চিন কুলিচ খানকে নিজাম-উল-মুলক উপাধিতে ভূষিত করে দাক্ষিণাত্যের সুবাদার পদে নিয়োগ করা হয়। চিন-কুলিচ খান দাক্ষিণাত্যে জায়গির বন্টনের অধিকার লাভ করেন ও মারাঠাদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে স্বাধীনতা লাভ করেন। মহম্মদ আমিন খান দ্বিতীয় বক্সীর পদ লাভ করেন। আবদুস সামাদ খান যদিও জুলফিকার খানের সমর্থক ছিলেন, তা সত্ত্বেও যেহেতু তিনি চিন কুলিচ খানের আত্মীয় ছিলেন, সেহেতু তাকে ক্ষমা করা হয় এবং সাত হাজারির 'জাট'-এর মনসবদার পদে উন্নীত করে লাহোরের শাসনকর্তা পদে নিযুক্ত করা হয়।

সম্রাট ফারুকশিয়ারের সঙ্গে সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের সুসম্পর্ক বজায় থাকেনি। প্রথম থেকেই সৈয়দ ভ্রাতাদের সঙ্গে ফারুকশিয়ারের সম্পর্কের মধ্যে একটা পারস্পরিক সন্দেহ ও অবিশ্বাসের ক্ষেত্র তৈরি হয়েছিল। সৈয়দ ভ্রাতারা চেয়েছিলেন যে সম্রাট সমস্ত বিষয়ে তাঁদের উপদেশ বা পরামর্শ মেনে চলবেন। কিন্তু ফারুকশিয়ার সৈয়দ ভ্রাতাদের বিরুদ্ধে চক্রান্তে লিপ্ত হন। কাফী খান লিখেছেন যে সৈয়দ ভ্রাতাদের প্রভাব এতই গভীর হয়ে উঠেছিল যে কোনও মনসব তাঁদের সম্মতি ছাড়া বণ্টন করা সম্ভব ছিল না। মির জুমলা হুসেন আলি খানের সঙ্গে পরামর্শ না করেই দরাজ হাতে মনসব বিলি করতে থাকলে এবং এ বিষয়ে ফারুকশিয়ারের মদত থাকার ফলে ক্ষুব্ধ সৈয়দ ভ্রাতারা ফারুকশিয়ারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করেন। ফারুকশিয়ারের পক্ষে এই ষড়যন্ত্র ঠেকানো সম্ভব হয়নি। দুর্নীতি ও অসততার দায়ে মির জুমলাকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয় এবং তাঁর মনসব ও জায়গির বাজেয়াপ্ত করা হয়। এর ফলে ফারুকশিয়ার দুর্বল হয়ে পড়েন। এই অবস্থায় ফারুকশিয়ার তাঁর রক্ষণশীল দেওয়ান-ই-খালিসা ইনায়েতুল্লা খানের প্ররোচনায় অমুসলমানদের উপর পুনরায় জিজিয়া কর আরোপ করেন এবং হিন্দুস্থানী অভিজাতদের নিকট থেকে 'সয়ের হামিল' এলাকার জায়গিরদারগুলি নিয়ে নিলে হিন্দু অভিজাতরা ফারুকশিয়ারের ওপর অসন্তুষ্ট হন। সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করেন। তাঁরা হিন্দু মানসিকতা ও অনুভূতিকে কাজে লাগান। এই সময় কয়েকজন প্রভাবশালী অভিজাত যেমন সরবুলান্দ খান, মহম্মদ আমিন খান, নিজাম-উল-মুলক প্রমুখ সম্রাটের ওপর নানা কারণে অসন্তুষ্ট হন। এই অবস্থায় ফারুকশিয়ার সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন ও সঙ্গীহীন হয়ে পড়লে হুসেন আলি মারাঠা সৈন্যবাহিনী সঙ্গে নিয়ে দিল্লি প্রবেশ করেন এবং ১৭১৯ খ্রীঃ ফারুকশিয়ারকে হত্যা করেন।

এরপর সৈয়দ ভাইরা জাহান্দার শাহ-র এক ভাই রফি-উস্-শানের দুই পুত্র রফি-উদ্-দরজাৎ এবং রফি-উদ্-দৌল্লাহকে অল্প সময়ের জন্য পরপর দিল্লির সিংহাসনে বসান। এরপর সম্রাট হন জাহান্দার শাহ-র আর এক ভাই জাহান শাহর পুত্র রোশন আখতার যিনি মহম্মদ শাহ উপাধি নিয়ে মুঘল সম্রাট পদে অভিষিক্ত হন। এই সময় সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় মুঘল দরবারে অপ্রতিহত ক্ষমতার অধিকারী হন। সাম্রাজ্যের যাবতীয় ক্ষমতা এমন কি, সম্রাটের ব্যক্তিগত জীবনযাত্রার ওপরও সৈয়দ ভ্রাতাদের নিয়ন্ত্রণ ছিল নিরঙ্কুশ। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসের তাঁরা King Maker বা রাজা তৈরি করার ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। কিন্তু সৈয়দদের প্রতাপ নিরবচ্ছিন্নভাবে চলতে পারেনি। জিজিয়া কর তুলে দেওয়া, মারাঠাদের নির্দিষ্ট কিছু এলাকা থেকে চৌথ ও সরদেশমুখী আদায়ের স্বীকৃতিদান, চূড়ামন জাঠের ওপর দিল্লি থেকে গোয়ালিয়র

পর্যন্ত বিস্তৃত রাজপথের দায়িত্ব অর্পণ এবং ফারুকশিয়ারকে হত্যা করার জন্য সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় ইরানি ও তুরানি অভিজাতদের বিরাগভাজন হন। এই সময় নিজাম-উল-মুলক জাতি ও ধর্মের জিগির তুলে ঘোষণা করেন যে-ইরানি ও তুরানি গোষ্ঠীসহ সকল মুঘল অভিজাতশ্রেণির সম্মান, সাম্রাজ্যের মর্যাদা এবং ইসলাম ধর্ম সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় এবং তাদের হিন্দু মিত্রদের দ্বারা বিপন্ন হয়েছে। ১৭২০ খ্রিঃ ১০ই আগস্ট নিজামের বাহিনীর হাতে এবং ১৭২০ খ্রিঃ ১৩ই নভেম্বর মহম্মদ আমিন খান, মহম্মদ খান বঙ্গাশ এবং সম্রাট মহম্মদ শাহের যৌথ বাহিনীর হাতে সৈয়দ বাহিনীর পরাজয় ঘটে। এই সঙ্গে মুঘল দরবারে সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের আধিপত্যের অবসান ঘটে।

মহম্মদ শাহ ১৭৪৮ খ্রিঃ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তবে তাঁর সুদীর্ঘ রাজত্বকালে অভিজাতদের দলাদলি এবং আর্থিক দুর্নীতি বজায় ছিল। সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের পতনের পর ১৭২১ খ্রিঃ ফেব্রুয়ারী থেকে ১৭২৩ খ্রিঃ ডিসেম্বর পর্যন্ত নিজম-উল-মুলক ওয়াজির পদে নিযুক্ত ছিলেন। এই সময়ে শাসনতন্ত্রের বিভিন্ন স্তরে দুর্নীতি ও বিশৃঙ্খলা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। একজন শক্তিশালী এবং দূরদৃষ্টিসম্পন্ন শাসক অভিজাতদের সমর্থন পেলে হয়ত অবস্থার সামাল দিতে পারতেন। কিন্তু মহম্মদ শাহ এর জন্য উপযুক্ত ব্যক্তি ছিলেন না। তিনি ছিলেন দুর্বলচিত্ত এবং আরাম ও বিলাসব্যসনের প্রতি আসক্ত। তিনি রাজ্যপরিচালনার ব্যাপারগুলিকে গুরুত্ব দিতেন না। কুকি জিউ নামে এক সুন্দরী ও বুদ্ধিমতী মহিলা মুঘল দরবারে অসম্ভব প্রভাবশালী হয়ে ওঠেন। কুকি জিউ বিভিন্ন ব্যাপারে উৎকোচ নিতেন এবং সেই উৎকোচে মহম্মদ শা-র ভাগ ছিল। এই পরিস্থিতিতে মুঘল অর্থনীতি ভেঙে পড়ে এবং রাজকোষ শূন্য হয়ে যায়। শাসনব্যবস্থায় দক্ষতা ফিরিয়ে আনার জন্য নিজাম-উল-মুলক কিছু সংস্কার সাধনে উদ্যোগী হলে ও মহম্মদ শাহ এবং কুকি জিউ-এর বিরোধীতা করেন। শাসনসংস্কারে ব্যর্থ হয়ে নিজাম ওয়াজিরাৎ ত্যাগ করে হায়দ্রাবাদে গিয়ে স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। এই সময় থেকেই শুরু হয় স্বাধীন হায়দ্রাবাদ রাজ্যের ইতিহাস। মুঘল সাম্রাজ্যের প্রকৃত ভাঙনের শুরু হয়।

১৭.৩ সাম্রাজ্যের পতনে অভিজাতদের ভূমিকা

অর্থনৈতিক অবক্ষয় এবং অভিজাতদের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব মুঘল সাম্রাজ্যে শাসনতান্ত্রিক বিশৃঙ্খলার জন্ম দেয় এবং কেন্দ্রীয় শক্তির দুর্বলতার সুযোগে আঞ্চলিক শক্তির উত্থান ও বৈদেশিক আক্রমণের পথ প্রশস্ত হয়। মুঘল প্রশাসনিক কাঠামোর অন্যতম স্তম্ভস্বরূপ ছিল মুঘল অভিজাতশ্রেণি। সমসাময়িক রাজনৈতিক কেন্দ্রবিন্দুর চরিত্রগত বা গুণগত পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অভিজাতদের ভূমিকার পরিবর্তন ঘটে। মুঘল সাম্রাজ্যের গৌরব বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এই অভিজাতশ্রেণির অবদান যেমন অনস্বীকার্য, তেমনি এদের গঠনতান্ত্রিক দুর্বলতা এবং স্বার্থদ্বন্দ্ব সেই গৌরবকে ম্লান করেছিল। যদুনাথ সরকার মুঘল শাসনের অবক্ষয়ের অন্যতম কারণ হিসেবে অযোগ্য ও স্বার্থান্ধ অভিজাতদের দায়ী করেছেন। সপ্তদশ শতকে প্রতিভাসম্পন্ন অভিজাত যেমন আবদুল রহিম, সাদাউল্লা মীরজুমলা, ইসলাম খাঁ প্রমুখ অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। অষ্টাদশ শতকের প্রথম দিকেও অনেক অভিজাত বিশেষত জুলফিকার খান, সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় এবং নিজাম-উল-মুলক-এর প্রশাসনিক ও কূটনৈতিক দক্ষতা প্রশংসার দাবি রাখে। সৈয়দ ভ্রাতারা মারাঠা

ও রাজপুতদের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তুলে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির নজিরও সৃষ্টি করেছিলেন। কিন্তু তাঁদের সকলের কাছেই ব্যক্তিস্বার্থ বা গোষ্ঠীস্বার্থই বড় ছিল। সাম্রাজ্যের সার্বিক স্বার্থ তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। সতীশচন্দ্র মনে করেন, এই শাসকশ্রেণি ছিল মুঘল সাম্রাজ্যের ইস্পাত-কাঠামো, কিন্তু অষ্টাদশ শতকের প্রথমভাবে এই অভিজাত শ্রেণি তাদের সেই উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হন। তবে এক্ষেত্রে সম্রাট তাদের গতিপথ নিয়ন্ত্রণ করতে পারতেন, কিন্তু সম্রাট দুর্বল, অযোগ্য হওয়ায় অভিজাত শ্রেণি সাম্রাজ্যের প্রতি সেবার মধ্য দিয়ে তাদের কর্তব্য পালনে বিরত হয়েছিলেন।

১৭.৪ নাদির শাহ-র আক্রমণ (১৭৩৮-৩৯ খ্রি:)

মুঘল সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ সংকটের মধ্যে পারস্য সম্রাট নাদির শাহর আক্রমণ ছিল সাম্রাজ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক। নাদির শাহর হাতে পরাজিত হয়ে মহম্মদ শাহ তাঁকে প্রচুর ধনসম্পদ দিতে বাধ্য হন। মুঘল রাজকোষ শূন্য হয়ে যায়। মহম্মদ শাহ তাঁর দীর্ঘ রাজত্বে কোনো সময়ে যুদ্ধ করেননি। এই জাতীয় ব্যক্তির পরিষদরাও ছিলেন যুদ্ধবিমুখ। যদুনাথ সরকারের মন্তব্য হল—শাসক যে চরিত্রের ছিলেন, সেই রকমই অজ্ঞ, অনভিজ্ঞ এবং স্বার্থপর ছিলেন অভিজাতবর্গ। সতীশ চন্দ্র এবং আতাহার আলী দেখিয়েছেন যে আর্থিক বিপর্যয়ের কারণে মনসবদাররা সেনা ও রসদ মোতায়েন করতে পারেনি।

মুঘল সাম্রাজ্য যত দিন শক্তিশালী ছিল ততদিন ভারতে বৈদেশিক আক্রমণ ঘটেনি। বিচক্ষণ মুঘল সম্রাটরা বৈদেশিক আক্রমণের আশঙ্কায় ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্তে সতর্ক দৃষ্টি রেখেছিলেন। তাঁরা কাবুল ও কান্দাহারের উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। কিন্তু ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের নিরাপত্তা অবহেলিত হয়। ফলে ভারতের বিরুদ্ধে পারস্য সম্রাট নাদির শাহ ও আফগান সম্রাট আহম্মদ শাহ আবদালির আক্রমণ সম্ভব হয়েছিল।

১৭৩৬ খ্রিঃ সাফাভি বংশের নাবালক রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করে নাদির যখন শাহ উপাধি গ্রহণ করে পারস্য সম্রাট বলে ঘোষণা করেন তখন অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা ও ঘনঘন বৈদেশিক আক্রমণজনিত কারণে পারস্যের রাজকোষ শূন্য হয়ে গিয়েছিল। নাদির শাহ নিজের ক্ষমতা সংহত করার জন্য বিশাল সেনাবাহিনীর প্রয়োজন অনুভব করেন এবং এই সেনাবাহিনীর ব্যয়ভার মেটানোর জন্য প্রয়োজন ছিল প্রচুর অর্থের। ভারতের সমসাময়িক রাজনৈতিক দুর্বলতা ও আর্থিক সমৃদ্ধি নাদিরকে প্রলুব্ধ করে। কোনো কোনো সমসাময়িক মারাঠা ঐতিহাসিক নাদির শাহ-র ভারত আক্রমণের পেছনে মুঘল দরবারে অসন্তুষ্ট গোষ্ঠীর মদত ছিল বলে মনে করলেও আধুনিক গবেষকরা এই বক্তব্যের সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। নাদির শাহ ১৭৩৮ খ্রিঃ গোড়ায় কান্দাহার অধিকার করেন। এর পর কাবুল দখল করে খাইবার গিরিপথ অতিক্রম করে ভারতে প্রবেশ করেন ও লাহোর অধিকার করে নেন। লাহোর অধিকার করে নাদির যখন দিল্লির পথে অগ্রসর হন, তখন ও সেই সংকটের মুহূর্তে মুঘল বাহিনীকে পরিচালনা করবেন তা নিয়ে বিরোধ ও রাজনীতি অব্যাহত ছিল।

কোনোরকমে একটি বাহিনী নিয়ে মহম্মদ শাহ বর্তমান হরিয়ানার কার্নালে নাদির শাহ-র বাহিনী সঙ্গে যুদ্ধ করেন। যুদ্ধে মহম্মদ শাহ পরাজিত হন। দীর্ঘ দুই শত বছরের সামরিক ঐতিহ্য থাকা সত্ত্বেও তাসের ঘরের মতো মুঘলদের প্রতিরোধ ভেঙে পড়ে। কাবুল থেকে পাঞ্জাব পর্যন্ত যাবতীয় মুঘল দুর্গ ও প্রতিরোধব্যূহ নাদির দখল করেন। ১৭৩৯ খ্রিঃ দিল্লি নগরীর লুণ্ঠন ও গণহত্যা মুঘল সাম্রাজ্যের ভগ্নদশাকে জনসমক্ষে প্রকট করে। আধুনিক ঐতিহাসিকরা ধারণা করেন যে শুধুমাত্র রাজকোষ ও প্রাসাদ লুঠ করে নাদির শাহ প্রায় ৭০ কোটি টাকা লাভ করেন। দেশে প্রত্যাবর্তনকালে কোটি কোটি টাকার সঙ্গে তিনি শাহজাহানের বিখ্যাত কোহিনূর হীরে ও ময়ূর সিংহাসন এবং উপঢৌকন হিসেবে হাতি, ঘোড়া, উট, গবাদি পশু, দাসদাসি ও কারিগর নিয়ে যান। V. A. Smith এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করেন, *"Nadir Shah proceeded systematically and remorselessly to collect from all classes of population the wealth of Delhi, the accumulation of nearly three centuries and a half. After a stay of fifty eight days, he departed for his own country laden with treasure of incalculable richness, including, the world-famed peacock throne, of Shah jahan."*

ভারতের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাসে নাদির শাহর আক্রমণ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ভগ্নপ্রায় মুঘল সাম্রাজ্যের মৃত্যু ঘটে এই অভিযানের মাধ্যমে। স্থানীয় কিছু শক্তির উত্থান ইতিপূর্বেই ঘটেছিল। এবার ছোট ছোট জমিদারও কার্যত স্বাধীন হয়। ব্রিটিশ বণিকদলও উপলব্ধি করে যে ভারতের শোষণের পথ প্রশস্ত। নাদিরের সীমাহীন লুণ্ঠনের ফলে কেবল রাজকীয় অর্থব্যবস্থাই নয়, সারা দেশের অর্থনীতি বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। এই সময় মুঘল সাম্রাজ্যের এলাকা বলতে বোঝায় পশ্চিমের সাহারানপুর থেকে নাগোর, পূর্বে ফারুকাবাদ এবং গঙ্গানদী থেকে দক্ষিণে চম্বল নদী পর্যন্ত এলাকা। কিন্তু এ অঞ্চলেও মুঘল সম্রাটের নিরঙ্কুশ আধিপত্য সম্ভবত ছিল না।

১৭.৫ উপসংহার

ঔরঙ্গজেবের মৃত্যু ভারতের ইতিহাসে একটি যুগের সমাপ্তি ঘোষণা করে। ঔরঙ্গজেবের পর যারা মুঘল সাম্রাজ্যে সম্রাট পদে আসীন হয়েছিলেন তাদের মধ্যে উদ্যম, দূরদর্শিতা এবং দক্ষতার অভাব ছিল। বাহাদুর শাহ ছিলেন বয়ঃভারে শ্রান্ত, জাহান্দার শাহ ছিলেন ব্যাভিচারী এবং অলস, ফারুকশিয়ার ছিলেন যোগ্যতাহীন। সম্রাটের ব্যক্তিত্ব, দক্ষতা ও উদ্যমের উপর একান্তভাবে নির্ভর করত সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব ও সংহতি। দুর্বল ও অপদার্থ সম্রাটদের পক্ষে উচ্চাকাঙ্ক্ষী, ক্ষমতালিপ্সু, শাসকশ্রেণীকে নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হয়নি। আসাদ খান, জুলফিকার খান, সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়, নিজাম-উল-মুলকের মত প্রতিভার অধিকারী অভিজাতরা তাদের প্রতিভার অনেকাংশই ব্যয় করেছেন নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থসিদ্ধির জন্য। সাম্রাজ্যের প্রতি সেবার মাধ্যমে কর্তব্য পালনে বিরত থেকেছেন। ফলে সাম্রাজ্যের সংহতি শিথিল হয়েছে। সম্রাটের দুর্বলতার প্রেক্ষাপটে আঞ্চলিক শক্তিগুলি, যেমন-রাজপুত, মারাঠা, বুন্দেলা, জাঠ এবং শিখরা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে এবং পরবর্তী মুঘল সম্রাটদের পক্ষে সাম্রাজ্যের সংহতি রক্ষা করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। অভ্যন্তরীণ আর্থ-সামাজিক, সামরিক ও রাজনৈতিক কারণে ক্ষয়িষ্ণু মুঘল সাম্রাজ্যের ওপর চরম

আঘাত হানেন নাদির শাহ। নাদির শাহ-র আক্রমণের মুখে মুঘল সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ে।

১৭.৬ প্রশ্নাবলী

১. অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে মুঘল দরবারে দল ও রাজনীতির প্রকৃতি বিশ্লেষণ করুন।

২. অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্দ্ধে মুঘল প্রশাসনে অভিজাত শ্রেণির ভূমিকা আলোচনা করুন। সাম্রাজ্যের পতনে তাঁরা কতখানি দায়ী ছিলেন?

৩. নাদির শাহ-র ভারত আক্রমণের কারণ কী ছিল? ভারতের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাসে এই আক্রমণের গুরুত্ব আলোচনা করুন।

১৭.৭ গ্রন্থপঞ্জি

- Irvine, William. *Later Mughals,* Low Price Publications, 1995
- Chandra, Satish. *Parties and Politics at the Mughal Court,* 1707-1740, Oxford, 2004
- *The History and culture of the Indian People, Vol. VII, The Mughal Empire,* Bharatiya Vidyabhavan.
- Prasad, Bisheshwar. *Bondange and Freedom,* New Delhi, 1981
- Richards, John F. *The Mughal Empire,* Cambridge University Press, 1995
- Truschke, Audrey. *Aurangzeb, The Life and Legacy of India's Most Controversial King,* Stafford University Press, 2017
- Srivastava, A. L. *The Mughal Empire,* 1526-1803, Agra, 1952.

—

একক ১৮ ❑ আঞ্চলিক শক্তির উত্থান

গঠন

১৮.০ উদ্দেশ্য

১৮.১ ভূমিকা

১৮.২ হায়দ্রাবাদ

১৮.৩ অযোধ্যা

১৮.৪ বাংলা

১৮.৪.১. মুর্শিদকুলি খান ও রাজস্ব প্রশাসন

১৮.৪.২. সুজাউদ্দিন খান-মহম্মদ (১৭২৭-১৭৩৯ খ্রীঃ)

১৮.৪.৩. সরফরাজ খান (১৭৩৯-১৭৪০ খ্রীঃ)

১৮.৪.৪. আলীবর্দী খান (১৭৪০-১৭৫৬ খ্রীঃ)

১৮.৪.৫. আলিবর্দী খান ও মারাঠা আক্রমণ

১৮.৪.৬. মারাঠা আক্রমণের প্রভাব

১৮.৪.৭. আলবর্দী খান ও ইউরোপীয় বণিকগণ

১৮.৪.৮. সিরাজ-উদ্-দ্দৌলা (১৭৫৬-৫৭ খ্রীঃ)

১৮.৪.৯. সিরাজ-উদ্-দ্দৌলা ও ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি

১৮.৪.১০. পলাশির যুদ্ধের ফলাফল

১৮.৫ উপসংহার

১৮.৬ প্রশ্নাবলী

১৮.৭ গ্রন্থপঞ্জি

১৮.০ উদ্দেশ্য

বর্তমান এককের উদ্দেশ্য হল অষ্টাদশ শতকের ভারতের রাজনৈতিক পটভূমিতে মুঘল সাম্রাজ্যের অবক্ষয়ের সময়ে আঞ্চলিক শক্তির উত্থানকে বিশ্লেষণ করা। হায়দ্রাবাদ, অযোধ্যা ও বাংলাকে কেন্দ্র করে আঞ্চলিক শক্তির বিকাশ অষ্টাদশ শতকের ভারতবর্ষে ঘটেছিল। নিম্নে বর্ণিত বিষয়গুলির উপর গুরুত্ব আরোপ করে এই আলোচনা করা হবে:

- নিজামের নেতৃত্বে হায়দ্রাবাদের উত্থান
- লখনউকে কেন্দ্র করে অযোধ্যার উত্থান
- নবাবি শক্তিকে কেন্দ্র করে বাংলার উত্থান
- পলাশির যুদ্ধ, বাংলায় স্বাধীন নবাবির পতন ও ইংরেজ শক্তির ক্ষমতা বিস্তার

১৮.১ ভূমিকা

মুঘল সাম্রাজ্যের ভাঙনের এক স্পষ্ট প্রকাশ ছিল মুঘল সুবাগুলির স্বতন্ত্র চেতনা এবং আঞ্চলিক স্তরে স্বাধীন রাজ্য গঠনের প্রয়াস। ডঃ কালিকিঙ্কর দত্ত অষ্টাদশ শতককে দুঃসাহসী ভাগ্যান্বেষীদের যুগ বলে অভিহিত করেছেন। দক্ষ ভাগ্যান্বেষী সৈনিকগণ মুঘল সম্রাটের প্রতি মৌখিক আনুগত্য বজায় রেখে নিজ নিজ অঞ্চলে স্বাধীন প্রশাসনিক কর্তৃত্ব ভোগ করতে শুরু করেন। হায়দ্রাবাদ, অযোধ্যা, বাংলা প্রভৃতি অঞ্চল সম্রাটের আনুগত্য স্বীকার করলেও স্বাধীন প্রশাসনিক কর্তৃত্ব এমনভাবে ভোগ করতে প্রয়াসী ছিল যাতে কেন্দ্রীভূত মুঘল সাম্রাজ্যের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে বিবেচনা করা ছিল কষ্টকর। এইসব স্বাধীন রাজ্যের শাসকেরা নিজ নিজ অঞ্চলে আইন শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করতে এবং সুবিন্যস্ত অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর তাঁর দুর্বল উত্তরসূরিদের পক্ষে এই প্রতিভাবান আঞ্চলিক শাসকদের নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়নি। এদের কেন্দ্রবিমুখ মানসিকতা ও কার্যকলাপের সঙ্গে আপোস করেই তাঁরা সন্তুষ্ট ছিলেন।

১৮.২ হায়দ্রাবাদ

১৭২৪ খ্রিঃ দক্ষিণ ভারতে হায়দ্রাবাদ রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন মুঘল অভিজাত মীর কামারউদ্দিন-চিন কুলিচ খান। ১৭১৩ খ্রিঃ সম্রাট ফারুকশিয়ার চিনকুলিচ খানকে নিজাম-উল-মুলক উপাধি দিয়ে দাক্ষিণাত্যের মোট ছয়টি সুবার সুবেদার এবং একই সঙ্গে কর্ণাটকের ফৌজদার পদে নিযুক্ত করেছিলেন। তখন দাক্ষিণাত্যে সুষ্ঠু প্রশাসন ছিল না। নিজাম-এর লক্ষ্য ছিল মারাঠা শক্তিকে খর্ব করা। মারাঠাদের দমন করার নানা পরিকল্পনা রূপায়ণে তিনি অগ্রসর হন। মারাঠাদের চৌথ আদায়ের বিরোধিতা করেন এবং মারাঠা সর্দারদের অন্তর্দ্বন্দ্বকে কাজে লাগিয়ে তার কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট হন। ইতিমধ্যে রাজধানীতে সম্রাটের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে দরবারে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রবল আকার নেয়। সৈয়দ ভ্রাতাদের ক্রমান্বয়ে ক্ষমতাবৃদ্ধির কারণে সম্রাটের বাহ্যিক অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়েছিল। একই সঙ্গে সৈয়দ ভ্রাতাদের বিরোধিতা ও বিরূপতার ফলে নিজামেরও রাজনৈতিক জীবন কিছুটা অনিশ্চিত হয়ে পড়েছিল। ১৭১৫ খ্রিঃ নিজাম-উল-মুলকের অপসারণ এবং হুসেন আলি খানকে দাক্ষিণাত্যের সুবাদার পদে নিয়োগের মধ্যে গোষ্ঠী রাজনীতির প্রকাশ ঘটেছিল। নিজাম বুঝেছিলেন যে তাঁর অপসারণের পেছনে সৈয়দ ভ্রাতাদের ভূমিকা ছিল। সম্রাট ফারুকশিয়ারের সঙ্গে সৈয়দ ভ্রাতাদের মতবিরোধ দেখা দিলে দিল্লীর রাজনীতিতে সংকট ঘনীভূত হয়।

শেষ পর্যন্ত সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় ফারুকশিয়ারকে হত্যা করেন এবং সিংহাসনে বসেন মহম্মদ শাহ। মহম্মদ শাহ সম্রাট হলেও সর্বময় কর্তৃত্ব ছিল সৈয়দ ভ্রাতাদের হাতে। সৈয়দ ভ্রাতাদের একচ্ছত্র আধিপত্যের বিরুদ্ধে নিজাম-উল-মুলকের নেতৃত্বে দরবারে একটি প্রতিদ্বন্দ্বী রক্ষণশীল জোট তৈরি হয়। সৈয়দ ভ্রাতাদের পতন হয়। ১৭২২ খ্রিঃ নিজাম-উল মুলককে ওয়াজীর পদে নিযুক্ত করা হয়। ১৭২২ থেকে ১৭২৪ খ্রিঃ পর্যন্ত নিজাম দিল্লীতে উজীর হিসেবে কর্মরত ছিলেন এবং এই সময় তিনি জায়গির ব্যবস্থার উন্নতি সাধন এবং সরকারের খালিসা জমিতে ইজারাদারী ব্যবস্থা বন্ধের পরিকল্পনা করেন। কিন্তু দুর্বলচেতা সম্রাট মহম্মদ শাহ নিজামের পরিকল্পনা রূপায়ণে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। সম্রাটের দুর্বলতা এবং দরবারের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে ক্লান্ত হয়ে নিজাম ১৭২৪ খ্রিঃ রাজধানী ত্যাগ করেন এবং নূতন করে দাক্ষিণাত্যের সুবেদার পদ গ্রহণ করেন। দিল্লীর প্রভাবমুক্ত হয়ে দক্ষিণ ভারতে একটি স্বাধীন রাজ্য গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেন।

নিজামকে দাক্ষিণাত্য বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছিল। প্রাথমিক পর্বে দাক্ষিণাত্যে প্রশাসনিক দায়িত্ব গ্রহণ করার পর তিনি দক্ষতার সঙ্গে দাক্ষিণাত্যে মারাঠা প্রভাব খর্ব করে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে এনেছিলেন। সেই সময় দাক্ষিণাত্যের ছয়টি সুবার কেন্দ্র ছিল ঔরঙ্গাবাদ। সুবার কেন্দ্রগুলি ছিল ঔরঙ্গাবাদ, মুহম্মদাবাদ, খান্দেশ, বেরার, বিজাপুর এবং হায়দ্রাবাদ। এই সুবাগুলি থেকে প্রতি বছর গড়ে প্রায় ১৯ কোটি টাকা রাজস্ব আদায় হত। দাক্ষিণাত্যে নিজামের প্রত্যাবর্তনের পর নিজাম তাঁর বিরোধীদের থেকে রেহাই পাননি। রাজধানীতে নিজামের বিরোধীরা সম্রাটের নিকট নানা কাল্পনিক অভিযোগ করতে থাকায় মহম্মদ শাহ মনে করেন যে নিজাম তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবেন। সম্রাট নিজামের এই আনুমানিক বিদ্রোহ দমনের জন্য হায়দ্রাবাদের শাসক মুবারিজ খানকে নির্দেশ দেন। মুবারিজের সঙ্গে মারাঠাদের সম্পর্ক খারাপ হওয়ায় নিজাম ও মারাঠাদের যুগ্ম বাহিনী মুবারিজ খানকে পরাজিত ও হত্যা করেন। পরের বছর মুবারিজ খানের পুত্রকে পরাস্ত করে নিজাম হায়দ্রাবাদ দখল করেন এবং এর পরই স্বাধীন হায়দ্রাবাদ রাজ্যের ভিত্তি স্থাপিত হয়।

প্রশাসনিক সংস্কারে কাজে তিনি প্রথমে ঔরঙ্গাবাদে একটি নির্দিষ্ট ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা চালু করেন। ক্রমে দাক্ষিণাত্যের অন্যান্য অঞ্চলে একই রকমের রাজস্ব কায়েম হয়। মনসব বন্টন তথা জায়গির নির্ধারণ সবই স্বাধীনভাবে করতেন। গুলাম হুসেন *সিয়ার-উল-মুতাক্ষরিন*-এ নিজাম-উল-মুলকের দীর্ঘ ৩৭ বছর ধরে কার্যত স্বাধীনভাবে এক বিশাল রাজ্য শাসন এবং তার শ্রীবৃদ্ধি ঘটানোর কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি সম্রাটের প্রতি বাহ্যিক আনুগত্য বজায় রেখেছিলেন, নিজের নামে খুৎবা পাঠ ও মুদ্রা জারী করেননি। কোনও সময়ে তিনি প্রকাশ্যে স্বাধীনতা ঘোষণা করেননি বা সম্রাটের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করেননি।

নিজামের সমস্যা ছিল মারাঠাদের নিয়ে। তাঁরই মতো প্রথম বাজী রাও ছিলেন উচ্চাকাঙ্ক্ষী। প্রথম বাজী রাও-এর নেতৃত্বে মারাঠারা দক্ষিণে, পশ্চিমে ও উত্তরে সাম্রাজ্য বিস্তারের কাজে নিযুক্ত ছিল। নিজাম পেশোয়ার বিরুদ্ধে মারাঠা সর্দারদের নিজ পক্ষে আনতে সচেষ্ট হয়ে প্রয়োজনমত জায়গির ও বন্টন করেন। একই সঙ্গে শাহুর বিরুদ্ধে কোলাপুরে শম্ভুজীর সঙ্গেও যোগাযোগ করেন। ১৭২৮ খ্রিস্টাব্দে পালখেদের যুদ্ধে পেশোয়া প্রথম বাজী রাও নিজামকে পরাজিত করেন এবং মুঙ্গি-সেরগাঁওয়ের সন্ধির দ্বারা নিজাম পেশোয়ার প্রায় সমস্ত দাবি মেনে নিতে বাধ্য হন।

পেশোয়ার সঙ্গে চুক্তির পর দাক্ষিণাত্যে কার্যত নিজামই হয়ে ওঠেন মুঘল সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী। পেশোয়া বাজী রাও দিল্লী অভিযান করলে তাঁকে প্রতিরোধ করার জন্য সম্রাট নিজামকে ডেকে পাঠালে নিজাম তাঁর দ্বিতীয় পুত্র নাসির জঙ্গকে দাক্ষিণাত্যের দায়িত্ব দিয়ে ১৭৩৭ খ্রিঃ-এর জুলাই মাসে দিল্লী পৌঁছন। সম্রাট তাঁকে আসফ-ঝা উপাধিতে ভূষিত করেন। কিন্তু পেশোয়ার সঙ্গে ভোপালের যুদ্ধে নিজাম পরাজিত হন। ১৭৩৮ খ্রিঃ ৭ই জানুয়ারী সম্পাদিত এক চুক্তি দ্বারা নিজাম সম্রাটের পক্ষে বাজী রাওকে মালবের সুবেদারি সহ আরও কিছু সুবিধা প্রদান করেন।

এরপর নিজাম হায়দ্রাবাদে ফিরে যান এবং স্বাধীনভাবে শাসন করতে শুরু করেন। বিদ্রোহী সামন্তদের নিয়ন্ত্রণ করেন। হিন্দু বণিক ও মহাজনদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে শাসনব্যবস্থা গড়ে তোলেন। তাঁর শেষ কৃতিত্ব ছিল আর্কটের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা। ১৭৪১ খ্রিঃ কর্নাটকে পুত্র নাসির জঙ্গ বিদ্রোহ করলে নিজাম তা দমন করেন এবং ১৭৪৩ খ্রিঃ নাসির জঙ্গকেই কর্নাটকের সুবেদার নিযুক্ত করেন। ১৭৪৮ খ্রিঃ নিজামের মৃত্যু হয়। এই সময় মুঘল সম্রাটের প্রতি বাহ্যিক আনুগত্য বজায় রেখে হায়দ্রাবাদ ছিল কার্যত একটি স্বাধীন রাজ্য। অনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেন যে মুঘল সাম্রাজ্যের ধ্বংসস্তূপের ওপর গড়ে ওঠা অন্যান্য আঞ্চলিক রাজ্যগুলির চেয়ে হায়দ্রাবাদ যথেষ্ট বেশি কৃতিত্বের অধিকারী ছিল। তবে নিজামের মৃত্যুর পর পুত্র নাসির জঙ্গ এবং পৌত্র মুজফ্‌ফর জঙ্গ উত্তরাধিকার যুদ্ধে লিপ্ত হলে হায়দ্রাবাদের রাজনীতিতে বিশৃঙ্খলা দেখা যায় এবং এই সুযোগে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দক্ষিণ ভারতের রাজনীতিতে কর্তৃত্ব বিস্তার করে।

১৮.৩ অযোধ্যা

অষ্টাদশ শতকে মুঘল সাম্রাজ্যের ভাঙনের প্রেক্ষাপটে গড়ে ওঠা স্বাধীন আঞ্চলিক রাজ্যগুলির মধ্যে অযোধ্যা ছিল অন্যতম। অযোধ্যা সুবার আয়তন ছিল বিশাল—এই রাজ্যের সীমানা পূর্বে বেনারস, পশ্চিমের কিছু ভূখণ্ড এবং এলাহাবাদ ও কানপুরের সন্নিহিত কয়েকটি জেলা নিয়ে গঠিত। ঔরঙ্গজেবের রাজত্বের শেষপর্ব থেকে অযোধ্যায় স্থানীয় ভূস্বামীদের বিদ্রোহ ঘটে। এই পরিস্থিতিতে ১৭২২ খ্রিঃ সাদাত খান (আসল নাম মীর মহম্মদ আমিন) সুবেদার পদে নিযুক্ত হন। পারস্যের খোরাসান থেকে আগত ভাগ্যান্বেষী সাদাত খান বেনারস সহ গাজীপুর, জৌনপুর ও চুনারের ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করলে সেনাপতি এবং প্রশাসক হিসেবে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে এবং এর পুরস্কার হিসেবে সম্রাট তাঁকে বুরহান-উল-মুলক উপাধিতে ভূষিত করেন। বিচক্ষণ, উচ্চাকাঙ্ক্ষী, সাহসী, দৃঢ় প্রতিজ্ঞ প্রশাসক সাদাত খান মুঘল সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগে অযোধ্যাকে কেন্দ্র করে একটি স্বাধীন ও সমৃদ্ধ রাজ্য গঠনের পরিকল্পনা নেন।

সাদাত খানের লক্ষ্য ছিল অযোধ্যায় পারিবারিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা। সেই উদ্দেশ্যে জামাতা সফদর জঙ্গকে তিনি নিজের সহকারী পদে নিযুক্ত করেন এবং সম্রাটের অনুমোদন আদায় করেন। প্রশাসনকে নিজের অনুগত রাখার তাগিদে অর্থব্যবস্থার উপর নিজের নিয়ন্ত্রণ থাকার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন, সাদাত খান প্রথমেই অযোধ্যায় শান্তি শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কঠোর হাতে বিদ্রোহী জমিদার ও

সামন্ত রাজাদের দমন করে অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কঠোর হাতে বিদ্রোহী জমিদার ও সামন্ত রাজাদের দমন করে অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন। আইন শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি রাজস্ব ব্যবস্থার সংস্কারে উদ্যোগ নেন। তিনি দেওয়ানি প্রশাসন অর্থাৎ রাজস্ব বিভাগ নিজের অধীনে নিয়ে আনেন এবং এই বিভাগে যোগ্য হিন্দু ক্ষেত্রী কর্মচারীদের নিয়োগ করা হয়। পূর্বতন ভূমি বন্দোবস্ত পদ্ধতির সংস্কার করে স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিদের মধ্যে জায়গির বন্টন করা হয়। স্থানীয় অর্থব্যবস্থার উন্নতি ঘটে এবং কৃষি পণ্যের বিপণন বৃদ্ধি পায়, বাণিজ্য সম্প্রসারিত হয়। অযোধ্যায় নূতন আর্থিক পরিবেশে যারা সমৃদ্ধির সুযোগ গ্রহণ করে তাদের মধ্যে ছিল ভারতীয় মুসলমান ও আফগান সর্দাররা এবং তাদের সঙ্গে হিন্দু বণিক গোষ্ঠী। এরা সাদাত খানের সমর্থকে পরিণত হন। সাদাত খান অযোধ্যার সঙ্গে এলাহাবাদ ও বারাণসী অঞ্চল যুক্ত করেন। তিনি সম্রাটের প্রতি আনুগত্য বজায় রেখেছিলেন। ১৭৩৯ খ্রিঃ নাদির শাহর আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য সম্রাটের কাছে কার্নালের যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন। তবে সম্রাটের কাছে মীর বক্সী-র পদ প্রার্থনা করে ব্যর্থ হলে নাদির শাহ-র পক্ষ অবলম্বন করেন। নাদির শাহ তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেন। এই ঘটনার পর ১৭৩৯ খ্রিঃ ২০ মার্চ সাদাত খান দিল্লীতে আত্মহত্যা করেন। এর ফলে ক্ষয়িষ্ণু মুঘল সাম্রাজ্য একজন দক্ষ প্রশাসককে হারায়।

সাদাত খান-এর মৃত্যুর পর তাঁর জামাতা তথা ভ্রাতুষ্পুত্র সফদর জঙ্গ (১৭৩৯-৫৪ খ্রিঃ) পরবর্তী সুবেদার হিসেবে নিযুক্ত হন। সফদর জঙ্গ ছিলেন একজন যোগ্য শাসক। শাসন সংস্কারের ক্ষেত্রে তিনি সাদাত খানের নীতি অনুসরণ করেন। তিনি অযোধ্যায় শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখেন, অযোধ্যার সমৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়। জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকলকে যোগ্যতার ভিত্তিতে উচ্চপদে নিয়োগ করা হয়। সফদর জঙ্গ-এর আমলে অযোধ্যার নবাবদের কর্মকেন্দ্র লক্ষ্ণৌ শহরে স্থানান্তরিত হয়, উদ্ভব ঘটে 'লক্ষ্ণৌ সংস্কৃতির'। এই সময় লক্ষ্ণৌ সাহিত্য, সঙ্গীত, নৃত্যকলা, শিল্প স্থাপত্যের চর্চার কেন্দ্রে পরিণত হয়। বড় ইমামবাড়া, ছোট ইমামবাড়া, ভুলভুলাইয়া, রুমি দরওয়াজা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য স্থাপত্য এই সময়ের সৃষ্টি। তবে দরবারি রাজনীতিতে সফদর জঙ্গ বিশেষভাবে জড়িয়ে পড়েছিলেন। তাঁর দ্রুত ক্ষমতা বৃদ্ধি অনেকে মেনে নিতে পারেননি। দিল্লির দরবারে অত্যন্ত প্রভাবশালী অভিজাত জাভেদ খানের সঙ্গে গোষ্ঠীগত লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়েন। ১৭৫৩ খ্রিঃ গুপ্তঘাতক দিয়ে জাভেদ খানকে হত্যা করান। তাঁর এই আচরণের ফলে দরবারে শত্রুসংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং সম্রাটও তাঁকে উপেক্ষা করেন। সফদর জঙ্গ অযোধ্যায় ফিরে আসেন। ১৭৪৪ খ্রিঃ তাঁর মৃত্যু হলে তাঁর পুত্র সুজা-উদ-দৌল্লাকে অযোধ্যার সুবেদার হিসাবে ঘোষণা করা হয়। অযোধ্যার উপর দিল্লির কর্তৃত্ব ছিল নামমাত্র। উত্তর ভারতে তখন অযোধ্যা ছিল একমাত্র শক্তিশালী রাজ্য, যা মুঘল সাম্রাজ্যের প্রকৃত উত্তরাধিকারী হয়ে উঠেছিল।

১৮.৪ বাংলা

বাংলায় স্বাধীন নবাবির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মুর্শিদকুলি খান (১৭০০-১৭২৭ খ্রিঃ)। জন্মসূত্রে মুর্শিদকুলি খান ছিলেন বুরহানপুর অঞ্চলের এক দক্ষিণ ব্রাহ্মণ। তিনি ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হন এবং ইস্পাহানের

জনৈক বণিক হাজি সাফি ইস্পাহানির নিকট তাঁকে বিক্রী করা হয়। তাঁর নাম হয় মহম্মদ হাদি। সাফি ইস্পাহানির সঙ্গে কিছুদিন পারস্যে অতিবাহিত করার পরে মহম্মদ হাদি ভারতে আসেন এবং বেরার অঞ্চলে দেওয়ানি বা রাজস্ব দপ্তরে কাজ করে রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয়ে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। সম্রাট ঔরঙ্গজেব ১৬৯৮ খ্রিঃ তাঁকে হায়দ্রাবাদের দেওয়ান পদে নিযুক্ত করেন। এই পদে তাঁর কৃতিত্বের ফলস্বরূপ তিনি ১৭০০ খ্রিঃ বাংলায় দেওয়ান পদে নিযুক্ত হন। তাঁর বিশ্বস্ততা ও কর্মদক্ষতায় মুগ্ধ হয়ে ঔরঙ্গজেব তাঁকে মুর্শিদকুলি খান উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৭০২ খ্রিঃ মারাঠা যুদ্ধের ব্যর্থতা যখন ঔরঙ্গজেবকে বিপর্যস্ত ও মুঘল অর্থনীতিকে বিপন্ন করে তুলেছিল, তখন বাংলায় দেওয়ান হিসেবে তিনি সম্রাট ঔরঙ্গজেবের হাতে ১ কোটি টাকার রাজস্ব তুলে দিয়েছিলেন। ১৭০৩ খ্রিঃ তিনি ওড়িষ্যার সুবেদার পদে উন্নীত হন এবং ১৭০৪ খ্রীঃ তাঁকে বিহারের দেওয়ান পদে বহাল করা হয়। ১৭০৭ খ্রিঃ ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর ১৭১৩ খ্রিঃ মুর্শিদকুলি বাংলার অতিরিক্ত সুবেদার পদে নিযুক্ত হন এবং মাত্র চার বছর পরেই ১৭১৭ খ্রিঃ তিনি বাংলায় সুবেদার হন। মুঘল দরবারের অভিজাতদের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের সুযোগে মুর্শিদকুলি বাংলায় এক নূতন যুগের সূচনা হয়। দিল্লির মুঘল সম্রাটের প্রতি তাঁর আনুগত্য অস্বীকার না করলেও কার্যত স্বাধীনভাবে বাংলা শাসন করতে থাকেন। তাঁর আমলে বাংলাদেশে একটি স্বতন্ত্র ও দক্ষ প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে ওঠে।

১৮.৪.১. মুর্শিদকুলি খান ও রাজস্ব প্রশাসন

মুর্শিদকুলি খানের ভূমি রাজস্ব সংস্কার সম্পর্কে জানার জন্য প্রধানত কয়েকটি তথ্যসূত্রের উপর নির্ভর করতে হয়। এগুলি হল—সলিমুল্লার 'তারিখ-ই-বাঙলা', গোলাম হোসেনের 'রিয়াজ-উস্-সালাতিন, এবং জেমস্ গ্রান্টের 'Analysis of the Finances of Bengal'। মুর্শিদকুলি দেওয়ান হিসাবে নিযুক্ত হওয়ার পর দেখেন যে বাংলার ভূমি-রাজস্ব হিসাবে সরকারের আয় হয় খুবই সামান্য। বাংলার সব জমিই জায়গির-স্বরূপ আমলা ও অভিজাতদের মধ্যে বণ্টিত। রাজস্ব বলতে বোঝাতে শুধুমাত্র বাণিজ্যিক শুল্ক। অনেক ক্ষেত্রেই অন্য প্রদেশ থেকে টাকা এনে বাংলার প্রশাসনিক আয়-ব্যায়ের ঘাটতি মেটানো হত। সরকারের খাস জমি বা খালিসা বলে যে সামান্য পরিমাণ জমি ছিল, তা থেকেও তৎকালীন জমিদারদের অক্ষমতা ও উদ্যোগহীনতার কারণে রাজস্ব আদায় করা সম্ভব হয়নি।

বাংলার রাজস্বব্যবস্থাকে সচল করার লক্ষ্যে মুর্শিদকুলি কর্মচারীদের জায়গির হিসাবে প্রদত্ত সমস্ত জমি অধিগ্রহণ করে সেগুলিকে খালিসায় পরিণত করেন। জায়গিরচ্যুত কর্মচারীদের উড়িষ্যার অনুন্নত অঞ্চলে নূতনভাবে জায়গির বণ্টন করেন। একইসঙ্গে ভূমি রাজস্ব বাবদ আয় বৃদ্ধি করার জন্য মুর্শিদকুলি জায়গিরদারদের নিকট থেকে অধিকৃত জমিগুলিতে নিলামের ভিত্তিতে ইজারাদার নিয়োগ করেন। যে ব্যক্তি নিলামে সর্বোচ্চ রাজস্ব প্রদানের অঙ্গীকার করতেন, তাকেই ইজারা প্রদান করা হত। মুর্শিদকুলি উপলব্ধি করেছিলেন যে আকবরের ভূমি রাজস্ব মন্ত্রী টোডরমল কর্তৃক প্রবর্তিত জাবতি বন্দোবস্ত—অর্থাৎ যে বন্দোবস্ত অনুযায়ী কৃষকদের নিকট থেকে সরাসরি ভূমিরাজস্ব আদায় করা হত—বাংলাদেশের ক্ষেত্রে

সেই ব্যবস্থার প্রচলন সম্ভব নয়। যদুনাথ সরকার মুর্শিদকুলি প্রবর্তিত এই ব্যবস্থাকে 'মাল-জামিনি' ব্যবস্থা নামে অভিহিত করেছেন। এই মাল-জামিনি ব্যবস্থা অনুযায়ী ইজারাদাররা মাল (রাজস্ব) আদায়ের অধিকারের বিনিময়ে জামিন (security bond) দিতেন এবং আদায়ীকৃত রাজস্বের একটি অংশ পারিশ্রমিক হিসাবে পেতেন। যে সব পুরোনো জমিদার থেকে নিয়েছিলেন, তাঁরা ছিলেন ইজারাদারদের নিয়ন্ত্রণাধীন। যদুনাথ সরকার মনে করেন যে, এভাবেই মুর্শিদকুলির সময়ে প্রাচীন তথা ঐতিহ্যবাহী জমিদাররা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। কিছুদিনের মধ্যেই ইজারাদাররা জমিদার হিসেবে পরিচিত হন এবং এদের অনেকেই পরবর্তীকালে রাজা বা মহারাজ উপাধি ধারণ করে নিজেদের মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। এইভাবে মুর্শিদকুলির ভূমিরাজস্ব সংস্কার করে বাংলাদেশে নূতন ভূস্বামী অভিজাত শ্রেণির সৃষ্টি করেন। এই নূতন অভিজাতদের বেশির ভাগ ছিল হিন্দু কারণ মুসলমান অভিজাতদের কর্মদক্ষতা নিয়ে মুর্শিদকুলির সন্দেহ ছিল। ডঃ বিজেন গুপ্ত-র মতে, মুর্শিদকুলির পৃষ্ঠপোষকতায় তথা নূতন রাজস্ব ব্যবস্থার কারণে অষ্টাদশ শতকের শুরুতে বাঙালী হিন্দুর পুনরুত্থান ঘটল। তবে মুর্শিদকুলির ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার ফলে বাংলার ঐতিহ্যগত বংশানুক্রমিক জমিদার পরিবারগুলি ধ্বংসূ হয়েছিল বলে যদুনাথ সরকার যে মন্তব্য করেছেন, আবদুল করিম সে বিষয়ে একমত না হয়ে বলেন যে বাংলার পুরাতন ও ঐতিহ্যবাহী জমিদার পরিবারগুলি বীরভূম, বিষ্ণুপুর, বর্ধমান, নদীয়া প্রভৃতি অঞ্চলে ছিলেন। নরেন্দ্র কৃষ্ণ সিংহ বলেছেন যে মুর্শিদকুলি বৃহৎ জমিদারি গঠনে উৎসাহী ছিলেন। মুর্শিদকুলির আমলে বাংলায় ছয়টি বৃহৎ জমিদারি রাজশাহী, দিনাজপুর, নদীয়া, বীরভূম, বিষ্ণুপুর ও বর্ধমানে ছিল এবং বিহারে ছিল তিনটি বৃহৎ জমিদারি তিরহুত, শাহাবাদ এবং টিকারি-তে। মুর্শিদকুলি বৃহৎ জমিদারি গঠনে উৎসাহী ছিলেন কারণ তাঁর মনে হয়েছিল যে বৃহৎ জমিদারদের সাহায্যে রাজস্ব ব্যবস্থা পরিচালনা করা অনেক সহজ হবে। তবে জমিদাররা যাতে অতিরিক্ত ক্ষমতাশালী না হয়ে উঠতে পারে, সেদিকে তিনি নজর দিতেন।

ভূমিরাজস্ব সংগ্রহের ব্যাপারে মুর্শিদকুলি ছিলেন কঠোর। জমিদাররা অথবা রাজস্ব কর্মচারীরা রাষ্ট্রের প্রাপ্য রাজস্ব ঠিকমতো প্রদান করলে সরকার তাদের বিরুদ্ধে কোনরকম অত্যাচার করত না। জমিদাররা এলাকার আইন শৃঙ্খলা রক্ষা না করলে বা বিদ্রোহ ঘোষণা করলে তাদের জমি বাজেয়াপ্ত করা হত। মুর্শিদকুলি প্রতি ১লা বৈশাখ রাজস্ব বিভাগে 'পূণ্যাহ' অনুষ্ঠান পালন করতেন। ঐদিন বকেয়া রাজস্বের হিসেব-নিকেশ হত এবং বাকি রাজস্বের জন্য জমিদারগণ জামিন দিতেন। ঐ অনুষ্ঠানে দক্ষ ও নিয়মিত রাজস্ব প্রদানকারী জমিদারদের পুরস্কৃত করা হত। শাস্তিপ্রদানের ক্ষেত্রে মুর্শিদকুলি ছিলেন পক্ষপাত শূন্য। হিন্দু জমিদার এবং মুসলমান আমলাদের বিরুদ্ধে সমান পদক্ষেপ গ্রহণ করা হত। তবে তিনি শুধুমাত্র নির্ধারিত পরিমাণ রাজস্বই দাবি করতেন। বাড়তি রাজস্ব আদায় বা বেআইনি কর নিষিদ্ধ করেছিলেন। রাজস্ব বকেয়া রাখার শাস্তি ছিল মারাত্মক। রাজস্ব খেলাপকারী জমিদারদের মুর্শিদাবাদের প্রাসাদের সামনে সাধারণ বন্দীর মতো দাঁড় করিয়ে রাখা থেকে শুরু করে বেত্রাঘাত, কান ধরে ওঠা-বসাও করানো হত। কঠোর শাস্তির ভয়ে মুর্শিদকুলির সময় জমিদার বা আমলাদের সরকারের প্রাপ্য রাজস্ব দেওয়ার তৎপরতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। এর ফলে ভূমিরাজস্ব বাবদ আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি James Grant তাঁর 'Analysis

of Finances of Bengal' পেয়েছিল বলে গ্রন্থে মন্তব্য করে লেখেন—মুর্শিদকুলির শাসনকাল ছিল 'রাজস্ব ব্যবস্থার এক নূতন এবং সুবিখ্যাত যুগ'।

তবে একদিকে ভূমিরাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি এবং অন্যদিকে আদায়ের জন্য নিপীড়ন—এই দুইয়ের ফলে বাংলায় জমিদার শ্রেণি বিশেষভাবে বিব্রত হয়ে পড়ে। অত্যধিক হারে রাজস্বের চাপে সাধারণ কৃষকরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মুর্শিদকুলির ভূমিরাজস্ব নীতির ফলশ্রুতি হিসাবে রাষ্ট্রের আয় বৃদ্ধি পেয়েছিল, দেশে কৃষিজমির পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং কৃষির সম্প্রসারণ ঘটেছিল, কিন্তু সার্বিকভাবে বাংলার অর্থনীতির বিশেষ উন্নতি হয়নি বলে যদুনাথ সরকার মন্তব্য করেছেন। বাংলার মানুষ কৃষিক্ষেত্রে বা হস্তশিল্পে শ্রমের বিনিময়ে আর্থিক সম্পদ গড়ে তুলতে পারেনি। সাধারণ মানুষের সঞ্চয়ে রৌপ্যমুদ্রা ছিল না। বাংলা থেকে নিয়মিত রাজস্ব দিল্লিতে পৌঁছত। দিল্লি ও মুর্শিদাবাদের বিলাস বৈভব যত বৃদ্ধি পেয়েছিল, বাংলার মানুষ ততই অনাহারে মারা গিয়েছিলেন বলে সলিম-উল্লাহ মন্তব্য করেছেন।

মুর্শিদকুলির ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থাকে কেবলমাত্র উৎপীড়নমূলক একটি ব্যবস্থা হিসাবে চিহ্নিত করা সমীচীন নয়। তাঁর প্রবর্তিত ব্যবস্থায় কৃষকদের কৃষিখনন (তাকাভি) দানের ব্যবস্থা ছিল। জেমস্ গ্রান্টের বক্তব্য অনুযায়ী নির্ধারিত রাজস্বের সবটুকু সবসময় আদায় করা হত না, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি জনিত প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে রাজস্বের পরিমাণ হ্রাস করা হত। নির্ধারিত রাজস্বের অতিরিক্ত আদায় বা বেআইনী কর আদায় মুর্শিদকুলি নিষিদ্ধ করেছিলেন। অনেক সময় বড়ো জমিদারেরা রায়তদের ওপর চূড়ান্ত নির্যাতন চালিয়ে রাজস্ব আদায় করতেন কিন্তু তাতে মুর্শিদকুলির সম্মতি ছিল—এরকম কোনো ঐতিহাসিক তথ্য নেই। ভুমিরাজস্বের ক্ষেত্রে মুর্শিদকুলি রায়ত, রাজস্ব কর্মচারী এবং জমিদারদের নিয়ে একটি সমন্বিত ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। মুর্শিদকুলির কৃতিত্ব এই যে, বাংলার অবহেলিত ভূমি রাজস্ব প্রশাসনকে তিনি নূতনভাবে গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। রাজস্ব আদায়ে কঠোর হলেও কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে জনসাধারণের কর প্রদান ক্ষমতা বৃদ্ধিতে অবহেলা করেননি। মুর্শিদকুলির শাসনকালে বাংলার সামগ্রিক সমৃদ্ধি সূচিত হয়েছিল।

১৮.৪.২. সুজাউদ্দিন খান-মহম্মদ (১৭২৭-১৭৩৯ খ্রি:)

মুর্শিদকুলি খানের মৃত্যুর পর তাঁর জামাতা সুজাউদ্দিন সিংহাসনে আরোহন করেন। মুর্শিদকুলি তাঁর জীবিতকালে দৌহিত্র সরফরাজ খানকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হিসেবে মনোনীত করলেও সুজাউদ্দিন এই মনোনয়নের বিরোধিতা করেন। মুর্শিদকুলির মৃত্যু সংবাদ পেয়ে তিনি উড়িষ্যা থেকে বাংলার দিকে যাত্রা করেন এবং এই সময় দিল্লির প্রভাবশালী অভিজাত শামস্-উদৌলা'র উদ্যোগে বাংলার সিংহাসনে তাঁর নিয়োগ-সংক্রান্ত বাদশাহি ফরমান জোগাড় করে তাঁর দাবির বৈধতা প্রতিষ্ঠা করেন।

শাসক হিসেবে সুজাউদ্দিন নিজের যোগ্যতার পরিচয় দেন। মুর্শিদকুলিকে অনুসরণ করে তিনি একটি স্বৈরতান্ত্রিক শাসন কাঠামো গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে নিজের আস্থাভাজন ব্যক্তি ও আত্মীয়স্বজনকে নিয়োগ করেন। বাংলার দেওয়ান পদে অধিষ্ঠিত হন পুত্র সরফরাজ খান, উড়িষ্যার উপ-শাসক নিযুক্ত হন

তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র মহম্মদ তাকী খান এবং ঢাকার উপশাসক হন জামাতা দ্বিতীয় মুর্শিদকুলি। শাসনব্যবস্থার সুবিধার্থে তিনি সমগ্র রাজ্যকে চারটি বিভাগে ভাগ করেন। পশ্চিমবঙ্গ, মধ্যবঙ্গ এবং উত্তরবঙ্গের কিছু অংশ নিয়ে গঠিত হয় কেন্দ্রীয় বিভাগ, পূর্ববঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গ এবং চট্টগ্রাম ও শ্রীহট্ট নিয়ে গঠিত হয় ঢাকা বিভাগ, তৃতীয় ও চতুর্থ বিভাগ ছিল যথাক্রমে উড়িষ্যা এবং বিহার বিভাগ। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে সুজাউদ্দিনের প্রধান পরামর্শদাতা ছিলেন আলিবর্দী খান ও তাঁর ভাই হাজী আহম্মদ এবং দুই ধনী ব্যবসায়ী রায় রায়ান আলমচাঁদ এবং জগৎশেঠ ফেতেচাঁদ। জগৎ শেঠ সুজাউদ্দিনের আমলে যথেষ্ট প্রভাব-প্রতিপত্তি অর্জন করেছিলেন।

সুজাউদ্দিন দেশের শান্তি শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বজায় রেখেছিলেন। দিল্লিতে পর্যাপ্ত পরিমাণ টাকা নিয়মিত পাঠিয়ে সম্রাটকে সন্তুষ্ট রেখেছিলেন। নিজের আত্মীয়দের উচ্চপদে নিয়োগ করে কর্তৃত্ব সুদৃঢ় করলেও তাঁর শ্রেণিবিদ্বেষ বা ধর্মবিদ্বেষ ছিল না। বহু উচ্চপদে তিনি হিন্দুদের নিয়োগ করেছিলেন। রাজবল্লভ, বসন্ত রায় প্রভৃতি হিন্দু কর্মচারী তাঁর সময়ে গুরুত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত ছিলেন। বিদেশি বণিকদের বাণিজ্যিক ক্রিয়াকলাপ তাঁর সময়ে বাংলার অর্থনীতিকে সমৃদ্ধশালী করেছিল। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম ছিল কম। টাকায় ৮ মন চাল পাওয়া যেত।

তবে সুজাউদ্দিনের শাসনের প্রথম দিকে যতটা প্রশাসক হিসেবে যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছিলেন। পরের দিকে তার পরিচয় পাওয়া যায় না। জমিদারদের প্রতি উদারপন্থা অবলম্বন করায় কৃষকদের ওপর জমিদারদের অত্যাচার অনেক বেড়ে গিয়েছিল। সুজাউদ্দিন প্রতি বছর আবওয়াব (অতিরিক্ত রাজস্ব) আদায়ের ব্যবস্থা করেছিলেন। আবওয়াব ছিল চার ধরনের—যেমন (১) নজরানা মোকবারি, (২) জার মাথুত, (৩) মাথুৎ ফিলখানা এবং (৪) ফৌজদারি আবওয়াব। সরকারের পক্ষে জমিদারদের কাছ থেকে ঐসব আবওয়াব আদায় করা হত। জমিদাররা এই বর্ধিত করের বোঝা প্রজাদের ওপর চাপিয়েছিলেন। জমিদারদেরা উৎপীড়ন থেকে কৃষকদের রক্ষা করার কোনো পদক্ষেপ সুজাউদ্দিন গ্রহণ করেনি। রাজত্বের শেষদিকে সুজাউদ্দিন আমোদ-প্রমোদে অতিরিক্ত আসক্ত হয়ে পড়েছিলেন। শাসনকার্য পরিচালনার ভার তিনি অন্যান্যদের হাতে ছেড়ে দেন। এই সুযোগে রায় রায়ান আমিন চাঁদ ও মহাজন জগৎ শেঠ নিজেদের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করেন। রাজ্যের কল্যাণে এদের আগ্রহ ছিল না। অধিকাংশ ঐতিহাসিক সুজাউদ্দিনের রাজত্বকালকে অষ্টাদশ শতকের বাংলার ইতিহাসে এক গুরুত্বহীন অধ্যায় বলে অভিহিত করেছেন।

১৮.৪.৩. সরফরাজ খান (১৭৩৯-১৭৪০ খ্রি:)

১৭৩৯ খ্রিঃ সুজাউদ্দিনের মৃত্যুর পর সরফরাজ খান বাংলার সিংহাসনে আরোহন করেন। তিনি শাসক হিসেবে অযোগ্য ছিলেন। আমোদ প্রমোদে দিন অতিবাহিত করতেন। বিহারের নায়েব নাজিম আলিবর্দী খান ও তাঁর জেষ্ঠভ্রাতা হাজি আহমদের ওপর বিভিন্ন বিষয়ে নির্ভরশীল হয়ে পড়ায় এদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পায় এবং এদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা দমনের কোন ক্ষমতাই সরফরাজের ছিল না। আলিবর্দী খান সসৈন্যে পাটনা থেকে সিংহাসন দখলের জন্য মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হন এবং ১৭৪০ খ্রিঃ গিরিয়ার যুদ্ধে সরফরাজকে পরাজিত ও হত্যা করে বাংলার মসনদ দখল করেন। অনেকে সরফরাজের বিরুদ্ধে আলিবর্দীর ষড়যন্ত্রকে

নীতিজ্ঞান বর্জিত কাজ বলে মনে করলেও অষ্টাদশ শতকের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের নিরিখে বাহুবলে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করাই ছিল সেই যুগের রীতি। সরফরাজের অযোগ্যতা ও উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপনের সুযোগে আলিবর্দী কৌশল ও বাহুবলের সাহায্যে বাংলার সিংহাসন দখল করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

১৮.৪.৪. আলীবর্দী খান (১৭৪০-১৭৫৬ খ্রি:)

আর্লিবর্দীর আসল নাম ছিল মির্জাবন্দে বা মীর্জা মহম্মদ। তাঁর প্রথম জীবন শুরু হয় মুঘল সরকারের মনসবদারি লাভের মাধ্যমে। ১৭৪০ খ্রিঃ সরফরাজকে গিরিয়ার যুদ্ধে পরাজিত ও হত্যা করে নবাব হওয়ার পর আলিবর্দী একটি স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ শাসনতান্ত্রিক পদগুলিতে নিজের আত্মীয়স্বজন ও বিশ্বাসভাজন লোকদের নিযুক্ত করেছিলেন। নিজের তিন কন্যার সাথে ভাই হাজী আহম্মদের তিন পুত্রের বিবাহ দিয়ে তাদের যথাক্রমে ঢাকা, পূর্ণিয়া এবং পাটনার নায়েব-নাজিম পদে নিযুক্ত করেন। নজরানার বিনিময়ে তিনি দিল্লির সম্রাটের নিকট থেকে তাঁর নিজের নবাব পদে নিয়োগের বৈধ ফরমান সংগ্রহ করেন।

অবশ্য আলিবর্দীর সিংহাসন দখল প্রতিবাদহীন ছিল না। উড়িষ্যার সহকারী নবাব দ্বিতীয় মুর্শিদকুলি নবাব পদে আলিবর্দীকে স্বীকার করেননি। বাংলার মসনদ দখলের উদ্দেশ্যে তিনি আলিবর্দীকে স্বীকার করেননি। বাংলার মসনদ দখলের উদ্দেশ্যে তিনি আলিবর্দীর বিরুদ্ধে বাংলা অভিমুখে সসৈন্যে অগ্রসর হলে বালেশ্বরের নিকট ফুলবাড়ি যুদ্ধে (১৭৪১ খ্রিঃ ৩ মার্চ) তিনি আলিবর্দীর হাতে পরাজিত হন। এরপর তিনমাস নবাব আলিবর্দী উড়িষ্যায় অবস্থান করে শান্তি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। এই সময় বাংলা মারাঠা আক্রমণের শিকার হলে তিনি বাংলায় মারাঠা-বর্গীদের আক্রমণ প্রতিরোধে ব্যস্ত হন।

১৮.৪.৫. আলিবর্দী খান ও মারাঠা আক্রমণ

আলিবর্দী খান-কে সবচেয়ে বেশী বিব্রত করেছিল ১৭৪২ খ্রিঃ পর্যন্ত মারাঠা জাতির বারংবার বাংলাদেশ আক্রমণ, সম্পদ লুণ্ঠন এবং সম্পত্তির ধ্বংসসাধন। বাংলার সম্পদের লোভ এবং সমসাময়িক রাজনৈতিক অস্থিরতা মারাঠাদের বাংলা আক্রমণে আগ্রহী করে তোলে। অষ্টাদশ শতকের বাঙালী কবি ভারতচন্দ্র 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে এই মারাঠা আক্রমণের উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া গঙ্গারাম রচিত 'মহারাষ্ট্রপুরাণ'-এও বাংলায় মারাঠা আক্রমণের কাহিনী লিপিবদ্ধ হয়েছে। ১৭৪২ খ্রিঃ এপ্রিলে সর্বপ্রথম মারাঠা বাহিনী বধর্মানে এসে লুণ্ঠন শুরু করে। নবাব স্বয়ং বর্ধমানে এসে মারাঠা আক্রমণ প্রতিহত করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। এই মারাঠা বাহিনী ছিল নাগপুরের রঘুজী ভোঁসলের অনুগত। ভোঁসলের সেনাপতি ভাস্কর রামকে এই পর্বে সাহায্য করেছিলেন মীর হাবিব নামে এক সেনাপতি। নবাব আলিবর্দীর অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে ভাস্কর রাম রাজধানী মুর্শিদাবাদে লুঠতরাজ চালান। মারাঠারা কাটোয়া দখল করে নেয় এবং ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে রাজমহল থেকে শুরু করে দক্ষিণবঙ্গের মেদিনীপুর ও উড়িষ্যার জলেশ্বর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলে নবাবী শাসনের অবসান ঘটে এবং মারাঠা আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। শেষ রাও ঐ অঞ্চলের

প্রশাসক নিযুক্ত হন, স্থানীয় জমিদারগণ মারাঠাদের রাজস্ব দিতে বাধ্য হন। মারাঠাদের অধীনে বঙ্গদেশ শ্মশানে পরিণত হয়। রেশম চাষের জন্য প্রয়োজনীয় তুঁত চাষের বাগান, তাঁতির তাঁতঘর মারাঠাদের অত্যাচারের হাত থেকে রেহাই পায়নি। মারাঠাদের লোভ ও লুণ্ঠনের ইতিবৃত্ত সলিমুল্লাহ তাঁর 'তারিখ-ই-বাঙলা' তে ব্যক্ত করেছেন।

আলিবর্দী মারাঠাদের নিকট সন্ধির প্রস্তাব করলে ভাস্কর রাম সন্ধির বিনিময়ে এক কোটী টাকা এবং নবাবের সমস্ত হাতি দাবি করেন। আলিবর্দী এই প্রস্তাবে রাজী হননি। তিনি এক নূতন বাহিনী সংগ্রহ করে মারাঠাদের আক্রমণের প্রস্তুতি নেন। ভাস্কর পণ্ডিত যখন কাটোয়ায় দুর্গাপূজায় ব্যস্ত ছিলেন তখন আলিবর্দীর বাহিনী মারাঠাদের ওপর আক্রমণ করে। মারাঠারা কাটোয়া পরিত্যাগ করে, কাটোয়া নবাবের হস্তগত হয়। ১৭৪৩ খ্রিঃ মার্চ মাসে রঘুজী ভোঁসলে নিজে ভাস্কর পণ্ডিতকে সঙ্গে নিয়ে কাটোয়ায় উপস্থিত হন। মারাঠা রাজনীতিতে তখন গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব চলেছিল। পেশোয়া বালাজী বাজী রাও-এর সঙ্গে রঘুজীর সম্পর্ক ভাল ছিল না। আলিবর্দী পেশোয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁকে চৌথ প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেন। স্থির হয়, আলিবর্দী বাংলার চৌথ বাবদ রাজা শাহুকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ এবং অতিরিক্ত ২২ লক্ষ টাকা দেবেন। বিনিময়ে পেশোয়া ভবিষ্যতে মারাঠা আক্রমণের সম্ভাবনা থেকে বাংলাকে রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দেন। এই সময়ে কলকাতাকে মারাঠা আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য বৃত্তাকার পরিখা বা 'Maratha Ditch' খনন করা হয়।

পেশোয়ার সঙ্গে নবাবের এই চুক্তির স্থায়িত্বকাল ছিল অল্প। মারাঠারাজ শাহুর মধ্যস্থতায় পেশোয়া এবং রঘুজীর মধ্যে সমঝোতার ভিত্তিতে ১৭৪৪ খ্রিঃ মার্চ মাসে উভয়েই বাংলা আক্রমণ করেন। আলিবর্দী তখন ভাস্কর রামকে হত্যা করেন। ১৭৪৫ খ্রিঃ রঘুজী আবার বাংলা আক্রমণ করেন কিন্তু তিনি সফল হননি। ১৭৫১ খ্রিঃ পর্যন্ত বাংলায় মারাঠা আক্রমণ চলেছিল, বৃদ্ধ নবাবের পক্ষে মারাঠা আক্রমণের চাপ বহন করা সম্ভব না হওয়ায় এবং মারাঠারাও দীর্ঘদিন ধরে অভিযান চালিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়ায় উভয়পক্ষেই শান্তি স্থাপনে উৎসুক হয়। এই পরিস্থিতিতে ১৭৫১ খ্রিঃ নবাব ও মারাঠাদের মধ্যে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তির শর্তানুযায়ী স্থির হয় যে (ক) নবাবের কর্মচারী হিসেবে মীর হাবিব উড়িষ্যার ডেপুটি গভর্নর নিযুক্ত হবেন। উদ্বৃত্ত রাজস্ব পাবেন রঘুজী ভোঁসলে। (খ) নবাব আলিবর্দী ১২ লক্ষ টাকা মারাঠাদের চৌথ হিসেবে দেবেন। (গ) সুবর্ণরেখা নদী পর্যন্ত বাংলা সুবার সীমানা নির্দিষ্ট করা হয়। মারাঠারা সুবর্ণরেখা নদী অতিক্রম না করার প্রতিশ্রুতি দেয়।

১৮.৪.৬. মারাঠা আক্রমণের প্রভাব

বাংলার আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে মারাঠা আক্রমণের প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী। কালীকিংঙ্কর দত্ত অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে মারাঠা আক্রমণকে বাংলার ইতিহাসে সম্ভবত সবচেয়ে ক্ষতিকারক ঘটনা বলে মত প্রকাশ করেছেন। এই আক্রমণ বাংলার অর্থনৈতিক সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনকে প্রভাবিত করেছিল। মারাঠাদের লুণ্ঠন এবং অত্যাচারের ফলে বাংলারা বাণিজ্য, শিল্প মুদ্রা ব্যবস্থা ও কৃষি বিপর্যস্ত হয়। শিল্পী ও কারিগরেরা মারাঠাদের অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে নিজেদের এলাকা ছেড়ে চলে যায়। ফলে শিল্প পণ্য উৎপাদন বিঘ্নিত হয়। টাকাপয়সা লুণ্ঠিত হওয়ার ফলে মুদ্রাব্যবস্থায় চরম সংকট দেখা দেয়।

কৃষিকাজ ব্যাহত হওয়ায় খাদ্যসংকট চরম ওঠে এবং দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায়। মারাঠা আক্রমণের ফলে বাংলার পশ্চিম প্রান্ত জনশূন্য হয়ে পড়ে। পূর্ব ও উত্তরবঙ্গ এবং কলকাতায় জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। পারিবারের মেয়েরা মারাঠা সৈন্যদের দ্বারা নানাভাবে অত্যাচারিত ও অপমানিত হতেন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, মারাঠা আক্রমণের সুযোগ নিয়ে নবাবের বিরুদ্ধে আফগানরা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। উড়িষ্যার ওপর মারাঠা কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মারাঠা আক্রমণ ও অত্যাচার থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য বহু মানুষ কলকাতায় ইংরেজদের ঘাঁটিতে আশ্রয় নিয়েছিল। দেশবাসী নবাবের প্রতি আস্থাহীন এবং ইংরেজদের ওপর আস্থাশীল হয়ে পড়েন। এই ঘটনা পরবর্তীকালে ইংরেজ কর্তৃত্বের সম্ভাবনা সৃষ্টি করে।

১৮.৪.৭. আলবর্দী খান ও ইউরোপীয় বণিকগণ

আলিবর্দী খান রাজ্যের সমৃদ্ধির জন্য যথেষ্ট আগ্রহী ছিলেন। ভূমিরাজস্ব বৃদ্ধির সুযোগ কম থাকায় তিনি বাণিজ্য-বৃদ্ধির দিকে বিশেষ নজর দেন। বাংলাদেশে বাণিজ্যরত ইংরেজ, ফরাসী, ডাচ প্রভৃতি বণিকগোষ্ঠীর বাণিজ্যের সম্প্রসারণে বিশেষ উৎসাহ প্রদর্শন করেছিলেন। বণিকদের মধ্যে বাণিজ্যগত যে কোনো রকমের বিবাদ নবাব নিজের উদ্যোগে মিটিয়ে নিতেন বলে এস. সি. হিল মন্তব্য করেছেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে বহির্বাণিজ্য দেশের অর্থনৈতিক বৃদ্ধির সহায়ক। তবে তিনি বিদেশি বণিকদের রাজনৈতিক ও সামরিক ক্ষমতাবৃদ্ধি অনুমোদন করেননি। তিনি চেয়েছিলেন ইউরোপীয় বণিকরা কেবলমাত্র বণিক হিসেবে বাংলায় বসবাস করুক এবং মুঘল সম্রাটের নিকট থেকে অর্জিত বাণিজ্যিক সুবিধাগুলি ইউরোপীয়রা ভোগ করুক কিন্তু দেখতে হবে ইউরোপীয় বণিকরা যাতে কোনোরকম অবৈধ সুযোগ ভোগ করতে না পারে বা তাদের বাণিজ্যিক সুযোগসুবিধাগুলি যেন নবাবের সার্বভৌম ক্ষমতার পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করতে না পারে।

ইউরোপীয় বণিকদের শ্রীবৃদ্ধির ওপর বাংলার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি যে অনেকাংশে নির্ভরশীল তা আলিবর্দী বিশ্বাস করতেন। ইউরোপীয় বণিকরা বাংলাদেশের পণ্য ক্রয় করে বাংলার বাইরে রপ্তানি করলে ইউরোপীয় বণিকদের নিকট থেকে প্রাপ্ত শুল্ক রাষ্ট্রের আয় বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে। Scrafton নামে জনৈক ইংরেজ কর্মচারী লিখেছেন— 'Alivardi used to compare the Europeans to a hive of bees of whose honey you might reap the benefit, but if you distrub their hive they would sting you to death'.

তবে আলিবদীর সঙ্গে বণিকদের সবসময় সুসম্পর্ক বজায় থাকেনি। ১৭৪০ খ্রিঃ থেকে বারবার ইউরোপের বিভিন্ন অংশ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে থাকে এবং প্রায় সব ক্ষেত্রেই ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স বিপরীত পক্ষে ছিল। এই যুদ্ধের প্রভাবে বাংলায় ইংরেজ ও ফরাসী কোম্পানিগুলি সংঘর্ষে লিপ্ত হত। দক্ষিণে করমণ্ডলের উপকূলে এই সমস্যা ঘনীভূত হওয়ায় তার প্রভাব বাংলায় পড়েছিল। ইংরেজ ও ফরাসি উভয়েই বাংলাদেশে দুর্গ নির্মাণ করতে চাইলে তিনি নিষেধ করেন এবং বলেন যে তারা এদেশে বাণিজ্য করতে এসেছে, তাদের দুর্গের কোনো প্রয়োজন নেই। আলিবর্দী তাদের নিরাপত্তা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। এছাড়া ইংরেজ কোম্পানী সবসময় ১৭১৭ খ্রিঃ পাওয়া দস্তকের অপব্যবহার করতে চাইত। আলিবর্দী

তা মেনে নেননি। মৃত্যুকালে উত্তরাধিকারী সিরাজ-উদ্-দৌল্লাকে সর্বদা ইউরোপীয় বণিকদের সম্পর্কে সজাগ থাকার নির্দেশ দিয়ে যান।

১৮.৪.৮. সিরাজ-উদ্-দ্দৌলা (১৭৫৬-৫৭ খ্রি:)

১৭৫৬ খ্রিঃ ১০ই এপ্রিল অপুত্রক অবস্থায় নবাব আলিবর্দীর মৃত্যু হলে বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন আলিবর্দীর তৃতীয়া কন্যা আমিনা বেগমের জৈষ্ঠ পুত্র সিরাজ-উদ্-দৌল্লা। সিরাজের নবাবি লাভের পথ মসৃণ ছিল না। তাঁর শত্রু ছিলেন আলবর্দীর জৈষ্ঠ কন্যা ঘসেটি বেগম এবং মধ্যম পুত্র সৌকত-জঙ্গ। আলিবর্দীর সেনাপতি মিরজাফরও সিরাজের বিরুদ্ধে বিরূপ মনোভাব পোষণ করতেন। এছাড়া ছিলেন ঢাকার দেওয়ান রাজবল্লভ যাকে সিরাজ আয়ব্যয়ের হিসাব দাখিল করার নির্দেশ দিলে রাজবল্লভ তা না করে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র এবং সঞ্চিত ধনরত্ন-সহ পুত্র কৃষ্ণদাসকে কলকাতায় ইংরেজ কোম্পানির আশ্রয়ে পাঠিয়ে দেন। রাজবল্লভ সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। সিরাজের সঙ্গে ইংরেজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সম্পর্কের অবনতি ঘটলে সিরাজ-বিরোধী ষড়যন্ত্র নূতন মাত্রা পায়।

১৮.৪.৯. সিরাজ-উদ্-দ্দৌলা ও ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি

সিরাজ-উদ্-দৌল্লার সঙ্গে ইংরেজ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিরোধের কারণ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতপার্থক্য আছে। কোনো কোনো ঐতিহাসিক বিশেষত ইংরেজ লেখকরা এই সম্পর্কের অবনতির জন্য সিরাজের ব্যক্তিগত ত্রুটি ও উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে দায়ী করেছেন। হলওয়েল সিরাজকে একজন নীতিজ্ঞানহীন, স্বৈরাচারী ও অর্থলোভী বলে অভিহিত করেছেন। এস. সি. হিল সিরাজের 'অহমিকা ও অর্থলোভকে এই সংঘাতের জন্য দায়ী করেছেন, এছাড়া তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মানসিক তারতম্য এবং বিভিন্ন ভারতীয় অ-মুসলমান গোষ্ঠীর বিশেষত হিন্দুদের ক্ষোভ ও অসন্তোষের কথাও উল্লেখ করেছেন। সিরাজের অহংকার এবং ধনলোভ প্রসঙ্গে হিল বলেন, আলিবর্দীর শাসনকালে সিরাজ একবার ইংরেজদের কাশিমবাজার কুঠি পরিদর্শনের এবং সেখানে রাত্রিবাসের ইচ্ছা জানিয়েছিল। ইংরেজরা এতে সম্মতি না দেওয়ায় সিরাজ-আহত হন, তাঁর আত্মসম্মানে লাগে। সিরাজ নবাব হলে তৎকালীন রীতি অনুসারে ইংরেজরা যথাযথ পরিমাণ উপঢৌকন পাঠায়নি। এজন্য সিরাজ ইংরেজদের ওপর বিরক্ত হন। হিলের মতে, সিরাজ ছিলেন অত্যন্ত ধনলোভী। দূত মারফত তিনি কলকাতার ঐশ্বর্যের সংবাদ পেয়ে অর্থ-সম্পদ লুণ্ঠনের উদ্দেশ্যে কলকাতা দূর্গ আক্রমণ করেন। এর পেছনে কোনো রাজনৈতিক প্রয়োজন ছিল না। হিল ইংরেজদের সঙ্গে সিরাজের মানসিক তারতম্যকে বিরোধের জন্য দায়ী করে বলেন, ইংরেজ কোম্পানি অবাধ-বাণিজ্যনীতি ও আইনের শাসনের পক্ষপাতী ছিল। কিন্তু সিরাজ তাঁর চরম স্বৈরতন্ত্রী মনোভাবের কারণে ইংরেজদের আইনসম্মত বাণিজ্যকে সংকুচিত করার চেষ্টা করলে সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে ওঠে। এছাড়া হিল এবং ব্রিজিন গুপ্ত তৎকালীন হিন্দু জমিদার গোষ্ঠীর ও উচ্চপদস্থ হিন্দু সরকারি কর্মীদের ক্ষোভ ও অসন্তোষের কথা উল্লেখ করে বলেন যে, জগৎ শেঠ ও তাঁর অনুগামীদের সিরাজ-বিরোধী ষড়যন্ত্র ছিল তৎকালীন হিন্দু সমাজের স্বৈরতান্ত্রিক

মুসলমান শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ার ফলশ্রুতি। সি. এ. বেইলি একইভাবে মন্তব্য করেন যে ইংরেজরা ১৭৫৭ খ্রিঃ মে বিপ্লবের মধ্য দিয়ে বাংলা অধিকার করেছিল, তা ছিল হিন্দু বাণিজ্যিক শ্রেণি কর্তৃক পরিচালিত বিপ্লবের ফল, নবাব কর্তৃক বাংলা থেকে ইংরেজরা বিতাড়িত হোক এটা তারা চাননি।

অপরদিকে, যদুনাথ সরকার, কে. কে. দত্ত, রমেশচন্দ্র মজুমদার, রামগোপাল, ব্রিজিন গুপ্ত প্রমুখ ঐতিহাসিক এই বক্তব্যের বিরোধিতা করেছেন। ব্রিজিন গুপ্ত হিলের বক্তব্যের মধ্যে কোন সামঞ্জস্য খুঁজে পান নি। তিনি বলেন, মুর্শিদকুলির সময় থেকে উদ্ভূত হিন্দু প্রতিপত্তিশালী গোষ্ঠীর উদ্ভব ঘটলেও তা সিরাজের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হয়নি। ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করার লক্ষ্যে কয়েকজন হিন্দু সিরাজ বিরোধী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিলেন কিন্তু এই ষড়যন্ত্রে কেবল হিন্দুরা ছিলেন না, মীরজাফরের মতো মুসলমানও ছিলেন। আবার, প্রাচ্য পাশ্চাত্যের মানসিক তারতম্য নয়, বাস্তব রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রয়োজনেই সিরাজ ইংরেজদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছিলেন।

কে. কে. দত্ত সিরাজের সঙ্গে ইংরেজের বিরোধের কারণ হিসেবে ইংরেজের বিরুদ্ধে তিনটি নির্দিষ্ট অভিযোগ এনে বলেন যে, (১) প্রচলিত আইন ভঙ্গ করে এবং নবাবের সার্বভৌম ক্ষমতা অস্বীকার করে ইংরেজগণ দুর্গ নির্মাণ ও খাল খনন করেছিল, যা নবাবের পক্ষে মেনে নেওয়া অসম্ভব ছিল। (২) ইংরেজ কর্তৃপক্ষ নবাবের নিষেধ অমান্য করে দস্তকের ব্যাপক অপব্যবহার করেছিল, যা নবাবের অর্থনৈতিক স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল। (৩) নবাব কর্তৃক অভিযুক্ত কৃষ্ণদাসকে রাজনৈতিক আশ্রয়দান করে এবং নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ঘসেটি বেগম, মীরজাফর প্রমুখকে মদত দিয়ে ইংরেজরা নবাবের অস্তিত্বকে বিপন্ন করেছিল। কোনো স্বাধীন, সার্বভৌম নবাবের পক্ষে এটা মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না।

বস্তুতপক্ষে, প্রথম থেকেই ইংরেজরা সিরাজের অপসারণ চেয়েছিল। কারণ ইংরেজদের বিশ্বাস ছিল যে, সিরাজের অস্তিত্ব তাদের ব্যক্তিগত বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধির পথে বাধাস্বরূপ। এই পরিস্থিতিতে মীরজাফর, জগৎ শেঠ প্রমুখ নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য সিরাজ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত বলে ইংরেজদের কাজ অনেকটাই সহজ হয়ে যায়। ১৭৪৭ খ্রিঃ ২৩শে জুন মুর্শিদাবাদের কাছে পলাশির প্রান্তরে ইংরেজ বাহিনী ষড়যন্ত্রের আশ্রয় নিয়ে নবাবের বাহিনীকে পরাজিত করে। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সহযোগিতায় মীরজাফর বাংলার নূতন নবাব পদে অধিষ্ঠিত হন।

১৮.৪.১০. পলাশির যুদ্ধের ফলাফল

পলাশির যুদ্ধের সুদূরপ্রসারী ফলাফল নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতপার্থক্য আছে। পলাশির যুদ্ধে বাংলার স্বাধীন নবাবির অবসান এবং ইংরেজ কর্তৃত্বের সূচনা হয়েছিল বলে কোনো কোনো ঐতিহাসিক মন্তব্য করেছেন। নবীনচন্দ্র সেনও পলাশির যুদ্ধের ফলে ভারতের রাজনৈতিক ভাগ্যাকাশে অন্ধকারের সূচনা হয়েছিল বলে মনে করেন। এই মত সমর্থনযোগ্য নয় বলে অনেকে মনে করেন। পলাশির যুদ্ধের ফলে ইংরেজরা নূতন করে রাজনৈতিক বা বাণিজ্যিক অধিকার লাভ করেনি। এই যুদ্ধের পরেও বাংলার শাসনতান্ত্রিক

প্রধান ছিলেন বাংলার নবাব। ইংরেজরা কিছু অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা ছাড়া কোন শাসনতান্ত্রিক অধিকার বা সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হয়নি। পরবর্তীকালে মিরকাশিম কর্তৃক শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী গঠন, রাজধানী স্থানান্তকরণ সংক্রান্ত পদক্ষেপ বাংলার নবাবের সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারের অস্তিত্বই প্রমাণিত হয়। পলাশিতে ইংরেজ ও নবাবরে মধ্যে যে সংঘাত হয়, তাতে ইংরেজদের সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়নি। নবাবের জয়লাভের সম্ভাবনা ছিল। মীরমদন নিহত হওয়ায় সেই সম্ভাবনা বিনষ্ট হয়। মিরজাফর যুদ্ধক্ষেত্রে সিরাজের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে যুদ্ধে অংশ নেননি। পলাশির জয় ছিল ষড়যন্ত্রের ফল।

তবে এই যুদ্ধে জয়লাভের ফলে ভারতীয় রাজন্যবর্গ এবং ইউরোপীয় বণিক সম্প্রদায়ের চোখে ইংরেজদের মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছিল বলে তারাচাঁদ মন্তব্য করেছেন। পরবর্তীকালে মিরজাফরের দুর্বল শাসন ও ব্যক্তিত্ব ইংরেজদের রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের সুযোগ করে দিয়েছিল। যদুনাথ সরকার পলাশির যুদ্ধকে বাংলার নবজাগরণের সূচনা হিসাবে দেখেছেন। বাংলায় যে পাশ্চাত্য শিক্ষার সূচনা হয়েছিল তা যুগ যুগ ধরে চলে আসা কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসকে দূর করে এবং পাশ্চাত্যের যুক্তিবাদী ও বস্তুবাদী দর্শন বাংলা তথা ভারতকে অনেকটাই উন্নতির দিকে নিয়ে যায়।

পলাশির যুদ্ধের অর্থনৈতিক প্রতিক্রিয়া ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। পলাশি থেকে বাংলায় শিল্প বাণিজ্যের ওপর কোম্পানির আধিপত্য স্থাপিত হয়েছিল, শুরু হয়েছিল নির্লজ্জ লুণ্ঠনপর্ব। তবে যদুনাথ সরকার, অমলেশ ত্রিপাঠী, তপন রায় চৌধুরী প্রমুখ প্রাক্-পলাশি পর্বেই বাংলার অর্থনীতিতে ভাঙনের সূচনা হয়েছিল বলে মনে করেন। যদুনাথ সরকার মন্তব্য করেছেন যে মুর্শিদকুলি খান কঠোর হাতে বাংলার ভূমিরাজস্ব আদায় করে দিল্লিতে পাঠানোর ফলে বাংলা থেকে বিশাল পরিমাণ সম্পদের নিঃসরণ ঘটত এবং এর ফলে সাধারণ মানুষের হাতে নগদ অর্থের সঞ্চয় হ্রাস পায় ও তাদের ক্রয়ক্ষমতা কমে যায়।

অপরদিকে নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিনহা, সব্যসাচী ভট্টাচার্য, সুশীল চৌধুরী প্রমুখ ঐতিহাসিক বাংলার আর্থ-রাজনৈতিক অবক্ষয়ের সূচনা পলাশি পরবর্তীকালের ঘটনা বলে মনে করেন। যদুনাথ সরকারের প্রাক্-পলাশি পর্বে বাংলার অর্থনীতিতে ভাঙন প্রসঙ্গে বলা হয় যে এই পর্বে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলাদেশে বাণিজ্যের প্রয়োজনে ইউরোপ থেকে প্রচুর পরিমাণ সোনা-রূপার মুদ্রা আমদানি করত এবং পণ্য ক্রয়ের জন্য তারা স্থানীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে অর্থ-ঋণও নিত। এর ফলে বাংলার অর্থনীতি সমৃদ্ধ হয় এবং জগৎশেঠের মতো ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানগুলি সমৃদ্ধশালী হয়। প্রাক্-পলাশি পর্বে বাংলার ব্যংকিং ব্যবস্থা উন্নত ছিল বলে ইরফান হাবিব মন্তব্য করেছেন।

পলাশি-উত্তরকালে ব্যাপকহারে সম্পদ নিঃসরণ হয়েছিল বলে ইরফান হাবিব মনে করেন। মার্কিন ঐতিহাসিক ব্রুকস অ্যাডামস্ মনে করেন যে পলাশি থেকে যে আর্থিক নিষ্ক্রমণের শুরু হয়েছিল তা থেকে ইংল্যাণ্ডের পুঁজিপতিরা লাভবান হল, পুঁজি গড়ে ওঠে যা শিল্পবিপ্লবের সহায়ক হয়। ইংরেজ কোম্পানি, ইংরেজ কর্মচারীদের বেসরকারী বাণিজ্য এবং ছোট-বড় ইংরেজ রাজকর্মচারীদের অবৈধ উপায়ে অর্জিত অর্থ তাদের দেশে চলে যেতে থাকে। এজেন্সী হাউসগুলির মাধ্যমে সম্পদ নিঃসরণের ফলে বাংলার ব্যাংকিং ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। এদেশে অর্জিত অর্থ দেশের শিল্প বাণিজ্যে-লগ্নি করেনি। কোম্পানির

কর্মচারীরা শুধু বাণিজ্যের ওপর একাধিপত্য স্থাপন করেনি, তারা অভ্যন্তরীণ শিল্প উৎপাদনের ওপর নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করেছিল। সব্যসাচী ভট্টাচার্য দেখিয়েছেন যে রাজনৈতিক ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে ব্রিটিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলার বস্ত্র বাণিজ্যের ওপর একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ কায়েম করতে সচেষ্ট হয়েছিল। তাঁর মতে এই প্রক্রিয়া হল 'Domination Effect'; এর ফলে বাংলার অবক্ষয় দেখা দেয় এবং এর অনিবার্য ফল হল অবশিল্পায়ন। কোম্পানির নূতন আর্থিক নীতি, বেসরকারি বাণিজ্য, কোম্পানির কর্মচারীদের ব্যক্তিগত ব্যবসা ও দুর্নীতি এবং কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের অবক্ষয় হয় পলাশি লুণ্ঠনের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি।

১৮.৫ উপসংহার

অষ্টাদশ শতকের ভারতের ইতিহাস অত্যন্ত ঘটনাবহুল। এই শতক অনেক ধরনের পরস্পর বিরোধী ঘটনাক্রম, রাজনৈতিক পালাবদল ও সংঘাতসঙ্কুল সামরিক বিন্যাস প্রত্যক্ষ করেছে। রাজনৈতিক-সামরিক সমীকরণ যেমন এই শতকে অতি দ্রুত পরিবর্তিত হয়েছিল, তেমনি অর্থনীতির পরিসরে গভীর পরিবর্তন এই একই সময়কালে হয়েছিল। অষ্টাদশ শতকের সর্বাপেক্ষা তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হল মুঘল সাম্রাজ্যের অবক্ষয় ও পতন। মুঘল সাম্রাজ্যের শূন্যস্থান প্রাথমিক ভাবে দখল করেছিল যে ধরনের শক্তি তাদেরকে দুটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে: (ক) উত্তরাধিকারী রাজ্যসমূহ, বা successor states, এবং (খ) বিদ্রোহী রাজ্য সমূহ বা rebel states। বাংলা, অযোধ্যা ও হায়দ্রাবাদ প্রথম ধরনের রাজ্য; পক্ষান্তরে মারাঠা বা শিখ শক্তি ছিল বিদ্রোহী রাজ্য। অর্থাৎ বাংলা, হায়দ্রাবাদ এবং অযোধ্যা বিদ্রোহ বা রক্তপাতের মাধ্যমে মুঘল সাম্রাজ্যের থেকে পৃথক হয়নি। বরং তত্ত্বগত ভাবে মুঘল শক্তির সার্বভৌমত্ব এই তিনটি রাজ্যের শাসকগণ স্বীকার করতে দ্বিধা করত না। বাস্তবে অবশ্য তারা স্বাধীন আচরণই করত। এই তিনটি রাজ্যের শক্তির প্রতিষ্ঠা ও প্রসার অষ্টাদশ শতকের ভারতের রাজনৈতিক-সামরিক চালচিত্রকে বহুলাংশে নতুন চেহারা দিয়েছিল। আঞ্চলিক ও স্থানীয় স্তরে এর জটিল ও গভীর প্রভাব পড়েছিল। রাজনৈতিক প্রভুত্ব, রাজস্ব আদায়, বাজারের বিকাশ, বাণিজ্যের প্রসারণ সব কিছুই এই পরিবর্তনের সাক্ষী ছিল। অষ্টাদশ শতকের বাংলায় সম্ভবত সর্বাপেক্ষা গভীর পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল। এই পরিবর্তনের সূত্রপাত ঘটেছিল ১৭৫৭ সালে পলাশির যুদ্ধে সিরাজের পরাজয় ও ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির জয়ী হওয়ার মধ্যে দিয়ে। এর ফলে বাংলা তথা ভারতে ঔপনিবেশিকতাবাদের সূত্রপাত ঘটে, যা পরবর্তী প্রায় দুশ বছর এই দেশের ইতিহাসকে প্রভাবিত করেছিল।

১৮.৬ প্রশ্নাবলী

১. কীভাবে অষ্টাদশ শতকে মুঘল সম্রাটের প্রতি আনুগত্য বজায় রেখে হায়দ্রাবাদের একটি স্বাধীন রাজ্য গড়ে ওঠে?

২. কীভাবে অষ্টাদশ শতকে মুঘল সাম্রাজ্যের ভাঙনের প্রেক্ষাপটে অযোধ্যা একটি স্বাধীন রাজ্য হিসেবে গড়ে ওঠে? আপনি কি মনে করেন যে উত্তর ভারতে অযোধ্যা ছিল একটি শক্তিশালী

রাজ্য, যা মুঘল সাম্রাজ্যের প্রকৃত উত্তরাধিকারী হয়ে উঠেছিল?

৩. মুর্শিদকুলি খানের ভূমি রাজস্ব নীতির একটি সমালোচনামূলক বিচার করুন। বাংলার গ্রামীণ সমাজের ওপর এই নীতির কী প্রভাব পড়েছিল?

৪. আপনি কি অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে মারাঠা আক্রমণকে বাংলার ইতিহাসে সবচেয়ে ক্ষতিকারক ঘটনা বলে মনে করেন?

৫. আলিবর্দী খানের সঙ্গে ইউরোপীয় বণিকদের সম্পর্ক আলোচনা করুন।

৬. সিরাজ-উদ-দৌল্লার সঙ্গে ইংরেজ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিরোধের কারণ কী ছিল?

৭. পলাশীর যুদ্ধের ফলাফল আলোচনা করুন। এই যুদ্ধে কি বাংলার স্বাধীন নবাবির অবসান এবং ইংরেজ কর্তৃত্বের সূচনা হয়েছিল?

১৮.৭ গ্রন্থপঞ্জি

- Alam, Muzaffar. *The Crisis of Empire in Mughal North India; Awadh and Punjab,* 1707-1748, Delhi, 1986.
- Dutta K.K. *Siraj-ud-daulah,* Calcutta, 1971
- Gupta B.K. *Siraj-ud-dualah and the East India Company, 1756-1757, Leiden, 1962*
- Marshall, P. J. *The New Cambridge History of India, Bengal, The British Bridegehead Eastern India, 1740-1828,* Orient Longman, 1987.
- Singh, S. N. *The Kingdom of Awadh,* Mittal Publications, 2003
- Vaikuntham, Y. *State, Economy and Social Transformation; Hyderabad State (1724-1948),* Manohar, 2002
- Wheeler, James T. *India Under British Rule from the Foundation of the East India Company,* Macmilan and Co. 1886

একক ১৯ ❑ ভারত ইতিহাসে অষ্টাদশ শতক : ঐতিহাসিক বিতর্ক

গঠন

১৯.০ উদ্দেশ্য

১৯.১ ভূমিকা

১৯.২ অষ্টাদশ শতক : ঐতিহাসিক বিতর্ক

১৯.৩ অতীতের সঙ্গে ধারাবাহিকতা ও পরিবর্তন

১৯.৪ উপসংহার

১৯.৫ প্রশ্নাবলী

১৯.৬ গ্রন্থপঞ্জি

১৯.০ উদ্দেশ্য

এই একক পাঠের উদ্দেশ্য হল ভারতবর্ষের ইতিহাসে অষ্টাদশ শতককে কেন্দ্র করে যে ঐতিহাসিক বিতর্ক তৈরি হয়েছে তা বিশ্লেষণ করা। এই আলোচনায় দুটি বিষয়ের উপর জোর দেওয়া হবে:

- প্রথম বিষয়টি হল অষ্টাদশ শতককে কেন্দ্র করে ঐতিহাসিকগণের মধ্যে যে বিতর্ক রয়েছে তা ব্যাখ্যা করা।
- দ্বিতীয় বিষয়টি হল ধারাবাহিকতা ও পরিবর্তন কীভাবে অষ্টাদশ শতকের ভারতের ইতিহাসকে প্রভাবিত করেছে তা অনুধাবন করা।

১৯.১ ভূমিকা

ভারতের ইতিহাসে অষ্টাদশ শতকে একদিকে মুঘল সাম্রাজ্যের ভাঙন, অন্যদিকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রসার ঘটতে দেখা যায়। যার ফলশ্রুতি হল সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক পরিবর্তন। এই দুটি বিষয় পর্যালোচনা করে নানা বিতর্কিত দৃষ্টিভঙ্গির অবতারণা করা হয়েছে। একদল ঐতিহাসিক মনে করেন যে অষ্টাদশ শতকে ভারতের সমাজ ও অর্থনীতির নানা স্তরে অবক্ষয়ের চিহ্ন স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। অপরদল মনে করেন যে অষ্টাদশ শতক ভারতের ইতিহাস শ্রীবৃদ্ধি ও সমৃদ্ধির যুগ। আবার কোনো কোনো ঐতিহাসিক এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে অতীতের সঙ্গে কোনো ছেদ ভারত ইতিহাসের অষ্টাদশ শতকে পরিলক্ষিত হয়নি; অতীতের সঙ্গে বর্তমানের ধারাবাহিকতা এই শতকে সম্পূর্ণভাবে বজায় ছিল।

১৯.২ অষ্টাদশ শতক : ঐতিহাসিক বিতর্ক

ভারতের ইতিহাসে অষ্টাদশ শতককে অবক্ষয়, নৈরাজ্য ও অরাজকতার যুগ হিসাবে চিহ্নিত করা যায় কিনা সে প্রসঙ্গে অধিকাংশ ইংরেজ ঐতিহাসিক যেমন জেমস মিল, ডি. এইচ, মোরল্যাণ্ড সহ ভারতীয় ঐতিহাসিক যেমন যদুনাথ সরকার, ঈশ্বরী প্রসাদ এবং তারাচাঁদ প্রমুখ এই শতককে অবক্ষয়ের কাল হিসাবে চিহ্নিত করে বলেন যে, এই শতকে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অবক্ষয় স্পষ্ট হয়েছিল। অত্যন্ত শক্তিশালী কেন্দ্রীভূত মুঘল সাম্রাজ্য ভেঙে টুকরো টুকরো হয়েছিল, এবং এই ভাঙন ছিল পতনোন্মুখ কাঠামোর ফলশ্রুতি। তাঁদের মতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে ভারতবর্ষ আবদ্ধ ছিল একটি গতিহীন স্থবির সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংগঠনের মধ্যে। গ্রামগুলির বিচ্ছিন্নতা, কৃষি ও কারিগরি উৎপাদনের একীকরণ এবং কারিগরদের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা, শ্রমবিভাজনের অত্যল্পতা, কৃষি ও শিল্পে প্রযুক্তির অনগ্রসরতা, জাতিভেদ প্রথার জন্য সামাজিক স্থবিরতা গ্রামীণ সমাজ থেকে উদ্বৃত্ত সম্পদের অপহরণ এবং তার ফলে পুঁজি সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা এবং উচ্চবর্ণের মানুষের কর্তৃত্বাধীন ধর্মনির্ভর শিক্ষাব্যবস্থা ইত্যাদিকে এই শতকে ভারতীয় অর্থনীতি ও সমাজের পশ্চাদবর্তিতার দৃষ্টান্ত হিসাবে তুলে ধরা হয়েছে। অপরদিকে আধুনিক গবেষণার অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করে অষ্টাদশ শতককে সপ্তদশ শতকের অনুসারী বা পরিপূরক বলা হয়েছে। অষ্টাদশ শতকের রাজনৈতিক পরিবর্তনের ফলে ভারতে নূতন যুগের সূচনা হয়েছে যার ফলে ভারতের চিরাচরিত জীবনে পরিবর্তন এসেছে এবং ভারতে আধুনিকতার সূচনা হয়েছে এবং যে নূতন চেতনা ও উত্তরণের পদধ্বনি অষ্টাদশ শতকে শোনা গিয়েছিল তা পূর্ণতা পেয়েছে উনবিংশ শতকে। কে. এম. পানিক্কার, সি. এ. বেইলি, মুজাফ্‌ফর আলম, চেতন সিং, গৌতম ভদ্র, প্রমুখ এই যুগে নানা বিপর্যয়ের মধ্যে গতিশীলতা ও উন্নয়নের উপাদান খুঁজে পেয়েছেন।

মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের প্রেক্ষাপটে দেশ জুড়ে অধঃপতন দেখা দেয়নি। সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সংস্কৃতির বৃহত্তর প্রেক্ষাপটের নিরিখে এই শতককে সপ্তদশ শতক থেকে সম্পূর্ণ পৃথকভাবে দেখা যুক্তিযুক্ত নয়। মুঘল সাম্রাজ্যের অবক্ষয় দেখা দিলেও মুঘল প্রশাসনিকতা ও অর্থনৈতিক কাঠামো সর্বত্র প্রায় একই রকম ছিল। রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা এবং সশস্ত্র সংঘাত দেশের কোনো কোনো অঞ্চলের অর্থনীতির ওপর আঘাত হেনেছিল ঠিকই; কিন্তু এর প্রভাব সর্বত্র সমানভাবে পড়েনি। ভারতের কোনো কোনো অঞ্চলে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে অষ্টাদশ শতকের ভারতবর্ষকে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই ভারতের রাজনীতিকে ব্যাপক 'অরাজকতার কাল' বলা সমীচীন নয়। তাঁর মতে, 'রিয়াসত' গুলিকে প্রধানরা নবাব উপাধি নিলেও তাঁরা স্বাধীন বা সার্বভৌম ছিলেন না। প্রতিটি রিয়াসতে নিয়োগের ক্ষেত্রে মুঘল সম্রাটের অনুমোদন ছিল বাধ্যতামূলক। অধ্যাপক আশীন দাশগুপ্ত দেখিয়েছেন যে, সুরাট মুসলিপত্তনম, ঢাকা ইত্যাদি শহরগুলি অবক্ষয়ের পথে গেলেও এই প্রক্রিয়া অর্থনৈতিক অবক্ষয়ের ইঙ্গিতবাহী ছিল না। ১৭৩০ খ্রিঃ পর সুরাটের পতন ঘটলেও সুরাটের স্থান দখল করে নেয় কালিকট ও পুলিকট। যৌথ বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলি বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে পণ্য চলাচলের ব্যবস্থা করেছিল, ফলে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছিল। বি. আর. গ্রেভার

মনে করেন, মুঘল সাম্রাজ্যের অবক্ষয় এবং বিদেশী আগ্রাসন সত্বেও গ্রামাঞ্চলে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত বাণিজ্যপণ্য প্রাদেশিক স্তরে নূতন বাণিজ্যের সন্ধান পেয়েছিল। অষ্টাদশ শতকে কৃষি ও হস্তশিল্পে বিশেষ কোনো অবক্ষয় দেখা যায় না। কেম্ব্রিজ ঐতিহাসিক ধর্মকুমারও মনে করেন না যে অষ্টাদশ শতকে মুঘল সাম্রাজ্যের ভাঙন এবং আঞ্চলিক রাজ্যগুলির উত্থান ভারতের অর্থনীতিকে প্রভাবিত করেছিল। অষ্টাদশ শতকের ভারতীয় অর্থনীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল ধারাবাহিকতা। সতীশচন্দ্রের মন্তব্য হল, ১৮১৩ খ্রিঃ আগে ইংল্যাণ্ডে শিল্পবিপ্লবের প্রভাব তেমনভাবে অনুভূত হয়নি। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের রপ্তানি বৃদ্ধিতে উৎসাহী ছিল। সুশীল চৌধুরী বলেছেন, অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধ ছিল বাংলার শ্রীবৃদ্ধি ও সমৃদ্ধির যুগ। পলাশির যুদ্ধের আগে পর্যন্ত বাংলার অর্থনীতি ছিল যথেষ্ট শক্তিশালী। অষ্টাদশ শতকে ভারতের কুটির শিল্পও যথেষ্ট উন্নত ছিল। মুঘল অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে বিলাস দ্রব্যের চাহিদায় বড় রকমের ঘাটতি লক্ষ্য করা যায়নি। রাজনৈতিক অস্থিরতা সত্বেও আগ্রার মত শহর ১৭৮৭ খ্রিঃ পর্যন্ত একটি বর্ধিষ্ণু অঞ্চল হিসেবে মর্যাদার অধিকারী ছিল। মুজাফফর আলম তাঁর *The Crisis of Empore in Mughal North India, Awadh and Punjab, 1707-1748* গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে অষ্টাদশ শতকের পাঞ্জাব এবং অযোধ্যায় অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি দেখা গিয়েছিল। করমণ্ডল অঞ্চলে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার অভাব, পণ্য উৎপাদন ও বাজারের বিকাশে কোনো বাধার সৃষ্টি করেনি বলে ভাস্বতী ভট্টাচার্য তাঁর 'The Hinterland and the Coast: The Pattern of Interaction in Coromondal in the Eighteenth Century' প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র, মসুলিপত্তনম থেকে হিন্দুপুর ও ওয়ালাজাপেটে সরে গিয়েছিল। বস্তুত অযোধ্যা, বাংলা, হায়দ্রাবাদ, পাঞ্জাব, মহারাষ্ট্র, রোহিলখণ্ড, মহীশূর, ফারুকাবাদ প্রভৃতি অঞ্চলে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি দেখা দিয়েছিল যা অষ্টাদশ শতককে অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগ বা তত্ত্বকে সমর্থন করে না।

কে. লিওনার্দ তাঁর 'The Great Firm Theory of the Decline of the Mughal Empire' প্রবন্ধে বাণিজ্যিক পুঁজি আঞ্চলিক অর্থনীতির বিকাশে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল বলে লিখেছেন। আঞ্চলিক স্তরে ঋণ ব্যবস্থার বিকাশ, প্রাথমিক স্তরে ব্যাংক ব্যবস্থার সক্রিয়তার ফলে যে নূতন চাকুরিজীবির শ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছিল এদের মধ্যে অনেকেই বাণিজ্য সংস্থা, হিসাব রক্ষকের কাজ বা রাজস্ব আদায়ের কাজে যুক্ত ছিলেন। বিভিন্ন জাতপাতের মানুষকে নিয়ে গড়ে ওঠা বণিক সংগঠনগুলির উত্থান ও সেগুলির রাজনীতিতে অংশগ্রহণ আঞ্চলিক স্তরে অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়ক ছিল। সি. এ. বেইলি তাঁর *Rulers, Townsmen and Bazars: North Indian Society in the Age of British Expansion, 1770-1870* এবং *Indian society and the Making of the British Empire* গ্রন্থে বলেছেন অষ্টাদশ শতক জুড়ে ব্যাপক যুদ্ধ ও আগ্রাসন ভারতের অর্থ তথা রাষ্ট্রব্যবস্থাকে দুর্বল করে দিলেও এর মধ্যে দিয়ে ভারতের অর্থব্যবস্থা ধ্বংস হয়নি। তাঁর মতে, লুণ্ঠিত দ্রব্য ভারতের বাজারে বিক্রি হয়েছিল এবং সে কারণে নানাস্থানে বাজার গড়ে ওঠে এবং সেই বাজারগুলি অর্থনীতির

মেরুদণ্ডের মত কাজ করে। তিনি মনে করেন, সমসাময়িক রাজনৈতিক প্রতিকূলতার বিরুদ্ধাচরণের তাগিদে সামরিক সরঞ্জাম বাড়ানোর প্রয়োজন ছিল, এবং সেই কারণে অযোধ্যা, হায়দ্রাবাদ, পাঞ্জাব, রোহিলখণ্ড, মহারাষ্ট্রে রাজস্ব আদায়ের উপর নিয়ন্ত্রণ বাড়ানো হয়েছিল। আন্দ্রে উইঙ্ক ও সঞ্জয় সুব্রমন্যম বলেছেন যে প্রাক্ ঔপনিবেশিক অঞ্চলগুলিতে কৃষিতে পুঁজির অনুপ্রবেশ বেড়েছিল, দেশি পুঁজির ক্ষয়প্রাপ্তি তখনও ঘটেনি। এই পুঁজির অনেকটাই অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে ও বিলাসপণ্যের বাণিজ্যে বিনিয়োগ করা হত। তবে এই সময়ে ইউরোপের অর্থনীতিতে যে বৈপ্লবিক গতিময়তা লক্ষ্য করা যায়, তা ভারতের ক্ষেত্রে অনুপস্থিত ছিল। কৃষি ও শিল্পে উভয়ক্ষেত্রেই কারিগরি ও প্রযুক্তিবিদ্যায় বহু শতাব্দী ধরে কোনো উন্নতি ঘটেনি। ইউরোপের মতো শিল্প-বাণিজ্য নির্ভর শহর ভারতে ছিল না, যে কারণে গ্রামীণ অর্থনীতিতে সংকট দেখা দিলে শহরগুলি রক্ষাকবচ হিসাবে কাজ করতে পারেনি। ইউরোপে নূতন প্রযুক্তি ব্যবহার করে সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলা হয়েছিল, তার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করার সামর্থ মুঘল বাহিনীর ছিল না। আগ্নেয়াস্ত্রগুলি উন্নতমানের ছিল না, কুটির শিল্প প্রাথমিক স্তরেই থেকে গিয়েছিল। উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার করা হয়নি। আতাহার আলির মতে, মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের কারণ হল 'সাংস্কৃতিক ব্যর্থতা'। এই ব্যর্থতার জন্য সাম্রাজ্য কৃষি সংকটের মোকাবিলা করতে পারেনি, —সামরিক ও রাজনৈতিক বিপর্যয় এসেছিল।

অষ্টাদশ শতকে ভারতীয় সমুদ্র বণিকরা ইউরোপীয়দের কাছে পিছিয়ে পড়ে। এশীয় দেশগুলির মধ্যে সামুদ্রিক বাণিজ্য এবং ভারত ও ইউরোপের মধ্যে বাণিজ্যের বেশিরভাগ এই সময় ইউরোপীয় কোম্পানিগুলির নিয়ন্ত্রণাধীন হয়, যদিও ভারতীয়দের আঞ্চলিক ও দূরপাল্লার অর্ন্তদেশীয় বাণিজ্য আরও কিছুদিন টিকে ছিল। অষ্টাদশ শতকের প্রথম দিকে বাংলা ও অযোধ্যার আঞ্চলিক বাণিজ্য ভাল চলেছিল। কাশ্মীর, বিলাসপুর ও মোরদাবাদের ব্যবসায়ীরা এই সময়ে তৎপর ছিল। তবে ইউরোপের বাণিজ্যে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন বা গতিময়তা লক্ষ্য করা যায়, তা ভারতের ক্ষেত্রে উপস্থিত ছিল না। তপন রায়চৌধুরী দেখিয়েছেন যে ভারতে বাণিজ্যিক পরিকাঠামোর সঙ্গে গ্রামভিত্তিক ক্ষুদ্রায়তন হস্তশিল্পের উৎপাদন কাঠামোর চরিত্র ও গতানুগতিক প্রযুক্তিবিদ্যা এক ধরনের ভারসাম্য বজায় রেখেছিল, যেখানে পরিবর্তনের তাগিদ অনুভূত হয়নি।

ইরফান হাবিব বলেছেন ইংরেজ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে ভারতীয়দের নিকট থেকে বিপুল পরিমাণ নজরানা আদায় এবং ভারতের বাইরে সেগুলির বিনিয়োগ বাণিজ্যিক পুঁজির বিকাশে বিঘ্ন সৃষ্টি করেছিল এবং ভারতের কৃষি অর্থনীতিতে ঔপনিবেশিক নিয়ন্ত্রণ সুদৃঢ় হয়েছিল। এছাড়া ভারতে সোনা-রূপার আমদানির পরিমাণ হ্রাস পায়। বুলিয়ন আমদানির পরিমাণ হ্রাস পাওয়ার ফলে দেশের অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ভারতীয় সম্পদ নির্গমনের প্রক্রিয়া তীব্রতর হয়। বস্তুত কোম্পানির সরকার ছিল অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিক থেকে ভারতীয় সমাজের স্বার্থের পরিপন্থী। ইরফান হাবিব মনে করেন, প্রাক্ -ঔপনিবেশিক ভারতে পুঁজি সঞ্চয়ের ও উৎপাদন ব্যবস্থায় পুঁজিবাদী সম্পর্ক গড়ে

ওঠার প্রমাণ পাওয়া যায় না ঠিকই, কিন্তু সে সময় রাষ্ট্র ভূমিরাজস্ব নগদ টাকায় আদায় করায় বাণিজ্যিক পুঁজির বিকাশ ঘটেছিল যদিও এই বিকাশ শহরাঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল। বাণিজ্যিক পুঁজির সঙ্গে গ্রামাঞ্চলের পিছিয়ে পড়া অঞ্চলের কোনো যোগাযোগ গড়ে ওঠেনি। ঔপনিবেশিক অর্থনীতির বিকাশ সার্বিকভাবে দেশজ বাণিজ্যিক পুঁজির প্রসারের পথ রুদ্ধ করেছিল।

১৯.৩ অতীতের সঙ্গে ধারাবাহিকতা ও পরিবর্তন

কোনো কোনো ঐতিহাসিক মনে করেন, অষ্টাদশ শতকের ভারত ছিল মূলত অতীতের সঙ্গে ধারাবাহিকতার ইতিহাস। ব্রিটিশরা নবাবদের নিকট থেকে যে প্রশাসনিক দপ্তরগুলি পেয়েছিল, সেগুলির সাহায্যে তারা প্রশাসনিক কাজাকর্ম চালিয়েছিল। প্রশাসনিক কাজে তারা স্থানীয় উচ্চবর্গীয়দের ওপর নির্ভর করেছিল। ভূমিরাজস্ব আদায়ের প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার কাজে এবং বাণিজ্যের সম্প্রসারণে, কৃষিপণ্যের বাণিজ্যকরণে তাঁরা উদ্যোগী হয়েছিল। নীলমণি মুখার্জী এবং আর. ই. ফ্রিকেনবার্গ *'The Ryotwari System and Sccial Organisation in Madras Presidency'* প্রবন্ধে বলেন যে দক্ষিণ ভারতে রায়তওয়ারি বন্দোবস্ত প্রচলন করে ইংরেজরা ঐতিহ্যগত কৃষিব্যবস্থার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে চেয়েছিল। অষ্টাদশ শতকে সমাজ ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করা গেলে এবং এই শতকের সমাজ ও সংস্কৃতিতে রক্ষণশীলতা ও অবক্ষয়ের ছাপ স্পষ্ট হলেও কয়েকটি ক্ষেত্রে পরিবর্তনের আভাস পাওয়া যায়। দিল্লির শাসকশ্রেণি আত্মকলহ ও রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে ব্যস্ত থাকায় মুঘল শিল্পকলা ও স্থাপত্য ভাস্কর্যের অবনতি ঘটলে হায়দ্রাবাদ, লক্ষ্ণৌ, পাটনা প্রভৃতি শহরগুলিতে শিল্পীরা ভিড় করে এবং এর ফলে এই সব শহরে শিল্পকলার চর্চা বেড়ে যায়। অষ্টাদশ শতকে বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষায় ভারত ইউরোপের তুলনায় পিছিয়ে থাকলেও ভারতীয় শাসক গোষ্ঠী পশ্চিমি বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে। হায়দার আলী, টিপু সুলতান প্রমুখ এ ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন। অষ্টাদশ শতকে ভারতের বিভিন্ন স্থানে আঞ্চলিক ধাঁচে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা গড়ে ওঠে, যার মধ্যে একটা অসম ও স্থানীয় চরিত্র উন্মোচিত হয়।

১৯.৪ উপসংহার

অষ্টাদশ শতককে ভারতের ইতিহাসে অবক্ষয়, নৈরাজ্য ও অরাজকতার যুগ হিসেবে চিহ্নিত করে এবং এই যুক্তিতে কোনো কোনো ঐতিহাসিক ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ প্রসারের একটা নৈতিক যথার্থতা খুজে দেখার চেষ্টা করেছেন। সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে অনেকে সপ্তদশ শতকের অনুসারী বা পরিপূরক বলেছেন। অনেকে এই যুগে নানা বিপর্যয়ের মধ্যেও বিভিন্ন গতিশীলতা ও উন্নয়নের উপাদান খুঁজে পেয়েছেন। তবে এই সময় ইউরোপের অর্থনীতিতে যে বৈপ্লবিক গতিময়তা লক্ষ্য করা

গিয়েছিল, তা ভারতের ক্ষেত্রে অনুপস্থিত ছিল বলে অনেকে অভিমত পোষণ করেন। অষ্টাদশ শতকে সমাজ ও সংস্কৃতির ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করা গেলেও এবং এই শতকের সমাজ ও সংস্কৃতিতে রক্ষণশীলতা এবং অবক্ষয়ের ছাপ স্পষ্ট হলেও কয়েকটি ক্ষেত্রে পরিবর্তনের ছাপ পাওয়া যায়। অষ্টাদশ শতকে বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষায় ভারত ইউরোপের তুলনায় পিছিয়ে থাকলেও ভারতীয় শাসক গোষ্ঠী বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে। হায়দার আলী, টিপু সুলতান প্রমুখের মধ্যে এই ধরনের আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়।

১৯.৫ প্রশ্নাবলী

১. অষ্টাদশ শতককে কি ভারতের ইতিহাসে অবক্ষয় ও অরাজকতার যুগ হিসাবে চিহ্নিত করা যায়? এ বিষয়ে সতীশচন্দ্রের অভিমত ব্যাখ্যা করুন।

২. ভারতের ইতিহাসে অষ্টাদশ শতকের গুরুত্ব কী ছিল? এ বিষয়ে আধুনিক ঐতিহাসিকদের অভিমত বিশ্লেষণ করুন।

১৯.৬ গ্রন্থপঞ্জি

- Alam, Muzaffar. *The Crisis of Empire in Mughal North India; Awadh and Punjab,* 1707-1748, Oxford, 2013
- Ali, Athar. *Mughal India, Studies in Polity, Ideas, Society and Culture,* 1707-1740, Oxford, 2006
- Bayley, C.A. *Rulers, Townsmen and Bazars; North Indian Society, in the Age of British Expansion 1770-1870,* Cambridge, 1983.
- Chandra, Satish. *Medieval India, Society, Jagirdari Crisis and the Village, Delhi, 1982*
- Chandra, Satish. *The 18th Century India; Its Economy and the Role of the Marathas, The Jats, The Sikha and Afghans,* Calcutta, 1986
- Chandra, Satish. *Parties and Politics at the Mughal Court, 1707-40,* Oxford, 2002.
- Wink, Andre. *Land Sovereignty in India, Agrarian Society and Politics Under Eighteenth Century Maratha Swarajya,* Cambridge, 1986
- Habib, Irfan. *The Agrarian System of Mughal India 1556-1707* Oxford 2013
- Prasad, Iswari. *The Mughal Empire,* Chug Publication, 1974

- Sarkar, Jagadish Narayan. *A Study of Eighteenth Century India, Vol. I, Political History (1707-1761),* Calcutta, 1976
- Richards, J.F. *Mughal Administration in Golkunda,* Oxford 1975
- ভদ্র, গৌতম. *মুঘল যুগে কৃষি-অর্থনীতি ও কৃষক বিদ্রোহ,* কলকাতা, ১৯৯১
- বন্দ্যোপাধ্যায়, শেখর. *অষ্টাদশ শতকের মুঘল সংকট ও আধুনিক ইতিহাস চিন্তা,* কলকাতা, ১৯৮৩
- নাথ, প্রত্যয় ও কৌস্তক মণি সেনগুপ্ত. *ইতিহাসের বিতর্ক বিতর্কের ইতিহাস—অতীতের ভারত ও আজকের গবেষণা,* কলকাতা, ২০২১

পর্যায় ৬
ব্যবসা ও বাণিজ্য

একক ২০ ❑ হস্তশিল্প ও প্রযুক্তি

গঠন

২০.০ উদ্দেশ্য

২০.১ ভূমিকা

২০.২ বস্ত্রশিল্প স্বর্ণশিল্প কাগজশিল্প ও অন্যান্য হস্তশিল্প

২০.৩ প্রযুক্তি

২০.৪ উপসংহার

২০.৫ প্রশ্নাবলী

২০.৬ গ্রন্থপঞ্জি

২০.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে মুঘল আমলের হস্তশিল্প ও প্রযুক্তি সম্পর্কিত নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আমরা অবহিত হব:

- মুঘল ভারতে হস্তশিল্প ও প্রযুক্তির বিকাশ
- উৎপাদনের বিভিন্ন ক্ষেত্র যেমন বস্ত্রশিল্প, স্বর্ণশিল্প, কাগজশিল্প সহ অন্যান্য ক্ষেত্রগুলির অবস্থা ও অগ্রগতি
- মুঘল ভারতে প্রযুক্তি বিদ্যার অগ্রগতি

২০.১ ভূমিকা

যে কোনো দেশের শিল্পের বিকাশ প্রযুক্তির অগ্রগতির উপর নির্ভর করো। আধুনিক যুগে অষ্টাদশ শতকে ইংল্যাণ্ডে বস্ত্রকে কেন্দ্র করে প্রথম যে শিল্প বিপ্লব গড়ে ওঠে তার মূলে ছিল প্রযুক্তির অগ্রগতি। তবে ইতিপূর্বে পৃথিবীর সর্বত্র শিল্প ক্ষেত্রে কৃৎকৌশলগত তেমন কোনো রূপান্তর দেখা যায়নি যা উৎপাদন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে কোনো বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে পারে। ভারতবর্ষও তার ব্যতিক্রম নয়। প্রাচীন ভারতে সামান্য প্রযুক্তির উপর নির্ভর করে যে হস্তশিল্প গড়ে উঠেছিল সপ্তদশ শতকে তার অগ্রগতি ঘটে। সেকালের হস্তশিল্প ও প্রযুক্তি সম্পর্কে অবহিত হওয়াই এ পাঠের উদ্দেশ্য।

মুঘল আমলে হস্তশিল্পে বিশেষ দক্ষতা অর্জিত হয়েছিল। বিভিন্ন হস্তশিল্পের উপর নির্ভর করে কারিগররা জীবিকা নির্বাহ করত। একদিকে তারা ছিল যেমন নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য উৎপাদনকারী তেমনই অন্যদিকে বিভিন্ন সৌখিন পণ্য সামগ্রীও উৎপাদন করত। হস্তশিল্পের প্রধান প্রধান উৎপাদনের মধ্যে

ছিল বাসনপত্র, কৃষি সরঞ্জাম, নানা ধরনের অলংকার, ইট, কাগজ, নৌকা, মৃৎশিল্প প্রভৃতি। বিভিন্ন প্রকার লোহা বা তামার পাত্র, বটি, কাটারি, ছোরা, বর্ষা ইত্যাদি ধাতুনির্মিত সরঞ্জাম তৈরি হত। ধাতুর পাত্র নির্মাণে কারিগররা বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেছিল। কাঠের তৈরি আসবাবপত্র ধনী ব্যক্তিদের ঘরের শোভা পেত। এসব শিল্পীরা কাঠের কাজের বিশেষ দক্ষ ছিলেন। এছাড়া চর্ম শিল্পের বিশেষ কদর ছিল। জুতা, ঘোড়ার সাজ, যেমন—জিন, রেকাব তৈরিতে বা জলের থলি তৈরিতে চামড়া ব্যবহার করা হত। লাহোর, মুলতান চর্মজ সামগ্রী প্রস্তুতের জন্য বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিল। পেলসার্ট ও মোরল্যাণ্ড বাংলা ও বিহারের চর্মশিল্পের প্রশংসা করেছেন।

২০.২ বস্ত্রশিল্প স্বর্ণশিল্প কাগজশিল্প ও অন্যান্য হস্তশিল্প

ভারতবর্ষকে 'Mother of Cotton' বা 'কার্পাসের জনক' নামে অভিহিত করা হয়। সুপ্রাচীন মেহেরগড় সভ্যতায় খ্রিস্টপূর্ব ৪০০০ অব্দে পোড়া কার্পাস বীজের নিদর্শন পাওয়া গেছে। সিন্ধু সভ্যতায় মহেঞ্জোদারোতে খ্রিস্টপূর্ব ২০০০ অব্দে কার্পাস বস্ত্রের ছোট ছোট টুকরো মিলেছে। প্রাক ঔপনিবেশিক আমলে উৎপাদিত পণ্যের মোট মূল্য ও শ্রমশক্তির আয়তনের নিরিখে কৃষির বাইরে সম্ভবত সর্ব-বৃহৎ শিল্প ছিল সুতিবস্ত্র। স্বাভাবিকভাবেই যে কৃৎকৌশলের উপর নির্ভর করে এই শিল্পের বিকাশ ঘটে তা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ।

মুঘল আমলে ভারতে কারিগরি শিল্পের মধ্যে বস্ত্রশিল্প সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য যার খ্যাতি জগৎজোড়া। ক্ষেত থেকে কার্পাস সংগ্রহ থেকে শুরু করে বস্ত্র উৎপাদন করা পর্যন্ত গোটা প্রক্রিয়াটি কারিগরি দক্ষতার উপর ছিল নির্ভরশীল। প্রতিটি ধাপে বেশ কিছু যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হতো। সর্বপ্রথম বীজ থেকে কার্পাসের আঁশ ছাড়াবার জন্য দুটি রোলার বিশিষ্ট চরকা বা চরকি নামক একটি কাঠের যন্ত্র ব্যবহৃত হত। এটি সম্পূর্ণ ভারতীয় যন্ত্র। ষষ্ঠ শতাব্দীর অজন্তা গুহার এক নম্বর গুহায় অঙ্কিত চিত্রে এই যন্ত্রের ছবি দেখা যায়। মুঘল আমলে সপ্তদশ শতাব্দীতে চরকার চাকা ঘোরাবার জন্য হাতল (crank handle) লাগাবার ব্যবস্থা হয়। এছাড়া তুলো পেঁজার জন্য 'তুলো পেঁজার ধনুক' (scutch bow) ব্যবহার করা হত। তুলো থেকে সুতো তৈরির জন্য ব্যবহৃত হতো সুতো বোনার চরকা-র বা স্পিনিং হুইলের। এই চরকায় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে কোন হাতল ছিল না। মুঘল মিনিয়েচার পেইন্টিং (miniature Painting)-এ এই সময়কালের চরকায় কোন হাতল লক্ষ্য করা যায় না। কিন্তু পরবর্তীকালের বিভিন্ন ছবিতে চরকায় হাতল দেখা যায়। ১৬৩০ খ্রিস্টাব্দে সুফি গায়কদের নিয়ে আঁকা ছবিতে চরকায় হাতল দেখা যায়। ঔরঙ্গজেবের আমলের (১৬৫৯-১৭০৭) এক ছবিতে দেখা যায় যে এক গ্রামীণ মহিলা হাতলযুক্ত চরকায় সুতো কাটছেন।

কাপড় বুনতে অনুভূমিক যন্ত্র ব্যবহার করা হত। মুঘল আমলে টানা-তাঁতে, তাঁতিরা খাড়া বয়ন যন্ত্রের ওপর থেকে টানা সুতো নীচে নামিয়ে দিত, যাতে তাঁতিরা পড়েন সুতা বহনকারী মাকুর মধ্য দিয়ে চালিয়ে কাপড় বা গালিচার ওপর নক্সা বুনতো। কাশ্মীরে এই পদ্ধতিতে শাল তৈরি করা হত। ১৬৭৯ খ্রিস্টাব্দে অন্ধ্রের এলুরু-তে একদল ইরানি একই রকম খাড়া বয়ন যন্ত্র ব্যবহার করে গালিচা তৈরি করত। কাপড় বোনার পর রং করা হতো। দুটি পদ্ধতিতে কাপড় রং করা হতো-বাঁধনা ও ব্লক

প্রিন্টিং। বাঁধনা পদ্ধতিতে কাপড় প্রথমে বেঁধে নিয়ে তার ওপর নকশা ফুটিয়ে তোলার জন্য রং করা হত। আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে কাপড়ে নক্শা ছাপা হত নকশা করা কাঠের ব্লকে রং লাগিয়ে তা কাপড়ে ছাপ মেরে। ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে এই পদ্ধতিতে কাপড় ছাপা হত। এই পদ্ধতিতে প্রস্তুত কাপড়কে 'ছিট' (chint) বলা হত। যা পরবর্তীকালে ইউরোপীয়দের কাছে অপভ্রংশ হয়ে chintz নামে পরিচিত হয়। বিদেশী বণিকরা যেমন নকশা (design) দিতেন কারিগররা তেমনি সুতির ছাপা তৈরি করে দিতেন। তাভার্নিয়েরের রচনায় এর উল্লেখ রয়েছে। এডওয়ার্ড ও টেরী ভারতের রঞ্জন শিল্প দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। আকবরের আমলে মুঘল অভিজাত আব্দুল খান-ই-খনান ১৫৯০-এ সিরনজের কয়েকজন কারিগরের পৃষ্ঠপোষকতা করেন যারা ছিট কাপড় ছাপাবার ফলকে নকসা করতেন। সুতির ছাপা কাপড় তৈরির প্রধান কেন্দ্র ছিল বেরার, বুরহানপুর, আহমেদাবাদ ও আগ্রা। সোনার জরি ও রেশম সুতো মিশিয়ে কাপড় তৈরি কাপড় জরবাফ্ত বা কিংখাব নামে পরিচিত ছিল। জিয়াউদ্দিন বারনী সাধারণ লোকের সামর্থের বাইরে থাকা বা ধনী ব্যক্তিদের পরিধেয় হিসাবে যে বস্ত্রের তালিকা উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে সর্বাগ্রে রেখেছেন এই নানাধরনের জারবাফ্তা বস্ত্রকে। আগুনে গরম করে খুব সরু সোনা ও রূপার তার তৈরি করে সেগুলিকে ড্র-প্লেটের (Draw plate/অতি সূক্ষ ছিদ্র যুক্ত পাত) সাহায্যে আরও সূক্ষ্মতর করে কাপড় বোনার কাজে ব্যবহার করা হত। ড্র-প্লেটের সাহায্যে কাপড় বুননের এই পদ্ধতি ভারতে মুঘল আমলেই প্রথম শুরু হয়।

কাপড় বোনা শেষ হলে প্রথমে কাপড়খানা ধোয়া হত। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে কাপড় ধোয়ার কাজ এত উন্নত ছিল ও ধোপারা এত দক্ষ ছিল যে, ইউরোপীয় পর্যবেক্ষকরা তাতে বিস্ময় প্রকাশ করতেন। আবুল ফজল লিখেছেন সোনারগাঁও-এর অন্তর্গত এগারসিন্দুর জল কাপড় ধোয়ার জন্য সবচেয়ে উৎকৃষ্ট ছিল। তবে জল ভালো হলেও কাপড় ভালো ধোয়া হতো না। তার জন্য ভালো সাবান বা ক্ষার এবং ধোপার বিশেষ পারদর্শিতার প্রয়োজন ছিল। ডেনিশ কোম্পানি রিপোর্টে থেকে জানা যায় যে কাপড় ধোয়ার জন্য যে দক্ষতার প্রয়োজন তা বাংলার ধোপাদের মধ্যে বেশি ছিল। হিন্দুরাই সাধারণত ধোপার কাজ করতো। মুসলিমরা ধোপার কাজ করছে, তার প্রমাণ কোথাও পাওয়া যায় না। জেমস টেলর লিখেছেন, অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি নাগাদ সূক্ষ্মতাভেদে একশো-টা মসলিনের ধোয়া ও মেরামতের জন্য খরচ ৩০ টাকা থেকে ১০০ টাকার মধ্যে ওঠানামা করতো।

কাপড় ধোয়ার পর অনেক সময় দেখা যেত মসলিনের সুতো এলিয়ে পড়েছে বা অবিন্যস্ত হয়ে গেছে। তখন এই সুতোগুলোকে ঠিকঠাক করে সুবিন্যস্ত করতে হত। যারা এ কাজ করতো তাদের বলা হত নারদিয়া বা নুরদিয়া। আবার ধোয়ার সময় কাপড়ের কোন জায়গায় সুতো নষ্ট হয়ে গেলে রিফুকার বা রিফুগাররা নিখুঁতভাবে তা রিফু করে দিত। ঢাকার রিফুকাররা এ কাজে অত্যন্ত দক্ষ ছিল। এদের অধিকাংশই ছিল মুসলমান এবং সংঘবদ্ধভাবে তারা বসবাস করত। অষ্টাদশ শতকের প্রথম দিকে একটি সূক্ষ্মতম মসলিন ধোয়া ও মেরামতের খরচ পড়ত ১০ টাকার মতো। কাপড় ধোয়ার সময় কাপড়ে কোন দাগ লাগলে ধোপারা তা পরিষ্কার করে দিত। লোহার দাগ তুলতে ব্যবহৃত হতো আমরুলের রস। মসলিনের কাপড় মসৃণ করা হতো শাখ দিয়ে ঘষে আর মোটা কাপড় ছোট ছোট মুগুর দিয়ে পিটিয়ে।

ইস্ত্রিওয়ালারা কাপড় ইস্ত্রি করত। লোহার তৈরি আগুনে গরম করে তা কাপড়ের উপর বোলানো হত। মসলিন ইস্ত্রি করার সময় বিশেষ যত্ন নিতে হত। মসলিনে যাতে দাগ না লেগে যায় তার জন্য কাগজের ভাঁজে কাপড় রেখে ইস্ত্রি করা হতো। অনেক সময় কাপড়ে সুতার কাজ করা হতো। বাংলার কারিগররা একাজে অত্যন্ত পটু ছিল।

মুঘল যুগে রেশম সুতোর সাথে জরি মিশিয়ে কাপড় বোনা হত। একে জরবাফত্ বলা হত। কাপড়ের সৌন্দর্য যাতে আরও বৃদ্ধি পায় যখন 'শাফশাহাঙ্গা' বা (Draw Plate)-এর ব্যবহার শুরু হয়। আগুনে গরম করে অত্যন্ত সরু সোনা ও রূপোর তার বানানো হতো, যার প্রত্যেকটির ব্যাস সমান। তারপর লোহার Draw Plate-এর ছিদ্র গুলোর মধ্য দিয়ে সাঁড়াশি দিয়ে টেনে পরপর সোনা ও রূপোর তারগুলো বের করে আনা হত।

কাপড় তৈরি হলে তা প্যাকিং করা হত। নারদিয়ারা কাপড় ভাঁজ করতো। এরপর বস্তাবন্দরা কাপড়গুলো স্তূপাকৃতি করে কাপড়ের গাটারি বাঁধতো। এরা কাপড়গুলি গুছিয়ে দুটো তক্তার মাঝে রেখে গাঁটারি বাঁধতো। দামি মসলিনগুলি প্যাকেটিং-এর ক্ষেত্রে এক একটি মসলিন বাঁশের দুই গেরোর মাঝখানে ফাঁকা জায়গায় পুরে প্যাক করা হতো।

এইভাবে দেখা যায় কাপড় বোনার বেশ কয়েকটি জটিল ধাপ—সুতো-নাটানো, টানা-হোতান, নারোদ-বাধা, বুইবাধা, কাপড়-বোনা ইত্যাদি অতিক্রম করে তবেই বস্ত্র উৎপন্ন হত। বোনা হয়ে গেলে কাপড় ধোয়া, সূত্র বিন্যস্ত করা, ইস্ত্রি করা রিপু করা আর রংয়ের ও ছুচের কাজ, তারপর কাপড়ের গাঁটড়ি বাধা হত। এত সব জটিল কাজ করতে প্রায় ছয়-সাত মাস লেগে যেত।

বাংলা বস্ত্র উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত ছিল। এখানকার ঢাকাই মসলিনের খ্যাতি ছিল জগৎজোড়া। মুঘল আমলে ওমরাহ এবং বাংলার নবাবদের জন্য ছিল মলবুস খাস কুঠি। এই বাদশাহি কারখানায় তৈরী হত মলবুস খাস বা বাদশাহি পরিধেয়। এই কারখানা তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে থাকতেন একজন দারোগা। তাকে সাহায্য করত মুকিম। মলবুসখাস কুঠিতে মসলিন তৈরির জন্য সবচেয়ে দক্ষ তাঁতিদের নাম তালিকাভুক্ত করা হতো। খুব সূক্ষ্ম একখণ্ড মসলিন তৈরি করতে সময় লাগত পাঁচ থেকে ছয় মাস। খুব উৎকৃষ্ট মসলিনের দামও ছিল খুব বেশি।

জাহাঙ্গিরের সময় একটি 'আব-ই-রাওয়ান' মসলিনের দাম ছিল ৪০০ টাকা। আর ঔরঙ্গজেবের সময় একটা জামদানির দাম ছিল ২৫০ টাকা। অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ভারতের এই সমৃদ্ধ বস্ত্র উপনিবেশিক শাসনের যাঁতাকলে পড়ে ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হয়।

স্বর্ণ-শিল্পে ভারতীয় কারিগররা বিশেষ দক্ষতা দেখিয়েছিল। আগ্রা শহরে অকীক (agate) স্ফটিক ও অন্যান্য উপাদানের উপর সোনার কাজ করা হত। গরীব মানুষ ও ছোটো ছেলেরা এই কাজে নিযুক্ত হত এবং অত্যন্ত দ্রুততা ও দক্ষতার সঙ্গে তা করতে সক্ষম ছিল। জাঁ দ্য থেভেনট লিখেছেন, প্রতি এক তাল সোনার কাজের জন্য তারা দুই ক্রাউন মজুরির পেত।

সপ্তদশ শতকের সরকারি দপ্তরে দলিল-দস্তাবেজ প্রস্তুত, বণিক, হস্তলিপিবিদ্ ও শিক্ষার্থীদের কাজে কাগজের প্রয়োজন বৃদ্ধি পায়। এই সময় থেকে ভারতে কাগজ শিল্পের বিশেষ বিকাশ ঘটে। উত্তর ভারতের জঙ্গল থেকে কাঠ সংগ্রহ করে, কাঠের পিণ্ড থেকে কাগজ তৈরি করা হতে থাকে। বিহারের

বিভিন্ন অঞ্চল কাগজ তৈরির জন্য খ্যাতি লাভ করেছিল। উত্তর ভারত থেকে ক্যাম্বে-তে কাগজ প্রেরণ করা হত। সেখান থেকে তা বিদেশে রপ্তানি হত। মুঘল আমলে যে সমস্ত সামগ্রী দিয়ে কাগজ বানানো হত তার মধ্যে ছিল ছেড়া সুতির কাপড়, পুরনো দড়ি ও নিম্নমানের তন্তু-বিশিষ্ট চটের থলি এবং কতিপয় লতাগুল্মের ছাল। এগুলি একটি তানু'র (চৌবাচ্চা) মধ্যে জলে ডুবিয়ে ভেজানো হত। তারপর পিটিয়ে তা মণ্ড বানানো হতো। অতঃপর পরিমাণ মতো সোডা বা চুন জলে গুলে তার মধ্যে আবার ওই মন্ডকে চোবানো হত। এরপর বাসের টুকরোর ছাঁচগুলো মন্ড ভেজানো চৌবাচ্চায় ফেলা হত এবং মন্ডের যেটুকু তাতে আটকে যেত, তা ছাড়িয়ে ফালি করে রোদে শুকাতে দেওয়া হতো। কাগজের উপরিভাগ একটি পাথর বা কাঁচ দিয়ে ঘষে মসৃণ করে তাতে ঔজ্জ্বল্য আনা হত। সপ্তদশ শতাব্দীতে উন্নত মানের দামি কাগজে সোনার জল করা ফুল ছাপ দেওয়া হত। এই শতকে কাগজের ব্যবহার বৃদ্ধি পায়। ফলে সরকারি দপ্তরে হিসাবপত্র রাখা সুবিধা হয়। বাণিজ্য সংক্রান্ত কাগজপত্র, বিশেষত হুণ্ডির বিস্তার ঘটে। কিন্তু লক্ষণীয় যে মুদ্রণ শিল্পের অগ্রগতি ঘটেনি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য চিনে মুদ্রণের ইতিহাসের সূচনা নবম শতাব্দীতে। চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ দিকে তা' ইউরোপে পৌঁছে যায়। জেসুইট পাদ্রী বা ইউরোপীয়দের মাধ্যমে মুঘল দরবারে ছাপা বই ও কাঠ খোদাই মুদ্রাঙ্কনের আবির্ভাব ঘটলেও ভারতে মুদ্রণ শিল্প সম্পর্কে বিশেষ কোনো আগ্রহ সৃষ্টি হয়নি। হতে পারে ফারসি বর্ণমালার যথাযথ বিন্যাসের অসুবিধা মুদ্রণ শিল্পের বিকাশে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিল। অথবা বিরাট সংখ্যক হস্তলিপি বিশারদের উপস্থিতি, যারা বই নকল করার জন্য সর্বদা প্রস্তুত ছিল, তারা মুদ্রণ শিল্পের প্রতিবন্ধক স্বরূপ ছিল। ছাপাবার চাইতে মানুষ তাদের উপরই বেশী নির্ভর করত।

২০.৩ প্রযুক্তি

মুঘল আমলে বিভিন্ন ধরনের মৃৎপাত্র তৈরি হতো। ভারতীয় সৌখিন মৃৎপাত্র বিশ্বের বিভিন্ন দেশে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। মানুচ্চির বর্ণনা থেকে জানা যায় যে কাঁচের তৈরি পেয়ালার থেকেও সুন্দর ও কাগজের চেয়েও পাতলা ছিল এই মৃৎপাত্র। লবণাক্ত মাটির সঙ্গে পশুর চর্বি মিশিয়ে সাবান তৈরির কৌশল ভারতে আমদানি হয়েছিল মুসলমানদের হাত ধরেই। এই কারিগরি শিল্পের সাহায্যে সস্তায় ও দ্রুত কাপড় ধোয়া সম্ভব হত। পরিবহনের কাজে ব্যবহৃত হয় এমন যানবাহন নির্মাণেও বহু মানুষ নিযুক্ত ছিল। গো-শকট, নৌকা ও জাহাজ নির্মাণে ভারতীয় কারিগররা দক্ষতা অর্জন করেছিল। অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে নৌকার বিশেষ ভূমিকা ছিল। নদীর পথে পণ্য পরিবহনের জন্য নৌকা অপরিহার্য ছিল। আবুল ফজলের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে বর্ষাকালে যাতায়াতের প্রয়োজন ছাড়াও যুদ্ধের কাজে ও রসদ পরিবহনের জন্য নৌকা ব্যবহার করা হতো। আকবরের আমলে এমন নৌকাও তৈরি করা হত যেগুলো হাতি পরিবহনে সক্ষম ছিল। সুজন রাই নৌকা নির্মাণের কারিগরদের বিশেষ দক্ষতার কথা লিখেছেন। নিকোলো কন্টি-র বর্ণনা থেকে জানা যায় ভারতীয়রা ইউরোপীয়দের চেয়েও বেশি বড় জাহাজ নির্মাণ করতে পারতো। পশ্চিম উপকূলে সুরাট, বেসিন, গোয়া, পূর্ব-উপকূলে মসুলিপত্তম, উত্তর ভারতে লাহোর ও এলাহাবাদে জাহাজ নির্মাণ শিল্পের প্রধান কেন্দ্র ছিল। পূর্ব ভারতের ঢাকা-চট্টগ্রাম-সপ্তগ্রামেও জাহাজ নির্মিত হত। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ভারতীয় জাহাজ নির্মাণ শিল্প সাবেকি ধাঁচে চলছিল। কিন্তু ওই

শতকের দ্বিতীয়ার্ধে জাহাজ নির্মাণ শিল্পে ভারতীয় কারিগররা অসাধ্য সাধন করেছিল। ১৬৬৮ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ কুঠিয়ালরা পর্যন্ত সুরাট থেকে তাদের জাহাজ তৈরির জন্য উৎসাহী হয়ে উঠেছিল। এসময় কোম্পানির কর্তৃপক্ষকে তারা সুরাটের কারিগরদের সম্পর্কে লিখেছিল, "এই ছুতোর-রা তাদের কলায় এতটাই বিশারদ ও সুদক্ষ হয়ে উঠেছে যে এখানে এমন অনেক ভারতীয় নৌ-যান রয়েছে যেগুলো আকৃতিতে ইংল্যান্ড বা হল্যাণ্ডে তৈরি হওয়া জাহাজগুলোকে ছাপিয়ে যাবে। ১৬৭১ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ ফ্রায়ার সুরাটে একশোরও বেশি উন্নত মানের জাহাজ দেখেছিলেন যার মধ্যে তিন-চারটে ছিল 'Man of War' এবং যেগুলির আকার ছিল Third Rate Ship-এর মত বিশাল। 'Man of War' বলতে সেই জাহাজকেই বোঝাত যেগুলিতে কামান থাকতো এবং যেগুলি পালের সাহায্যে চালানে হত। ইংল্যান্ডে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে এ ধরনের জাহাজ তৈরি হত। আর 'Man of War' হল সেগুলি যেগুলিতে ৬৪ থেকে ৮০ টি কামান থাকত এবং ৬০ বা তার বেশি আগ্নেয় অস্ত্রবাহী সৈন্য থাকতো। ফ্রায়ার লিখেছেন, এ ধরনের জাহাজ ভারতীয় কারিগররা করতে পেরেছিল কারণ জাহাজ নির্মাণে দক্ষ কিছু অভাবী ইংরেজ ভারতীয় কারিগরদের এই নতুন কারিগরিতে প্রশিক্ষিত করেছিল।

কিন্তু তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, ভারতীয় ছুতোরদের কিছু কিছু কলা কৌশল বা দক্ষতা ইউরোপীয় জাহাজে নির্মাণে দক্ষ কারিগরদের সমতুল ছিল বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে তারা ইউরোপীয়দের ছাপিয়ে গিয়েছিল। যেমন জাহাজের পাটাতনগুলোকে নিশ্ছিদ্রভাবে পরস্পরের সাথে আটকাবার ভারতীয় পদ্ধতি ছিল বিস্ময়কর। পাটাতনের জোড়াগুলিকে জল নিরোধ বস্তু, পুরানো দড়ির প্যাঁচ খুলে যাওয়া আলগা তন্তু দিয়ে বন্ধ করার যে পদ্ধতি ভারতীয় কারিগররা অনুসরণ করতো, তা পিচ ও আলকাতরা দিয়ে বন্ধ করার সাধারণ পদ্ধতির চেয়ে অনেক বেশি টেকসই ছিল। চুনের মিশ্রণ বা 'চুনাম' জাহাজের পাটাতনে লেপন করা হত যা সমুদ্রকীটের আক্রমণ থেকে জাহাজকে রক্ষা করত। যেভাবে জাহাজ মেরামতির জন্য সেটাকে জল থেকে ডাঙ্গায় crab এবং tacle বা কপিকলের দ্বারা তোলা হত, তা দেখে ১৬৭৯ খ্রিস্টাব্দে টমাস বাউরি উচ্চ প্রশংসা করেছিলেন। অন্ধ্রের নরসাপুর পোতাশ্রয়ে 'ক্যাপস্টান' ও 'কপিকল'-এর ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া যায়। এতদসত্ত্বেও ভারতীয় জাহাজগুলোতে অনেক খামতি থেকে গিয়েছিল। যেমন ভারতীয়রা দূরবীন তৈরি করতে চেষ্টা করেননি। লোহার তৈরি জিনিসপত্র, নোঙ্গর ইত্যাদি যা জাহাজের কাজে লাগতো, তা মানের দিক থেকে সন্তোষজনক ছিল না। জাহাজ তৈরির প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের ঘাটতির বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে ১৬৭৭ খ্রিস্টাব্দে বোম্বাইতে ইংরেজ কর্তৃপক্ষের এক আবেদনে। সেখানে তারা ইংল্যাণ্ড থেকে জাহাজের আবশ্যিক জিনিসপত্র আমদানির আর্জি জানিয়েছিল।

পরিস্রবণের মাধ্যমে দস্তা উৎপাদনের কৌশল এ আমলে জানা ছিল। ফলে পিতল তৈরির কাজ সহজতর হয়েছিল।

এর পাশাপাশি কাঁচের তৈরি দ্রব্য উৎপাদন করতেও ভারতীয়রা সক্ষম ছিল। মুঘল কর্মচারীরা চোখে চশমা ধারণ করতেন। তবে খুব ভালো কাঁচের চশমা তৈরির দক্ষতা ভারতীয়দের ছিল না। এর জন্য ইউরোপীয় চশমা আমদানির ওপর তাদের নির্ভর করতে হত। আকবরের আমলে মিনিয়েচার পেন্টিং-এ চশমার দেখা মেলে।

কাঁচের জিনিস উৎপাদনে মুঘল যুগে অগ্রগতি ছিল সীমিত। ফলে কাঁচের পেছনে পারদ মিশ্রণের প্রলেপ লাগানো আয়না বানানো সম্ভব হয়নি। সেজন্য অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ভারতীয়দের পালিশ করা ইস্পাদের আয়না ব্যবহার করতে হত। আকবরের সভাকবি ফৈজী উত্তল লেন্স যুক্ত চশমার উপর তার নির্ভরতার প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। তবে ভারতে অবশ্য তখনো এগুলি তৈরি হত না। ইউরোপ থেকে আসতো। মুঘল অভিজাতরা বিদেশি চশমা উপহার হিসাবে গ্রহণ করতেন। টেলিস্কোপের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। তা ইউরোপ থেকে আমদানি হত। দিল্লিতে জয়সিংহের মানমন্দিরে (১৭১০) যে টেলিস্কোপ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল, তা ইউরোপ থেকেই আনা হয়েছিল। ঐ মানমন্দিরের দূরবিনের সাহায্যে শুক্র গ্রহের চন্দ্রকলা দৃশ্যমান হত।

মুঘল যুগে ঘর ঠাণ্ডা করার পদ্ধতি কারিগররা আয়ত্ত করেছিল। আবুল ফজল লিখেছেন যে, ভারতের বিরুদ্ধে অভিযোগ হল এদেশে ঠাণ্ডা জলের অভাব আর অতিরিক্ত গরম। দ্বিতীয় বিষয়টির মোকাবিলা করার জন্য ঘর ঠাণ্ডা করার ব্যবস্থা হয়। 'টেকচাঁদ বাহার' (১৭৩৯)-এ এই পদ্ধতির বর্ণনা মেলে। খস্ নামের এক বেশ সুগন্ধি শিকড় রয়েছে। সেই শিকড় কাঠের ফ্রেমের মধ্যে বসিয়ে কুটিরে বসানো হত। এই খসের ফ্রেমে জল দিলে মধ্য গ্রীষ্মেও শীতের অনুভূতি মিলত। জল ঠাণ্ডা রাখার জন্য সোরা-র ব্যবহার শুরু হয় আকবরের আমল থেকে।

সপ্তদশ শতকে দেশলাইয়ের কাঠির তৈরির কৌশল ভারতীয় আয়ত্ত করেছিল। 'টেকচাঁদ বাহার'-এ একটি কাঠির অগ্রভাগ গলিত গন্ধকে চুবিয়ে কিভাবে দেশলাইয়ের কাঠি তৈরি হত, তার বর্ণনা আছে। হিন্দুস্থানে একে বলা হত 'দিয়া সালাই'। ইউরোপে অবশ্য ষোড়শ শতকেই ইংল্যাণ্ডে দেশলাইয়ের প্রচলন হয়েছিল।

সাধারণত আলো জ্বালাবার জন্য মশাল ব্যবহার করা হত, যাতে ছেড়া ন্যাকড়া সলতে জড়ানো ধাতুর সঙ্গে কাঠের বাট লাগানো থাকত। এটি বহন করত যারা তাদের মশালচি বলা হত। মাঝে মাঝে তারা লম্বা গলা যুক্ত ধাতব বোতল থেকে তেল সলতেতে ঢেলে দিত। ষোড়শ শতকে মোমবাতি যাকে 'শম' বলা হত, তার ব্যবহার শুরু হয়। আবুল ফজল বিশালাকৃতি মোমবাতি তৈরির জন্য আকবরকে কৃতিত্ব দিয়েছেন। মোমবাতি ছাঁচে বানানো হত ও ধাতব মোমদানির ওপর তা স্থাপন করা হতো। শাহজাহানের পাঠাগারের জন্য প্রস্তুত *বাদশাহনামা*-য় অঙ্কিত চিত্র থেকে জানা যায় যে হাওয়ায় যাতে মোমবাতি নিভে না যায় সে জন্য তা কাচের বোতলের মধ্যে রাখা হত। তবে বার্নিয়ের ১৬৬৩ খ্রিস্টাব্দে বর্ণনা থেকে জানা যায় যে সে সময় দিল্লীর পথঘাট আলোকিত করার জন্য কোনো ব্যবস্থা ছিল না যা সেকালে প্যারিসে ছিল।

মুঘল আমলে নির্মাণকার্য জিপসাম, চুনাপাথর, কলিচুন সদাফি বা শামুক চুন ইত্যাদি ব্যবহৃত হত। সপ্তদশ শতকের প্রথম দিকে (১৬২৬ খ্রিস্টাব্দে) পেলসার্ট লিখেছেন যে, চুনের সাথে দুধ আর চিনি মিশিয়ে বাড়ি বানানো হতো এবং তা দিয়ে দেওয়ালে সাদা প্লাস্টার করা হত। এই প্লাস্টার হল্যাণ্ডের যেকোনো প্লাস্টারের চেয়ে ছিল উন্নত মানে।

স্থাপত্য নির্মাণের ক্ষেত্রে মুঘলরা সুবহ (Portable) বাড়ি তৈরির উদ্ভাবনী ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছিল। কাঠের থাম বা কড়িবর্গা জুড়ে জুড়ে এই বাড়িগুলো তৈরি করা হত। এই থাম বা কড়িবর্গা সংযুক্ত করা হতো এদের মাথায় বিপরীতধর্মী ফিটিং সহ লোহার খাপ দিয়ে, যাতে সহজে তা খুলে ফেলা

যায়। এই বাড়িগুলির দেওয়াল ও ছাদ তৈরি হত বুনট ঘাসের চাদর দিয়ে। আকবর এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাওয়ার সময় এই বাড়িগুলিকে বহন করা হত। সপ্তদশ শতকে এই বাড়িগুলিকে বলা হত 'বাংলা'। এর থেকেই সাহেবদের বাসস্থান বাংলো-র আবির্ভাব ঘটেছে।

এছাড়া বড় বড় ইমারত নির্মাণের ও সেতু তৈরিতে মুঘল যুগের কারিগরদের ইঞ্জিনিয়ারিং দক্ষতার পরিচয় মেলে। সেতু-স্তম্ভ ও সেতুর খিলান নির্মাণে এযুগের শিল্পীরা দক্ষতার পরিচয় দিলেও তার মধ্যে কিছু সীমাবদ্ধতাও রয়ে গিয়েছিল।

ভারতের লৌহ-আকরিকের প্রাচুর্য লৌহ শিল্পের বিকাশের পথকে প্রশস্ত করে। খনিজ সম্পদ হিসেবে মধ্যযুগে লবণের পরেই ছিল লৌহ-আকরিকের এর স্থান। এদেশে দামাস্কাস স্টিল দিয়ে তরবারি তৈরি হত। তবে মুঘল আমলে ঢালাই লোহার তৈরি কোন বড় মাপের জিনিসের তেমন কোন উল্লেখযোগ্য নিদর্শন পাওয়া যায় না। তবে অনুমেয় যে, ইউরোপের লোহার আগ্নেয়াস্ত্র এবং নোঙ্গর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে এদেশে কারিগররা ঢালাই লোহা তৈরির চেষ্টা করেছিল। আলেকজান্ডার হ্যামিল্টন ১৭৬০ সালে উড়িষ্যা ভ্রমণের সময় লক্ষ্য করেছিলেন যে সেখানে লৌহ-আকরিকের প্রাচুর্য রয়েছে। সেখানকার অধিবাসীরা লোহার নঙ্গর প্রস্তুত করে ঢালাই করে। তবে তা ইউরোপীয় মানের সমপর্যায়ভুক্ত নয়। ভালো লোহা কাটার যন্ত্রের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত উৎকর্ষ সাধিত না হওয়ায় ভারতীয় লৌহ নির্মিত বস্তু ইউরোপের তুলনায় পিছিয়ে পড়েছিল। তুরপুন বা ড্রিল (Drill) ঘোরানো হত ধনুকের ছিলাকে এক অক্ষের বিপরীত মুখে চালিয়ে। এরকম তুরপুন ছুতোর ও মনিকার—দুজনেই ব্যবহার করত। শান দেবার যন্ত্র ছিল শক্ত পাথরের চাকা যাতে ঘষে ঘষে লোহার ছুরির ধার দেওয়া বা সাফ বা পালিশ করা হত। এসব যন্ত্রগুলি সবই ছিল সাবেকি। প্রযুক্তিগত কোনো উন্নতি এই যন্ত্রে লক্ষ্য করা যায়নি। এক্ষেত্রে সপ্তদশ শতাব্দীতে একমাত্র যে যন্ত্রে উন্নতি লক্ষ্য করা যায় তা হল মনিকারের তুর্পুন চালানোর জন্য Belt drive এর ব্যবহার। একটি বড় কাঠের চক্র চারজন লোক মিলে ঘোরাত এবং তার সাথে বেল্ট দিয়ে যুক্ত অপেক্ষাকৃত ছোট চক্রটিতে থাকত তুরপুন।

ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইউরোপে স্ক্রু তৈরি শুরু হয়েছিল। ভারতের সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে স্ক্রু-র মত যন্ত্রাংশের ববহার শুরু হয় যদিও তা ইউরোপের মত অত উন্নত ছিল না। পেরেকের গায়ে তার জড়িয়ে তা ঝালাই করে স্ক্রু তৈরি করা হতো ফ্রায়ার ১৬৭৪ খ্রিস্টাব্দে সুরাটে ধনুকাকৃতি উন্নত মানের এক যন্ত্রের সাহায্যে হীরক ছেদন করতে দেখেছিলেন।

মুঘল যুগে খনি থেকে বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদ উত্তোলন করা হতো। তবে খাদান খনন প্রক্রিয়া ছিল প্রাচীন। খনি থেকে লবণ, হীরা ও আরও অন্যান্য ধাতুর আকরিক উত্তোলন করা হত। সুজন রাই ভাণ্ডারির বর্ণনা থেকে জানা যায় যে ১৬৯৫ খ্রিস্টাব্দের Salt Range-এর লবণ খনিগুলোর গভীরতা ছিল ২০০ বা ৩০০ গজ। এই গভীরতা ছিল অনুভূমিক। আবার গোলকুণ্ডার হীরার খনির গভীরতা ছিল অপেক্ষাকৃত কম। যেমন কোল্লুর-এর খনিগুলিরর গভীরতা ছিল ১২ থেকে ১৪ বিঘত বা আধ হাত। আবার গল্লাপল্লেতে ৩.৫ মিটার। মুঘল আমলে অবশ্য জলস্তর ভেদ করে খনি খনন করার প্রযুক্তি জানা ছিল না। খনি থেকে জল ছেচে বার করার কোনো যন্ত্র ছিল না। এমনকি কপিকল ব্যবহৃত হত না। খনি গহ্বর থেকে মাটি ও জল বালতিতে করে তুলে হাতে হাতে উপরে পাঠানো হত। হীরার

খনিগুলিতে যেখানে জলস্তর নীচের ছিল সেখানে খাদান খনন করা হত অনেকটা কূপ খননের ধাঁচে।

কামানের ব্যবহার বাবরের ভারত আগমনের পূর্বেই এদেশে চালু ছিল। ইক্‌তিদার আলম খানের মতে পঞ্চদশ শতকের শেষার্ধে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে কামানের ব্যবহার ছিল। তবে পাণিপথের যুদ্ধে কামান ও হাত বন্দুকের ব্যবহারে বাবর যে সাফল্য লাভ করেছিলেন, তা ভারতে কামানের জনপ্রিয়তা বাড়িয়ে দেয়।

আকবরের পূর্ববর্তী মুঘল শাসকদের আমলে কী ধরনের আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহৃত হতো তা নিয়ে বহুবিধ মত রয়েছে। আলম খান রচিত সচিত্র 'হামজানামা' বন্দুকবাজদের যেসব ছবি আছে তার বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে আকবরের রাজত্বে হাত কামানের সঙ্গে সমকালীন অটোমানদের ব্যবহৃত কামানের প্রচুর সাদৃশ্য ছিল। এগুলি অবশ্য ছিল গাদা-বন্দুক (Matchlock) জাতীয়। ভারতে পর্তুগিজরা যে ধরনের বন্দুক ব্যবহার করত তাদের অনুপাতে মুঘলদের বন্দুক ছিল নিকৃষ্টমানের। গোলা বারুদের ব্যবহারের ক্ষেত্রে ইউরোপ অনেক বেশি এগিয়ে ছিল যদিও ভারত এ ক্ষেত্রে ইউরোপীয় বন্দুকের অনুসরণ করতো।

আবুল ফজলের বর্ণনা থেকে মনে হয় আকবরই প্রথম যথাযথভাবে হাত-কামানের প্রচলন করেন। তার সময় ব্যবহৃত বন্দুকগুলি কোনোমতেই গাদা বন্দুক ছিল না। আইন-ই-আকবরি উন্নত হাত কামান তৈরির জন্য আকবরের অদম্য উৎসাহের কথা বর্ণিত আছে। সম্রাট কামানগুলি পরীক্ষা করে দেখতেন। আকবরের আমলে তৈরি কামানগুলি ছোট ছোট অংশে বিভক্ত ছিল এবং খণ্ডিত অবস্থায় তাদের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে যাওয়া যেত এবং প্রয়োজন মত বিভিন্ন অংশগুলিকে জুড়ে দেওয়া যেত। কামানগুলি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে গোলা নিক্ষেপ করতে পারতো। সম্ভবত জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে চকমকি পাথর যুক্ত (flint lock : পুরোনো ধাঁচের বন্দুক যাতে স্ফুলিঙ্গ সৃষ্টির জন্য চকমকির টুকরো ব্যবহৃত হত) বন্দুকে সংযোজিত হয়েছিল। ভারতীয়রা flint lock তৈরির কায়দা আয়ত্ত করেছিল। 'সিয়াখনামা' হল হিসাবশাস্ত্র সম্পর্কিত এক পুস্তক, রচিত হয় ১৬৯৪-৯৬ খ্রিস্টাব্দে। সেখানে ভারতীয় গানাবন্দুকে চকমকি পাথর ব্যবহারের উল্লেখ রয়েছে। মুঘল আমলে ম্যাচ-লক, ফ্লিন্ট-লক, হুউল-লক বুন্দুকের ব্যবহার তৈরির কৌশল মুঘলরা আয়ত্ত করেছিল। কামান বন্দুক ইত্যাদি চালানোর জন্য ভারতের প্রয়োজন ছিল বারুদের। ভারতে উৎপন্ন বারুদের কার্যকারিতা তেমন বিশেষ ছিল না। ওলন্দাজরা বিদেশ থেকে সরাসরি বারুদ এদেশে আমদানি করত। ভারতে সোরার অভাব ছিল না এবং বিহারে যেসব পাওয়া যেত তার মান ছিল খুব উন্নত। কিন্তু তাকে এদেশে বারুদে রূপান্তরিত করার কৃৎকৌশল সেভাবে আবিষ্কৃত হয়নি। তাই প্রতিবছর ওলন্দাজরা পুলিকট বন্দর থেকে নিজেদের দেশে সোরা চালান দিত।

২০.৪ উপসংহার

প্রসঙ্গত মনে রাখা দরকার, মুঘল যুগে 'যজমানি পদ্ধতি' শিল্প উৎপাদন প্রক্রিয়ার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। ভারতের কৃষিজীবী মানুষ স্বীয় প্রয়োজনে প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদনের জন্য গ্রামীণ কারিগরদের উপর নির্ভর করত বা অনেক ক্ষেত্রে দক্ষ ভৃত্যদের শিল্প উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত করত। কৃষকেরা বিনিময়ে কারিগরদের নিষ্কর জমি বা নগদ অর্থ প্রদান করত। এইভাবে গ্রামীণ স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জিত হয়েছিল। এই ব্যবস্থাকে 'যজমানি পদ্ধতি' বলা হত। আচার্য যদুনাথ সরকারের মতে ব্রিটিশ আমলের

আগে ভারতের সর্বত্র যজমানি প্রথা ছিল। তবে মহারাষ্ট্র এবং বাংলায় এই প্রথার প্রচলন ছিল সবচেয়ে বেশি। ধীরে ধীরে বাজারের সম্প্রসারণ ও চাহিদা বৃদ্ধির ফলে কারিগরদের ওপর ক্রমশ চাপ বৃদ্ধি পায়। এই অবস্থায় অগ্রিম প্রদান করে কারিগরদের একাংশকে গ্রামীণ কৃষি অর্থনীতি থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়। অগ্রিম প্রদানের এই পদ্ধতি 'দাদনি' নামে পরিচিত। এই ব্যবস্থার কারিগররা মধ্যবর্তী দালাল বা বিক্রেতাদের কাছ থেকে নগদ অর্থ ঋণ করে বা কাঁচামাল নিয়ে উৎপাদন কার্যে লিপ্ত হত। এই দাদনি প্রথার আবির্ভাবে অষ্টাদশ শতকের সূচনা থেকে যজমানি প্রথার অবসান ঘটে।

মুঘল যুগের সামগ্রিক শিল্প উৎপাদন ব্যবস্থার দিকে নজর করলে কতগুলো নেতিবাচক দিক ফুটে ওঠে। ভারতীয় কারিগররা খুব সাধারণ মানের প্রযুক্তি প্রয়োগ করে পণ্য উৎপাদন করত। ধাতুর তৈরি যন্ত্রপাতির চাইতে কাষ্ঠনির্মিত যন্ত্রের প্রাধান্য ছিল। তা দিয়েই তাঁরা শিল্প সামগ্রী উৎপন্ন করত। বার্নিয়ের দিল্লির কারিগরদের এই অবস্থাকে 'যন্ত্রপাতির অভাবগ্রস্থ' দশা বলে বর্ণনা করেছেন। জ্বালানি হিসেবে কয়লার ব্যবহার ছিল খুবই কম। এই দুর্বলতা উন্নত প্রযুক্তির উদ্ভাবনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। প্রযুক্তির প্রতি মানুষের অনীহা ছিল প্রকট। শ্রমিক বিকল্প হিসেবে প্রযুক্তির ব্যবহার তারা কল্পনাও করতে পারত না। যন্ত্রের চেয়ে ব্যক্তিগত দক্ষতা বা মানবিক নৈপুণ্যের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হত। তবে ভুললে চলবে না এই ব্যক্তিগত দক্ষতার উপর নির্ভর করে অতিসাধারণ যন্ত্রপাতির সাহায্যে ভারতীয় কারিগররা উৎকৃষ্টমানের বস্ত্র উৎপাদনে সক্ষম ছিল যা জগৎজোড়া খ্যাতি অর্জনের সক্ষম হয়েছিল। ভারতীয় হাত-বন্দুক ও পাখি মারা বন্দুকের উন্নত মানের প্রশংসা করেছেন বার্নিয়ের। সপ্তদশ শতকে ভারতে তৈরি কামান ও গোলার মান ও কর্মক্ষমতা সম্পর্কে কারও অসন্তোষ ছিল না। জাহাজের পাটাতন তৈরির ভারতীয় পদ্ধতি ইউরোপীয় পদ্ধতি থেকে ছিল উচ্চমানের। জলশক্তি বা বায়ুশক্তি ব্যবহারের প্রযুক্তিগত কৌশল ভারতীয়দের অজানা ছিল। তবে এও ঠিক যে দাক্ষিণাত্যে ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে হাজারা জেলায় জল চালিত কল দ্বারা ধান-ভানা বা তুলো পেঁজার কাজ প্রচলিত ছিল। বন্দুকের সঙ্গীন-এ বার্নিশের কাজ বা পাথরের সোনা ঝাল দেওয়ার মতো এমন কিছু প্রযুক্তি ভারতীয়দের জানা ছিল যা ইউরোপীয়দের জ্ঞানের বাইরে ছিল। যন্ত্রপাতির অভাব থাকা সত্বেও ভারতীয় কারিগররা ও শিল্পীরা যে উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিয়েছেন, বার্নিয়ার, ফ্রায়ার, ওভিংটনের মত বিদেশি পর্যটকগণও প্রশংসা করেছেন। এমনকি তাঁদের মনে হয়েছিল যে ভারতীয় কারিগররা ইউরোপীয়দের উৎকর্ষতাকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল।

ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার লিখেছেন যে, মুঘল যুগে রাষ্ট্র বা অভিজাত বর্গ কেউই বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের অজানা রাস্তায় হাঁটেনি। অন্যদিকে দরিদ্র কারিগরদের পক্ষেও ঝুঁকিপূর্ণ ব্যয়বহুল নতুন প্রযুক্তি গ্রহণের সাহস দেখাবার ক্ষমতা ছিল না। কারিগররা স্বাধীন হলেও তাদের অবস্থা দাসেদের চাইতে উন্নত ছিল না। এর সাথে যুক্ত হয়েছিল প্রশাসনিক উৎপীড়ন। ডাচ পর্যটক পেলসার্টের বর্ণনা থেকে জানা যায়, কারিগরদের মজুরি ছিল খুব কম। প্রশাসন শ্রমিক নিপীড়ন সম্পর্কে উদাসীন ছিল। অনেকক্ষেত্রে তারাই নিপীড়কের ভূমিকা নিত।

মুঘল যুগে প্রযুক্তির অনগ্রসরতার কারণ হিসেবে মার্কসবাদী ঐতিহাসিকরা বর্ণ-ব্যবস্থার কুফলকে

দায়ী করেছেন। হিন্দু-মুসলমান উভয়ের বংশানুক্রমিক বৃত্তি শ্রমের গতিশীলতাকে নষ্ট করে দিয়েছিল। পেলসার্ট বলেছেন, অসবর্ণ বিবাহ দ্বারা বৃত্তির পরিবর্তন করা অসম্ভব ছিল। এর ফলে বিশেষ গোষ্ঠীর মধ্যে বিশেষ দক্ষতা আবদ্ধ হয়ে পড়ে। তবে প্রযুক্তির অগ্রগতির পথে বর্ণ ব্যবস্থার এই অস্তিত্ব কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেনি বলেই ঐতিহাসিক ইরফান হাবিব মনে করেন। তার মতে, পেশার দুয়ার সকলের জন্য উন্মুক্ত ছিল। কোনো নির্দিষ্ট বর্ণ চিরকালের জন্য একটিমাত্র পেশার গণ্ডির মধ্যে নিজেদের আবদ্ধ রাখেনি। সমস্ত জাতির জন্য পেশার সুযোগের ব্যবস্থা করতে প্রশাসন অনেক সময় উদ্যোগ নিত। ঔরঙ্গজেব এই মর্মে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, আমেদাবাদে (গুজরাটে) সবাইকে কাপড় বোনার কাজ শিক্ষার সুযোগ দিতে হবে।

২০.৫ প্রশ্নাবলী

১. সপ্তদশ শতকে ভারতে প্রযুক্তির বিকাশ কীভাবে শিল্পের অগ্রগতির পক্ষে সহায়ক হয়েছিল?
২. মুঘল আমলে ভারতের বিভিন্ন শিল্প সম্পর্কে এক সংক্ষিপ্ত নিবন্ধ লিখুন।
৩. মুঘল যুগে বস্ত্র শিল্পের বিকাশ সম্পর্কে একটি টীকা লিখুন।

২০.৬ গ্রন্থপঞ্জি

- Raychoudhuri, Tapan, Habib, Irfan (1982). *The Cambridge Economic History of India. Vol. 1, c, 1200-c. 1750*. Cambridge University Press.
- হাবিব, ইরফান (2011), *মধ্য যুগের ভারতীয় প্রযুক্তি, ৬৫০-১৭৫০ খ্রিস্টাব্দ,* ন্যাশানাল বুক এজেন্সি।
- ভদ্র, গৌতম (1991), *মুঘল যুগে কৃষি-অর্থনীতি ও কৃষক বিদ্রোহ,* সুবর্ণরেখা

—

একক ঃ ২১ ❑ মুদ্রা ব্যবস্থা

গঠন

২১.০ উদ্দেশ্য

২১.১ ভূমিকা

২১.২ মুদ্রার ধরণ

২১.৩ মুদ্রার গড়ন

২১.৪ উপসংহার

২১.৫ অনুশালনী

২১.৬ গ্রন্থপঞ্জি

২১.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠের মাধ্যমে মুঘল অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অঙ্গ হিসাবে মুদ্রা ব্যবস্থা সম্পর্কে ধারণা শিক্ষার্থীরা করতে পারবে। নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর এই এককে গুরুত্ব সহকারে আলোচনা হবে :

- সুলতানী আমলের মুদ্রা ব্যবস্থা থেকে সরে এসে মুঘলরা এদেশে কীরূপ মুদ্রা ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল.
- মুঘল মুদ্রার ধাঁচ ও গড়ন কেমন ছিল।

২১.১ ভূমিকা

ভারতে যুগ যুগ ধরে বিভিন্ন রাজ্য বা সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছে। অসংখ্য রাজ বংশ সেসব রাজ্য বা সাম্রাজ্যে রাজত্ব করেছে। প্রশাসনের অঙ্গ হিসাবে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে সুষ্ঠ ভাবে পরিচলিত করতে সে সব রাজ্য বা সাম্রাজ্যের শাসকেরা সুনির্দিষ্ট মুদ্রানীতি অনুসরণ করেছে। ফলে সারা ভারত ব্যাপী অসংখ্য মুদ্রার উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। ষোড়শ শতকে বিদেশাগত মুঘলরা এদেশে এসে ভারতবর্ষকে কেবল নিজেদের বাসভূমি করে নেয়নি, দক্ষ প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলতেও উদ্যোগী হয় এবং দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় ভিত্তির অপর প্রতিষ্ঠিত করতে মনোযোগী হয়। তাদের হাতে মধ্যযুগের ভারতে সুনির্দিষ্ট মুদ্রা অর্থনীতি বাস্তব রূপ পায়।

২১.২ মুদ্রার ধরণ

সমকালীন বিশ্বে মুঘল সাম্রাজ্যের মুদ্রা সমূহ ছিল বিশেষভাবে সমাদ্রিত। তবে মনে রাখতে হবে মধ্যযুগের ভারতে মুদ্রা ব্যবস্থা প্রবর্তনে শের শাহ এক উজ্জ্বল নাম। রৌপ্য মুদ্রা রূপেয়ার সাথে সাথে

তিনি স্বর্ণ মুদ্রা ও তাম্র মুদ্রাও প্রবর্তন করেন। আকবরের আমলে শেরশাহ প্রবর্তিত এই ব্যবস্থা দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়।

চতুর্দশ শতকে তৈমুর লং ভারত আক্রমণ করেন। তার পাঁচ পুরুষ পর মোঙ্গলরা মুঘল নাম নিয়ে আবার ভারতে আবির্ভূত হয়। এবারে তারা তার লুণ্ঠন করে ফিরে যায়নি। এদেশের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে স্থায়ী বসতি গড়ে তুলেছিল। আর জাহিরুদ্দিন মহম্মদ বাবর হলেন সেই ব্যবস্থার কাণ্ডারি। ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে পানিপথের যুদ্ধে দিল্লির সুলতান ইব্রাহিম লোদীকে পরাজিত ও নিহত করে মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন তিনি। তবে বেশিদিন তিনি এই সাম্রাজ্য ভোগ করতে পারেননি। শুধু তিনিই নন, তাঁর পুত্র হুমায়ুনও তাই। ১৫৩০ খ্রিস্টাব্দে বাবরের অকস্মাৎ মৃত্যু হয়। আর হুমায়ুন শেরশাহের কাছে পরাজিত হবার পর ১৫৪২ খ্রিস্টাব্দে এদেশ থেকে বিতাড়িত হন। প্রায় তেরো বছর মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন স্থান ও পারস্যে দিন যাপন করার পর তিনি পুনরায় ১৫৫৫ খ্রিস্টাব্দে দিল্লি পুনরুদ্ধার করেন। মুঘল সাম্রাজ্য সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করেন হুমায়ুনের পুত্র জালালউদ্দিন মহম্মদ আকবর। তাঁর হাতেই মুঘল রাষ্ট্রীয় প্রশাসন সুনির্দিষ্ট রূপ লাভ করে। উত্তর ও মধ্য ভারত এবং দাক্ষিণাত্য অঞ্চলে তিনি মুঘলদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। তিনিই প্রথম এক সুনির্দিষ্ট মুঘল মুদ্রা-নীতি প্রবর্তন করেন।

বাবর হুমায়ুন বা আকবর তাঁদের রাজত্বের প্রথম তিন বছর রৌপ্য নির্মিত শাহরুখী মুদ্রা প্রচলন করেন। পঞ্চদশ শতকের সূচনা থেকে তৈমুর বংশীয় শাসক শাহরুখ যে মুদ্রা প্রচলন করেন তা শাহরুখী মুদ্রা নামে পরিচিত ছিল। ৭২ গ্রেণ ওজনের এই রৌপ্য মুদ্রা সমগ্র মধ্য-এশিয়া পারস্য ও অক্ষু নদীর অপর পাড়ে অবস্থিত শাহবানিদ সাম্রাজ্যে বহুল প্রচলিত ছিল। মুদ্রার সোজা দিকে বিভিন্ন আকারের ঘেরা জায়গার মধ্যে কালিমা এবং বাইরে মুদ্রার প্রান্তভাগে বা মার্জিনে চারজন খলিফার নাম উৎকীর্ণ করা থাকত। মুদ্রার উল্টো পিঠে প্রবর্তক শাসকের নাম, তার উপাধি, সাল, টাকশালের নাম উত্তীর্ণ করা থাকত। বাবরের আমলের এই শাহরুখী মুদ্রায় 'অল্ সুতান অল্ আজম ওয়া অল খাকান অল মকররম জাহিরুদ্দিন মহম্মদ বাবর বাদশাহ গাজী' উৎকীর্ণ করা হত।

হুমায়ুনের মুদ্রাতে 'অল সুলতান অল আজম ওয়া অল খাকান মকররম মহম্মদ হুমায়ুন বাদশাহ গাজী' উৎকীর্ণ করা থাকতো। আকবরও হুমায়ুনের মত তার মুদ্রাতে 'জালাউদ্দিন মহম্মদ আকবর বাদশাহ' এই নাম উৎকীর্ণ করেছিলেন।

আগ্রা, জৌনপুর, কাবুল, লাহোর, বাদখশান, সমরখন্দ ও কাবুল থেকে শাহরুখী মুদ্রা প্রবর্তন করেছিলেন বাবর। সমরখন্দ, বদখশান, কাবুল থেকে যেসব মুদ্রাগুলি তার আমলে প্রচলিত হয়েছিল সেগুলিতে বাবর নিজ পরিচায়ক চিহ্নের ছাপ দিয়ে বাজারে ছেড়েছিলেন। এক্ষেত্রে বাবর তিন ধরনের ছাপ মেরেছিলঃ (ক) ছোট চৌখুপি ডিজাইনের মধ্যে 'আদল বাবর' লিপিবদ্ধ করা। (খ) এক চৌখুপি যা চারটি পাপড়ি দিয়ে ঘেরা ছিল, তার মধ্যে 'আদলবাবর গাজী' উৎকীর্ণ করা। এছাড়া (গ) কোনো মুদ্রায় 'জাহিরুদ্দিনমহম্মদ বাবর' লেখা।

হুমায়ুনের আমলে আগ্রা, কাবুল, লাহোর, কান্দাহার থেকে শাহরুখী মুদ্রা প্রচলিত হয়েছিল। আকবর কেবল লাহোর থেকেই শাহরুখী মুদ্রা চালু করেন। প্রচলিত শাহরুখী মুদ্রার ওপর 'আদল আকবর' ছাপ দিয়ে ও তারিখ উৎকীর্ণ করে সেগুলি পুনঃপ্রবর্তন করেন। এই ছাপ দেওয়া মুদ্রায় ৯৮৩ এবং ৯৮৪ হিজিরা অব্দ উৎকীর্ণ করা হয়। কিছু শাহবাদিন মুদ্রাতেও 'আদল কাবুল' ও ৯৬৩, ৯৬৪, ৯৬৮, ৯৮২

হিজিরা অব্দের ছাপ মেরে পুনঃপ্রবর্তন করা হয়েছে। সম্ভবত আকবর ওই মুদ্রাগুলিকে ছাপ মেরে পুনঃ প্রবর্তন করেছিলেন।

হুমায়ুনের আমলে আগ্রা থেকে কিছু শাহরুখী ধরণের স্বর্ণমুদ্রা প্রবর্তিত হয়। এছাড়া পারসিক স্বর্ণমুদ্রার অনুকরণে তিনি কিছু ছোট আকারের সোনার মুদ্রাও প্রবর্তন করেছিলেন। বাবার ও হুমায়ুনের আমলে কিছু তাম্র মুদ্রার প্রচলন হয়েছিল, যেগুলিতে সম্রাটের কোনো নাম খোদাই করা হয়নি। যেসব স্থান থেকে শাহরুখী মুদ্রা প্রচলন করা হয়েছিল, সেই সব জায়গা থেকে এই তাম্র মুদ্রাগুলোও প্রবর্তিত হয়। এগুলির একদিকে টাকশালের নাম ও অন্যদিকে তারিখ উৎকীর্ণ করা হয়েছিল। হুমায়ুন তার স্বল্পকালীন শাসনকালে পাঠান শাসকদের আমলে বা শূরী রাজত্বকালে যে রৌপ্য মুদ্রা প্রচলিত হয়েছিল তার মান অনুযায়ী রুপার মুদ্রার নতুন মানদণ্ড স্থির করেন। পরবর্তী মুঘল শাসকদের আমলে এই নতুন মুদ্রামান অনুযায়ী মুদ্রা প্রস্তুত করা হত।

সম্রাট আকবর সোনা, রুপা ও তামা-এই তিন ধরনের ধাতুর তৈরি মুদ্রা প্রচলন করেছিলেন। এগুলি শূরী মুদ্রার অনুকরণে তৈরি হয়েছিল। ওজন ও গঠনগত দিক থেকে এগুলির সাথে শূরী মুদ্রার বিশেষ সাযুজ্য ছিল। আকবরের স্বর্ণমুদ্রাকে বলা হত মোহর, রৌপ্য মুদ্রাকে রুপিয়া আর তাম্র মুদ্রাকে দাম। স্বর্ণ মুদ্রার ওজন ছিল ১১ মাষা বা ১৬৮-১৭০ গ্রেণ। রুপিয়ার ওজন ছিল ১১ ১/২ মাষা বা ১৭৮ গ্রেণ। রূপেয়ার খাদ মেশানো হত অনধিক ৪ শতাংশ। আর তামার মুদ্রার ওজন ছিল ১ তোল ৮ মাষা ৮ সুরখ (Surk) বা ৩২৩ গ্রেন। ১৬৬৩-৬৪ খ্রিস্টাব্দে তামার অভাব দেখা দিল এক নতুন ধরনের হাল্কা তাম্র মুদ্রা চালু হয় যার ওজন ছিল দামের ওজনের দুই-তৃতীয়াংশ। ৪০ দামে এক রুপিয়া হত। আর ৯ রুপিয়ায় ১ মোহর। আবুল ফজল জানিয়েছেন যে, আকবর ১০ ও ১২ রুপিয়া মূল্যের আরও দু ধরনের স্বর্ণ মুদ্রা প্রচলন করেছিলেন, যাদের ওজন ছিল ১৮৬-১৮৮ গ্রেণ ও ২১৫ গ্রেন। কিন্তু ১২ রুপিয়া মূল্যে আকবরি স্বর্ণমুদ্রার কোনো হদিস মেলেনি। ৯৮৫ হিজিরা সন পর্যন্ত আকবরের আমলে ৯ রুপিয়া মূল্যের মোহর প্রচলিত ছিল। তারপর থেকে ১০ রুপিয়া মূল্যের মোহর চালু করা হয় এরপর থেকে আকবরের রাজত্বের ৪২ তম বছর পর্যন্ত অর্থাৎ ১০০৫ হিজিরা সন পর্যন্ত এই দুই ধরনের মোহরই প্রচলিত ছিল। তবে এই সময়ে অধিক ওজনের মোহরের চল ছিল বেশি, কম ওজনের মোহর খুব কম প্রচলিত ছিল। তবে তারপর থেকে কম ওজনের মোহরই বেশি ব্যবহৃত হতো।

আকবরের বা তার পূর্ববর্তী মুঘল সম্রাটের আমলে প্রবর্তিত মুদ্রাগুলি সাম্রাজ্যের যে-কোনো প্রদেশে ব্যবহারের জন্য প্রচলিত ছিল। তবে এ ছাড়াও কিছু স্থানীয় মুদ্রার প্রচলন ছিল। হুমায়ুনের প্রচলিত মুদ্রার মত পারসিক মুদ্রার অনুকরণে আকবর কিছু মুদ্রা প্রবর্তন করেছিলেন বাদাখশান বা কাবুল থেকে। কাশ্মীর, গুজরাট বা মালব থেকেও কিছু স্থানীয় রৌপ্য মুদ্রা প্রচলিত হয়েছিল তাঁর আমলে।

২১.৩ মুদ্রার গড়ন

আকবরের আমলের মুদ্রাগুলির আকৃতি প্রথমদিকে গোলাকার ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে চতুষ্কোণ বিশিষ্ট স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা প্রবর্তন করা হয়। তাঁর রাজত্বের ৩০ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে (হিজরা অব্দ ৯৩৩-৯৯৮) বৃত্তাকার ও চতুষ্কোণ বিশিষ্ট মুদ্রা প্রবর্তিত হয়। তবে সম্ভবত রাজত্বের ৩৫তম বছর থেকে চতুষ্কোণ বিশিষ্ট মুদ্রার প্রচলন বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তীকালে প্রচলিত সব মুদ্রাই ছিল গোলাকার।

কয়েকটি বিশেষ ঘটনাকে স্মরণীয় করে রাখতে আকবর ষড়-কোণ বিশিষ্ট কিছু মুদ্রা প্রচলন করে ছিলেন। এগুলি 'মিহরাবি' মুদ্রা নামে পরিতি। সোনার তৈরি এই মুদ্রাগুলি উপর ও নিচের দিকে চাপা, পাশাপাশি লম্বা এবং ডান ও বাঁদিকের কোণ অনেকটা গোলাকৃতি। এই রূপ মুদ্রা খুব অল্প সংখ্যকই পাওয়া গেছে।

আকবরের মুদ্রাগুলিতে উৎকীর্ণ লিপিগুলিরও কিছু বিশেষত্ব ছিল। তার রাজত্বের প্রথম ২৯ বছরের মধ্যে (১৫৮৫-র মধ্যে) যেসব মুদ্রাগুলি প্রবর্তিত হয় তাতে কালিমা উত্তীর্ণ করা থাকত। বাবর হুমায়ুনের প্রবর্তিত শাহরুখী মুদ্রার মত আকবরের মুদ্রার সোজা দিকেও চারজন খলিফার নাম উৎকীর্ণ করা হত। আন্যদিকে আকবরের গৃহীত উপাধি অল মুলতান অল আজম খাকান অল মোকাররম এবং সম্রাটের নাম জালালউদ্দিন মোহম্মদ আকবর বাদশাহ গাজী উৎকীর্ণ করা হত। এছাড়া মুদ্রায় শুভ কামনা 'খালদ আল্লাহ তাহাহ মূলক ওয়া সালতানাত' ছাপাখানার নাম বা হিজিরা বর্ষ উৎকীর্ণ করা থাকত।

আকবরের মধ্যে ধর্মীয় ভাব পরিবর্তন লক্ষ করা গেলে মুদ্রায় তার প্রভাব পড়ে। এসময় মুদ্রায় টাকশালের নাম উৎকীর্ণ করার প্রথা আকবর রদ করেন এবং তার পরিবর্তে উর্দু 'ফারর ক্যোয়ারিন' কথাগুলি উৎকীর্ণ করা শুরু করেন। যার মানে বিজয়ী শিবির। সম্ভবত ১৫৮৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই প্রথা প্রচলিত ছিল। পরবর্তীকালে মুদ্রা থেকে আকবর কালিমা উত্তীর্ণ করা বন্ধ করে দেন। পরিবর্তে ইলাহি ধর্মমত অনুসারে 'আল্লাহ আকবর জাল্লা জালআলা' উৎকীর্ণ করেন। সম্রাটের নাম ও উপাধি উল্লেখ করার রীতিও বন্ধ হয়।

১৫৮৫ খ্রিস্টাব্দের পর প্রচলিত ইলাহি মুদ্রাকে চার ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথমদিকের মুদ্রায় কেবলই ইলাহি ধর্মমত অনুসারে 'আল্লাহ আকবর' একদিকে, অন্যদিকে 'জাল্লা জালাল'বা 'জাল্লা জালআলা' লিপিবদ্ধ করা হয়। তার রাজত্বের ৩০ তম বছরে এই মুদ্রাগুলো প্রবর্তন করা হয়। দ্বিতীয় প্রকারের ইলাহি মুদ্রায় একদিকে 'জাল্লা জালাল' ইলাহি শব্দ ও মুদ্রা তৈরির সাল উৎকীর্ণ করা থাকত। রাজত্বের ৩৫তম বছর পর্যন্ত এই মুদ্রা প্রচলন করা হয়েছিল। তৃতীয় ধরণের মুদ্রার প্রচলন শুরু হয় তাঁর রাজত্বের ৩৫ তম বছর থেকে। মুদ্রার একদিকে ইলাহি মত আর অন্যদিকে দু'লাইনে তারিখ উৎকীর্ণ করা শুরু হয়। এই সময় থেকে কোন মাসে মুদ্রাটি প্রচলন করা হচ্ছে, তা উৎকীর্ণ করা থাকত। মুঘল মুদ্রা ইতিহাসে এ নতুন সংযোজন। তবে আকবর মুদ্রায় টাকশালের নাম উল্লেখ করার রীতি ফিরিয়ে এনেছিলেন। আকবরের রাজত্বের শেষকাল পর্যন্ত এই পদ্ধতি অক্ষুন্ন ছিল। তবে মুদ্রায় আকবর আরও কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে ছিলেন। তার প্রচলিত কিছু স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রায় দশমিক সম্পর্কিত চিহ্ন প্রচলন করেন। যেমন রাজত্বের চল্লিশতম বছরে মুদ্রায় দু'লাইনের কবিতা খোদাই করা মুদ্রার প্রচলন করেন। যদিও কিছু দিনের মধ্যেই তা আবার বন্ধ হয়ে যায়। তবে তাঁর শাসনকালের ৪৯তম বছর থেকে আমৃত্যু এই কবিতা উৎকীর্ণ করা মুদ্রা প্রতিমাসেই প্রচলিত হত। এছাড়া কিছু মুদ্রায় ছবি উৎকীর্ণ করেছিলেন আকবর। খান্দেশ ও আসিরগড় দুর্গ জয় করার পর তিনি যে স্বর্ণ মুদ্রা প্রচলন করেন তার একদিকে বাজপাখি ও অন্যদিকে টাকশালের নাম ও তারিখ খোদাই করা ছিল। এছাড়া এই সূত্রে কিছু রৌপ্য মুদ্রাও প্রবর্তন করেন এবং অন্য কিছু মুদ্রায় বাজপাখি সহ অশ্বারূঢ় আকবরের প্রতিকৃতি অঙ্কিত

হয়েছিল। তাঁর রাজত্বের পঞ্চাশ বছর উপলক্ষে কিছু সোনা ও রুপার মুদ্রা প্রবর্তিত হয়। এগুলিতে নাগরী হরফে রামসিয়া লিপি সহ সীতা ও রামের ছবি উৎকীর্ণ করা ছাড়াও হংস চিত্রিত করা হয়।

১৬০৫ খ্রিস্টাব্দে আকবর মারা যাবার পরই যে জাহাঙ্গিরের রাজ্যভিষেক হয়েছিল তা নয়। তাঁর রাজ্যভিষেক কয়েক মাস পরে ১৬০৫ খ্রিস্টাব্দে হয়। তিনি এই সময়ে আদেশ জারি করেছিলেন যে, দিল্লিতে রাজপদে অভিষিক্ত না হওয়া পর্যন্ত তার নামে যেন কোন মুদ্রা প্রচলন করা না হয়। তবে সম্ভবত সমস্ত টাঁকশাল তার এই নির্দেশ মানেনি। এই অন্তর্বর্তী সময় আগ্রার টাঁকশাল থেকে দুটি বাক্যের কবিতা উৎকীর্ণ করা এক স্বর্ণ মুদ্রা প্রচলন করা হয়, যাতে '৫১তম রাজত্ব বৎসর' কথাটা উৎকীর্ণ করা হয়েছিল। জাহাঙ্গিরের রাজত্বের প্রথম বছরে সম্রাট আকবরের ছবি উৎকীর্ণ করা একটি মোহর প্রচলন করা হয় এবং এই অন্তর্বর্তী সময়ে কাবুল ও আহমাদাবাদ থেকে 'রাজকুমার সলিম' উৎকীর্ণ রৌপ্য মুদ্রা প্রচলিত হয়।

রাজ্যাভিষেকের অব্যবহিত পর জাহাঙ্গির সমস্ত মুদ্রার ওজন ২০% করে বাড়াবার নির্দেশ দেন। সোনার মুদ্রার ওজন বৃদ্ধি পেয়ে হয় ২০২ গ্রেন, রুপার মুদ্রা ২১২ গ্রেন। তার রাজত্বের চতুর্থ বছর থেকেই ওজন বাড়িয়ে করা হয় যথাক্রমে ২১২ গ্রেণ ও ২২২ গ্রেণ। কিন্তু এইসব ভারী মুদ্রা বহন করা অসুবিধাজনক বলে জনগণ সম্রাটের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার ওজন কমিয়ে করা হয় যথাক্রমে ১৭০ গ্রাম ও ১৭৮ গ্রাম। আমৃত্যু তাঁর রাজত্বকালে এই ওজনের স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা বহাল ছিল।

জাহাঙ্গিরের আমলে আহমদনগর ফতেপুর জাহাঙ্গিরনগর কাশ্মীর, লাহোর, পাটনা ও টাট্টা থেকে স্বর্ণ মুদ্রা চালু করা হয়। শুধু রৌপ্য মুদ্রার প্রচলন করা হয় বৈরাট, নারনোল এবং উদয়পুর থেকে। কেবলমাত্র তাম্রমুদ্রা প্রস্তুত করা হত আকবরনগর, এলাহবাদ, বাবার, ইলিচপুর, জলেশ্বর, কটক, পাঞ্জনগর, রোটাস এবং উর্দু-রাহি-দেকান (দাক্ষিণাত্যের পথে অবস্থিত শিবির) থেকে। তামা ও রুপা উভয় প্রকার মুদ্রার প্রচলন করা হয়েছিল কাবুল, কান্দাহার, সুরাট ও উজ্জয়নী থেকে। আকবরের তুলনায় অনেক কম সংখ্যক টাঁকসাল থেকে জাহাঙ্গিরের আমলে মুদ্রা নির্মিত হত।

জাহাঙ্গিরের রাজত্বের ষষ্ঠবর্ষ বা তারপর থেকে প্রস্তুত করা মুদ্রার একদিকে 'নুরুদ্দিন জাহাঙ্গীর শাহ আকবরশাহ' এবং অন্যদিকে টাঁকশালের নাম ইলাহি মাসের নাম রাজ্যভিষেক ও হিজিরা বর্ষ উৎকীর্ণ করা হতো। এছাড়া জাহাঙ্গিরের অনেক মুদ্রায় পদ্য উৎকীর্ণ করা হত। তাঁর রাজত্বের ষষ্ঠ থেকে নবম বছরের মধ্যে জাহাঙ্গিরের অনেক মুদ্রায় পদ্য উৎকীর্ণ করা হত। তাঁর রাজত্বের ষষ্ঠ থেকে নবম বছরের মধ্যে জাহাঙ্গির এমন কিছু মুদ্রার প্রচলন করেন, যেগুলিতে তাঁর ছবি উৎকীর্ণ করা থাকত। মুদ্রাগুলি তিনি তাঁর প্রিয়পাত্রদের উপহার দিতেন।

রাজত্বের ষষ্ঠ বৎসরে চালু করা জাহাঙ্গিরের ছবি উত্তীর্ণ করা মুদ্রা পাওয়া গেছে। এসব ছবিতে জাহাঙ্গিরের দক্ষিণ হস্তে কখনও কখনও আবার পানপাত্র বা কখনও বারান্দায় হাত রাখা অবস্থায় সম্রাটের আবক্ষ চিত্র। সপ্তম বৎসরের মুদ্রায় সম্রাটকে পায়ের উপর পা তুলে সিংহাসনে বসে থাকা অবস্থায় দেখানো হয়েছে। তখন তার ডান হাতে পানপাত্র দেখা যায়। আর মুদ্রার অন্য পিঠে কিছু প্রতীক চিহ্ন ও লিপি উৎকীর্ণ করা। রাজত্বের অষ্টম বছরে প্রচলিত মুদ্রার একদিকে উপবিষ্ট সম্রাট এবং আন্যদিকে একটি সিংহ উৎকীর্ণ করা হয়। এতদিন পর্যন্ত প্রচলন করার সম্রাটের ছবি সম্বলিত মুদ্রাগুলিতে কোন

স্থান থেকে সেগুলি চালু করা হয়েছে, তার উল্লেখ থাকত না। কিন্তু নবম বর্ষে প্রচলিত এরূপ মুদ্রায় স্থান নাম অঙ্কিত হয়। ঐ বছর চালু করা মুদ্রাগুলি যে আজমীড় থেকে প্রচলিত হয়েছিল, তা মুদ্রায় উৎকীর্ণ করা হয়। রাজত্বের ১৩তম বছরে জাহাঙ্গির তার মুদ্রায় রাশিচক্র উৎকীর্ণ করেন। তবে এরূপ মুদ্রার সংখ্যা কম। তাঁর রাজত্বের শেষদিকে সাম্রাজ্যের কর্তৃত্ব নুরজাহানের হস্তগত হয়। মুদ্রাতেও তার প্রভাব পড়ে। এ সময়ে আগ্রা, আকবরনগর, এলাহাবাদ পাটনা, আহমদাবাদ, সুরাট, কাশ্মীর, লাহোর থেকে প্রচলিত মুদ্রায় দু'পংক্তির কবিতা লেখা থাকতোঃ

'জী হুকম শাহ জাহাঙ্গীর য়াফত্ শব্দ জিবার
বা-নাম নূরজহাঁবাদশা বেগম জার।'

অর্থাৎ জাহাঙ্গিরের আদেশে সোনার উপর নূরজাহান বেগমের নাম স্থাপন করায় সোনা শত (গুণ) সৌন্দর্যময় হয়ে উঠলো। যতদিন জাহাঙ্গির জীবিত ছিলেন ততদিনে এই মুদ্রাগুলি প্রচলিত ছিল। তবে শাহজাহান সিংহাসনে বসলে এই মুদ্রা ও রাশিচক্র সম্বলিত মুদ্রার ব্যবহার নিষিদ্ধ করেন। ওই মুদ্রা ব্যবহৃত হলে ব্যবহারকারীদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়ারও আদেশ জারি করেন। সবাইকে মুদ্রাগুলি টাঁকশালে ফেরত দেওয়ার নির্দেশ দেন এবং তা গলিয়ে ফেলতে বলেন।

জাহাঙ্গির ও শাহজাহানের মধ্যবর্তী কালে মাত্র তিন মাসের জন্য রাজত্ব করেন খসরুর পুত্র দাওয়ার বক্স (নভেম্বর ১৬২৭ থেকে জানুয়ারী, ১৬২৮ খ্রি)। তার আমলে প্রচলিত মুদ্রার এক পিঠে কলিমা আর অন্য পিঠে আবু মুজাফফর দাওয়ার বক্স বাদশা' নাম উৎকীর্ণ করা হত। শাহজাহানের আমলেও স্বর্ণও রৌপ্যমুদ্রার একদিকে কালিমা ও টাঁকশালের নাম এবং অন্যদিকে নিজ নাম ও উপাধি উৎকীর্ণ করা হত। রাজত্বের প্রথম পাঁচ বছরে যেসব মুদ্রা প্রচলিত হয়েছিল সেগুলির অলংকরণ ছিল সহজ সরল। কিন্তু পঞ্চম বছর থেকে তাঁর রাজত্বের শেষ পর্যন্ত শাহজাহান প্রচলিত মুদ্রায় বহুবিধ অলংকরণ লক্ষ্য করা যায়। তাঁর মুদ্রায় খলিফাদের নাম উৎকীর্ণ করার রীতি আবার শুরু হয়। সোনা ও রুপার মুদ্রার মত শাহজাহানের রাজত্বের প্রথম কয়েক বছরের তামার মুদ্রাতেও সোজা দিকে কালিমা এবং বিপরীত দিকে সম্রাটের নাম ও উপাধি উৎকীর্ণ করা হত। তবে রাজত্বে চতুর্থ বর্ষ থেকে শাহজাহান তাম্র মুদ্রায় কালিমা উৎকীর্ণ করা স্থগিত রাখেন এবং মুদ্রার সোজা দিকে রাজার নাম ও উপাধি উৎকীর্ণ করার নির্দেশ দেন।

১৬৫৬-৫৭ খ্রিস্টাব্দে শাহজাহান গুরুতর অসুস্থ হবার পর সিংহাসনের উত্তরাধিকার নিয়ে তাঁর পুত্রদের মধ্যে লড়াই শুরু হয়। এই সময় সিংহাসনে নিজেদের দাবি জোরালো করার জন্য যুবরাজ শাহ সুজা এবং মুরাদ বক্স নিজেদের নামে মুদ্রা প্রচলন করেন। শাহ সুজার মুদ্রা প্রস্তুত করা হয় বাংলার আকবর নগর থেকে আর গুজরাটের আহম্মদনগর, সুরাট ও খাম্বাত থেকে মুরাদ বক্সের নামে মুদ্রা প্রচলিত হয়। এদের মুদ্রার আকৃতি চতুষ্কোণ। মুদ্রার একদিকে 'কালিমা' ও অন্যদিকে খলিফাদের নাম উৎকীর্ণ করা থাকতো। এছাড়া মুদ্রায় যুবরাজদের নাম ও উপাধি লেখা থাকতো। দুই রাজপুত্রই নিজেদের 'সিকান্দার সনি' বা দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার বলে উল্লেখ করেছেন।

ঔরঙ্গজেব সিংহাসনে আরোহন করেন ১৬৫৯ খ্রিস্টাব্দে। সিংহাসনে বসেই তিনি মুদ্রায় 'কালিমা' উৎকীর্ণ করা বন্ধ করে দেন। কারণ মুদ্রা হস্তান্তরিত করার সময় কাফের বা অমুসলমানদের সংস্পর্শে

কোরানের বাণী অপবিত্র হবে বলে তিনি মনে করতেন। মুদ্রার সোজা দিক তিনি নিজের নাম ও উপাধি উৎকীর্ণ করার জন্য ব্যবহার করতে শুরু করতেন। পরবর্তীকালে ছোট দু'পংক্তির কবিতাও তা মুদ্রায় উৎকীর্ণ করা হতো:

সিক্কা জাদ দর জহাঁ চু মিহর (বদর্)
মুনির শাহ্ ঔরংজেব আলিমগীর।

মীর আব্দুল বাকি শাহবাই রচিত এ কবিতার অর্থ হল—শাহ ঔরঙ্গজেব আলমগীর উজ্জ্বল সূর্যের মত মুদ্রা প্রস্তুত করেছেন। ঔরঙ্গজেবের মুদ্রার সোজা দিকে ফুলুস বাদশা বা ফুলুস আলমগীর, ফুলুস আলমগিরি, ফুলুস ঔরঙ্গজেব শহী, ঔরঙ্গজেব আলমগীর, সিক্কা মোবারক জুলুস ইত্যাদি নাম উৎকীর্ণ করা হত। পূর্ববর্তী সম্রাটদের তুলনায় ঔরঙ্গজেবের তাম্রমুদ্রা অনেক বেশি সংখ্যায় পাওয়া গেছে। তাঁর রাজত্বের প্রথম পাঁচ বছর পর্যন্ত 'দাম' ওজনের তাম্র মুদ্রা চালু ছিল। তারপর ধাতুর মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় তাম্র মুদ্রার ওজন হ্রাস করা হয়। তবে তার পরবর্তীকালে প্রথম শাহ আলম ও ফারুখশিয়ারের আমলে বর্ধিত ওজনের 'দাম' পাওয়া গেছে। মুঘল সম্রাটদের মধ্যে ঔরঙ্গজেবের মুদ্রাই সবচেয়ে বেশি সংখ্যক টাঁকশাল থেকে প্রচলন করা হয়। মালিকানগরের টাঁকশাল থেকে শুধুমাত্র সোনার মুদ্রা তৈরি হত। আমেদাবাদ, আকবরাবাদ, আকবরনগর, আজিমাবাদ, বিজাপুর প্রভৃতি স্থানের টাঁকশাল থেকে সোনা, রুপা ও তামার মুদ্রা প্রচলন করা হয়। রুপো ও তামার মুদ্রা প্রচলিত হত আজমনগর, ইলিচপুর, মছলিপট্টন, মাইলাপুর মাইলাপুর প্রভৃতি স্থান থেকে।

টাঁকশাল : মুদ্রা ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের জন মুঘলরা সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে মুদ্রা তৈরির বহু কারখানা বা টাঁকশাল নির্মাণ করেছিল। ১৫৯৫ সালে আকবরের রাজত্ব শেষ দিকে তাম্রমুদ্রা তৈরির জন্য ৪২টি টাঁকশাল চলছিল। রৌপ্য মুদ্রা তৈরি হতো ১৪টি টাঁকশালে। আর স্বর্ণমুদ্রা তৈরি হত ৪টি টাঁকশালে। ঔরঙ্গজেবের আমলে এই সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ১৭০০ খ্রিস্টাব্দ রৌপ্যমুদ্রা তৈরি হত ৪০টি টাঁকশালে। অর্থাৎ আকবরের আমলের তুলনায় এসময়ে আরও ২৬টি বেশি টাঁকশালে রুপিয়া তৈরি হত। টাঁকশালের এই সংখ্যা বৃদ্ধি কেবল সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণের কারণেই হয়নি পুরনো অধিকৃত অঞ্চলেও নতুন টাঁকশাল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সারা দেশে বহু টাঁকশালে উৎপাদিত মুদ্রার মধ্যে যে গুণগত সমতা মুঘল শাসকেরা বজায় রাখতে পেরেছিল তা প্রশংসার দাবি রাখে।

মুঘল টাঁকশালগুলিতে মুদ্রা তৈরি হতো। যে কোনো ব্যক্তি সোনা বা তামা টাকশালে নিয়ে গিয়ে নির্দিষ্ট অর্থের বিনিময় মুদ্রা তৈরি করতে পারতো। সাধারণত যে পরিমাণ মুদ্রা তৈরি করা হত তার উপর ৫.৬% হারে শুল্ক ধার্য করা হত। নতুন মুদ্রার দাম (যা তাজা সিক্কা নামে পরিচিত ছিল) সাধারণত বেশি হত। মুদ্রায় বিভিন্ন তথ্য বিভিন্ন তথ্য লিপিবদ্ধ। যেমন প্রতি মুদ্রায় টাঁকশালের নাম ও প্রস্তুতির সন উল্লেখিত থাকত। সোনা রূপা ও তামার মধ্যে পারস্পরিক মূল্যমান সময়ের সাথে সাথে হেরফের হত, বিশেষত, ধাতুর দামের ওঠাপড়া হলে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে আকবরের আমলে ৪০ দাম সমান ছিল এক রুপিয়া। কিন্তু পরবর্তীকালে আকবরের মৃত্যুর পর মুদ্রার মূল্য হার একই রাখা সম্ভব হয়নি। কারণ সে সময়ে তামার দাম অনেক বৃদ্ধি পায়। সে সময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রুপার প্রচলন হয় যাকে 'আনা' বলা হত। এই 'আনা' ছিল এক রূপিয়ার ১/১৬ অংশ। শাহজাহানের আমলে এর ব্যাপক

প্রচলন হয়। তাঁর আমলে দামের পরিবর্তে রুপোর আনা বাজারে খুচরো লেনদেনে ব্যবহৃত হতে থাকে। এছাড়া মিশ্র ধাতুর মুদ্রা ও তাম্রমুদ্রার পরিবর্তে রূপার মুদ্রা বিনিময়ের প্রধান মাধ্যম হয়ে ওঠে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আকবরের রাজত্বকালে বেশিরভাগ সময় ধরে তামার টংকার বহুল প্রচলন ছিল। এরপরেই ব্যবহৃত হত দাম। দুটি দামের সমান ছিল এক টঙ্কা। আইন-ই-আকবরিতে আবুল ফজল রাজস্ব, দ্রব্যমূল্য, মজুরি সবকিছুই দামে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু সপ্তদশ শতকে এসবের পরিসংখ্যান পাওয়া যায় রূপেয়ায়। তাম্রমুদ্রা দামের স্থান তখন দখল করে রৌপ্য রুপেয়া। সমস্ত ধরনের কেনাবেচা রুপেয়ার মাধ্যমে হতে থাকে। এমনকি জমি কেনাবেচাও হত এই রুপেয়াতেই। তবে কোনো কোনো স্থানে এর ব্যতিক্রম দেখা যায়, যেমন গুজরাটের বন্দরগুলোতে পুরনো সুলতানি যুগের মুদ্রার চল ছিল। তবে ঔরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্যে বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা বিজয় সম্পন্ন করলে সেখানে প্রচলিত হূনের পরিবর্তে রূপেয়ার বা রৌপ্য মুদ্রার প্রচলন হয়। কেবলমাত্র ছোটখাটো পণ্য ক্রয় বিক্রয় বা খুচরো ব্যবসায় তামার মুদ্রা ব্যবহার করা হত। তবে পূর্ব ভারতে মুঘল যুগে বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে 'কড়ি' ব্যবহার করা হত। বিশেষত, বাংলা ও ওড়িশায়। মালদ্বীপ থেকে কড়ি আমদানি হতো বাংলায়। আড়াই হাজার কড়ি-র সমান ছিল এক রুপেয়া। অন্যদিকে পশ্চিম ভারতের গুজরাটে 'আমণ্ড' (Almond) আমদানি করা হত। এই 'আমণ্ড' কড়ির মত লেনদেনের জন্য ব্যবহৃত হত।

বৃহৎ লেনদেনের ক্ষেত্রে হুণ্ডির প্রচলন ছিল। কীভাবে হুণ্ডি ব্যবস্থা কার্যকর হত, তার বিস্তৃত বর্ণনা মেলে মিরাৎ-উল-আহম্মদি তে। ফারসিতে এই ব্যবস্থাকে বলা হত সাফটা। ব্যাংকার, শ্রফ, বা মহাজন হুণ্ডির জন্য কমিশন পেত। সাধারণত এর হার হত ১%। তবে দূরত্বভেদে এই কমিশনের হারের হেরফের হত। হুণ্ডির মাধ্যমে মুঘল যুগে বাজারে টাকার সরবরাহ বৃদ্ধি পেয়েছিল। সপ্তদশ শতকে হুণ্ডির জন্য বিমার ব্যবস্থা করাও হয়েছিল। বিমার প্রিমিয়ামের হার কম ছিল না। তবে তা কখনই অত্যাধিক নয়। গোটা বিষয়টা নিয়ন্ত্রণ করত সরাফ বা শ্রফ-রা। ১৬৬৫ খ্রিস্টাব্দে মসুলিপত্তম থেকে সুরাটে নগদ অর্থ পাঠাবার জন্য যে বিমা করা হতো তার প্রিমিয়াম মূল্য ছিল ঐ টাকার ১% মাত্র।

২১.৪ উপসংহার

ঔরঙ্গজেবের পরবর্তীকালে মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের পথ ত্বরান্বিত হয়। এই সময়ে অসংখ্য মুদ্রায় মোগল সম্রাটদের নাম উল্লিখিত থাকলেও কার্যত সেগুলি মোগল সম্রাটদের মুদ্রা ছিল না। ফারুখশিয়ার মোগল টাঁকশাল বিক্রি করে দেওয়া বা ভাড়া দেবার ব্যবস্থা করেন। ঔরঙ্গজেবের পর আজম শাহ, কামবক্স, শাহ আলম, আজিম উস শান, জাহান্দার শাহ, ফারুখশিয়ার, রফি উদ্ দৌলা, মহাম্মদ ইব্রাহিম, মহাম্মদ শাহ, আহমদ শাহ্, দ্বিতীয় আলমগীর, দ্বিতীয় শাহ আলম, মোহাম্মদ আকবর, বাহাদুর শাহ প্রভৃতি মুঘল শাসকদের নামে মুদ্রা প্রচলিত হয়েছিল।

ঔরঙ্গজেবের উত্তরাধিকারীরা তাদের মুদ্রায় ঔরঙ্গজেবের উৎকীর্ণ লিপি 'মন জুলুস, মৈমানৎ মানুস' এবং টাঁকশালের নাম ও অভিকর্ষ বর্ষ উৎকীর্ণ করার পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। মুদ্রার সোজা দিকে উৎকীর্ণ লিপি 'সিক্কা মুবারক' (বা শুভ লক্ষণযুক্ত মুদ্রা), রাজার নাম এবং তার সঙ্গে 'বাদশা গাজী' লেখা থাকতো। কিন্তু কখনো কখনো শাসকরা মুদ্রার সোজা দিকে দু-লাইনের কবিতা উৎকীর্ণ করতেন। আজম শাহ, কাম বক্স, জাহান্দার শাহ, ফারুখশিয়ার, দ্বিতীয় শাহ আলম প্রমুখের মুদ্রায় তা দেখা যায়।

মুঘল যুগের স্বর্ণমুদ্রা মোহর, রৌপ্যমুদ্রা রুপিয়া ছাড়াও শাসকরা বিভিন্ন উৎসবের সময় বিতরণের জন্য কিছু মুদ্রা প্রচলন করেন। এর মধ্যে সর্বাধিক প্রচলিত মুদ্রার নাম ছিল 'নিশার' (Nishar), যার মূল্য ছিল সিকি রুপিয়া। এই নিশার মুদ্রা প্রচলন করেছিলেন জাহাঙ্গির, শাহজাহান, আওরঙ্গজেব, জাহান্দার শাহ ও ফারুকশিয়ার। তবে সোনার নিশার মুদ্রাও প্রচলিত হয়েছিল তবে তা খুব অল্প। জাহাঙ্গির যে নিশার (সোনার) চালু করেছিএলন তার নাম নূর-আফসান (জ্যোতি বিচ্ছুরক) ও খৈয়ব কবুল (যে দান গ্রহণ করার জন্য)। জিজিয়া পুনঃপ্রবর্তন করে ঔরঙ্গজেব ১৬৭৯ খ্রিস্টাব্দে দিরহাম শরাই' নামক এক ধরনের মুদ্রা প্রবর্তন করেন। ওই মুদ্রায় জিজিয়া জমা করা হতো। জিজিয়া প্রবর্তন করে ফারুকশিয়ারও অনুরূপ দিরহাম মুদ্রা চালু করেন।

এছাড়াও সম্রাটগণ রাজদূত, সম্ভ্রান্ত মহিলা ও প্রিয়পাত্রদের উপহার দেবার জন্য বেশি মূল্যের সোনা ও রুপার মুদ্রা প্রস্তুত করেছিলেন। দু'তোলা থেকে দু'শো তোলা ওজনের বিভিন্ন ধরনের মুদ্রা পাওয়া গেছে। আইন-ই-আকবরি ও তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরীতে আকবর ও জাহাঙ্গিরের আমলে এ জাতীয় মুদ্রা প্রচলনের কথা উল্লেখিত হয়েছে। মুদ্রাগুলির নামও বিভিন্ন ছিল। যেমন আকবরের আমলে ১০০ গ্রাম ওজনের মোহরের নাম ছিল শাহানশাহ, ৫০ গ্রাম ওজনের মোহর রাহাস, ২৫ গ্রাম ওজনের নাম 'মোহরের আত্মা' এবং ২০ গ্রাম ওজনের মোহরের নাম বিনসত। অনুরূপে জাহাঙ্গিরের আমলে প্রচলিত সোনার মুদ্রার নাম ছিল নূর শাহী, নূর মুলতানী, নূরদৌলত, নূর করম, নূর মিহর প্রভৃতি। পরবর্তী শাসকগণও এই রীতি অব্যাহত রাখেন।

২১.৫ অনুশালনী

১. মুঘল মুদ্রা ব্যাবস্থার স্বরূপ কী ছিল?
২. আকবর প্রবর্তিত মুদ্রা ব্যাবস্থায় জাহাঙ্গীর কী কী পরিবর্তন সাধন করেছিলেন?
৩. শাহজাহান ও ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালে মুঘল মুদ্রা ব্যবস্থা সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লিখুন।
৪. ঔরঙ্গজেবের পরবর্তীকালে মুঘল মুদ্রা ব্যবস্থা সম্পর্কে একটি টীকা লিখুন।

২১.৬ গ্রন্থপঞ্জি

- Raychaudhuri, Tapan and Habib, Irfan (1982). *The Cambridge Economic History of India. Volume. 1, c, 1200 - c. 1750.* Cambridge University Press.
- Habib, Irfan (1963). *The Agrarian System pf Mughal India, 1556-1707,* Asia Publishing House.
- Gupta, Parameswari Lal. (1969). *Coins.* National Book Trust.

——

একক ঃ ২২ ❑ বাজার; পরিবহন ব্যবস্থা; সামরিক কেন্দ্র

গঠন

২২.০ উদ্দেশ্য

২২.১ ভূমিকা

২২.২ বাজার

২২.৩ পরিবহন

২২.৪ নাগরিক কেন্দ্র

২২.৫ উপসংহার

২২.৬ প্রশ্নাবলী

২২.৭ গ্রন্থপঞ্জি

২২.০ উদ্দেশ্য

এই এককের উদ্দেশ্য হল নিম্নে বর্ণিত বিষয়গুলি অধ্যয়ন করা :

- মুঘল আমলের বাজার ব্যবস্থা
- মুঘল আমলের পরিবহন ব্যবস্থা
- মুঘল আমলের নাগরিক কেন্দ্রের বিকাশ ও বিবর্তন

২২.১ ভূমিকা

যে কোনো যুগের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের অন্যতম উপাদান হল বাজার, পরিবহন ও শহর। ভারতে অতি প্রাচীন যুগ থেকেই বাজার, পরিবহন ও নগরের বিকাশ ঘটেছিল। বাজার, বাণিজ্য ও পণ্য পরিবহনের মাধ্যমে ভারতের মতন বিশাল দেশের এক অংশ অন্য অংশের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল। রাষ্ট্রীয় ঐক্য ও সাম্রাজ্যের উত্থান অর্থনৈতিক ক্ষেত্রগুলির বিচ্ছিন্নতা দূর করার পক্ষে সহায়ক হয়েছিল। আকবরের সময় থেকে ভারতের মতন বিশাল দেশে মুঘলদের প্রকৃত রাজনৈতিক আধিপত্য ও সামরিক প্রসার অপ্রতিরোধ্য গতিতে শুরু হয়। এই প্রসারণ পূর্ণ গতিতে সক্রিয় ছিল ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকাল পর্যন্ত। মুঘল শক্তির সামরিক বিজয় ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে শান্তি ও সংহতি সুনিশ্চিত করতে সক্ষম হয়েছিল। এর ফলে স্বল্পপাল্লার বাণিজ্যের পাশাপাশি দূরপাল্লার বাণিজ্যের প্রসার ঘটে। এর সঙ্গে সংযুক্ত হয় বাজারের বিকাশ। বাজার, বাণিজ্য, পরিবহন ও নগর এক সূত্রে গাঁথা ছিল। মুঘল অর্থনীতির চেহারা-চরিত্রকে সার্বিক

ভাবে বুঝতে গেলে তাই পরিবহন ব্যবস্থা, বাজার ও নাগরিক কেন্দ্রগুলির ইতিহাসকে বোঝা প্রয়োজন। এই এককে সেই প্রয়াস গ্রহণ করা হয়েছে।

২২.২ বাজার

মুঘল আমলে অধিকাংশ শহরে একাধিক বাজার ছিল। তবে তার মধ্যে একটি-ই ছিল প্রধান। সুরাট, হুগলী, সপ্তগ্রাম প্রভৃতি শহরের বাজারের কথা বিভিন্ন বিদেশি পর্যটকদের বর্ণনায় বর্ণিত হয়েছে। সুরাটের বাজারে এত বেশি লোক তাঁত বা রেশম বস্ত্র বিক্রি করত যে বাজারে যাতায়াতে অসুবিধা সৃষ্টি হত। বিদেশি পর্যটক সুরাট বা আগ্রার বাজারকে ইজিপ্টের জমজমাট বাজারের সঙ্গে তুলনা করেছেন। এসব বাজারের পণ্য সামগ্রী কেবল স্থানীয় চাহিদাকেই পূরণ করত তা নয়, দূর বাণিজ্যের বণিকদের চাহিদাও মেটাত।

শিল্পপণ্য উৎপাদনের জন্য প্রয়োজন কাঁচামাল। এই কাঁচামাল উৎপাদনের জন্য সেকালে কয়েকটি স্থান বাণিজ্যিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। যেমন সুতা তৈরির জন্য বিখ্যাত ছিল গুজরাটের বারোচ ও মাহামুদাবাদ। এখান থেকে অন্যত্র সুতা সরবরহ হত। গুজরাতের কয়েকটি মাণ্ডি বিখ্যাত ছিল তুলা বিক্রির জন্য। যেমন জাম্বুসর। কাশ্মীর ও গুজরাটে কাঠের গোলার বড় বাজার ছিল। কাশিমবাজারের কাছে শেরপুর দড়ি তৈরির জন্য ছিল বিখ্যাত। এর পাশাপাশি কিছু কিছু শহর নির্দিষ্ট পণ্য বিক্রির জন্য সুখ্যাত ছিল। যেমন গোয়া ও বেলগাও দুর্মূল্য পাথরের জন্য বিখ্যাত ছিল। গুজরাতে রেশম শিল্প বেশ সমৃদ্ধি অর্জন করেছিল। ওই শিল্প বাংলার রেশমের ওপর নির্ভরশীল ছিল। বাংলা থেকে কাঁচা রেশম আগ্রাতেও রপ্তানি হত। সেখান থেকে তা যেত গুজরাট, পারস্য, তুর্কিস্তানে। উত্তর ভারতের বণিকরা এই বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করত। বাংলার নীল মসুলিপত্তমে যেত বিদেশে রপ্তানির জন্য। কয়েকটি নির্দিষ্ট স্থানে খনিজ দ্রব্যের সহজলভ্যতা ছিল। যেমন গোয়ালিওরের লৌহ নির্মিত দ্রব্য সমূহের সারা ভারতব্যাপী চাহিদা ছিল। পাটনা ও আগ্রা সোরা তৈরির জন্য বিখ্যাত। পাটনা থেকে নৌকা সহযোগে এই সোরা আসতো বাংলায়, সেখান থেকে বিদেশে রপ্তানি হত।

বিভিন্ন ফল ও মশলার অভ্যন্তরীণ বাজার ছিল। মালাবার অঞ্চলে প্রচুর নারকেল উৎপন্ন হত। ওই নারকেল জাহাজে করে করমণ্ডলের চেট্টি বণিকরা পূর্ব উপকূলে বা গুজরাটে নিয়ে যেত। এছাড়া মালাবার থেকে গুজরাটে যেত তাঁত ও মশলা। বুরহানপুরে তামাক উৎপন্ন হত। বুরহানপুর থেকে তামাক এবং বিহার থেকে আফিম আসত বাংলায়। তুতিকোরিন থেকে আসতো শাঁখ। সেগুলিতে কারুকার্য করে বাংলা থেকে তা ভারতের অন্যত্র পাঠানো হত। কাশ্মীর থেকে শাল ও কাঠের তৈরি সৌখিন জিনিসপত্র সারা দেশে বিক্রি হত। সমকালীন সাহিত্যে ভাগীরথীর তীরে গড়ে ওঠা বিভিন্ন শহরে কাশ্মীর ও দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন দ্রব্য বিক্রির উল্লেখ মেলে। জাহাঙ্গিরের আমলে অমৃতসরে পশম ও গালিচা শিল্পের প্রসার ঘটে। বাংলা, উত্তরপ্রদেশ ও পাঞ্জাব ছিল চিনি উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত।

অন্যান্য স্থানীয় পণ্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল বিহারের সুগন্ধী, মৃৎপাত্র, গোয়ালিয়রের জসমিন তেল, সাহাজাদপুরের কাগজ বা বাড়ি তৈরির জন্য রাজস্থানের মার্বেল পাথর। এসব ছাড়াও ছিল দাস ব্যবসা। বাংলা থেকে দাস চালান হত। পর্তুগিজরা এই ব্যবসায়ে হাত পাকিয়েছিল।

২২.৩ পরিবহন

জলপথে পণ্য পরিবহনের খরচ কম থাকায় খাদ্য দ্রব্য, লবণ ও সোরা, জলপথে চালান হত। বিদেশি পর্যটকেরা এই নৌ-পরিবহনের বিস্তৃত বর্ণনা রেখে গেছেন। রালফ ফিচ, মানরিখ, ফিঞ্চ, বা বাউরী প্রমুখ নৌ-বাণিজ্যের বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন। মানরিখ বৃহৎ আকারের নৌকার কথা বলেছেন। বাউরী হুগলী ও পাটনার মধ্যে পাল তোলা নৌকা চলাচল করতে দেখেছিলেন।

প্রধানত বলদ টানা দুচাকার গাড়িই ছিল যাত্রীদের যাতায়াতের ব্যবস্থা। উটের গাড়ি ছিল রাজস্থানে। ঘোড়া আসতো বিদেশ থেকে। ঘোড়ার অপ্রতুলতার কারণে ঘোড়ায় টানা গাড়ীর বেশী চল ছিল না। দু'চাকার বলদের গাড়িতে ছাড়াও চার চাকার গাড়িও ছিল। বিদেশি পর্যটকদের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, এই সব গরুর গাড়িগুলি বেশ জোরে যেত। প্রায় পচাত্তর মিনিটে দু'মাইল পথ অতিক্রম করতে পারত। রালফ্ ফিচ্ লিখেছেন এরা সারাদিনে মাইল কুড়ি পথ অতিক্রম করতে পারতো। পশ্চিম রাজস্থান, গুহারাট ও সিন্ধুতে উটের প্রচলন ছিল। আবুল ফজল লিখেছেন, কচ্ছ অঞ্চলে সবথেকে ভাল উট পাওয়া যেত এবং সবথেকে বেশি উট পাওয়া যেত সিন্ধুতে। আগ্রা থেকে সুরাটে উটে টানা গাড়ি চলাচল করত। ভারি মাল ও ভারি কামান পরিবহনের জন্য হাতির ব্যবহারের চল ছিল। আইন-ই আকবরিতে আবুল ফজল গহরবাহাল বলে এক শ্রেণির গাড়ির কথা বলেছেন, যেগুলি ঘোড়ায় টানা ছিল। তবে ঘোড়ায় টানা গাড়ির প্রচলন বেশি দেখা যায় জাহাঙ্গিরের আমল থেকে।

দেশের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য অনেকাংশ জলপথের উপর নির্ভরশীল ছিল। এসব নৌকা সাধারণত চার-পাঁচ টন মাল পরিবহনের ক্ষমতা রাখত। পাটনা থেকে হুগলির মধ্যে দু'শ টন মাল নিয়ে নৌকা চলাচল করত। রাজমহলে পর্যটক মানরিখ দুহাজারের ওপর দাঁড় টানা নৌকা দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ছিলেন। গঙ্গায় বৃহৎ আকারের নৌকা চলাচল করত। ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম দিকে ভারথেমা বিভিন্ন ধরনের নৌকার উল্লেখ করেছেন—দুই মাস্তুল, এক মাস্তুল যুক্ত নৌকা, সরু আকারের নৌকা, দাঁড়-টানা নৌকা ইত্যাদি। গুজরাটে প্রায় সাতাশখানি বন্দরে ছোট-বড় সব ধরনের নৌকা দেখা যেত।

রাস্তার ধারে বিশ্রামের জন্য সরাইখানার ব্যবস্থা ছিল। আগ্রা থেকে পাটনা বা লাহোর-মূলতানের প্রতিদিনের পথের শেষে সরাই পাওয়া যেত। আবার রাজস্থানের মধ্য দিয়ে আগ্রা সুরাট পথে সরাইয়ের দেখা মিলত সাত দিন অন্তর। শেরশাহ প্রচুর সরাইখানা তৈরি করে যাতায়াত ব্যবস্থার সুবিধা করে দিয়েছিলেন। বার্ণিয়ের-এর বর্ণনা থেকে জানা যায় সরাইগুলি ছিল বড় বড় খামার বাড়ির মত, সেখানে শত শত মানুষ পশু সহ থাকতে পারত। বড় সরাইগুলিতে আটশ থেকে হাজার লোক তাদের পণ্যবাহী গাড়ি ও পশু নিয়ে থাকতে পারতো। ফরাসি বণিক মাতা বলেছেন, তুর্কী বা পারস্যের তুলনায় ভারতে সরাইয়ের সংখ্যা কম ছিল।

২২.৪ নাগরিক কেন্দ্র

ভারতবর্ষের নাগরিক সভ্যতা ও নগর বিকাশের ধারা রয়েছে সুপ্রাচীন, খ্রিস্টপূর্ব হরপ্পা সভ্যতা প্রথম অস্তিত্ব শহরের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় মহেঞ্জোদারো, হরপ্পা ইত্যাদি শহরের মধ্যে। এই সভ্যতা ধ্বংসের পরবর্তী হাজার বছরের মধ্যে কোন নতুন নগর বা নাগরিক সভ্যতার চিহ্ন পাওয়া যায় না। বৈদিক সভ্যতা ছিল প্রধানত গ্রামীণ সভ্যতা যা কৃষি ও পশুপালনকে কেন্দ্র করে বিকশিত হয়েছিল। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে মধ্যে গাঙ্গেয় উপত্যকায় আবার নগর এর আবির্ভাব ঘটে। এটি ভারতের দ্বিতীয় নগর-বিপ্লব নামে ইতিহাসে খ্যাত। খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতক পর্যন্ত এই নগর বিকাশের ধারা অব্যাহত থাকে। তবে তৃতীয় শতকে অধিকাংশ নগরের পতন ঘটে, যদিও শহরগুলি যে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল তা নয়। পরবর্তী ইসলামের আবির্ভাবের পর দশম শতক থেকে ভারতে নতুন করে নগরায়ণ প্রক্রিয়া শুরু হয়। বাণিজ্য ও প্রশাসনিক কারণে বিভিন্ন শহর গড়ে ওঠে। চতুর্দশ শতকের পর ভারতের নতুন করে নগরায়ণ বিপ্লবের ক্ষেত্রে জোয়ার আসে। ঐতিহাসিকদের মতে সুলতানি যুগ শুরু হলে এই নগরায়ণ ঘটে। ইক্তা ব্যবস্থা নগরায়ণ প্রক্রিয়াকে শক্তি যোগায়। এর ফলে সুলতানি প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়, সেনাবাহিনীর সক্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। এর ফলে বাণিজ্যে, পরিবহন, বাজার ও সর্বোপরি উৎপাদন ব্যবস্থায় গতিশীলতা জন্ম নেয়। সুলতানি যুগে শুরু হওয়া এই গতিশীল নগরায়ণ প্রক্রিয়া মুঘল আমলেও সচল ও সক্রিয় ছিল। ইরফান হাবিব-এর মতে এই ধরনের নগর বিপ্লবে মূল ভূমিকা নিয়েছিল বিদেশ থেকে আসা কারিগররা যারা ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় মিশে গিয়েছিল। কেউ কেউ মনে করেন যে এর ফলে বহু হিন্দু কারিগর মুসলিম হয়ে যায় মূলত আর্থিক লাভের আশায় ও সামাজিক বৈষম্য এড়াতে। অধ্যাপক নুরুল হাসান ইক্তা ব্যবস্থা প্রবর্তন মধ্যযুগের ভারতে নগরায়ণের প্রশস্ত করেছিল বলে মনে করেন। পরবর্তীকালে মুঘল আমলে নগরায়ণের জোয়ার আসে এবং অসংখ্য নগর গড়ে ওঠে। এদের মধ্যে কিন্তু যেমন নতুন নগরের সূচনা হয় তেমনি কিছু প্রাচীন নগরের পুনরুজ্জীবন ঘটেছিল। তার মধ্যে আবার কিছু নগর-আন্তর্জাতিক গুরুত্ব ও অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল বৈদেশিক বাণিজ্যের কারণে। এগুলির সমৃদ্ধি দেখে বিদেশী পর্যটকরাও অবাক হয়েছিলেন। মূল নগরগুলো গড়ে ওঠার পেছনে একাধিক কারণ ছিল। রাজনৈতিক-সামরিক-বাণিজ্য প্রভৃতি কারণে এই নগরগুলির আবির্ভাব ঘটে। তবে প্রতিটি ক্ষেত্রেই উদ্বৃত্ত উৎপাদন নগর বিকাশকে প্রভাবিত করেছে। নগর সাধারণত প্রশাসনিক ও কারিগর শ্রেণির কর্মকেন্দ্র ও আবাসস্থল ছিল। খাদ্যের জন্য কোন অঞ্চলের কৃষি ক্ষেত্রে উদ্বৃত্ত উৎপাদনের উপর নগরের বাসিন্দাদের নির্ভরতা অনিবার্য ছিল।

অনেকে মনে করেন যে নগরের বিকাশ বা অবনতির সঙ্গে অর্থনৈতিক চাহিদা যতটা কার্যকারণ সম্পর্কে আবদ্ধ অন্য কোন বিষয়ের সঙ্গে তা অতটা নয়। আচার্য যদুনাথ সরকারের ছাত্র ঐতিহাসিক জগদীশনারায়ণ সরকার অবশ্য এ বক্তব্যে সহমত নন। তিনি মনে করেন ভারতে এমন নগর বহু রয়েছে যার আবির্ভাব এর পশ্চাতে রাজনৈতিক কারণ ও সামরিক এবং প্রশাসনিক প্রয়োজন গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এমন অনেক নগর মুঘল যুগে গড়ে ওঠার পশ্চাতে রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। এ প্রসঙ্গে তিনি দিল্লি আগ্রা ইত্যাদি শহরের কথা বলেছেন। দ্বাদশ শতক থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত

দিল্লি ভারতের প্রধান প্রশাসনিক কেন্দ্র হিসাবে অবস্থান করে। দক্ষিণ ভারতের আক্রমণের আশঙ্কা দিল্লির নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে থাকে এক মধ্যবর্তী নিরাপত্তা বলয় গড়ে তুলতে চাইলে, নগরী হিসাবে আগ্রার উত্থান ঘটে। প্রশাসনিক কেন্দ্র হিসেবে আগ্রা-দিল্লি যেমন সাম্রাজ্যের প্রধান শহর হয়ে উঠেছিল, তেমনি বিহারের পাটনা এবং খান্দেশ প্রশাসনিক গুরুত্বের কারণেই বড় শহর হিসেবে আবির্ভূত হয়। তেমনি আবার ধর্মীয় স্থানে মানুষের আনাগোনা, বিপুল জনসংখ্যার উপস্থিতি যে বাণিজ্যিক সম্ভাবনাকে তৈরি করেছিল তাও আবার কিছু নগরের বিকাশকে সহায়তা যুগিয়েছিল। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণ নগরের বিকাশের পিছনে কাজ করেছিল। যেমন বারাণসী, নাসিক, আজমীর।

উত্তর ভারতে চার প্রকারের নগরের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়, প্রথমত, প্রধান প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড কেন্দ্র হিসাবে ভারতের নগর গড়ে উঠেছিল যেখানে বাণিজ্যিক বা অন্যান্য কর্মকাণ্ডের গুরুত্ব ছিল গৌণ। আগ্রা দিল্লি এবং লাহোর শহর বা পরবর্তী কালে হায়দ্রাবাদ ও ফৈজাবাদ।

দ্বিতীয়তঃ এমন নগর ছিল যে গুলি বাণিজ্যিক ও শিল্প উৎপাদন কেন্দ্র হিসেবে গুরুত্ব অর্জন করেছিল যদিও সেখানে প্রশাসনিক সংগঠনের অস্তিত্ব ছিল তবুও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের গুরুত্বের তুলনায় প্রশাসনিক গুরুত্ব ছিল গৌণ। আমেদাবাদ এই শ্রেণিভুক্ত শহর ছিল।

তৃতীয়তঃ কিছু শহর ধর্মীয় স্থানকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। যেখানে স্থানীয় অধিবাসীদের সাথে সাথে তীর্থযাত্রীদের সমাগম হত। বেনারস এই শ্রেণির শহর ছিল লক্ষণীয় উত্তর ভারতের প্রধান নদীর তীরে অবস্থিত হওয়ায় যোগাযোগ ব্যবস্থার সুবিধা ভোগ করেছে। এছাড়া একই কথা প্রযোজ্য তিরুপতি, আজমীর শরীফ সম্পর্কে। ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার লিখেছেন "ধর্ম স্থানে তীর্থযাত্রীদের সমাগম ও তাদের চাহিদা পূরণে বিক্রেতাদের সমাবেশ এবং এর ফলে বাজারে প্রতিষ্ঠা ও বাজারকে কেন্দ্র করে হস্ত শিল্পের বিকাশ ইত্যাদিকে কেন্দ্র করেই শহরের প্রতিষ্ঠিত হয়।" সর্বোপরি, হস্তশিল্প বা স্থানীয় উৎপাদনের বিশেষত্বের জন্য (ম্যানুফ্যাকচারিং টেকনিক) বা স্থানীয় খ্যাতির জন্য কিছু নগরের আবির্ভাব ঘটেছিল। যেমন নীল উৎপাদনের কারণে বাখরাবাদ ও দরিয়াবাদ বস্ত্র উৎপাদনের জন্য নগর হিসাবে ক্রমশ প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিল।

মুঘল যুগে বিশেষত ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতক ছিল ভারতের স্বর্ণযুগ। ভারতের বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে একই শাসন প্রণালীর প্রতিষ্ঠা ঘটে ছিল যা অর্থনৈতিক বিকাশের পথকে প্রশস্ত করে। বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডের শ্রীবৃদ্ধি ঘটায়। সারাদেশে একই মুদ্রা ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। অনেক অভ্যন্তরীণ শুল্ক বিলুপ্তি পণ্য চলাচল সহজতর করে। পরিণামে আন্তঃবাণিজ্য অভূতপূর্ব বিকাশ ঘটে এবং একইসঙ্গে সমুদ্র-বাণিজ্যের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। এই অনুকূল পরিবেশে একাধিক নগর এর আবির্ভাব ঘটে। 'মিরাৎ-ই-আহমদী' গ্রন্থ থেকে জানা যায় আকবরের রাজত্বের শেষ দিকে একশ কুড়িটি বৃহৎ শহর, তিন হাজারের উপর ছোট শহর বা কসবা ছিল। এই শহরের অধিকাংশ গ্রাম থেকে উত্তীর্ণ হয়েছিল এবং বাণিজ্যিক বিকাশ তার প্রধান চালিকা শক্তি রূপে কাজ করেছিল।

র‍্যালফ ফিচের সাক্ষ্য অনুযায়ী আগ্রা ছিল সমকালের শ্রেষ্ঠ ও সর্বাধিক জনবহুল শহর। এমনকি শাহজাহানের আমলে দিল্লিতে রাজধানী স্থানান্তরিত হলেও আগ্রার গৌরব অক্ষুণ্ণ থাকে। বার্নিয়ের প্রমূখ পর্যটকদের বর্ণনায় আগ্রার বিশালতার কথা বারবার এসেছে। তবে লাহোর, পাটনা বা বেনারসও বড়

শহর ছিল। বিদেশিদের বর্ণনা থেকে এসব শহরের জনসংখ্যার একটা ধারণা পাওয়া যায়। কিন্তু সঠিক কত সংখ্যক বাস করত তার সুনির্দিষ্ট কোনো সংখ্যা পাওয়া যায় না। যা পাওয়া যায় তা হল এক অস্পষ্ট ধারণা। যেমন ষোড়শ শতকের প্রথম দিকে বাংলার লখনৌতি (গৌড়)তে চল্লিশ হাজার চুলা ছিল। আগ্রা এবং ফতেপুরসিক্রি আকবরের আমলে লণ্ডনের চেয়ে অনেক বড় ছিল। শাহজাহানের আমলে দিল্লি প্যারিস শহরের চেয়ে ছোট শহর ছিল। এসব বক্তব্য থেকে জনসংখ্যা সম্পর্কে সঠিক ধারণা করা সম্ভব নয়। ইউরোপীয় পর্যটকরা ইউরোপের সাথে ভারতীয় নগরগুলি যে তুলনা টেনেছেন, তার ভিত্তি মুঘল আমলের শহরের জনসংখ্যার পরিমাণ অনুমান করা যেতে পারে মাত্র, যেমন ১৬০৯ সালে আগ্রাতে জনসংখ্যা ছিল আনুমানিক ৫ লক্ষ। ১৬৬৬তে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৮ লক্ষ। ১৬৫৯ সালে দিল্লির জনসংখ্যা ছিল প্রায় ৫ লক্ষ। ১৬১৫ সালে লাহোর এরা জনসংখ্যা ছিল ৭ লক্ষ। শাহজাহান দিল্লিতে তার প্রশাসনিক কেন্দ্র সরিয়ে নিয়েছিলেন এবং গড়ে ছিলেন শাহজাহাবাদ নামের নতুন শহর। ১৬৬৬ সালে সুরাট-এর লোক সংখ্যা ছিল ১ লক্ষ, ১৬৩১-এ পাটনার জনসংখ্যা ছিল ২ লক্ষ, ১৬৩০-এ ঢাকার জনসংখ্যা ছিল ২ লক্ষ আর ১৬৭২-এ মসুলিপতনমের জনসংখ্যা ছিল ২ লক্ষ। সঠিক পরিসংখ্যানের অপ্রতুলতা সত্বেও ঐতিহাসিকরা মুঘল যুগের নগরায়ণ সম্পর্কে কিছু সিদ্ধান্তে এসেছেন। মুঘল যুগে বিশেষত ষোড়শ, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে নগরায়ণের সুবর্ণ যুগ এসেছিল উত্তর ভারত ও মধ্য ভারতে। পূর্ববর্তী যুগের শহরগুলির ক্ষেত্রে এ সময় যেমন আকার বৃদ্ধি ঘটে ছিল তেমনি অন্যদিকে সেগুলি পুনরুজ্জীবিত হয়ে ওঠে। এই প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করেছিল যে সব উপাদান তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-স্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিস্থিতি যা অর্থনৈতিক কার্যকলাপ সম্প্রসারণে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। Pax-Mughalica প্রতিষ্ঠাতার ফলে ভারতের অভ্যন্তরীণ দূরবর্তী বাণিজ্য (Long distance trade) এবং এশিয়া ও ইউরোপের সাথে ভারতের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য এবং এই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে ভারতের বস্ত্র শিল্পের যে বিপুল প্রসার ঘটায় তা নগরায়ণকে ত্বরান্বিত করে।

তবে নগরায়নের বিকাশ ও নগরায়ণের সমৃদ্ধির মাত্রা সর্বত্র সমান ছিল না। কোনো কোনো নগরের বিকাশ অন্য নগরের তুলনায় ছিল বেশি, কোন কোন নগরের আবার প্রভূত পরিমাণে বিকাশ ঘটেছিল। বিশেষত যেগুলি নৌ-পরিবহনের সুবিধা লাভ করতে পেরেছিল এবং নদী তীরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ বাজারগুলির সাথে ও উপকূলের বন্দরগুলির সঙ্গে যুক্ত ছিল। এই বন্দরগুলি, মনে রাখতে হবে, ইউরোপীয় বাজারের ভারতীয় পণ্যের চাহিদা পূরণ করত। যেমন পাটনা ও বেনারসের বস্ত্রশিল্প উপকৃত হয়েছিল কারণ গঙ্গার তীরে অবস্থিত এই শহরগুলির পণ্যসামগ্রী নদীপথে পরিবাহিত হয় সহজেই হুগলির বা কলকাতা চন্দননগর, চুঁচড়ার ইউরোপীয় ফ্যাক্টরিগুলিতে পৌঁছাতে পারতো। যেখানে এরূপ সুবিধা ছিল না সে শহরগুলি হয় আবদ্ধ হয়ে পড়েছিল নতুবা পতনের সম্মুখীন হয়েছিল। যেমন শরকি সুলতানদের রাজধানী জৌনপুর বহুলুল লোদী দ্বারা দখলীকৃত হওয়ায় পর সে তার পঞ্চদশ শতাব্দীর সমৃদ্ধি আর ফিরে পায়নি। রাভি নদীর তীরে অবস্থিত লাহোরের অবস্থান এবং কাশ্মীর, মুলতান, সিন্ধু ইত্যাদির সাথে যোগাযোগ এসব স্থলবেষ্টিত সফরকে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে সাহায্য করেছে। জগদীশনারায়ণ সরকার দেখিয়েছেন যে সুরাটের উত্থান এর আগে থাট্টা বা সিন্ধু ছিল প্রধান বন্দর। লাহোর, মুলতান, আগ্রা প্রভৃতির পণ্য ঠাট্টা বন্দর দিয়ে বিদেশে বা দক্ষিণে যেত।

পাঞ্জাব সিন্ধুর মধ্যবর্তী অঞ্চল নগরায়ণ ক্রমশ পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে অগ্রসর হতে দেখা যায়। সম্ভবত মুঘল আমলে সমগ্র উত্তর ভারতের পরিস্থিতি এই ঘটনার মধ্য দিয়ে প্রতিভাত হয়। এই প্রেক্ষিতে কয়েকটি প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।

(১) যমুনা ও শতদ্রুর মধ্যবর্তী স্থান এবং এদের মধ্যবর্তী অঞ্চল দিল্লির সুলতানি যুগের প্রথম দিকে সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধিময় অঞ্চল হয়ে উঠেছিল। সুলতানি আমলে ইক্তা বিলি বন্দোবস্তের মধ্যে সেই ইঙ্গিত নিহিত ছিল।

(২) দোয়াব অঞ্চলের সমৃদ্ধি ছিল বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

(৩) সপ্তদশ শতকে উত্তরপ্রদেশের পশ্চিম অংশে বিভিন্ন নগর ও জনপদ এর আবির্ভাব ঘটায় সেখানে প্রভাবশালী রাজনৈতিক-সামরিক ব্যক্তিদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

(৪) সর্বোপরি অষ্টাদশ শতকের মধ্যকালীন সময় যখন উত্তরপ্রদেশের পশ্চিমাংশ বিশেষত দোয়াব অঞ্চল রাজনৈতিক অনিশ্চয়তায় সৃষ্টি হয়েছিল, তখন উত্তরপ্রদেশের পূর্বদিকে জেলাগুলি বিশেষত অযোধ্যা সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠেছিল এবং নগর জীবনের সেই সমৃদ্ধি প্রকাশও পেয়েছিল।

পর্তুগিজ, ইংরেজ, ডাচ ও ফরাসিরা সমুদ্রপথে ভারতে এসে উপনীত হয়েছিল। এর ফলে আধুনিক ভারতীয় বাণিজ্যের সূচনা ঘটে। ভারতের কাঁচামাল ও শিল্পপণ্য সামগ্রী তার ফলে নতুন নতুন বাজারের সন্ধান পায়। এই বৈদেশিক বাণিজ্যের ফলে বন্দর-শহরগুলির সমৃদ্ধি অর্জিত হয়। যেসব বন্দরগুলি আগে থেকেই ছিল সেগুলির পাশাপাশি নতুন নতুন বন্দর শহরের আবির্ভাব ঘটেছিল ইউরোপীয়দের সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্কে গড়ে ওঠার ফলে। যেমন সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকে আবির্ভাব ঘটে মাদ্রাজ, বোম্বাই, হুগলি ও কলকাতার। ভৌগোলিক অবস্থানের সুবিধা ও আনুকূল্যে অনেক স্থানে নগরের বিকাশের পথ প্রশস্ত হয়েছিল, সে কথা আগেই বলা হয়েছে। কয়েকটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে। মাদ্রাজ সুনাম অর্জন করেছিল করমণ্ডল উপকূলের ভৌগলিক অবস্থানগত সুবিধার কারণে। ইংল্যাণ্ড, চিন, পারস্যের সঙ্গে মাদ্রাজের বাণিজ্যিক যোগসূত্র শহরের সমৃদ্ধির পথ প্রশস্ত করে। সপ্তদশ শতকে সুরাট ছিল মুঘল সাম্রাজ্যের সবচেয়ে সমৃদ্ধ বন্দর। ইউরোপীয় বাণিজ্যের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র সুরাট ছিল মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের হজের বন্দর। আবার আজমীর আরাবল্লী পর্বতের গিরিপথ নিয়ন্ত্রণ করত এবং দিল্লি থেকে আমেদাবাদ যাওয়ার সংক্ষিপ্ততম পথ আজমীর হয়ে যেত।

মুঘল যুগের নগরগুলির যে বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে তা হল, নগরগুলি প্রাচীর বেষ্টিত ছিল না। আগ্রার কোন প্রতিরক্ষা প্রাচীর ছিল না। সুরাটেরও কোনো প্রাচীর ছিল না। ধনী এই বন্দর শহর তাই বারংবার শিবাজী কর্তৃক লুণ্ঠিত হয়েছে। আওরঙ্গজেবের আমলে সুরাটে চারিদিকে প্রাচীর তোলা হয়েছিল বটে তবে তা মারাঠা আক্রমণ প্রতিহত করতে পারেনি। করমণ্ডল উপকূলে মসুলিপত্তম বন্দর ডাচ ও ইংরেজদের প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে এই শহরের বাণিজ্যিক সম্পর্ক নগরের সমৃদ্ধি সুনিশ্চিত করেছিল। একইভাবে ডাচ বাণিজ্যিকে কেন্দ্র করে সপ্তদশ শতকে ভারতের পূর্ব উপকূলে নেগাপত্তন, কুড্ডালোর, মায়লাপুর, বাংলার চুঁচুড়া শহরের প্রতিষ্ঠিত হয়। ফরাসিদের বাণিজ্যকে নির্ভর করে গড়ে ওঠে পণ্ডিচেরী ও চন্দননগর।

প্রশ্ন হল এসব বন্দর-শহরগুলো কী এমন ছিল যা গ্রামে ছিল না? মনে রাখা দরকার এক বন্দর শহরগুলি ভেঙে নতুন শহর গড়ে উঠত। এটা ভারতের সনাতন নিয়ম। যেমন ক্যাম্বের বদলে সুরাট গড়ে ওঠে, আবার সুরাটের বদলে বম্বে বড় শহর হয়ে ওঠে। কিন্তু উপকূলের এ অঞ্চলে একটা বন্দর শহর থাকবেই। ক্যাম্বে,

সুরাট, বোম্বের অস্তিত্ব সেই কথাই বলে। এছাড়া ওই শহরগুলিতে কিছু নির্মাণের কাজ হয়েছিল যা গ্রামে দেখা যেত না। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য নগর প্রাকার। যেমন আঠারো শতকের প্রথমে সুরাটকে ঘিরে দুটি দেয়াল তৈরি হয়েছিল। মুঘল সুরাটে একটা দুর্গও ছিল। কিন্তু গ্রাম অঞ্চলে কোন দুর্গ পাওয়া যায় না। সুরাটের দুর্গের কাছেই টাঁকশাল ছিল যেখানে টাকা তৈরি হতো। গ্রামে কোনো টাঁকশাল থাকত না।

মধ্যযুগে ইউরোপে অনেকক্ষেত্রেই বেড়ে ওঠা গ্রাম পরবর্তীকালে শহর হিসেবে পরিগণিত হয়েছিল।; কিন্তু ভারতের ক্ষেত্রে বিষয়টা ঠিক তা ছিল না। এখানে নগরগুলি একান্তই নগরী হিসেবেই গড়ে উঠেছিল। মুঘল আমলে সরকারি আধিকারিক এবং মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষরা গ্রামের চাইতে শহরে বসবাস করতে অধিক পছন্দ করতেন। যদিও গ্রামগুলি দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত। তারাই শহরগুলিকে শুল্ক ও খাদ্য সরবরাহ করত। শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল যেমন রেশম, কার্পাস, সুরা তারাই উৎপাদন করত।

এতসব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও গ্রামে সুযোগ-সুবিধার অভাব ছিল (amenities), যা শহরে সহজলভ্য ছিল। গ্রামগুলি ছিল কৃষকদের বাসস্থান সেখানে কোন কারিগর শ্রেণি বা বাজারের অস্তিত্ব ছিল না, গ্রামের উপরে ছিল যেগুলিকে বলা হত কসবা, কসবায় কৃষিজীবী মানুষের সাথে সাথে কারিগর শ্রেণিরও বাস ছিল। আর ছিল কিছু নিম্নপদস্থ সরকারি কর্মচারী। আর শহরগুলি ছিল বৃহৎ সংখ্যক কারিগর শ্রেণি বা কৃষিজীবী শ্রেণীভুক্ত মানুষের কেন্দ্রস্থল। প্রশাসনিক আধিকারিকদের আবাসস্থল ও কর্মকেন্দ্র গ্রাম ও নগরের মধ্যে পার্থক্য মৌলিক নয়। বরং এই পার্থক্য ছিল কার্যক্রম ভিত্তিক ও সাংগঠনিক (functional and organisational)। শহরগুলি ছিল ছোট ছোট দ্বীপের মতো দিগন্ত প্রসারিত এবং গ্রামীণ অঞ্চল দ্বারা পরিবেষ্টিত। এছাড়া স্থানীয় বাণিজ্যের প্রয়োজন ও পারস্পরিক-নির্ভরতা শহর ও গ্রামের মাঝের ব্যবধান ভেঙে দিয়েছিল। শহরের অর্থনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো শহরের জনগণের জন্য গ্রাম থেকে প্রয়োজনীয় খাদ্য সরবরাহ করা। খাদ্য ছাড়া অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও বিলাসবহুল পণ্য সৌখিন দ্রব্য গ্রাম থেকে শহরে প্রেরিত হত, কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া। কিছু শহর ছিল যেগুলি আধা গ্রামীণ কিছু বৈশিষ্ট্য বহন করত, যেগুলি বাইরের সহযোগিতা ব্যতিরেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে উঠেছিল। তবে অধিকাংশ বড় নগরগুলিকে তাদের খাদ্য সরবরাহের জন্য পার্শ্ববর্তী গ্রাম অঞ্চলের ওপর নির্ভর করতে হতো। তেমনি সকল চাহিদা গ্রামের উৎপাদন মাত্রা বৃদ্ধি করে গ্রামীণ অর্থনীতি সচল রাখত। শহরের প্রশাসনের দায়িত্ব ছিল খাদ্যশস্য ও অন্যান্য পণ্য সামগ্রীর এই আদান-প্রদান যাতে সুষ্ঠুভাবে হতে পারে সেদিকে নজর রাখা, বাজারদর ইচ্ছামত ওঠাপড়াকে নিয়ন্ত্রণে রাখা এবং সার্বিকভাবে ক্রেতার স্বার্থ সুরক্ষিত করা। সর্বোপরি বাণিজ্যিক কেন্দ্র হিসেবে শহরগুলি সন্নিহিত অঞ্চলে উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী বিক্রয়ের প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। শুধু তাই নয় শিল্পজাত পণ্য উৎপাদনের কেন্দ্র এবং ক্ষেত্রবিশেষে তা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পীঠস্থানে পরিণত হয়েছিল।

২২.৫ উপসংহার

মুঘল অর্থনীতির চরিত্র নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে প্রচুর বিতর্ক রয়েছে। কার্ল মার্কস সহ একাধিক

ইউরোপীয় পণ্ডিত মুঘল অর্থনীতির মধ্যে কোনো গতিশীলতা খুঁজে পাননি। এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী কৃষি অর্থনীতি ছিল স্থানু। বাজারের কোনো অস্তিত্ব ছিল না। গ্রামগুলি ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ। শহর বা নগরগুলি ছিল সামরিক-প্রশাসনিক কেন্দ্রে। অর্থনীতির কার্যক্রমের সঙ্গে মুঘল নগরের কোনো সম্পর্ক ছিল বলে মার্কস বা সমকালীন ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ মনে করতেন না। এই ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে তাঁরা এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতি বলে অভিহিত করেছিলেন। আধুনিক গবেষণায় এই তত্ত্ব প্রায় খারিজ হয়ে গিয়েছে। মনে রাখা দরকার যে পরিণত মার্কসও শেষ জীবনে এই তত্ত্বে আস্থা রাখতে পারেননি। আধুনিক ঐতিহাসিকদের গবেষণায় স্পষ্ট যে মুঘল আমলে সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যেই বাণিজ্য, নগর, পরিবহন ও বাজার ব্যবস্থার বিকাশ ঘটেছিল। গ্রাম শহরের উপর নির্ভর ছিল না; কিন্তু শহর গ্রামের উপর নির্ভর করত। নাগরিক ভোগ্য বা বিলাস পণ্যের চাহিদা গ্রামে ছিল না। কিন্তু কৃষিপণ্যের বিপুল চাহিদা শহরে ছিল। বাজার ও পরিবহণ ব্যবস্থার মাধ্যমে পণ্য গ্রাম বা গঞ্জ থেকে শহরের দূরবর্তী বাজারে পৌঁছে যেত। সুতরাং এই অর্থনীতি ছিল যথেষ্ঠ গতিশীল। কিন্তু এই বাণিজ্যিক গতিশীলতা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অগ্রদূত হয়ে কেন সুপ্রাচীন বর্ণব্যবস্থাকে ভাঙতে পারল না সেই প্রশ্ন থেকেই যায়।

২২.৬ অনুশালনী

১. মুঘল আমলে নগর বিকাশের ধারা আলোচনা করুন।
২. সপ্তদশ শতকে বাণিজ্য কীভাবে নগর বিকাশকে প্রভাবিত করেছিল?
৩. মুঘল যুগে পরিবহন ব্যবস্থার উপর একটি টীকা লিখুন।
৪. মুঘল অর্থনীতিতে বাজারের ভূমিকা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন।

২২.৭ গ্রন্থপঞ্জি

- Raychaudhuri, Tapan and Habib, Irfan (1982). *The Cambridge Economic History of India. Volume. 1, c, 1200 - c. 1750.* Cambridge University Press.
- ভদ্র, গৌতম (1991) *মুঘল যুগে কৃষি-অর্থনীতি ও কৃষক বিদ্রোহ,* সুবর্ণরেখা
- রায়, অনিরুদ্ধ (2016) *মধ্যযুগের ভারতীয় শহর,* আনন্দ পাবলিশার্স

একক ২৩ ❑ ভারত মহাসাগরীয় সমুদ্র বাণিজ্য

গঠন

২৩.০ উদ্দেশ্য

২৩.২ ভূমিকা

২৩.৩ ভারত মহাসাগর

২৩.৪ ভারত মহাসাগরে বাণিজ্যের বিকাশ

২৩.৫ সমুদ্রগামী জাহাজ

২৩.৬ বাণিজ্যিক পণ্য-সামগ্রী

২৩.৭ সমুদ্রে বাণিজ্যিক আধিপত্যের রূপান্তর

২৩.৮ উপসংহার

২৩.৯ অনুশীলনী

২৩.১০ গ্রন্থপঞ্জি

২৩.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করে শিক্ষার্থীরা মুঘল যুগে ভারত মহাসাগরে সমুদ্র বাণিজ্যের ইতিহাস সম্পর্কে অবহিত হবে। নিম্নে বর্ণিত বিষয়গুলি সম্পর্কে এই বিশ্লেষণে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হবে :

- ভারত মহাসাগরে নৌ-বাণিজ্যের বিকাশ ও বিবর্তন
- সমুদ্রগামী জাহাজ ও পণ্য-সামগ্রীর ইতিহাস
- সমুদ্র বাণিজ্যে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার দ্বন্দ্ব

২৩.২ ভূমিকা

যে কোনো দেশের স্থলভাগের ইতিহাস অধিক চর্চিত ও বহুল পঠিত। জলভাগেরও যে ইতিহাস থাকতে পারে তা আর ক'জনেই বা জানে? এদেশে শিশুকাল থেকে প্রাচীন ভারতের মৌর্যযুগ, কুষাণ যুগ বা গুপ্ত যুগের ইতিহাস পড়ানো হয়ে থাকে। আর সুলতানী আমল বা মুঘল সাম্রাজ্যের ইতিহাসের পঠন-পাঠন তো নৈমিত্তিক ঘটনা। কিন্তু ভারতের দক্ষিণে যে বিস্তৃত জলরাশি বর্তমান তারও যে সমৃদ্ধ ইতিহাস রয়েছে সেদিকে সচরাচর আমাদের নজর পড়ে না। চোল আমল থেকেই ভারত সমুদ্রের ওপর

কর্তৃত্ব করেছে। চোল শাসক রাজেন্দ্র চোল, প্রথম রাজরাজের আমলে চোলদের শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্য অভিযান, শ্রীলঙ্কার অনুরাধাপুরমের ধ্বংসাধন, বা মালদ্বীপ বিজয়ের মাধ্যমে ভারতীয়রা সমুদ্র শাসনের যে নজির রেখেছে, পরবর্তীকালে তা না থাকলেও সমুদ্রের ইতিহাসের সঙ্গে ভারতবর্ষের নাম ওতপ্রোতভাবে সংশ্লিষ্ট। অষ্টাদশ শতক থেকে এ দেশ যে ঔপনিবেশিক শাসনের বেড়াজালে জড়িয়ে পড়ে তা এসেছে সামুদ্রিক সংযোগের কারণেই। পর্তুগিজ, দিনেমার, ইংরেজ বা ফরাসিরা সামুদ্রিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার সূত্র ধরেই ভারতে তাদের উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়। প্রত্যক্ষভাবে ইউরোপকে জুড়ে দেয় এ দেশের বাণিজ্যের সঙ্গে। আর সেই সূত্রেই 'বণিকের মানদণ্ড' দেখা দেয় 'রাজদণ্ড' রূপে। ভারত মহাসাগরের সেই সমুদ্র বাণিজ্যের সাথে ছাত্রছাত্রীদের পরিচয় ঘটানোই এ পাঠের উদ্দেশ্য।

২৩.৩ ভারত মহাসাগর

আলোচ্য সময়ে ভারতের বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডকে বোঝার সুবিধার্থে দু'ভাগে ভাগ করা যেতে পারে—অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্য। বৈদেশিক বাণিজ্যকে আবার দুভাগে ভাগ করে আলোচনা করা যেতে পারে স্থল বাণিজ্য ও সমুদ্র-বাণিজ্য। এ দেশের ভৌগোলিক অবস্থান তথা ভারতের পূর্ব-পশ্চিম ও দক্ষিণ প্রান্ত জুড়ে বিস্তৃত জলরাশির উপস্থিতি সুপ্রাচীনকাল থেকে সমুদ্র বাণিজ্যকে সম্ভব করে তুলেছিল। ভারতের পশ্চিমে আরব সাগর, পূর্বে বঙ্গোপসাগর আর দক্ষিণে ভারত মহাসাগরের অবস্থান। প্রাচীনকালে হিন্দুরা পশ্চিমের এই জলরাশিকে পশ্চিম সাগর বলত। আর গ্রিক দৃষ্টিতে ভারতের দক্ষিণ 'ভারত মহাসাগর' নামে পরিচিত ছিল।

প্রাচীনকালের ভারতীয় তথ্যসূত্রে এই জলরাশিকে পূর্ব পশ্চিম ও দক্ষিণ সমুদ্র নামে উল্লিখিত হয়েছে। কোথাও ভারত মহাসাগর শব্দের উল্লেখ নেই। গ্রিক-রোমান দৃষ্টিতে ভারতের দক্ষিণস্থ জলভাগ ভারত সাগর নামে পরিচিত। প্লিনি-র ন্যাচারাল হিস্ট্রিতে প্রথম ভারত সাগরের পরিচয় মেলে। তবে তারও পূর্বে খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকে হেরোডোটাস 'এরিথ্রাস থালাসেস' নামে এক সমুদ্রের কথা লিখেছেন। সে বর্ণনা মোতাবেক এই সমুদ্র আফ্রিকা থেকে জাপান বা সমকালীন গ্রিক জগতের পরিচিত পূর্বতম অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এর মধ্যে ছিল ইন্ডিয়া এখনকার সিন্ধু প্রদেশ। অর্থাৎ ভারতের পশ্চিম উপকূল ভাগ পর্যন্ত ছিল সেই এরিথ্রাস থালাসেস-এর প্রান্তসীমা। পারস্য উপসাগর ও লোহিত সাগরও ছিল সেই জলরাশির অন্তর্ভুক্ত। সম্ভবত আফ্রিকার পূর্ব উপকূলবর্তী ও এশিয়ার তীরবর্তী সাগরের যতটুকু অংশ গ্রিক জগতের কাছে পরিচিত ছিল তাই 'ইরিথ্রিয় সাগর' নামে পরিচিত ছিল। পরবর্তী উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ *পেরিপ্লাস অফ দি এরিথ্রিয়ান সি* খ্রিস্টীয় প্রথম শতকের রচনা। রচয়িতা অজ্ঞাতনামা এক গ্রিক নাবিক। সাগরের পশ্চিম আফ্রিকা মহাদেশের পূর্ব উপকূল থাকলেও এর পূর্ব প্রান্তের সীমানা আগের তুলনায় অনেক প্রসারিত—খুসেখরা বা সুবর্ণদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত। সুতরাং সময়ের সাথে সাথে ইরিথ্রিয় সাগর প্রসারিত হয়েছিল এবং লোহিত সাগর পারস্য উপসাগর আরব সাগর ও বঙ্গোপসাগর এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

সুতরাং বলা যায় গ্রেকো-রোমান দৃষ্টিতে যা ভারত সাগর, হিন্দু দৃষ্টিতে তা পশ্চিম সাগর। আবার খ্রিস্ট্রীয় নবম শতকে আরবরা সেই জলভাগকেই হিন্দুস্থানের সমুদ্র বলে অভিহিত করতো।

২৩.৪ ভারত মহাসাগরে বাণিজ্যের বিকাশ

প্রাচীনকাল থেকে চিনের সাথে রোমান সাম্রাজ্যের যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, তা মূলত স্থলপথ ধরে চলত, যা সিল্করুট বা রেশমপথ নামে খ্যাতি লাভ করে। সপ্তম শতকে এসে তা বিনষ্ট হয়। যদিও চিনের সঙ্গে পাশ্চাত্য জগতের বাণিজ্য সম্পূর্ণ বন্ধ হয়নি। পরবর্তী পর্যায়ে সমুদ্রপথে চিনের সাথে পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলের বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। প্রথমদিকে এই বাণিজ্যিক সম্পর্কে পারসিক বণিকদের আধিপত্য ছিল। পরে অষ্টম শতক থেকে আরব বণিকরা সক্রিয় হয়ে উঠতে শুরু করে ও চিনের ক্যান্টন বন্দর পর্যন্ত তারা তাদের বাণিজ্য তরণী 'ধাও'কে নিয়ে নিয়মিত বাণিজ্য করতে শুরু করে। একাদশ শতকে লোহিত সাগরের বাণিজ্য সক্রিয় হয়ে ওঠে, যা গ্রিক-রোমান যুগে খুব উল্লেখযোগ্য ছিল। এই সময় কায়রো ও আলেকজান্দ্রিয়ার মধ্য দিয়ে ভারতীয় বা পূর্ব এশিয়ার পণ্য সামগ্রী মধ্য এশিয়ার মুসলিম দেশগুলো ও ভূমধ্যসাগরের বন্দরগুলোতে রপ্তানি হতো। অন্যদিকে দূরপ্রাচ্যের সমুদ্র বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রণ ছিল চৈনিকদের হাতে। যদিও চিনের বন্দরগুলোতে ঘাঁটি গেড়ে বসে থাকা বিদেশিরাও সে বাণিজ্যে অংশ নিত।

মোটের উপর একাদশ শতকের শেষ দিকে ভারত মহাসাগরে বাণিজ্যের গতিবিধির কিছু লক্ষণ স্পষ্ট। এই সময়ে আরব জাহাজগুলি মালাবার, করমণ্ডল, কুইলন, কালিকট, নেগাপত্তনম প্রভৃতি অঞ্চলের পণ্য নিয়ে হাজির হতো এবং ওইসব অঞ্চলে পূর্ব ভারত মহাসাগরের বাণিজ্য তরণীর সঙ্গে পণ্য ও যাত্রী বিনিময় করত। যেমন আরব জাহাজগুলির (ধাও) পণ্য চিনা জাহাজে (জাঙ্ক) যেত, তেমনি জাঙ্কের পণ্য ধাওতে উঠত। এভাবে পূর্ব ভারত মহাসাগরের জাঙ্ক ও পশ্চিম ভারত মহাসাগরের ধাও-এর মধ্যে পণ্য বিনিময় হত।

ভাস্কো-দা-গামা ভারতে এলেন ১৪৯৮-এ। অর্থাৎ পঞ্চদশ শতকের একেবারে অন্তিম লগ্নে। ভারতের পশ্চিম উপকূলের সবচেয়ে বড় বন্দর ছিল গুজরাটের ক্যাম্বে। টোমে পিরেজ লিখেছেন, ক্যাম্বের দুদিকে দুই বাহু প্রসারিত ছিল। অর্থাৎ একদিকে লোহিত সাগরে এডেন বন্দর ও অন্যদিকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মালাক্কার সাথে তার বাণিজ্যিক যোগ গড়ে উঠেছিল সমুদ্রপথে। এছাড়াও মালাবার, সিংহল, করমণ্ডল, বাংলা, পেগু, শ্যামদেশ এসব অঞ্চলের সাথেও ক্যাম্বের যোগাযোগ গড়ে উঠেছিল। ক্যাম্বের বড় প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল সে সময়ে ভারতের দক্ষিণে মালাবার উপকূলের কালিকট বন্দর। কালিকটের সঙ্গে বাণিজ্য চলত পারস্য, ক্যাম্বে, মালদ্বীপ ও লোহিত সাগর অঞ্চলের। তবে পর্তুগিজদের আগমনকালে কালিকট ও লোহিত সাগরের মধ্যের বাণিজ্য তলানিতে এসে ঠেকেছিল। এর কারণ সম্ভবত ক্যাম্বের উত্থান।

পঞ্চদশ শতকে ভারত মহাসাগরের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলো ভারত, চিন ও জাপানের মধ্যে পণ্য ক্রয় বিক্রয়ের কেন্দ্র হিসেবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় মালাক্কার উত্থান। এই উত্থান কালিকটে চিনা বণিকদের আগমনকে অপ্রয়োজনীয় করে তোলে। কারণ লোহিত সাগর বা পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলের পণ্য সামগ্রী

গুজরাটি বণিকরা মালাক্কায় বিক্রি করতে নিয়ে যেত। চিনা বণিকদের আর কালিকটে আসার প্রয়োজন হতো না। বস্তুত পঞ্চদশ শতকে চিন ভারতের পশ্চিমে মালাবার উপকূলের বন্দরগুলোতে পণ্য নিয়ে আসতো। বিশেষত তার দক্ষিণে অবস্থিত কিলোন বন্দরে। ঐ শতকের সূচনা থেকে চিন গোটা ভারত মহাসাগর জুড়েই তাদের বহর পাঠিয়েছিল। মিং বংশের শাসকরা তখন রাজত্ব করতেন। কিন্তু ১৪৩৩ সালের পর থেকে কোন চীনা জাহাজ আর ভারতের পশ্চিম উপকূলে আসেনি। এই না আসার কারণ এখনও অজ্ঞাত। এ সময় চীনা জাহাজগুলি মালাক্কা পর্যন্ত আসতো। তার পশ্চিমে আর অগ্রসর হতো না।

ষোড়শ শতকে কালিকট ছিল আরব মুসলমান বণিকদের কর্মক্ষেত্র। আরবের যে 'আল কারিমি' বণিকরা লোহিত সাগর অঞ্চলের মশলা বাণিজ্য একচেটিয়া কুক্ষিগত করেছিল, পরবর্তীকালে মামেলুক সুলতানদের নিপীড়নে তা ধ্বংস হয় এবং তাদের অনেকেই কালিকটে এসে বসবাস করতে শুরু করেন। প্রতি বছর এই আরব বণিকদের দশ-বারোটা জাহাজ ২২০০ বাহার ওজনের মশলাপতি ও তীর্থযাত্রী নিয়ে লোহিত সাগরের উদ্দেশ্যে পাড়ি দিত। আবার লোহিত সাগর অঞ্চল থেকে অনেক জাহাজ আরব বণিকদের নিয়ে কালিকটে আসতো ও পণ্য সংগ্রহের জন্য এসব বণিকেরা কালিকটে কয়েক মাসের জন্য অতিবাহিত করতেন। এভাবে কালিকট মিশর, সিরিয়া, খোরাসন, পারস্য, পশ্চিম আফ্রিকা প্রভৃতি অঞ্চল থেকে আগত বণিকদের বিশেষত মুসলমান বণিকদের বাসভূমি হয়ে ওঠে। আর ছিল গুজরাটি বণিকরা। তাঁরা পারস্য উপসাগর ও লোহিত সাগর অঞ্চলে বসতি গড়েছিল। তাঁদের কোনো জাহাজ ছিল না বটে। কিন্তু তার জন্য সমুদ্র বাণিজ্য আটকে থাকেনি। যে সমস্ত জাহাজ ভারতের পশ্চিম উপকূলে আসতো সেগুলোতেই তাঁরা পাড়ি জমাতো। এই জাহাজগুলিকে বলা হতো হিন্দুস্থানের বহর।

এইভাবে পর্তুগিজদের প্রাক্কালে ভারত মহাসাগরের পশ্চিম দিকে অর্থাৎ আরব সাগর অঞ্চলে ছিল আরব বণিকদের প্রাধান্য, পূর্বদিকে চিনা বণিকদের প্রাধান্য, যারা দক্ষিণ চিন সাগর ও মালাক্কার মধ্যে আধিপত্য বিস্তার করে অন্যদেশের বণিকদের হঠিয়ে দিয়ে। সে সময়ে ইন্দোনেশিয়ার সমুদ্রপথে একচেটিয়া বাণিজ্য করত জাভা ও মালয়ের ব্যবসায়ীরা। মধ্যবর্তী অংশে অর্থাৎ ক্যাম্বে থেকে মালাক্কা পর্যন্ত ছিল গুজরাটের মুসলমান তথা ভারতীয় বণিকদের প্রাধান্য। এককথায় ভারত সাগরের পূর্বদিকে চিনা জাঙ্কের প্রাধান্য আর পশ্চিমদিকে আরবদের ধাও-এর প্রাধান্য। আর মধ্যবর্তী অংশে ভারতীয় জাহাজ। পঞ্চদশ শতকের শেষ ও ষোড়শ শতকের সূচনায় এই ছিল ভারতসাগরের বাণিজ্যের মূল কথা। তবে পশ্চিম ভারত সাগরের বিশেষত লোহিত সাগর ও পারস্য উপাসাগরেও ভারতীয় জাহাজের যাতায়াত ছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পঞ্চদশ শতকের শেষদিকে ভারতের উপকূল বরাবর যে নৌবাণিজ্য ছিল তা মূলত ছিল মুসলমান বণিকদের নিয়ন্ত্রণে। আর সমুদ্র বাণিজ্যে পণ্য সরবরাহের যে ব্যবসা ছিল তার নিয়ন্ত্রণ ছিল হিন্দুদের হাতে। মনে রাখতে হবে ষোড়শ শতকের সূচনায় ভারত মহাসাগরের দীর্ঘতম বাণিজ্য পথ ছিল লোহিত সাগরে মুখে অবস্থিত এডেন থেকে শুরু করে গুজরাট বা করমণ্ডল উপকূল হয়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মালাক্কা পর্যন্ত প্রসারিত।

২৩.৫ সমুদ্রগামী জাহাজ

ভারত মহাসাগরের পশ্চিম দিকে পঞ্চদশ, ষোড়শ শতকে যে সব বাণিজ্য তরণীর দেখা মিলত তাদের পৃথক নাম ছিল। পশ্চিম সাগরে আরবদের যে জাহাজ চলতো সেগুলিকে 'ধাও' বলা হত। যদিও আরবরা কখনো তাদের জাহাজকে 'ধাও' বলে শনাক্ত করেনি। ইউরোপীয়রাই আরবদের জাহাজের এরূপ নামকরণ করে। এগুলির আয়তন তৎকালীন ভূমধ্যসাগরীয় বা উত্তর ইউরোপীয় জাহাজের চাইতেও বড় ছিল। মোরল্যাণ্ডের মতে, এই জাহাজগুলির বহন ক্ষমতা ছিল ১২৫ টন। চিনের 'জাঙ্ক' (চিনের জাহাজকে বলে হত) এই 'ধাও'-এর চেয়েও বড় ও শক্ত ছিল। সমুদ্রের টাইফুন প্রতিরোধ করে সেগুলি চলতে পারতো। অন্যদিকে ধাওগুলির গতি ছিল জাঙ্ক অপেক্ষা অনেক বেশী। আবার ভারতীয় জাহাজগুলিরও বিভিন্ন নাম ছিল। যেমন—বাঘলা, সামবুক, কটিয়া ও তাৎগী। এর মধ্যে বাঘলা সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ছিল। সেগুন কাঠের তৈরি এসব ভারতীয় জাহাজে একপ্রকার আঠা লাগানো হতো যাতে করে কাঠে পোকা না ধরে ও দীর্ঘ দিন জলে থাকতে পারে।

২৩.৬ বাণিজ্যিক পণ্য-সামগ্রী

যেসব পণ্যের কারবার চলত এই সমুদ্র বাণিজ্যে তার মধ্যে বস্ত্র ও মসলা ছিল সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। লোহিত সাগর অঞ্চলে রপ্তানি হতো কাপড়, নীল আর মাদকদ্রব্য। আমদানিকৃত পণ্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল গরম কাপড়, রেশম বস্ত্র ও সোনা রূপা। রপ্তানিকৃত পণ্যের মধ্যে নীল আসতো গুজরাট ও আগ্রা থেকে, মালাবার অঞ্চল থেকে গোলমরিচ, সিংহল থেকে দারুচিনি, ভারতবর্ষ থেকে কাপড় যেত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মালাক্কায়। গুজরাটি বণিকদের এক গোষ্ঠী ভারতবর্ষ থেকে কাপড় এবং খাদ্যশস্যের বিনিময়ে পূর্ব আফ্রিকা থেকে ক্রীতদাস, আবলুশ কাঠ, হাতির দাঁত ও সোনা ইত্যাদি আমদানি করতো। এছাড়া অন্য একটি সমুদ্রপথে ভারতীয় বণিকরা হেড্রামও থেকে হরমুজ হয়ে পারস্য সাগর দিয়ে ভারতে আসত ঘোড়া, মুক্তো পার্শিয়ান সিল্ক ও কার্পেট নিয়ে। বাংলা থেকে সমুদ্র পথে রপ্তানি হত কাপড়, কাঁচা রেশম ও খাদ্যশস্য। করমণ্ডল উপকূলের বন্দর থেকে রপ্তানি হতো কাপড় ও সুতো। পঞ্চদশ শতকের শেষ দিক থেকে মালাক্কায় গুজরাটি বণিকদের বসতি গড়ে ওঠে। মনে রাখতে হবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বিশেষত মাশলাদ্বীপে সস্তা ও মোটা কাপড়ের চাহিদা ছিল প্রভূত। কিন্তু মধ্যপ্রাচ্য লোহিত সাগর ও পারস্য উপসাগর অঞ্চলে যে সব কাপড় রপ্তানি হতো তার একটা বড় অংশই ছিল দামি ও মিহি কাপড়।

ভারত মহাসাগর অঞ্চলে যেসব পণ্য বাংলা থেকে রপ্তানি হতো তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল কাঁচা রেশম, চিনি ও বস্ত্র। এছাড়া গুজরাট থেকে রপ্তানি হতো তুলো, মালাবার থেকে গোলমরিচ। নীল রপ্তানি হতো গুজরাট ও বাংলা থেকে। ইউরোপে ভারতীয় নীলের খুব চাহিদা ছিল। কারণ এর দাম ও কার্যকারিতা বেশি। বুরহানপুর, সরখেজ ও বায়ানা-য় (আগ্রার কাছে) উৎকৃষ্ট নীল উৎপন্ন হতো। তবে সপ্তদশ শতকের

ভারতীয় নীল এর চাহিদা হ্রাস পায়। এই সময় থেকে আবার সোরা রপ্তনি হতে শুরু করে। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে পর্তুগিজরা ছাড়াও ডাচ ও ইংরেজরা এই সোরার ব্যবসায়ে লিপ্ত হয়। ষোড়শ শতকে যেসব পণ্য সামগ্রী ভারতবর্ষে ভারত মহাসাগরের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আসতো তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে সোনা, রুপা, কিছু মশলাপাতি আর ঘোড়া। আর অল্প বিস্তর আসতো মালয় থেকে টিন, পূর্ব-আফ্রিকা থেকে হাতির দাঁত। পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চল থেকে রং করার জন্য গাচ-গাছড়া, মদ, গোলাপজল ও নানান শুকনো ফল। উল্লেখ্য যে, সোনা রূপা আমদানির তুলনায় এসব পণ্যের মূল্য তেমন বেশি ছিল না। পশ্চিম এশিয়া থেকে সোনা রূপা ভারতে আমদানি হতো সেটাই বেশি অর্থকরী ছিল। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে যে আমদানি হতো তা পশ্চিমের আমদানির তুলনায় বিশেষ উল্লেখযোগ্য নয়।

২৩.৭ সমুদ্রে বাণিজ্যিক আধিপত্যের রূপান্তর

১৪৯৮ খ্রিস্টাব্দে ভাস্কো-দা-গামা-র নেতৃত্বে উত্তমাশা অন্তরীপ হয়ে ভারতে আসার পথ আবিষ্কৃত হয়। এর ফলে এখন থেকে ভারতের বাণিজ্য ইউরোপের বাণিজ্যের সাথে যুক্ত হয়ে পড়ে। পর্তুগিজরা ভারত মহাসাগরের সমুদ্র বাণিজ্য প্রতিষ্ঠা করেন তা Estado-da-India নামে পরিচিত। ভারত মহাসাগরে পর্তুগিজদের এই আবির্ভাব ষোড়শ শতকে সমুদ্র বাণিজ্যে এক নতুন যুগের সূচনা ঘটিয়ে দেয়। পরবর্তী দেড়'শ বছর তাদের এই জল সাম্রাজ্য অটুট থাকে। তবে এই শতকেই আরব সাগরের গা ঘেঁষে তিন-তিনটি সাম্রাজ্যের আবির্ভাব ঘটে। সাফাভি রাজ বংশের প্রতিষ্ঠা হয় পারস্যে। ভারতে মুঘল সাম্রাজ্য গড়ে ওঠে। আর এই সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ শাসক আকবর পনেরোশো সত্তরের দশকে গুজরাট অধিকার করেন। মধ্য এশিয়ার অটোমান তুর্কীরা চালদিরানের যুদ্ধে সাফাভিদের পরাজিত করে ইরাক দখল করে। পরে সিরিয়া ও মিশরের মামেলুকদের পরাজিত করে হেজাজের উপর আধিপত্য বিস্তার করে। লোহিত সাগরে তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। ষোড়শ শতকে ভারতের পশ্চিমে যে বাণিজ্যের বিশেষ প্রসার ঘটে, তা হল হজের বাণিজ্য। মানুষ হজের তীর্থযাত্রী হলেও বণিকেরা এই সুযোগে হজের বাণিজ্যে মেতে উঠতো। এমনকি তীর্থযাত্রীরাও সঙ্গে করে বাণিজ্য-পণ্য নিয়ে হজে যেত। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য থেকে শুরু করে মূল্যবান পণ্য সবই (মসলা, ভারতীয় কাপড়, মূল্যবান পাথর ইত্যাদি) বেচাকেনা চলত। মক্কা, মদিনা জেড্ডা, মোখা বন্দরের কাছে বেইট-আল-ফাকিতে এসব বাজার বসতো। অনেক ভারতীয় বণিক ষোলো শতকের এই বাণিজ্যে অংশ নিত। এইভাবে লোহিত সাগর অঞ্চলের সঙ্গে ষোড়শ শতকে ভারতীয় বণিকদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক সুদৃঢ় হয়ে উঠেছিল।

পঞ্চদশ শতকের শেষে ভারতে পর্তুগিজদের এই আবির্ভাব ষোড়শ শতকে ভারত মহাসাগরীয় বাণিজ্যে এক বিরাট পরিবর্তন নিয়ে আসে। তাঁরা আরব সাগরের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার উপর জোর দেয়। ভাস্কো দা গামা প্রথম যাত্রার সঙ্গে সঙ্গে পর্তুগালের রাজা ম্যানুয়েল 'পারস্য, ভারত এবং আরব জলপথের নৃপতি' উপাধি নেন। পর্তুগিজদের লক্ষ্য হয়ে পড়ে আরব সাগরের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার ওপর। উদ্দেশ্য ভারত

মহাসাগরে এশীয় বা ভারতীয় বণিকদের বাণিজ্যিক নিয়ন্ত্রণ করা ও তার থেকে শুল্ক আদায় করা। এজন্য তাঁরা কয়েকটি ব্যবস্থা নিল। এক, তাঁরা চরম নিষ্ঠুরতা আশ্রয় নেয় ভারত মহাসাগরে। দুই, কার্তাজ প্রথা প্রবর্তন করে। তিন, ভৌগোলিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ স্থানে দুর্গ নির্মাণ করে। যেমন গোয়া, কোচিন প্রভৃতি স্থানে। এসব দুর্গে সৈন্য মোতায়েন থাকতো এবং পর্তুগিজ জাহাজগুলি আশ্রয় পেত। এই নৌবাহিনীর সাহায্যে পর্তুগিজরা আরবসাগর জুড়ে টহল দিতে থাকে এবং মুসলমানদের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ঠেকিয়ে রাখতে শুরু করে। এ ব্যাপারে তারা কিছুটা সফল হলেও পুরোটা পারেনি।

কার্তাজ ব্যবস্থায় প্রত্যেক ভারতীয় বাণিজ্য জাহাজ সমুদ্রপথে চলাচলের জন্য পর্তুগিজদের কাছ থেকে ছাড়পত্র কিনতে হত। কার্তাজ থাকলে সমুদ্রে জাহাজের নিরাপত্তা থাকতো। না থাকলে মাঝ সমুদ্রে পর্তুগিজরা জাহাজ বাজেয়াপ্ত করতে পারত। লুঠও করত। বা জাহাজে দখল নিয়ে অন্য বন্দরে গিয়ে সেগুলি বিক্রি করে দিত। কার্তাজে জাহাজের মালিকের নাম, নাখোদার (জাহাজের ক্যাপ্টেন) নাম, গন্তব্য স্থল, পণ্যের বিবরণ ইত্যাদি নথিভুক্ত থাকতো। পর্তুগিজদের জন্য সংরক্ষিত কিছু পণ্যের বাণিজ্য করা নিষেধ ছিল। যেমন গোলমরিচ। কার্তাজের দাম বেশি না হলেও কার্তাজ কেনার অর্থ হল পর্তুগিজদের আধিপত্য মেনে নেওয়া। কার্তাজ ব্যবস্থা প্রবর্তন করে পর্তুগিজরা প্রমাণ করার চেষ্টা করে যে ভারত মহাসাগরে তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা এবং সমুদ্র বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের অধিকার তাদের আছে। আসলে ভারতীয় রাজ্যগুলির কোনো শক্তিশালী নৌবহর এ সময় ছিল না বলে পর্তুগিজরা তাদের নৌবহরের জোরে ভারত মহাসাগরে এই আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে ষোড়শ শতক জুড়ে। এছাড়া সমুদ্রপথে নিরাপদে চলাচলের জন্য পর্তুগিজদের শুল্ক দিতে হতো। পর্তুগিজ বন্দরগুলিতে ভারতীয় জাহাজ প্রবেশ করলে তাদের কাছ থেকে শুল্ক আদায় করা হতো। কার্তাজ ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে প্রয়োগ করতে পর্তুগিজরা জলপথে রণতরীর বহর নিয়ে মাঝ সমুদ্রে টহলদারি প্রথা শুরু করেছিল এবং পর্তুগিজ আর্মাডা জল-আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয়েছিল। ষোড়শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ভারতের পশ্চিম উপকূলে এই ব্যবস্থা চালু হয়েছিল। কার্তাজ নিয়েও ভারতীয় জাহাজ যাতে অন্যত্র চলে না যায় সে জন্য এই ব্যবস্থা হয়েছিল। আসলে পর্তুগিজ বন্দরে শুল্ক দিতে হতো বলে ভারতীয় জাহাজ পর্তুগিজ বন্দরগুলি এড়িয়ে যেত।

ষোড়শ শতকে পর্তুগিজরা মূলত মসলার বাণিজ্য করত। ১৫১১ খ্রিস্টাব্দে তারা গোলমরিচ উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্র ভারত মহাসাগরের পূর্ব দিকে অবস্থিত মলুক্কাস দখল করে। তবে মালাবার (ভারত) থেকে তারা অধিকাংশ গোলমরিচ সংগ্রহ করতো। এছাড়া ঘোড়ার ব্যবসায়ে পর্তুগিজদের আকর্ষণ ছিল। তাদের গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি গোয়া ঘোড়া বাণিজ্যের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল।

গুজরাটি বণিকরা জাহাজে করে পারস্য ও লোহিত সাগরের বন্দরগুলিতে তাদের পণ্য পাঠাতো। তার মধ্যে মশলাও ছিল। পর্তুগিজরা মাঝ সমুদ্রে এইসব জাহাজের উপর আক্রমণ চালাতে শুরু করে। গুজরাটি বণিকরা এই পরিস্থিতিতে সমুদ্রপথে নিরাপদে চলাচলের জন্য পর্তুগিজদের কাছ প্রথা মেনে নিয়েছিল। ক্যাম্বে থেকে যাত্রা শুরু করে গুজরাটি জাহাজ দিউ-তে গিয়ে গিয়ে শুল্ক দিত। তারপর সেখান

থেকে পারস্য বা লোহিত সাগরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করত।

ষোড়শ শতকে যেসব ভারতীয় বন্দরগুলি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল ভারত মহাসাগরীয় বাণিজ্যে এবার তার কথায় আসা যাক। এক্ষেত্রে প্রথমেই গুজরাটের ক্যাম্বে, সুরাট ও দিউ-য়ের কথা বলতে হয়। মালাবার অঞ্চলের প্রধান বন্দর ছিল কালিকট আর পূর্ব উপকূলে বিজয়নগর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত অন্ধ্র উপকূলে মসুলিপত্তন। আর বাংলাদেশে ছিল চট্টগ্রাম, সপ্তগ্রাম ও হুগলি। তবে ষোড়শ শতকের প্রথমে বন্দর হিসেবে গুজরাটের সুরাটের তেমন নামডাক ছিল না। ক্যাম্বে বন্দরের দিনও তখন অস্তমিত। যদিও তার বাণিজ্য তখনও অব্যাহত। গুজরাটি বণিকদের আখড়া সেখানে। ক্যাম্বে থেকে নৌবহর মালাক্কা বন্দরে যাতায়াত করতো। তবে ক্যাম্বের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে ইতিমধ্যে দিউ ও সুরাট ক্রমশ প্রতিযোগিতায় নেমে পড়েছে। শেষ পর্যন্ত দিউ সে প্রতিযোগিতায় এঁটে উঠতে পারেননি। সুরাটই গুরুত্বপূর্ণ বন্দর হয়ে ওঠে। শুধু তাই নয়, এই শতকের শ্রেষ্ঠ বন্দর হয়ে উঠেছিল সুরাট।

সপ্তদশ শতকে সুরাট সমৃদ্ধির শিখরে উঠেছিল। গুজরাটি লেখক দেশাই, 'মুরৎ সেনানী মূরৎ' গ্রন্থে দেখিয়েছেন এই সময় কীভাবে গুজরাটি বাণিজ্যের রমরমা চলছিল। সুরাটের এই সমৃদ্ধির পশ্চাতে মুঘল সম্রাটদের ভূমিকা ছিল। তারা সুরাট বন্দরকে হজের জন্য নির্দিষ্ট বন্দর হিসাবে গণ্য করেছিলেন। প্রতিবছর মুসলমান তীর্থযাত্রীরা এই বন্দর দিয়ে মক্কায় হজ করতে যেতেন। এছাড়া এই বন্দরে বাণিজ্যের জন্য একটা বড় মুঘল নৌবহর ছিল। শাহজাহান স্বয়ং সুরাটের নৌ-বাণিজ্যে আগ্রহী ছিলেন এবং বিশেষ মনোযোগ দিতেন। তিনি সুরাট থেকে মোখা পর্যন্ত জাহাজ পাঠাতেন। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মসলা বাণিজ্যে অংশ নিতেন। সতীশচন্দ্রের লেখা থেকে জানা যায় ১৬৫০ খ্রিস্টাব্দে শাহজাহান গুজরাটে ৬ থেকে ৮টি জাহাজ তৈরির নির্দেশ দিয়েছিলেন। মীর জুমলা, শাহ সুজা-র মত শাসকবর্গও সমুদ্র বাণিজ্যে অংশ নিয়েছিলেন। মনে রাখতে হবে ভারতীয় বণিকরা ছোট জাহাজ চালাতেন। ওজনের হিসাবে ১০০ টনের মত। তার বেশি নয়। কিন্তু মুঘল রাজপুরুষদের জাহাজগুলি হত বিরাট ৫০০-৬০০ টনের। তবে ভারতীয়রা ইউরোপের ওজন পদ্ধতির ব্যবহার করত না। তারা বলতো খাণ্ডি। তিন খাণ্ডি সমান এক টন। সতেরো শতকের মধ্যবর্তী সময় শাহজাহান মুঘল জাহাজের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছিলেন। এই সময় থেকেই সুরাট থেকে ভারতীয় জাহাজ পারস্য উপসাগরে পণ্য নিয়ে যেতে শুরু করে। ডাচ ও ইংরেজদের জাহাজগুলির আগে থেকেই পারস্য উপসাগরে যাতায়াত করত। ফলে ভারতীয় জাহাজের সঙ্গে ইউরোপীয় জাহাজের প্রতিযোগিতা শুরু হয়। মনে রাখতে হবে, সুরাটের জাহাজি বণিকেরা অধিকাংশই ধর্মে ছিল মুসলমান। তবে হিন্দু বণিক বা সওদাগরদের যে জাহাজ ছিল না তা নয়, তবে সংখ্যা কম।

সতেরো শতকের দ্বিতীয়ার্ধে সুরাটের বণিকেরা নিজেদের বহর তৈরি করেছিল। ওই শতকের প্রথমার্ধে সুরাটে ষোলটির বেশি বাণিজ্যবহর ছিল না। বাকিগুলি যা ছিল সব মুঘলদের। ১৬৭০ খ্রিস্টাব্দে সুরাটে বাণিজ্যপোতের সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ায় সত্তরের বেশি। এই শতকের দ্বিতীয়ার্ধে সুরাট বন্দরের বিখ্যাত জাহাজি বণিক ছিলেন মোল্লা আব্দুল গফুর। তিনি তৎকালীন ভারতের শ্রেষ্ঠ সমুদ্র বণিক। ঔরঙ্গজেবের আমলে

সুরাটে মুঘলদের জাহাজের সংখ্যা কমে যায়। ধর্মপ্রাণ এই সম্রাট ধর্ম বুঝলেও বাণিজ্যে উৎসাহী ছিলেন না। তার আমলে অনেক মুঘল জাহাজ বিক্রি হয়ে যায়। সেই জাহাজের কয়েকটি আবার গুজরাটি বণিকরা ক্রয় করেন। সতেরো শতকের শেষের দিকে দুটির বেশি বড় মুঘল জাহাজ সুরাট বন্দর থেকে মোখার (লোহিত সাগরের বন্দর) উদ্দেশ্যে রওনা দেয়নি। অর্থাৎ সতেরো শতকের দ্বিতীয়ার্ধে সুরাটে গুজরাটি বণিকদের বাণিজ্যে রমরমা দেখা দেয়। অন্য দিকে মুঘলদের বাণিজ্য পোতের সংখ্যা হ্রাস পায়। এই সময় গুজরাটি বণিকরা নিজস্ব বাণিজ্য বহর তৈরি করে এবং সুরাটে স্বাধীন বণিক গোষ্ঠী তৈরি হয়।

সতেরো শতকের প্রথমদিকে ভারতীয় বাণিজ্যের চেহারাটা ছিল মোটামুটি এরকম—সমুদ্রে বড় জাহাজ যেগুলো চলতো সেগুলির মালিক ছিল রাজপুরুষেরা আর ছোট জাহাজগুলোর মালিক সওদাগর শ্রেণি। সংখ্যার দিক থেকে এই ছোট জাহাজগুলি ছিল বেশি। হজের যাত্রী পাঠাবার জন্য কয়েকখানি জাহাজ রেখে দিয়ে বাকি জাহাজগুলো বিক্রি করে দেন ঔরঙ্গজেব। এই সময় থেকেই গুজরাটি বণিকরা নিজেদের বাণিজ্য জাহাজে করে সমুদ্র পাড়ি দিতে থাকে। আকারে এই জাহাজগুলো বেশি বড় ছিল না যদিও, তবু দ'শ টন বা ছয়'শো খাণ্ডির কম নয়। সেকালে আব্দুল গফুরের এরকম সাতটি জাহাজ ছিল। বলা যেতে পারে যে মুঘল বাণিজ্য বহরকে সরিয়ে দিয়ে সুরাটের বণিকরা নিজেদের বাণিজ্য বহর তৈরি করেছিল।

সুরাটের এই বাণিজ্যিক সাফল্য ও ঐশ্বর্য অনেককে এ শহর লুণ্ঠনে প্রবৃত্ত করেছিল। সতের শতকের দ্বিতীয়ার্ধে শিবাজী দুবার সুরাট লুণ্ঠন করেন। এই শতকের শেষের দিকে লোহিত সাগর থেকে ফেরার পথে ইউরোপীয় বোম্বেটেরা (জলদস্যু) সুরাটের জাহাজগুলোকে আক্রমণ করত। এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হলেও সুরাটের বাণিজ্য কিন্তু থেমে থাকেনি।

সুরাটের দক্ষিণে ছিল আহম্মদনগর। আহমনগের বড় বন্দর চাউল। পর্তুগিজরা এর দক্ষিণে তৈরি করে অন্য আরেকটি বন্দর। সেটিও চাউল। নদীর মুখে পর্তুগিজদের বন্দর চাউল। আর নদীর ওপরের দিকে ভারতীয় চাওল। ষোল শতকে আহম্মদনগরের চাউল বিখ্যাত বন্দর ছিল। কিন্তু সতেরো শতকে আর আহম্মদনগরের চাউলের কোন খবর মেলে না। আর পর্তুগিজ চাউল বন্দর থেকে বাণিজ্য করা অসম্ভব হয়ে উঠেছিল।

চাউলের আরো দক্ষিণে ছিল দাভোল বন্দর। দাভোল ছিল বিজাপুরের বন্দর। সতেরো শতকে দাভোল বড় বন্দর ছিল। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বিজাপুরের সুলতানরা এখান থেকে বিদেশে জাহাজ পাঠাতেন। স্থানীয় শাসকরাও বাণিজ্যে অংশ নিতেন এবং সমুদ্র জাহাজ পাঠাতেন এগুলি সব বড় বড় ৬০০ টনের জাহাজ। আহম্মদনগরের মন্ত্রী সিদি অম্বরেরও জাহাজ ছিল। তিনি এই দাভোল বন্দর থেকেই তার জাহাজ ছাড়তেন। সুরাটের বণিকরা এই দাভোল বন্দর ব্যবহার করত। এখানকার জাহাজে তাদের পণ্য তুলে দিতো বিদেশে পাঠাবার জন্য। এ বন্দরের জাহাজগুলি পূর্ব দিকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে যেত। আর পশ্চিমে যেত লোহিত সাগরীয় অঞ্চলে। আদিল শাহের ছয়টি বড় জাহাজ, দাভোলের শাসনকর্তার

সম্ভবত তিনটি জাহাজ ও সিদি অম্বরের একটি জাহাজ দাভোল থেকে প্রতি বছর ছাড়তো। কিন্তু সপ্তদশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে সমুদ্রে জাহাজ দেখলেই ইংরেজরা আক্রমণ করত। লুণ্ঠনও চলতো। এই বন্দরের বাণিজ্য নষ্ট করাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। অবশেষে ১৬৩৫ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ ও ডাচদের যুগ্ম আক্রমণে ডাভোলের পতন হয়। তবে এসব ছাড়াও নিশ্চয়ই আরও বন্দর ছিল। কিন্তু সে সম্পর্কে তেমন তথ্য পাওয়া যায় না।

মালাবার উপকূলের শ্রেষ্ঠ বন্দর ছিল কালিকট। কোনো ইউরোপীয় বণিকদের কুঠি ছিল কিনা তা জানা যায় না। ঐতিহাসিকদের অনুমান সতেরো শতকে কালিকটে সমৃদ্ধি বা অবক্ষয় কোনটাই হয়নি। বন্দরে এক স্থিতাবস্থা বজায় ছিল। কালিকটের উত্তরে ছিল গোয়া। পর্তুগিজদের দখলে থাকা ষোড়শ শতকের সমৃদ্ধ ও গুরুত্বপূর্ণ বন্দর। কিন্তু সতেরো শতকে গোয়ার বাণিজ্যিক অবক্ষয় লক্ষ্য করা যায়। সতেরো শতকের শেষ দশকে বোম্বাই বন্দর হিসেবে ক্রমশ অগ্রগতির পথে অগ্রসর হচ্ছিল ইংরেজদের নেতৃত্বে।

পশ্চিম উপকূলে অধুনা কেরালা অঞ্চলে মালাবার উপকূলের বিখ্যাত বন্দর কালিকট গোলমরিচের বাণিজ্যকেন্দ্র। জাহাজে চড়ে এখান থেকে 'ব্ল্যাকগোল্ড' (গোলমরিচকে বলা হত) পাড়ি জমাতে লোহিত সাগর বা পারস্য উপসাগর অঞ্চলে।

ষোড়শ শতকে করমণ্ডল অঞ্চলের প্রধান বন্দর ছিল পুলিকট। বিজয়নগর সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ১৫৬৫ খ্রিস্টাব্দে তালিকোটার যুদ্ধে বিজয়নগর সাম্রাজ্য ধ্বংস হলে পুলিকট পতনের দিতে ধাবিত হয়। তার জায়গায় নতুন বন্দর হিসাবে আবির্ভূত হয় মসুলিপত্তন। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও পশ্চিম ভারত সাগর—দুই দিকেই এই বন্দরের জাহাজ যাতায়াত করতো। বন্দর হিসাবে ষোড়শ শতকে পুলিকট এবং সতেরো শতকে মসুলিপত্তন বিশেষ-উল্লেখযোগ্য। যার পশ্চাতের শক্তি ছিল গোলকুণ্ডা।

বঙ্গদেশে শেষ সময় কয়েকটি বন্দর গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। এই দুটি বন্দর হল চট্টগ্রাম ও সপ্তগ্রাম। চট্টগ্রাম থেকে নদীপথে গৌড় পান্ডুয়া পর্যন্ত আসা যেত। চট্টগ্রামের পশ্চিমে ছিল সপ্তগ্রাম। তবে সপ্তগ্রাম বন্দরে জল কমে যাওয়ায় বা সরস্বতী নদীতে পলি পড়ে যাওয়ায় সপ্তগ্রামের দক্ষিণে হুগলিতে পর্তুগিজদের নতুন বন্দর গড়ে ওঠে। শাহজাহান ১৬৩২ হুগলি থেকে পর্তুগিজদের উৎখাত করে। এই হুগলি ছিল মুঘল সাম্রাজ্যের পূর্ব দিকে বন্দর। এখান থেকে তারা পারস্যে বাণিজ্য জাহাজ পাঠাতো। রাজপুরুষেরাও এই বাণিজ্যে অংশ নিতেন।

পুলিকট বন্দরের সঙ্গে ভারত মহাসাগরের পূর্ব দিকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাণিজ্যকেন্দ্র মালাক্কা বন্দরের যোগাযোগ ছিল। এখানে ষোড়শ শতকে পর্তুগিজরা প্রথম আসে। ১৫১১ খ্রিস্টাব্দে তারা মালাক্কা অধিকার করে আলবুকার্কের নেতৃত্বে। ষোড়শ শতকের প্রথমে গুজরাটি বণিকদের আধিপত্য ছিল মালাক্কায়। গুজরাটি বণিকদের জাহাজেই সে-সময় মালাক্কা থেকে মসলা লোহিত সাগর ও পারস্য উপসাগরে রপ্তানি হতো। এছাড়া মালাক্কা ছিল তেলেগু বণিকরা যারা কেলিং বা ক্লিং সওদাগর নামে পরিচিত ছিল। এরা জাভার বণিকদের সাহায্যে পূর্ব ইন্দোনেশিয়া থেকে বিভিন্ন মশলা বিশেষত গোলমরিচ মালাক্কায় নিয়ে এসে

বঙ্গোপসাগরের বাণিজ্যে ছড়িয়ে দিত। বাংলার বণিকরাও মালাক্কায় যেত। আর ছিল চিনা বণিকরা। মালাক্কার সুলতান সমস্ত বণিকদের স্বাধীনভাবে ব্যবসা করতে দিতেন। বিভিন্ন দেশের ব্যবসায়ীরা মালাক্কা শহরে নিজেদের গোষ্ঠী গঠন করে পৃথকভাবে বাণিজ্য চালাতেন। তাদের দুটি গোষ্ঠী ছিল—গুজরাটি বণিক গোষ্ঠী ও কেলিং-দের নেতৃত্বে অন্যান্য বণিকবৃন্দ। এই পরিস্থিতিতে আলবুকার্ক এর নেতৃত্বে পর্তুগিজরা মালাক্কা আক্রমণ করে দখল করে নেয়। সে সময় তারা ছিল গুজরাটি বণিকদের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী। পর্তুগিজদের হাত থেকে বাঁচতে গুজরাটি বণিকরা মালাক্কা ছেড়ে চলে যায় এবং মালাক্কার নতুন রাজধানী জোহরে ও উত্তর সুমাত্রার আচে বন্দরে নিজেদের বাণিজ্য আবার গড়ে তোলে। অর্থাৎ মালাক্কা থেকে গুজরাটি বণিকদের ব্যবসা আচেতে সরে যায়। ১৫৩০ এর গুজরাটি বাণিজ্য গোলমরিচ ও অন্যান্য মসলা নিয়ে আচে থেকে লোহিত সাগরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করতো। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এই গুজরাটি বণিকদের সাথে ৩০০ বছরের মধ্যে কোন ইউরোপীয় বণিকদের সদ্ভাব গড়ে ওঠেনি। এর কারণ গুজরাটি বণিকরা যে পথে জাহাজ চালাতো, সেই একই পথে ইউরোপীয়রাও বাণিজ্য জাহাজ চালাতো। ফলে তাদের মধ্যে কখনও মিত্রতা হয়নি।

পর্তুগিজরা যখন মালাক্কা আক্রমণ করল, তখন সেখানকার কেলিং বণিকরা তাদের নেতা নীন চাটুর নেতৃত্বে শহর ত্যাগ করেছিল। যুদ্ধ মিটে গেলে তারা আবার মালাক্কায় ফিরে আসে ও সমুদ্র বাণিজ্যে মন দেয়। এইবার তাদের এই সামুদ্রিক বাণিজ্য প্রধান বন্ধু হয় পর্তুগিজ বণিকরা। গুজরাটি বণিকরা ফলে হয়তো খানিকটা সুবিধা পেয়েছিল। অবশ্য তাদের বহর পশ্চিম ভারত সাগরে যেত না। তার চার-পাঁচটা বাণিজ্য জাহাজ পুলিকট ও পেগুতে যাতায়াত করতো। পর্তুগিজদের সহযোগিতায় এই ব্যবসা চালাতেন এমনকি পর্তুগিজ জাহাজে নীন চাটুর পণ্য পরিবহন হত। এছাড়া সূর্যদেব নামে আরো এককেলিং ব্যবসায়ী ছিলেন যিনি তার জাহাজ পাঠাতে পুলিকটে। যদিও জাভার বাণিজ্যে তার বেশি উৎসাহ ছিল। প্রতিবছর একটি বড় জাহাজ গোয়া থেকে পুলিকট ও মালাক্কা যাতায়াত করতো। আরেকটি যেত পেগুতে ভায়া পুলিকট। অন্যদিকে পুলিকটের তামিল মুসলিম বণিকরা আগেও যেমন মালাক্কাতে জাহাজ পাঠাত এখনও তেমনি পাঠাতে থাকলো। প্রতিবছর পাঁচটি জাহাজ পুলিকট থেকে মালাক্কায় যাতায়াত করতো। মালাক্কার দখলের পর গুজরাটি বণিকরা পর্তুগিজদের শত্রু হলো বটে তবে করমণ্ডল উপকূলের মানুষ তথা পুলিকটের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক দৃঢ় হলো। মনে রাখতে হবে বিজয়নগরের সঙ্গে পর্তুগিজদের সুসম্পর্ক ছিল এবং এই সম্পর্ক তারা দৃঢ় রাখতে চাইতো। এসব কারণেই দেখা যায় যে পুলিকটের সঙ্গে মালাক্কার বাণিজ্য ষোল শতকের প্রথমার্ধে অবনতি হয়নি। পর্তুগিজরা এইসময় পুলিকট ও বঙ্গোপসাগরের বাণিজ্যের অবনতির কারণ হয়নি। কিন্তু ষোড়শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এই পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটল। প্রথমত ১৫৬৫ খ্রিস্টাব্দে তালিকোটার যুদ্ধে বিজয়নগরের পতন ত্বরান্বিত হয়। গোলকুণ্ডা সুলতান যেভাবে বিজয়নগর লুণ্ঠন করেছিলেন তাতে এ শহরের পতন সুনিশ্চিত হয়। বিজয়নগর ধ্বংস হওয়ায় পুলিকট বন্দরের পেছনের শক্তি নষ্ট হল। দ্বিতীয়ত, ষোড়শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে পর্তুগিজ নীতিতেও পরিবর্তন এল। এতদিন বঙ্গোপসাগর

অঞ্চলে তাদের বাণিজ্য চলত রাজকীয় দপ্তরের নিয়ন্ত্রণে। রাজার জাহাজে এতদিন পণ্য পরিবহন চলত। এখন থেকে ব্যক্তিগত বাণিজ্য জাহাজ চালাবার অনুমতি দিলেন পর্তুগালের রাজা। রাজার জাহাজের পাশে সে সময়ে পর্তুগিজ বেসরকারি জাহাজও চলতে শুরু করলো। ষোল শতকের প্রথম দিকে পর্তুগালের বঙ্গোপসাগরের বাণিজ্যের স্বাধীনতায় হাত দেয়নি। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে এসে পর্তুগিজ এই নীতিতে পরিবর্তন ঘটে। পুলিকট থেকে মালাক্কায় পাঁচটি জাহাজ যাতায়াত করলে বিশেষ অনুমতি প্রাপ্ত পর্তুগীজ জাহাজের লাভ কম হয়। সুতরাং পর্তুগাল নির্দেশ জারি করল যে পর্তুগিজ রাজকর্মচারী গোয়া থেকে পুলিকট হয়ে মালাক্কায় জাহাজ পাঠাবে। এই বাণিজ্যে তার একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠা হবে। এর অর্থ হলো এরপর থেকে আর কোনো ভারতীয় জাহাজ মালাক্কার উদ্দেশ্যে যাত্রা করতে পারবে না। এভাবে পুলিকটের ভারতীয় বণিকদের মালাক্কার সঙ্গে বাণিজ্য বন্ধ করার ব্যবস্থা হল। এর পরেই পুলিকট বন্দরের পতন ঘটল। সপ্তদশ শতকে প্রথমে যখন ডাচ বণিকরা পুলিকটে আসেন তখন বন্দরটির হতশ্রী দশা তাদের চোখে পড়ে। মাত্র দু-তিন হাজার লোকের বাস সেখানে। বন্দর থেকে পণ্য সামগ্রী জাহাজে করে সমুদ্রে পাড়ি দেয় না। সমুদ্র পাড়ি দেবার জন্য শহরের ব্যবসায়ীরা আরো উত্তর দিকে অবস্থিত নতুন বন্দরে, মসুলিপত্তনে, পণ্য পাঠায়। ষোলো শতকের প্রথমে ভারতের পূর্ব উপকূলে পুলিকট আর সতেরো শতকের প্রথমে মসুলিপত্তনের সামুদ্রিক বাণিজ্যে আধিপত্য লক্ষ্য করা যায়।

ঐতিহাসিক আরসরত্নমের মতে করমণ্ডল উপকূলের বন্দরগুলির সমৃদ্ধির পশ্চাতে স্থানীয় রাজনৈতিক শক্তির উত্থান-পতনের বিষয়টি জড়িত ছিল। বন্দরের সমৃদ্ধি আভ্যন্তরীণ রাষ্ট্রশক্তির উপর নির্ভরশীল ছিল। বিশেষত পুলিকট ও মসুলিপত্তনের ক্ষেত্রে। পুলিকটের পেছনে ছিল বিজয়নগরের ক্ষমতা। আর মুসলিপত্তনের উত্থানের পশ্চাতে ছিল কুতুবশাহী সুলতানের রাজধানী গোলকুণ্ডা। সুরাট যেমন আগ্রা, দিল্লির ওপর নির্ভরশীল ছিল, তেমনি মুসলিপত্তন গোলকুণ্ডার ওপর। তবে সুরাট দিল্লির সাথে বেশি ঘনিষ্ঠ হয়নি। ইউরোপীয় শক্তির বিরুদ্ধে তারা মুঘলদের ব্যবহার করেছিল মাত্র। কিন্তু মুসলিপত্তনের সঙ্গে গোলকুণ্ডা দরবারের ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। এ প্রসঙ্গে গোলকুণ্ডার রাজপুরুষ প্রশাসক ইরানি বণিক মীর জুমলার কথা প্রাসঙ্গিক। তিনি শাসনকর্তা ছিলেন, আবার ব্যবসায়ীও। মসুলিপত্তনের বণিকরা বিত্তশালী কিন্তু সুরাটের বণিকদের মত স্বাধীন নয়। লক্ষণীয় বিষয় হল, সপ্তদশ শতকে মুসলিপত্তনের জাহাজি বণিকগণ কিন্তু মালাক্কার সঙ্গে আর সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করল না। বদলে তারা উত্তর সুমাত্রার আচে বন্দর, ইরাবতী নদীর মোহনায় অবস্থিত পেগু-র সঙ্গে বাণিজ্য শুরু করলো। পশ্চিমদিকে পারস্য উপসাগরে জাহাজ পাঠালো। এর কারণ পর্তুগিজদের তারা বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করেনি।

মালাক্কা পর্তুগিজদের দখলে যাওয়ায় ভারত মহাসাগরের বাণিজ্য-পথে কয়েকটি পরিবর্তন সংঘটিত হয়। সুমাত্রার উত্তরে আচে বন্দর গুজরাটিদের প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র হয়। এশীয় বণিকদের বাণিজ্য জাহাজগুলি মালাক্কা প্রণালী ব্যবহার বন্ধ করে দেয়। পরিবর্তে সুমাত্রা ও জাভার মধ্যবর্তী সুন্দা প্রণালীর ব্যবহারে বাড়ে। উত্তর জাভার ব্যান্টম বন্দর ও উত্তর সুমাত্রার আচে বন্দরের বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি পায়। মসুলিপত্তনের

সাথে পেগু ও আচের বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে উঠলে পর্তুগিজরা মসুলিপত্তমকে শত্রু বন্দর রূপে গণ্য করে ও পর্তুগিজ বেসরকারি জাহাজ মুসলিপত্তনের বাণিজ্যে বহরগুলিকে আক্রমণ করত যাতে মুসলিপত্তমের সাথে আচে-র বাণিজ্য নষ্ট হয়। আবার আচে-র জাহাজ মসুলিপত্তনে এলে সেগুলিকেও পর্তুগিজরা আক্রমণ করত।

সমুদ্রের স্বাধীনতা রক্ষার এই প্রচেষ্টা তথা অবাধে সমুদ্রপথ ব্যবহার করার প্রয়াস প্রায় আড়াইশো বছর ধরে চলেছিল বিভিন্ন রূপে এবং এও ঠিক যে পর্তুগালও বঙ্গোপসাগরে তার এই আধিপত্য বেশিদিন ধরে রাখতে পারেনি। ষোড়শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ও সপ্তদশ শতকের প্রথমে মসুলিপত্তন, আচে ও পেগুর বণিকরা সমুদ্রে স্বাধীনতা রক্ষার এই প্রয়াস চালিয়েছিল। অন্যদিকে পর্তুগিজ শক্তি ক্রমশ আভ্যন্তরীণ দুর্নীতির কারণে দুর্বল হয়ে পড়েছিল। এই অবস্থায় ১৬৪১ খ্রিস্টাব্দে মালাক্কা দখল করে ডাচরা। এরপর শুরু হল ডাচদের আধিপত্যের যুগ। তাঁরা সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় অন্যান্য বণিকদের বাণিজ্য আটকাতে যথাসাধ্য চেষ্টা করে। সুরাট ও হুগলি থেকে যেসব জাহাজ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বাণিজ্যে যেত, সেগুলির উপর আক্রমণ চালাতো। তবু তারা এ বাণিজ্য বন্ধ করতে পারেনি। তবে ডাচরা ১৬১৯ খ্রিস্টাব্দে বাটাভিয়ার পত্তন ঘটায় এবং বাটাভিয়াকে কেন্দ্র করেই তাদের যাবতীয় ব্যবসা-বাণিজ্য ও কার্যক্রমের দিকে মনোনিবেশ করে। সেখানে বাণিজ্য করার ক্ষেত্রে প্রভূত বিধিনিষেধ জারি করে। এইসব বিধি নিষেধ মান্য করে বাণিজ্য করা জাহাজি বণিকদের পক্ষে ছিল এক প্রকার অসম্ভব। ফলে বঙ্গোপসাগরের তীরবর্তী বন্দরের বণিকরা বাটাভিয়ার সঙ্গে কখনও বাণিজ্যে লিপ্ত হয়নি।

সতেরো শতকের প্রথম দিকে বাংলাদেশের প্রধান বন্দর হল হুগলি। সপ্তগ্রাম তখন গুরুত্ব হারিয়েছে সরস্বতী নদীতে পলি সঞ্চিত হবার কারণে। তার স্থান নিয়েছে হুগলি। এখানে পর্তুগীজদের বাণিজ্য ঘাঁটি। ১৬৩২ খ্রিস্টাব্দে মুঘলরা হুগলি দখল করে নেয়। এরপর থেকে হুগলি হয় মুঘলদের প্রধান বন্দর। এই বন্দরে এক ইরানি ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব ছিল। তারা পারস্য উপসাগর অঞ্চলে বাণিজ্যিক পণ্য প্রেরণ করতো। যদিও তাঁদের সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। সেকালে হুগলির সঙ্গে সর্বাধিক বাণিজ্য হত বঙ্গোপসাগরের বন্দরগুলোর, শ্রীলঙ্কা বা মালদ্বীপ থেকে তারা কড়ি নিয়ে আসতো বা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মসলা বাণিজ্যে অংশ নিত। সপ্তদশ শতকের শেষদিকে হুগলির কুড়িটা জাহাজ এই বাণিজ্যে লিপ্ত ছিল। এই জাহাজগুলির বেশিরভাগই ছিল রাজপুরুষদের মালিকানাধীন। যেমন মীরজুমলা, শাহ সুজা, বিহার ও ওড়িশার দেওয়ান ও ডেপুটি গভর্নর, রাজমহল ও হুগলির ফৌজদার এরা সকলেই সমুদ্র বাণিজ্যে অংশ নিতেন।

সপ্তদশ শতকে করমণ্ডল উপকূলে ইউরোপীয় বণিকদের কর্মকাণ্ড পরিব্যাপ্ত ছিল। ইংরেজরা মাদ্রাজে বাণিজ্য ঘাঁটি প্রতিষ্ঠা করে ১৬৩৯ খ্রিস্টাব্দে। সেখানে তাদের ব্যবসা সমৃদ্ধি অর্জন করে। পণ্ডিচেরিতে ফরাসি ঘাঁটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৬৭৪ এ। ডাচরা উত্তর দিকের মসুলিপত্তন থেকে সতেরো শতকের শেষের দিকে সরে আসে নেগাপত্তনে। ধীরে ধীরে সেটিই তাদের প্রধান ঘাঁটি হয়ে ওঠে। ঘটনা হলো ভারতীয়

সওদাগররা এইসব ইউরোপীয় শহর এড়িয়ে চলতো। বিশেষ করে ডাচ বন্দরগুলো। ডাচরা নিয়মের বড় কড়াকড়ি করত যা ভারতীয়রা মানতে চাইতো না। আসলে ইউরোপীয় কোম্পানির চেয়ে ভারতীয় বণিকদের ব্যবসা বেশি হলেই তখন সমস্যা সৃষ্টি করত ইউরোপীয়রা। এই কারণে নেগাপত্তন চাইলেও তার দক্ষিণের বন্দর শহর নাগর থেকে মুসলমান 'চুলিয়া' বণিকদের নেগাপত্তনে আনতে পারেনি। মসুলিপত্তনের পতনের পর সেখানকার পাঠান বণিকরাও ইউরোপীয় বন্দরগুলোতে বেশি যায়নি। লক্ষণীয় যে, ইউরোপীয়দের এই শহরগুলি সপ্তদশ শতকে খুব একটা বৃহৎ আকার ধারণ করেনি। সবই ছিল মাঝারি মাপের। যেমন মাদ্রাজ। কলকাতা গড়ে উঠবে তারও পরে।

আরেকটি বিষয় প্রসঙ্গত মনে রাখা দরকার। উত্তর করমণ্ডলের পণ্য সামগ্রী মূলত পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলে যেত। আর দক্ষিণ করমণ্ডলের উৎপাদিত সামগ্রী যেত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়। দক্ষিণের কাপড় ছিল সস্তা। সে কারণেই ইউরোপীয় বণিকরা একসময় মসুলিপত্তন ছেড়ে দক্ষিণ করমণ্ডলে নিজেদের ভাগ্যান্বেষণ করেছিল। ভারতীয় বণিকেরাও এই দলে নাম লিখিয়েছিল।

ষোড়শ শতাব্দী ও সপ্তদশ শতকের প্রথমার্ধে এশিয়া থেকে মশলা রপ্তানির বাণিজ্যে পর্তুগাল আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছিল। ইউরোপীয় বাজারে মশলা রপ্তানি করে পর্তুগিজরা যে বিরাট মুনাফা অর্জন করেছিল তাতে আকৃষ্ট হয়ে ইংরেজ ও ডাচরা এশিয়াতে বাণিজ্য করার জন্য কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত করেছিল। এইভাবে প্রায় একই সময়ে 'ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি' ১৬০০ খ্রিস্টাব্দে ও 'ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি' ১৬০২ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে এই দুটি কোম্পানি এশিয় বাণিজ্যে পর্তুগিজদের পেছনে ফেলে দেয়। ফলে পর্তুগিজ বাণিজ্য গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে। এই শতকের মধ্যবর্তীকালে এই দুই কোম্পানি বাংলায় (হুগলিতে ইংরেজরা আর চুচুড়ায় ডাচরা) তাদের কুঠি স্থাপন করে বাণিজ্য শুরু করে সুশীল চৌধুরীর মতে, ষোড়শ শতকের শেষ দিক থেকে অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত বাংলার সর্বাপেক্ষা বৃহৎ বন্দর ছিল হুগলি। ফরাসিরা বাংলায় বাণিজ্য শুরু করে কিছুকাল পর ১৬৮০-র দশকে। এছাড়াও অষ্টাদশ শতকের প্রথম দিকে অপর দুই ইউরোপীয় কোম্পানি—ডেনিশ কোম্পানি ও অস্টেন্ড কোম্পানি—বাংলায় বাণিজ্য শুরু করে। ইংরেজ ও ডাচ কোম্পানির প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল এশিয়া থেকে ইউরোপে মশলা রপ্তানি করা। সেজন্য তারা মশলা দ্বীপপুঞ্জে (Spice Island) অর্থাৎ জাভা, মালয়, সুমাত্রা বোর্নিও যায়। ইউরোপ থেকে সোনা রূপা, বিশেষত রূপা নিয়ে তারা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় যায়। কিন্তু সেখানে গিয়ে তারা দেখে ওই দ্বীপগুলিতে সবচেয়ে বেশি চাহিদা সস্তা ও মোটা ভারতীয় কাপড়ের। ফলে তাঁরা ভারতে আসে। এখান থেকে সোনা-রূপার বিনিময়ে সস্তা রঙিন কাপড় কিনে তারা মশলাদ্বীপে গিয়ে সেখান থেকে মশলা সংগ্রহ করে। ভারতে এই ইউরোপীয় কোম্পানিগুলির প্রথম নজর পড়ে করমণ্ডল, বিশেষত মাদ্রাজ উপকূলের উপর। সেখানকার কাপড় সস্তা ও সহজলভ্যও বটে। কিন্তু সেখানকার রাজনৈতিক অস্থিরতা, যুদ্ধবিগ্রহ ও দুর্ভিক্ষ সুস্থ বাণিজ্যের পক্ষে অসুবিধাজনক হয়ে পড়ে। তখন এই কোম্পানিগুলি বাংলার প্রতি নজর দেয়। বাংলার কাপড় কেবল সস্তাই নয়, অন্যান্য অঞ্চলের কাপড়ের

তুলনায় উৎকৃষ্টও বটে। তাছাড়া বাংলায় সস্তা ও উন্নত মানের রেশম পাওয়া যেত। একারণে ইউরোপীয় কোম্পানিগুলি বাংলায় বাণিজ্য করতে শুরু করে। ক্রমশ বণিক থেকে তারা শাসকে পরিণত হয়।

২৩.৮ উপসংহার

এই আলোচনার প্রেক্ষিতে কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যেমন, ভারতের সমুদ্র বণিকরা দেশের কয়েকটি বিশেষ এলাকায় বাস করতেন। গুজরাটের সুরাট বন্দর, কেরালার উপকূলের কালিকট, করমণ্ডলের মসুলিপত্তন, নিম্ন-গাঙ্গেয় উপত্যকার হুগলি ছিল ভারত মহাসাগরে সমুদ্র বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র। এর মধ্যে সপ্তদশ শতকের মুঘল সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ বন্দর নগরী ছিল সুরাট। সুরাটের বণিকরা ভারত মহাসাগরের বিভিন্ন বন্দরের সঙ্গে ব্যবসায় লিপ্ত হয়েছিলেন। সপ্তদশ শতকে সুরাটের সমৃদ্ধি ছিল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সুরাটের গুজরাটি বণিকদের জাহাজগুলি লোহিত সাগরের মোখা পর্যন্ত যেত, সেখান থেকে কিছু জাহাজ আবার আরো পশ্চিমে জেড্ডা পর্যন্ত অগ্রসর হত। তবে এরপরে আর কোনো ভারতীয় জাহাজকে তার ওপাশে যেতে দেওয়া হতো না। গড়ে প্রায় ৪০টি গুজরাটি জাহাজ এই লোহিত সাগরীয় বাণিজ্যে প্রতিবছর নিযুক্ত থাকতো। প্রধানত গুজরাটি কাপড়, আগ্রা অঞ্চলের নীল, মালাবারের মশলা এই সবই রপ্তানি হত গুজরাটি জাহাজগুলোয়। এর বিনিময়ে ভারতে আসতো আরবি ঘোড়া, কফি, কিছু ফল আর প্রচুর টাকা। এভাবে কাঁচা টাকা কত যে আসতো তার সঠিক হিসাব জানা যায় না। মোখা বন্দরকে সে যুগে বলা হতো 'মুঘল সাম্রাজ্যের রত্নভাণ্ডার'। লোহিত সাগর ছাড়া প্রতি বছর গুজরাটি জাহাজের দশ শতাংশ পারস্য উপসাগর অঞ্চলে আর দশ শতাংশ বাংলায় যেত। সপ্তদশ শতকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় গুজরাটি বণিকদের জাহাজ গেলেও অষ্টম শতকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে তাদের বাণিজ্যে মন্দা দেখা দেয়। আর পূর্ব এশিয়ার (চীন-জাপান) সঙ্গে বাণিজ্য ছিল না বললেই চলে।

২৩.৯ অনুশীলনী

১. সপ্তদশ শতকের শেষার্ধে ও অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে ভারত মহাসাগরের বাণিজ্যে কী পরিবর্তন এসেছিল?

২. ভারত মহাসাগরের বাণিজ্যে অংশগ্রহণকারী বন্দরগুলির গুরুত্বের বিবর্তন আলোচনা করুন।

৩. ভারত মহাসাগরে নৌ-বাণিজ্যে ইউরোপীয় শক্তিগুলির ভূমিকা সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লিখুন।

২৩.১০ গ্রন্থপঞ্জি

❑ Das Gupta, Ashin (1966). *Malabar in Asian Trade, 1740-1800*. Cambridge University P*ress.*

- Das Gupta, Ashin (1979). *Indian Merchants and the decline of Surat : C. 1700-1750.* Franz Steiner Verlag.
- Das Gupta, Uma (2004). *The World of the Indian Ocean Merchant 1500-1800.* Collected Essays of Ashin Das Gupta. Oxford University Press.
- Raychaudhuri, Tapan, Habib, Irfan & Kumar, Dharmam, (2009). *The Cambridge Economic History of India. Vol. 1 C, 1200-C. 1750.* New Delhi Orient Black Swan.
- Prakash, Om (2004). *Bullion for Goods European and Indian merchants in the India Ocean trade 1500-1800.* Manohar Publishers.
- Arasartnam, Sinnappah (1986), *Merchants, Companies and Commerce on the Coromondel Coast, 1650-1740.* Oxford University Press
- Chaudhury, Sushil, Morineau, M., & France, P. (1999). *Merchants Companies, and Trade: Europe and Asia in the Early Modern Era.* Cambridge University Press.
- রায়, অনিরুদ্ধ (1987), *মধ্যযুগের ভারত,* কে. পি. বাগচী অ্যান্ড কোম্পানি
- ভদ্র, গৌতম (1991), *মুঘল যুগে কৃষি-অর্থনীতি ও কৃষক বিদ্রোহ,* সুবর্ণরেখা
- দাশগুপ্ত, অশীন (2011), *প্রবন্ধ সমগ্র,* আনন্দ পাবলিশার্স।
- চৌধুরী, সুশীল, *সমুদ্র বাণিজ্যের প্রেক্ষিতে স্থল বাণিজ্য,* আনন্দ পাবলিশার্স
- নাথ, প্রত্যয় ও সেনগুপ্ত, কৌস্তভ মণি (2021), ইতিহাসের বিতর্ক, বিতর্কের ইতিহাস, *অতীতের ভারত ও আজকের গবেষণা,* আনন্দ পাবলিশার্স।

—

NOTE

NOTE

NOTE